প্রথম সংস্করণ : পৌষ : ১৩৫৫

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত



'ডাকঘর'-অভিনয়ের শেষ দৃশ্য

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ ১ম ও ২য় খণ্ড এখন একত্রে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল। পূর্বতন দুই খণ্ডের অধ্যায়গুলি বর্তমান গ্রন্থে পুনর্বিন্যস্ত এবং সেই সঙ্গে নূতন তিনটি অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। আরও অতিরিক্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটকসমূহের বিশদ বিবরণ মুদ্রিত হ'ল পরিশিষ্টে। পূর্বতন দুই খণ্ড আর প্রকাশিত হবে না।



শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক তাসের দেশের অভিনয় [বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ ঃ প্রথম খণ্ড

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

তখন ইংরাজি ১৯৪২ সালের প্রথম দিক্। জাপানী বোমার আতঙ্কে কলিকাতা জনহীন প্রায়। প্রতিকার না করিলে নয়—অথচ প্রতিকারের উপায় হাতে নাই; তখন কোনো একটা গুরুতর কাজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে পারিলে পারিপার্শ্বিক বিস্মৃতিতে এক প্রকার শান্তি পাওয়া যায়। এই রকম অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম।

কাজটি হাতে লইবার সময়ে তাহার বিরাটত্ব বুঝিতে পারি নাই। কাজের মধ্যে অনেকটা অগ্রসর হইবার পরে, ফিরিবার পথ যখন সংকীর্ণ, তখন বুঝিলাম যে, বিষয়টি যেমন মনে করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি ব্যাপক। কাজ খানিকটা অগ্রসর হইলে বিষয়ান্তর মনকে আকর্ষণ করিল। অনেক বিষয়ে যাহার লিখিবার অভ্যাস কোনো একটি বিশেষ বিষয় তাহাকে দীর্ঘকাল আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না। ফল হইল এই যে, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কখনো কখনো দুই-চারিটা অধ্যায় সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থাকারে সজ্জিত করিতে আর উৎসাহ পাই নাই। বুঝিলাম সম্পূর্ণ শেষ করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ হইয়া উঠিবে না। তাই খণ্ডশ প্রকাশ করা স্থির করিলাম। প্রথম খণ্ড বাহির হইল। এখন যদি প্রকাশিত পুস্তকের মোহ বাকি খণ্ডগুলিকে প্ররোচিত করিয়া বাহির করিতে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডে তত্ত্বনাট্য, তৃতীয় খণ্ডে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটক এবং চতুর্থ খণ্ডে প্রাসঙ্গিক সাধারণ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু সে ইচ্ছাই, ততোধিক কিছু মনে করিতে কাহাকেও বলি না।

এই গ্রন্থ কাহার কাজে লাগিবে?

রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী পাঠক বিষয়ের গৌরবে বইখানা একবার দেখিবেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ পাঠকের আকর্ষণ হইবার কথা নয়, হইলে বইখানা পড়িতে অন্তত মন্দ লাগিবে না, মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে, আর কিছু না হোক রবীন্দ্রসাহিত্যের নমুনা তো পড়া হইবে।

পরীক্ষার্থী ছাত্রসমাজের কি এ বই কাজে লাগিবে? আমাদের দেশে যে রীতিতে পরীক্ষা হইয়া থাকে তাহাতে না লাগিবারই কথা। এদেশের ছাত্রসমাজে পাঠ্য বই লিখিবার জন্য বিশেষ এক রীতি অনুসৃত হয়। ছাত্র-পাঠ্য সাহিত্যের বাহিরে সেই রীতি বা সেইসব লেখকের বড় দেখা পাওয়া যায় না। অনেকের ধারণা আমাদের ছাত্ররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সব বিষয়েই সমাজের অগ্রণী, কেবল বই পড়িবার সময় পশ্চাৎপদ কল্পনা করিয়া যাঁহারা ছাত্র-পাঠ্য সরল পুস্তক লিখিয়া থাকেন—তাঁহারা আর যাই করুন ছাত্রসমাজের প্রতি সম্মান দেখান না। এ বইখানা আমি বিশেষ ভাবে ছাত্রসমাজের জন্য লিখি নাই—এবং সেইজন্যই ভরসা করিতেছি তাহাদের কাজে লাগিবে, আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কের রসদ যোগাইতে পারিবে—এমন কি পরীক্ষা ব্যাপারেও হয়তো অকেজো হইবে না।

লেখক

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এবারে পুস্তকখানিতে নূতন একটি অধ্যায় ও একটি নির্ঘণ্ট সংযোজিত হওয়াতে বইয়ের আকার কিছু বাড়িল, মূল্যও কিছু বাড়িল।

প্রকাশক

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহের দ্বিতীয় খণ্ডের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্তমান সংস্করণে ছয়টি নূতন আলোচনা যুক্ত হইল। বর্তমান গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগুলি আমার লিখিত অন্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল। বলা বাহুল্য, সেই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে এগুলি আর সন্নিবিষ্ট হইবে না।

প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডে কেবল তত্ত্বনাট্যের আলোচনা ছিল, এবারে তৎসঙ্গে যুক্ত হইল প্রহসনগুলির আলোচনা।

নাট্যপ্রবাহের আরও একটা খণ্ড লিখিলে অবশিষ্ট রবীন্দ্রনাট্যের আলোচনা শেষ হইবে। কবে তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিব জানি না, তবে ইচ্ছার অভাব নাই।

গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের প্রকাশক কল্যাণীয় শ্রীমান প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক অতি দ্রুত গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করিয়া লেখকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

তত্ত্বনাট্য

প্রহসন

রূপান্তর ও নামান্তর

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ

[পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ]



'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ [বিশ্বভারতীর সৌজ



'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

গীতিনাট্য

বাল্মীকি-প্রতিভা

বাল্মীকি-প্রতিভা ১৮৮১-তে প্রকাশিত। পর বৎসর ১৮৮২-তে কালমৃগয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

"১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে (২০-এ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬) পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, কালমৃগয়ার কিয়দংশ তখনই ইহাতে যুক্ত হয়।"[১]

"পরে, এই গীতিনাট্যের (কালমৃগয়ার) অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।"[২]

"মায়ার খেলা ১২৯৫ (১৮৮৮) সালের অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।...মায়ার খেলার প্রথম সংস্করণ ও বর্তমান সংস্করণে প্রভেদ অতি সামান্য।"[৩]

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানে প্রচলিত বাল্মীকি-প্রতিভা আসলে তাহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। কালমৃগয়ার বহুলাংশ বাল্মীকি-প্রতিভায় যুক্ত হওয়াতে তাহা অচলিত সংগ্রহের পূর্বে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। মায়ার খেলা প্রায় অবিকল আছে।

এক্ষণে বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিত্যক্ত কালমৃগয়াও ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। মায়ার খেলা রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই তিনখানিই যদিচ গীতিনাট্য তবু ইহাদের মধ্যে জাতিগত ভেদ আছে। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়াতে নাট্যরস মুখ্য, সঙ্গীত

---

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫৪৮।

২ জীবনস্মৃতি, বাল্মীকি-প্রতিভা, র-র, ১৭শ খণ্ড, পৃ ৩৮২।

৩ র-র, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬২৯-৬৩।

গৌণ্য ; আর মায়ার খেলাতে গীতিরসই প্রধান—নাট্যরস গৌণস্থান অধিকার করিয়াছে। বস্তুত মায়ার খেলাই বিশুদ্ধ গীতিনাট্য।

"এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলির অধিকাংশই দিশি, কিন্তু গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে ; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষ-ভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি গানভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো—এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।...... বস্তুত, বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদগ্রহণ সম্ভব নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা ; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।......

"হর্বর্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না—কথার সঙ্গে সুর থাকে, এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া

মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসঙ্গত রীতিমত সঙ্গীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ, ইহাতে তালের কড়াক্কর বাঁধন নাই—একটা লয়ের মাত্রা আছে, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা—কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।

"বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া।···

"ইহার অনেক কাল পরে মায়ার খেলা বলিয়া আর একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।"[১]

সঙ্গীতের এই নূতন পরীক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও নানা কারণে বাল্মীকি-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১ জীবনস্মৃতি, বাল্মীকি-প্রতিভা, র-র, পৃ ৩৮১-৩৮৩।

এই নাটক লিখিবার সময়ে তিনি যে অপূর্ব উত্তেজনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকটা বাল্মীকির ছন্দ-লাভের 'অপূর্ব উদ্বেগে'র অনুরূপ। সঙ্গীতের নূতন পরীক্ষা, যৌবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে চৈতন্য, অভিনয়ের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ সব মিলিয়া কবিকে যেন মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

"বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্বমূর্তিও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধানিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত।

"এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাটক লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি বাংলার বাছ-বিচার নাই।...

"তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না;—তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরলবিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নবযৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুর ভাবে

ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমন করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি।”[১]

বাল্মীকি-প্রতিভা সম্বন্ধে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বাল্মীকির ছন্দ-লাভ কাহিনীটির প্রতি কবির মনের একটি স্বাভাবিক নিগূঢ় আকর্ষণ ছিল—খুব সম্ভব এই আকর্ষণ তাঁহার অগোচরে তাঁহাকে এই কাহিনীর দিকে টানিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। পরিণত বয়সেও এই কাহিনীর উত্তেজনা পুনরায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়।

আদিকবির ছন্দ-লাভ যে-কোনো কবির পক্ষেই আকর্ষণজনক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেন ইহার বিশেষ অর্থ ছিল। সরস্বতী কর্তৃক বাল্মীকিকে বীণা উপহারদান—বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার

'আমি বীণাপাণি, তোরে শিখাতে এসেছি গান,
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ…'

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আশ্চর্যভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বিস্ময়কর ভাবে Prophetic।

রবীন্দ্রনাথই এখানে বাল্মীকি, তিনিই নূতন ভারতবর্ষের আদিকবি।

রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে এই নাটকের ঘটনার কিছু কিছু প্রভেদ আছে। বাল্মীকির কালীপূজা, সরস্বতীর বালিকার ছদ্মবেশে বাল্মীকিকে ছলনা নূতন। এই বালিকাটির ছলনায় ও করুণায় আগে হইতেই বাল্মীকির মন বিগলিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছিল, এমন সময়ে চূড়ান্তরূপে আসিল ক্রৌঞ্চবধের ঘটনা। পূর্ব হইতেই বাল্মীকির হৃদয়কে এই নূতন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া কবি রামায়ণের ঘটনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

বাল্মীকি কালীপূজা পরিত্যাগ ও জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর

১ জীবনস্মৃতি, বাল্মীকি-প্রতিভা, পৃ ২০৪-২০৬।

আরাধনার মধ্যেও গভীরার্থ নিহিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যথাস্থানে ইহার আলোচনা করিয়াছি।

বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়ার বনদেবীগণ ও মায়ার খেলার অদৃশ্য মায়াকুমারীগণ—একই ভাবের রকমফের মূর্তি। ইহারা অনেকটা বিদেশী নাটকের কোরাসের অনুরূপ—নাটকের মূল অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। তানপুরায় যেমন গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত মূল সুরটিকে ধরিয়া রাখে, অনেকটা তেমনি। ইহারাই নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকের 'গানের দল'-এ পরিণত হইয়াছে।

কালমৃগয়া বাল্মীকি-প্রতিভার মতো উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ বাল্মীকি-প্রতিভার ঘটনার প্রতি কবি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, ইহাতে তাহার অভাব ছিল। কালমৃগয়ার ঘটনার প্রতি কবির যে আকর্ষণ তাহা কেবল শিল্পগত. মর্মগত নহে। বিশেষ বাল্মীকি-প্রতিভার প্রাথমিক সাফল্যকে কবি পুনরায় কালমৃগয়ায় অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এ রকম প্রচেষ্টা প্রায়ই সার্থক হয় না। খুব সম্ভব এইসব কারণেই কালমৃগয়ার যতটা-সম্ভব অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া কবি পরবর্তী কালে কালমৃগয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মায়ার খেলা

মায়ার খেলা গীতিনাট্য হইলেও অন্য জাতের নাটক। ইহাতে সঙ্গীতটাই মুখ্য, নাট্যঘটনা নিতান্ত গৌণ ; কাজেই এই গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথের গীতিপ্রধান প্রতিভা বিকাশের যেমন পূর্ণ সুযোগ ঘটিয়াছে, তেমনি আবার নাট্য-ব্যাপার গৌণ হইয়া পড়াতেও তাঁহার সুবিধা হইয়াছে। নাটকের ঘটনা-শৃঙ্খলা ইহাতে এমনি অস্পষ্ট যে, পাছে বুঝিতে অসুবিধা হয় তাই একটি বস্তুসংক্ষেপ ইহার প্রথম সংস্করণের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

মায়ার খেলার গল্পাংশ সংক্ষেপে এই রকম। অমর মানসী প্রতিমাকে জগতে খুঁজিতে বাহির হইল, শান্তা যে তাহাকে নীরবে ভালোবাসে তাহা জানিতেও পারিল না।

প্রমদার উপবনে আসিয়া হাস্যময়ী চপলা প্রমদাকে দেখিয়া সে ভালোবাসিয়া ফেলিল। অমরকে দেখিয়া প্রমদার মনেও ভালো-বাসার উন্মেষ হইল। কিন্তু লজ্জাতে কেহ কাহাকেও প্রেম নিবেদন করিতে পারিল না। অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শান্তার প্রেম তাহার প্রতি নিশ্চল আছে। সে শান্তাকে বিবাহের আয়োজন করিল। ইতিমধ্যে অমরের সন্ধানে সখীগণসহ প্রমদা মিলনোৎসবের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। "সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদ-প্রতিমা প্রমদার নিতান্ত দীন করুণভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হাত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও আর সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল—'আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন। এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাকো।' অমর শান্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল—'আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভগ্নসুখ ম্লানমালা কাহাকে দিব, কে লইবে?'—শান্তা ধীরে ধীরে কহিল—'আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল, প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনে সুখনিশা অবসান হইয়াছে—এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শুনাইব।' অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল—"[১]

---

১ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মায়ার খেলা, ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

মায়ার খেলার কবিলিখিত প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে আছে—"আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"

পূর্বরচিত সেই নাটকাটি 'নলিনী'। ইহা এক্ষণে অচলিত সংগ্রহের ১ম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

'নলিনী'র গল্পাংশ এইরূপ।

নীরদ নলিনীকে ভালোবাসিত। বালিকা স্বভাবত চপলা—তখনো তাহায় হৃদয়ে প্রেমোন্মেষ হয় নাই: সে নীরদের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারে নাই।

নীরদ বিদেশে গিয়া প্রেমময়ী গম্ভীর নীরজাকে বিবাহ করিয়া দেশে আনিল।

ইতিমধ্যে নলিনীর হৃদয়ে প্রেমোন্মেষ হইয়াছে, সে এখন নীরদের বিরহে মৃতপ্রায়।

নীরজা উভয়ের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া সে নীরদ ও নলিনীর মিলন করাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

দুইটি নাটকের মধ্যে ভাবের ঐক্য আছে বটে। দুটি নাটকেই প্রেমের দুটি করিয়া মূর্তি দেখানো হইয়াছে। প্রেমের একটি রূপ চপল, হাস্যময়, মোহ তাহার প্রধান অঙ্গ। আর একটি মূর্তি গভীর, গম্ভীর, তাহাকে প্রেমের আশ্রয় বলা যাইতে পারে। স্বভাবত মানুষ প্রেমের চপলতায় মুগ্ধ হয়, কিন্তু চপলতা বেশিদিন শান্তি দিতে পারে না, আবার সে অবজ্ঞাত অনাদৃত প্রেমের আশ্রয় স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রেমের মোহভঙ্গ হইলে তবেই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে।

'নলিনী' নাটকে নলিনী প্রেমের চপল মূর্তি। সে নিজেও যেমন হৃদয়ের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই, নীরদও তেমনি ভুল

করিয়াছে। গম্ভীর প্রেমময়ী নীরজাকে নীরদ বিবাহ করিল; নীরজা ভগ্নমোহ প্রেমের পরম আশ্রয়।

নীরদ শেষ পর্যন্ত এই আশ্রয়স্বরূপিণীকে ত্যাগ করিয়া নলিনীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু দুঃখভোগের দ্বারা নলিনীও তখন তাহার পূর্ব চপলতা পরিহার করিয়াছে; তখন সে প্রেমের স্বরূপ খানিকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছে।

কবি মায়ার খেলাকে নলিনীর সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। বাস্তবিক মায়ার খেলা নলিনী নাটকের ভাবগত সংশোধন ছাড়া আর কিছু নয়।

নলিনী ১৮৮৪-তে লিখিত; মায়ার খেলা ১৮৮৮-তে। এই চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা কবিকে কিয়ৎপরিমাণে প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে যেন সাহায্য করিয়াছে, তাহারই ফলে নলিনীর ভাবগত ভ্রান্তি মায়ার খেলায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে শোধিত হইয়াছে।

অমর গম্ভীর-প্রকৃতি শান্তাকে অবহেলা করিয়া চপলা প্রমদাকে ভালোবাসিল। কিন্তু ভালোবাসার প্রতিদান না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে শান্তাকে আশ্রয় করিল। ইতিমধ্যে প্রমদার প্রেমোন্মেষ ঘটিয়াছে, সে অমরের সন্ধানে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অমর ও শান্তার মিলনের পরম মুহূর্ত। অমরের মন পুনরায় প্রমদার-জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারে প্রমদা বুঝিতে পারিয়াছে বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া ফল নাই—সে ফিরিয়া গেল। তখন অমর সঙ্কটে পড়িল, তাহার প্রত্যাখ্যাত প্রেম কে লইবে? শান্তা কি আর গ্রহণ করিবে? কিন্তু শান্তা অতিবড় রিয়ালিস্ট, সে অমরের প্রেম অম্লানচিত্তে গ্রহণ করিল।

মায়ার খেলা নাটিকায় কবি প্রেমকে আশ্রয়ে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। নলিনী নাটকেও প্রেম আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাস্তবের আঘাতে শেষ পর্যন্ত আশ্রয়টাই ভাঙিয়া পড়িল। নীরদ শেষ পর্যন্ত নলিনীর হাতে গিয়া পড়িল। এখানে

নলিনীর প্রতিই অর্থাৎ প্রেমের মোহের প্রতিই যেন কবির অন্তরের আকর্ষণ; নীরজাকে অর্থাৎ প্রেমের আশ্রয়কে বাধ্য হইয়াই যেন আনিয়াছেন এবং প্রথম সুযোগেই মৃত্যুর সুলভ সমাধানের দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছেন।

মায়ার খেলাতে এত সহজ সমাধান তিনি গ্রহণ করেন নাই। দুঃখকে বাদ দিয়া প্রেমের কল্পনা তিনি করেন নাই। মায়ার খেলার অবসান প্রেমে, কিন্তু সে প্রেম দুঃখের সঙ্গে জড়িত। শান্তা, অমর প্রমদা কেহই সুখী হইল না, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রেমের স্বরূপকে চিনিতে পারিল—ইহা সুখ না হইলেও মহৎ সান্ত্বনা।

এই দুটি নাটকেই দেখা যায় যে, প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধারণার পূর্বাভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রথমত, তাঁহার ধারণা এই যে, প্রেমের পরিপূর্ণতার জন্য দুঃখ ও বিরহের প্রয়োজন আছে। এই ভাবটি কবির পরিণত বয়সের নাটক, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধে অবিরল।

মায়ার খেলাতে দেখি—শান্তা অমরকে বলিতেছে—

যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জন,
তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত মোহের কথা আমি কহিব।

শান্তা যাহা মৃদুভাবে, সমবেদনার সঙ্গে বলিয়াছে, চিত্রাঙ্গদাও ঠিক সেই ভাবটি আত্মপরিচয়ের শেষ মুহূর্তে প্রকাশ করিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা সগর্বে, স্বহস্তে মোহযবনিকা অপসারিত করিয়া সাহসের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়াছে আর শান্তা ঘটনাচক্রে অপসারিত মোহযবনিকার প্রান্তে নীরবে প্রশান্তভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছে।

প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ধারণা এই যে, প্রেমের মোহ

বা রোমান্সের চেয়ে মানুষের পক্ষে প্রেমের আশ্রয়ের প্রয়োজন বেশি। এই ভাবটিও কবির বহু রচনায় আছে।

প্রমদা ও নলিনী প্রেমের মোহ। শান্তা ও নীরজা প্রেমের আশ্রয়; চোখ মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের অল্প, কিন্তু জীবন স্নিগ্ধ করিবার ক্ষমতায় তাহারা অসাধারণ।

নলিনী নাটকে নীরজার মৃত্যুতে সেই আশ্রয়ভঙ্গ। মায়ার খেলাতে সেই আশ্রয়ে অমরের প্রত্যাবর্তন। প্রমদা কাঁদিল। তাহার আর উপায় কি? প্রেমের খেলায় "এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল।" সুখের জন্য প্রেম নয়, এবং মোহে প্রেমের চূড়ান্ত নয়। "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।"

দুঃখের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো.
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।

ইহাই মায়ার খেলার ধুয়া। আবার রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের ধুয়াও ইহাই।

রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্ব বলে যে—প্রেমের পূর্ণতার পক্ষে দুঃখের আবশ্যক। প্রেমে মোহ আছে বটে তবে তাহা প্রাথমিক মাত্র, সেই মোহ কাটাইয়া প্রেমের আশ্রয়ে পৌঁছানো দরকার—নতুবা প্রেম চিরস্থায়ী হয় না।

কিন্তু নাট্য, এমনকি গীতিনাট্য হিসাবে মায়ার খেলার অসাধারণত্ব নয়। গান হিসাবেই মায়ার খেলা অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলার আগেও গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মায়ার খেলায় আসিয়া তাঁহার গানের কলম যেন খুলিয়া গিয়াছে; তাহার কারণ, এতদিনে তিনি তাঁহার প্রতিভার অনুকূল জীবনবস্তু খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া tour-de-force' কিন্তু মায়ার খেলাতে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক প্রতিভার প্রথম ও অসংশয়িত উন্মেষ।

কাব্যনাট্য

চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ ও লক্ষ্মীর পরীক্ষাকে কাব্যনাট্য বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, সতী ও লক্ষ্মীর পরীক্ষাতে নাটকের গুণ অপরগুলির চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণে আছে, কিন্তু তাহা এত যৎসামান্য যে, কাব্যনাট্য পর্যায়ে ফেলিলে ইহাদের মর্যাদাহানির কোনো সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

এগুলিকে কাব্যনাট্য বলিবার তাৎপর্য এই যে, কাহিনী-রীতি এবং নাটকীয় রীতির সমন্বয়ে এগুলি গঠিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সময়টাকে কবির বাহন-পরীক্ষার যুগ বলা হইয়াছে। তিন শ্রেণীর বাহন লইয়া তিনি পরীক্ষা সুরু করিয়াছিলেন ; কাহিনী—যথা, বনফুল ও কবি-কাহিনী ; নাটক—যথা, রুদ্রচণ্ড ও নলিনী ; আর লিরিক বা গীতিশ্রেণীর কবিতা, যাহার অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে শৈশব-সঙ্গীত সংগ্রহে। এই তিন শ্রেণীর বাহনকে মিলাইয়া মিশাইয়া আবার মিশ্রবাহন রচনা করিবার পরীক্ষাও কবি সঙ্গে সঙ্গে করিতেছিলেন ; দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা যায় যে, গান ও নাটকের মিশ্রণে রচিত বাল্মীকি-প্রতিভা এবং কালমৃগয়া ; আবার নাটক ও কাহিনীর মিশ্রণে রচিত ভগ্নহৃদয়ের মতো কাব্যনাট্য। ভগ্নহৃদয়ের আকৃতিটা নাটকের হইলেও প্রকৃতিটা কাহিনীকাব্যের। পাছে আকৃতির মোহে পড়িয়া কেহ ইহাকে নাটক মনে করে তাই কবিকে ভূমিকায় বলিতে হইয়াছে যে "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক না মনে করেন।" ইহা বস্তুত কাব্য এবং কাহিনীকাব্য ; কবিকাহিনী ও বনফুলের সহিত প্রকৃতিগত ঐক্য তাহার, যদিচ আকৃতিতে নাটকীয় লক্ষণ দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

বর্তমান অধ্যায়ের কাব্যনাট্যগুলির আলোচনায় 'ভগ্নহৃদয়'-এর

বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ এগুলি ভগ্নহৃদয়ের মিশ্ররীতির পরীক্ষার পরীক্ষোত্তীর্ণ ফল। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘাকারের কাহিনীকাব্য আর লেখেন নাই, বনফুল এবং কবিকাহিনীর ধারা পরিত্যক্ত, কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত একথা বলা উচিত হইবে না, যেহেতু কাব্যনাট্যপর্যায়ে কাহিনী-কাব্যের মিলন রহিয়া গিয়াছে। কাব্যনাট্য কাহিনী ও নাটকের মিশ্ররীতির রচনা।

এই মিশ্ররীতিই রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভার যথার্থ বাহন, সেই কারণে বর্তমান আলোচ্য কাব্যনাট্যগুলিকে রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহের শ্রেষ্ঠফল বলা যাইতে পারে। এই মিশ্ররীতিতে নাট্যকারের দায়িত্ব লঘু, অথচ কবির কৃতিত্বপ্রকাশের অবকাশ প্রচুর, ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এখানে আপনার পক্ষ মেলিবার সুযোগ পাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ কখনোই বিশুদ্ধ নাটকীয় কৌশলকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। নাটকের মূল রহস্য এই যে, নাট্যকারকে একই সঙ্গে নাটকের পাত্রপাত্রীর গভীরতার মধ্যে তলাইয়া যাইতে হইবে আবার সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটিকে অনিবার্য পরিণামের দিকে দুর্নিবার বেগে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। গতির এই দ্বিত্ব গভীরতামুখী ও পরিণামমুখী, শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে এই দুই গতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারেন না, অন্তত সম্পূর্ণভাবে, সুনিপুণভাবে পারেন না। তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা অন্তর্মুখী, পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতার দিকে তাঁহার ঝোঁক বেশি; নাটকীয় পরিণামমুখী সক্রিয় সচলতার প্রতি তাহার একটা অবহেলার ভাব আছে। কাজেই বিশুদ্ধ নাটকে এই দ্বিত্বগতির বিপরীতমুখী প্রেরণায় তাঁহার প্রতিভা যেন আংশিক বাধাগ্রস্ত; কখনো কখনো আলৌকিক শক্তির সাহায্যে কতক-

পরিমাণে তিনি সফলতা লাভ করিয়াছেন, যেমন রাজা ও রাণীতে, মালিনীতে ও বিসর্জনে।

কিন্তু এই কাব্যনাট্যগুলির সুবিধা এই যে, ইহাতে পরিণামের অনিবার্য আহ্বান নাই; কেবল পাত্রপাত্রীর মানসিক গভীরতার বিশ্লেষণের সুযোগ আছে; পরিণামের তাগিদে বিশ্লেষণের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছুটিবার প্রয়োজন ইহাতে নাই; রহিয়া বসিয়া গভীরতার মধ্যে তলাইয়া যাইবার ইহাতে প্রশস্ত অবকাশ। এই কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু ঘটনার সমগ্রতা নয়, ঘটনার এক-একটি খণ্ড, পঞ্চাঙ্ক নাটকের ইহা যেন পঞ্চম অঙ্কটি।

এই কাব্যনাট্যগুলিতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কিছুই ঘটিতেছে না; যাহা ঘটিবার তাহা পূর্বেই ঘটিয়াছে; এখন সেইসব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ, এখন কেবল অনুতাপ ও পরিতাপ, আবেদন-নিবেদন ও আত্মসংবেদনের সুযোগ মাত্র আছে।

এই কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে চিত্রাঙ্গদা লিখিত হয় সকলের আগে আর কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ সকলের শেষে; প্রথমটি ১৮৯২-এ, শেষতমটি ১৯০০-তে; প্রথম ও শেষটির মধ্যে আট বৎসরের ব্যবধান থাকিলেও দেখা যাইবে মূলভাবের অসাধারণ ঐক্য। আর শুধু তাহাই নয়, ইহাতে ধর্মের যে আদর্শ, সামাজিক গুণের যে আদর্শ কবি স্থাপিত করিয়াছেন, ইহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালেও সেইসব আদর্শ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

কবির জীবনের একটা পর্বকে প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণের পর্ব বলা হইয়াছে। কল্পনায় প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকের বার্তা; নৈবেদ্য প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মলোকের বার্তাবাহী আর কথা ও কাহিনী প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক মহত্ত্বের বার্তাবহনকারী। আলোচ্য কাব্যনাট্যগুলিকে, বিশেষভাবে গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদকে এই পর্বের অনুগত করিয়া দেখিতে হইবে; এইগুলিতেও প্রাচীন ভারতের আদর্শের মহত্ত্বকে স্থাপিত

করিবার সেই একই চেষ্টা। চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়অভিশাপ রচনাকাল হিসাবে কিছু দূরস্থ বটে কিন্তু মূলভাবের অসঙ্গতি ঘটে নাই। চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপের সচেতন সৌন্দর্যলোক কল্পনা কাব্যের প্রেরণার অনুবর্তী। আর গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস ও কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের বিরলসৌন্দর্য, অন্তর্মহৎ গম্ভীর আদর্শ নৈবেদ্য কাব্যের অনুষঙ্গ।

বিদায়-অভিশাপ

"দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার পরে বিবৃত হইতেছে।"

কবির পঞ্চভূত গ্রন্থের 'কাব্যের তাৎপর্য' অংশে বিদায়-অভিশাপ সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রত্যালোচনা আছে। তন্মধ্যে শ্রীমতী স্রোতস্বিনী যাহা বলিয়াছেন তাহাই অনুধাবনযোগ্য। "কচদেবযানী-সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।"

সহস্র বৎসরের শেষে বেদনায় রক্তাভ বিদায়ের সূর্যাস্তের পরমক্ষণটি সমাগত। যাহা ঘটিবার তাহা ঐ হাজার বছরে ঘটিয়া গিয়াছে, এখন আর কোনো ঘটনা নাই, কেবল ভাবনা আছে, গত হাজার বছরের ভাবের শেষতম অনুবর্তন।

দেবযানী অত্যন্ত সুকৌশলে সুনিপুণভাবে ধীরে ধীরে হাজার বছরের সহস্রস্মৃতির বীণায় আঘাত করিয়া কচের মনে বাঞ্ছিত সুরটি

ধ্বনিত করিয়া তুলিতে চায়। সে নিজের হৃদয়গ্রন্থটির পাতার পর পাতা উল্টাইয়া অন্তরতম অধ্যায়টি কচের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল ; কিন্তু কচ কি তাহাকে ভালোবাসে ? হায়, মুগ্ধ রমণী কেমন করিয়া বুঝিবে কাহার অন্তর আজ বিদ্রাবিত করিয়া বিদায়ের সূর্যাস্ত এমন পরম মনোহর হইয়া উঠিয়াছে ?

কচ

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি ! বহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব ?

কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে মর্মকথা প্রকাশ সহজ নয়, মর্মপথ অনুসরণ আরো কঠিন। বিদায়-অভিশাপের ইহাই ট্র্যাজেডি। দেবযানী স্বাধীন, কচ কর্তব্যপাশে আবদ্ধ। দেবযানী প্রণয়ৈকসত্তা, কচ প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। এ দুয়ের মধ্যে যদি কোনোটাকে ত্যাগ করিতে হয় তবে পৌরুষগর্বী পুরুষকে প্রণয়িনীকেই ত্যাগ করিতে হয়। দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়াছে যে, সে সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখাইতে পারিবে, প্রয়োগ করিতে পারিবে না ; কিন্তু এ অভিসম্পাতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। সঞ্জীবনীবিদ্যা যদি নবজীবনলাভের বিদ্যা হয়, জীবনের আনন্দকে পুনরায় লাভের বিদ্যা হয়, কচ কি আর স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবে ? তাহার যে জীবনটা এখানে তপোবনতরুতলে ছায়ার চেয়েও ম্লান হইয়া পড়িয়া রহিল তাহাকে কচ কি আর সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে ? বিরহবেদনায় ভস্মীকৃত জীবনকে আর কি সে আনন্দলোকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবে ? নিজের হৃদয়ের প্রতি নিজের আয়ত্ত বিদ্যা প্রয়োগের ক্ষমতা আর তাহার রহিল না। এত দুঃখ সত্ত্বেও তাহার সান্ত্বনার স্থল থাকিত যদি দেবযানী তাহার মর্ম দেখিতে পাইত ; সে দেবযানীর হৃদয় দেখিয়া গেল, কিন্তু নিজের হৃদয় দেখাইতে পারিল কই !

এই বেদনাই এ কাব্যের মৌলিক রস। ব্যর্থ প্রেম নয়, কারণ এ প্রেমে ব্যর্থতা নাই; পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা আছে, কিন্তু ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাহারা পরস্পরকে বুঝিতে পারিতেছে না —ইহাই কাব্যের মৌলিক বেদনা; ইহা বোধকরি ব্যর্থ প্রেমের চেয়েও মর্মান্তিক। ব্যর্থপ্রেমে ফিরিবার পথটাই রুদ্ধ; এখানে পথ আছে, আকর্ষণ আছে, কিন্তু ফিরিবার উপায় চিরকালের জন্য বিঘ্নিত।

কচ ও দেবযানীর সংলাপের মধ্য দিয়া প্রেমোন্মেষের বিশ্লেষণে কবি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রাথমিক পরিচয়ের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির সূত্র ধরিয়া হৃদয়ের জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক জায়গায় কচের বিদীর্ণ হৃদয়ের ফাটলে আশার আলোকরেখা দেখিয়া দিব্য স্পর্ধার সঙ্গে দেবযানী বলিয়া উঠিয়াছে—

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

প্রণয়স্পর্ধার এই পরম মুহূর্তে দেবযানী স্বয়ং ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া উঠিয়াছে; সামান্য মানব সমালোচকের হাতের কলম 'মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো' তাহার পায়ের কাছে মূঢ় বিস্ময়ে মাথা নত করিয়া পড়িয়া থাকে; আপন কর্তব্য ভুলিয়া যায়।

শ্লেষচতুরা দেবযানী প্রথমে স্বর্গের ঐশ্বর্য ও মর্ত্যের দীনতা, সুর-ললনাদের সৌন্দর্য মর্ত্যবাসিনীদের রূপহীনতা, কচের জন্য স্বর্গে যে গৌরব অপেক্ষা করিয়া আছে ও এখানকার তপোবনের অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকরতার মধ্য দ্বন্দ্ব দেখাইয়া কচের প্রেমপ্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কচ কর্তব্যে অটল। সে বলিল—

সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।

দেবযানী

হাসি ?   হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয় !
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে।   হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্য গৃহে ; হেথায় সুলভ নহে হাসি।

স্বর্গে কান্না আছে ছায়া নাই ; সুখ আছে কিন্তু সুখের স্মৃতি থাকে না। মর্ত্যের নিয়ম আর এক রকম।

ইহাতেও যখন কচের গাম্ভীর্য টলিল না, তখন দেবযানী পারিপার্শ্বিকের তারে আঘাত করিয়া কচের মনে বাঞ্ছিত সুর ধ্বনিত করিতে চেষ্টা করিল। এই সেই "সুন্দরী অরণ্যভূমি" যে "সহস্র-বৎসর বল্লভ ছায়া" দিয়াছে ; "এই সেই বটতল, যেথা তুমি প্রতি-দিবসেই গোধন চরাতে" আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে ; আর এই সেই সেই কামধেনুটি স্বর্গপুরীর স্বাদ যাহার দুগ্ধে ; আর ওই আমাদের "কলস্বনা স্রোতস্বিনী বেণুমতী" :

হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আর কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহদুঃখবাস ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে ;
হায় রে দুরাশা !

কচ কি তাহাকে ভুলিতে পারে ? সে যে নবজীবনের উষার মতো একদিন তাহার জীবনশৈলের শৃঙ্গে দেখা দিয়াছিল ! তাহার স্মৃতি চিরদিনের জন্য কচের মর্ম-গ্রন্থিতে গাঁথা হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির ধাপে ধাপে উঠিয়া মানুষের দ্বারে পৌঁছানো রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথমার্ধের রীতি ; দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের ধাপে ধাপে উঠিয়া

তিনি প্রকৃতির দ্বারে পৌঁছিয়াছেন; এইভাবে জীবনচক্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি ও মানুষের মালা-বদল সম্পূর্ণ হইয়া দুইটি সত্তা দিক্‌মালাবলয়ে অখণ্ডভাবে বিধৃত হইয়াছে।

প্রেমস্পর্ধায় দেবযানী এমন মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছে যে, সে নিজেকে সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে কচের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। আজ তাহার সিদ্ধিলাভের চরমক্ষণে সঞ্জীবনী বিদ্যা ও দেবযানী প্রার্থিনীরূপে সমাগত।

আজ মোরা দোঁহে এক দিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও। বল যদি সরল সাহসে
বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ—নাহি ক্ষতি,
নাহি কোনো লজ্জা তাহে; রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।

দেবযানী বলিল—কচ তাহাকে খুশি করিয়া পিতার কাছে বিদ্যা লাভ করিবার উপায় খুঁজিয়াছিল, দীর্ঘকাল ধরিয়া সে দেবযানীকে প্রতারণা করিয়াছে।

কচ বলিল, সে প্রতারণা করে নাই—আর
ভালোবাসি কি না আজ
সে তর্কে কী ফল। আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে।

প্রেমৈকসত্তা দেবযানী ত্যাগের এ মহিমা বুঝিতে পারিবে না— তাহার কুলিশকঠোর নারীচিত্তে ত্যাগের স্থান নাই, ক্ষমার স্থান নাই। প্রস্থাননিষ্ঠ কচকে সে এই বলিয়া অভিশাপ দিল যে, সে সঞ্জীবনী-বিদ্যা কেবল শিখাইতে পারিবে, নিজে কখনো প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু দেখা গেল প্রেমতপস্বী কচ অনায়াসে বিদায়-মুহূর্তের সমস্ত গ্লানিকে মুছিয়া দিয়া দেবযানীকে আশীর্বাদ করিল—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।

দেবযানীই সুখী—তাহার সহস্রস্মৃতির কাঁটার উপরে আশীর্বাদের তিরস্করণী ঝরিয়া পাড়ল আর হতভাগ্য কচ অন্তরে নিদারুণ ব্যর্থতা ও বাহিরে সার্থক সিদ্ধি বহন করিয়া প্রতীক্ষমান স্বর্গলোকে ফিরিয়া চলিল: আপনাকে ছাড়া আর সকলকেই সঞ্জীবিত করিবার ক্ষমতা সে আজ লাভ করিয়াছে। প্রাণকে সঞ্জীবিত করিবার বিদ্যা সে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিবার বিদ্যা সে শিখিতে পারিল কই? দৈত্যরা বহুবার তাহাকে বধ করিয়াছে, দেবযানীর আগ্রহে দৈত্যগুরু প্রত্যেকবার তাহাকে জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, আজ বিদায়ের সময়ে সে অন্তরে মূর্ছিত হৃদয়কে বহন করিয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল, তাহার আয়ত্ত বিদ্যায় তাহা সঞ্জীবিত হইবার নয়। যে পরম স্পর্শে তাহার হৃদয় সঞ্জীবিত হইতে পারিত, কর্তব্যের অনুরোধে, পৌরুষ-গর্বী কচ স্বেচ্ছায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গান্ধারীর আবেদন

গান্ধারীর আবেদন যদি কাব্যমাত্র হইত, গান্ধারী ছাড়া অপর কোনো চরিত্র যদি ইহাতে না থাকিত, তবে ইহার যে-রস হইত, নাটক হওয়াতে সে-রসের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই কাব্যনাট্যে

গান্ধারীর চরিত্র প্রধান হইলেও, ধৃতরাষ্ট্রই অপেক্ষাকৃত অপ্রধান হইলেও সে-ই ইহার নায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কবির হয়ত ইচ্ছা ছিল গান্ধারী পাঠকের সমবেদনাকে সবচেয়ে বেশি করিয়া আকর্ষণ করুক, কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই; ধৃতরাষ্ট্র পাঠকের সমবেদনার সকলের চেয়ে বড় অংশীদার। এমন হইবার কারণ ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রে ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বজাত বেদনা আছে, গান্ধারীচরিত্রে তাহা নাই। রাজমাতার হৃদয়ে পুত্রদের পাপাচারজনিত মাতৃগর্বনাশী গ্লানি আছে, পুত্রত্যাগের দুঃখ আছে, কিন্তু ধর্মত্যাগের মহত্তর দুঃখ নাই। 'অন্তরে বাহিরে অন্ধ' ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে পুত্রের জন্য ধর্মত্যাগের দুঃখ আছে; ধর্মত্যাগের জন্য গ্লানি আছে: এই দুঃখের বেদনাই তাহার শুভ্রশীর্ষে ট্র্যাজেডির আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দিয়াছে।

এই বিরাট পুরুষের চরিত্র ছাড়া আলোচ্য কাব্যে আর কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ববিদীর্ণ চরিত্র নাই। গান্ধারীচরিত্রে সত্যকার দ্বন্দ্ব নাই, পুত্র ও ধর্মের মধ্যে কে রক্ষণীয় সে বিষয়ে তাহার কোনো ভ্রান্তি নাই; দুর্যোধনও সুনির্দিষ্ট পথের যাত্রী, রাজধর্ম ও লোকধর্মের মধ্যে কোন্ পথ অনুসরণীয়, সে বিষয়ে তাহার মনে কোনো প্রশ্ন নাই; কেবল অন্ধ পিতা উদ্যতদণ্ড বিধাতার পতনোন্মুখ গদার তলে বসিয়া স্বহস্তে পাপের সেতুবন্ধ ভাঙিয়া দিয়াছেন, তিনি বেশ জানেন তাঁহার কার্যের ফলে পুত্রকলত্র, রাজ্যসম্পদ, পুরাতন কুরুবংশ অচিরকালের মধ্যে রসাতলের মুখে ভাসিয়া যাইবে, কিন্তু যতক্ষণ না যায়—

ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
আলিঙ্গন কোরো না শিথিল, ততক্ষণ
দ্রুতহস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন;
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।—ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে,

না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা, লোকলজ্জা ভয়,
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম, শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ—আর নহে কেহ।

গান্ধারীর আবেদনের সার্থকতার পক্ষে নাটকটির অন্যান্য চরিত্র অবান্তর। গান্ধারীর আবেদন প্রথমে রাজার কাছে, অবশেষে ভগবানের কাছে। ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থানের পরে গান্ধারীর উক্তিগুলিই তাহার মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট; বরঞ্চ ইহা নাট্যাকারে গ্রথিত না হইয়া একভাষণ কাব্যাকারে লিখিত হইলে সমস্ত বক্তব্য ঠাসবুনানিতে জমিয়া উঠিয়া যেন গভীরতর রসের সঞ্চার করিত; নাট্যাকারে লিখিত হওয়াতে পাত্রপাত্রীর সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে যেন অনেকটা রস গলিয়া গিয়াছে, পাঠকের পাতে পড়ে নাই। সতী ও লক্ষ্মীর পরীক্ষা ছাড়া এই পর্যায়ের সমস্ত কাব্যনাট্য সম্বন্ধেই ইহা সত্য।

এইরূপ হওয়াতে গান্ধারীর আবেদনের যে ক্ষতিই হোক বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পৌরুষদর্পী স্বৈরশাসক দুর্যোধনকে পাইয়াছি। ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের পতনোন্মুখ বিরাট অট্টালিকাকে পাইয়াছি; ভানুমতীর স্বল্পায়ত চরিত্রে দুর্যোধনের যোগ্য সহধর্মিণীকে পাইয়াছি; গান্ধারীর আবেদনের রচনারীতির কাল্পনিক ক্ষতির তুলনায়—এই তিনটি চরিত্র যথেষ্ট লাভ; দুঃখ করিবার কারণ নাই।

কপটদ্যুতে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবেরা বনগমন করিতে উদ্যত হইলে গান্ধারী পাপাচারী পুত্রদের নির্বাসনের আদেশের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিতে আসিয়াছেন। দুর্যোধন গান্ধারীকে ভয় করে; পিতার অন্ধ স্নেহের উপরেই তাহার যাহা কিছু ভরসা; সে গান্ধারীর আগমনবার্তা শুনিবামাত্র প্রস্থান করিল।

ন্যায়ধর্ম-রক্ষার জন্য পুত্রকে নির্বাসিত করিবার আবেদন গান্ধারীর।

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বামহস্ত ; ধর্মরক্ষা-কাজ
তোমা 'পরে সমর্পিত।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আবেদন সফল হইবার নয়, তখন তিনি বিধাতর নিকটে দণ্ডের জন্য আবেদন করিলেন।

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি।

বিধাতার দণ্ড যখন পড়িবে তখন যে কেবল দুর্যোধন শাসিত হইবে এমন নয়, পাপী, পাপের ফলভাগী, পাপকে যাহারা বাধা দেয় নাই, যাহারা অলসভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সকলকে পিষ্ট করিয়া বিধাতার উদ্যত গদা আসিয়া পড়িবে।

তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীর-বধূ, হায় বীর-মাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস্ লুটি অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নমঃ
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি ; নমো নমো নমঃ
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।

নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

গান্ধারী নিশ্চিতভাবে জানে যে, তাহার আবেদনের ইহাই পরিণাম; এখন এই পরিণামের জন্য 'ছিন্নসিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে' অর্ঘ্য রচনা করিয়া এই 'দারুণ করুণ শান্তি'র জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকাই একমাত্র কর্তব্য; গান্ধারী সেই লগ্নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে, ভানুমতীকেও প্রস্তুত হইতে উপদেশ করিয়াছে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—পরে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলেই চলিবে। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মই একমাত্র বস্তু যাহা রক্ষণীয়। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই বস্তুর নাম ন্যায়ধর্ম; ন্যায়রক্ষা ধর্মরক্ষারই অঙ্গ; আর এই ন্যায়ধর্ম রক্ষার ভার রাজার উপরে, কারণ রাজা 'বিধাতার বামহস্ত', ধর্মরক্ষা-কাজ তাঁহার উপরে সমর্পিত। ন্যায়রক্ষা যে কেবল রাজনীতির সুবিধার জন্যই প্রয়োজন একথা রবীন্দ্রনাথ কখনো স্বীকার করেন না; ন্যায়রক্ষা ধর্মরক্ষার অঙ্গ বলিয়াই তাহা পালনীয়, আর রাজার উপরে সেই ভার বলিয়া রাজা সামাজিক কাঠামোর অপরিহার্য অংশ। সমস্ত সামাজিক গুণের মধ্যে ন্যায়কেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; বিধাতা যে কেবল ন্যায়ের চরম রক্ষক তাহা নয়, তিনি স্বয়ং ন্যায়মূর্তি; বিধাতার পরেই নৃপতি, তিনি সংসারে বিধাতার প্রতিনিধি।

কাব্যে ও উপন্যাসে আদর্শচরিত্র আঁকিবার অভ্যাস রবীন্দ্রনাথের আছে। আদর্শচরিত্র ব্যক্তি সুখদুঃখের অতীত; তাহার প্রতি পাঠকের প্রশংসমান মনোভাব, একাত্মতার নয়; সে পাঠকের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তি; সত্যকথা বলিতে কি, সাহিত্যে আদর্শচরিত্র অঙ্কনের স্থান আছে কি না সে বিষয়েও তর্ক চলিতে পারে।

আদর্শমাতা গান্ধারী ও আনন্দময়ী; আদর্শপিতা পরেশবাবু; আদর্শভ্রাতা গোবিন্দমাণিক্য; আদর্শস্বামী নিখিলেশ; আদর্শবন্ধু দেবদত্ত, আর আদর্শমানুষ রামচন্দ্র (ভাষা ও ছন্দ)।

এই আদর্শরমণী গান্ধারীর প্রতি যে-একাত্মতার ভাব অনুভব করি না (গান্ধারীর তাহাতে প্রয়োজনও নাই), অন্তরে বাহিরে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাহা করি। আসন্ন বিপদের দিনে যে তাহাকে একান্ত আপন বলিয়া আশ্রয় করিয়াছে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মরক্ষা করিতে ধৃতরাষ্ট্র চাহেন না।

পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি, আমি তার
একমাত্র ; উন্মত্ত তরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষ চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে, অংশ লই তার দুর্মতির,
অর্ধফল ভোগ করি তার দুর্গতির,
সেই তো সান্ত্বনা মোর। এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ, ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের শেষ কথা। গান্ধারীর দৃপ্তদৃষ্টির অদৃশ্য আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধ, অসহায়, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ পিতার স্খলিতগাত-প্রস্থান পাঠকের সমবেদনার শেষ গণ্ডুষটি পর্যন্ত টানিয়া লয়।

সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করিলে দুর্যোধনের যুক্তির ফাঁকি ধরা অসম্ভব নয়, তাহার রাজনীতির চাল যে সর্বনাশা তাহাও বোঝা যায়, দুর্যোধনের ঈপ্সিত পথ যে সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের অর্ধ্ব-শিলাখণ্ডের দ্বারা চিহ্নিত তাহাও পরিজ্ঞাত ; কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বে, দম্ভোক্তিতে

কি-একটা অদৃশ্য সুরাসম আকর্ষণ আছে ক্ষণকালের জন্য পাঠককে যাহা আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। ব্যক্তিত্বের চৌম্বক শক্তির উপরেই স্বৈর-শাসকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। শাসন করিবার জন্যই তাহার জন্ম, তাহার ক্ষুদ্রতম কথাটিও প্রজাদের পক্ষে অনুশাসন, যতদিন জীবিত থাকিবে তাহার থামিবার উপায় নাই—আগাইয়া যাইতেই হইবে—আর তাহার পতনের ভৈরবরবের তাল পতন ধ্বনিতে দিগ্‌গজগণ যেন চমকিত হইয়া উঠিবে। যে-সব চরিত্র সমালোচকগণকে হতবুদ্ধি করিয়াছে দুর্যোধন-চরিত্র তাহাদের অন্যতম, দেবযানী চরিত্র অন্যতম; ইহারা বিস্ময়ের, বিশ্লেষণের নহে।

এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কাব্যোৎকর্ষের বিচারে গান্ধারীর আবেদন দুর্বলতম। দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের অংশ নিখুঁত; গান্ধারীর দীর্ঘ উক্তিগুলি অতিভাষণে পূর্ণ; পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর প্রবেশ প্রায় নিরর্থক। তা সত্ত্বেও যে ইহা বাঙালী পাঠকসমাজের এত প্রিয় তাহার কারণ সাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ। দুর্যোধনের দম্ভোক্তিকে 'কুর্জনীয়' দর্পিত অসৌজন্যের আভাস; ধৃতরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন-আঘাত রাষ্ট্রনীতি যে বৃটিশ রাজনীতি হইতে খুব ভিন্ন এমন মনে করিবার কারণ নাই। আবার দুর্যোধনের—

এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে,
কণ্টকতরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্য গুণগান,
আমাদের নিত্য নিন্দা।

কৌরব-পাণ্ডবকে ভিন্ন করিয়া রাখিয়া উভয়কেই দুর্বল করিবার এই ভেদনীতির মধ্যে যদি কোনো সমালোচক হিন্দু-মুসলমান শাসনের রাজকীয় নীতির আভাস দেখিতে পান, তিনি ভুল

দেখিয়াছেন এমন মনে করিব না। ক্লাসিক্‌স্ মানেই সাহিত্যের সেই ধ্রুবপদ অংশ যাহা যুগে যুগে অবস্থাভেদে নূতনতর অর্থে জ্যোতিষ্মান হইয়া দেখা দেয়, প্রতি যুগ তাহার মধ্যে আপন অন্তর্নিহিত মহিমার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়।

সতী

সতী নাটকের সহিত গান্ধারীর আবেদনের ঐক্য ও দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। এখানেও ধর্মরক্ষার জন্য মাতা-কর্তৃক সন্তান-পরিত্যাগ; মাতার গ্রাস হইতে বাঁচিবার জন্য সন্তানের পিতার আশ্রয় গ্রহণ: বিনায়করাও ধৃতরাষ্ট্রের মতোই সন্তান-বৎসল; রমাবাই গান্ধারীর মতোই ধর্মের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য নিষ্করুণ; কিন্তু সব উলটপালট হইয়া গিয়াছে দুই নাটকের ধর্মের আদর্শ ভেদে।

বিনায়করাও ও রমাবাই-এর কন্যা অমাবাই-এর বিবাহ স্থির হইয়াছিল জীবাজীর সহিত। কন্যাপক্ষ যখন বিবাহসভায় বিলম্বিত জীবাজীর জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে তখন জীবাজীর শিবিকায় চড়িয়া বিজাপুররাজের এক মুসলমান সভাসদ আসিয়া উপস্থিত হইল। হতবুদ্ধি সভাস্থল হইতে অমাবাইকে হরণ করিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। কিছু পরে বন্ধনমুক্ত জীবাজী আসিয়া উপস্থিত। তখন জীবাজী, বিনায়ক ও সভাস্থ সকলে হোমাগ্নিস্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, দস্যুকে বধ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ তাহারা গ্রহণ করিবে।

ইতিমধ্যে অমাবাই বিধর্মী স্বামীকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের সন্তানও হইয়াছে।

অনেকদিন পরে বিবাহরাত্রির সেই শপথ পালনের সুযোগ ঘটিয়াছে। রণক্ষেত্রে জীবাজী ও অমাবাই-এর স্বামী উভয়েই নিহত। অমাবাই বিনায়করাও-এ সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। পিতা কন্যাকে বাগ্‌দত্ত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইতে উপদেশ করিল। কিন্তু করুণায় যখন

তাহার হৃদয় বিগলিতপ্রায় তখন রমাবাই আসিয়া উপস্থিত। পিতার করুণা মাতাকে স্পর্শ করিল না; সে জীবাজীর সৈন্যদের সাহায্যে কন্যাকে জীবাজীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ করিবার আয়োজন করিল; অসহায় কন্যা অসহায়তর পিতাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিল, কিন্তু বিনায়ক তখন নিরুপায়, সে রমাবাই-এর আদেশে সৈন্যগণ-কর্তৃক বন্দীকৃত। বাগ্‌দত্ত পতির সহিত অমাবাইকে স্থাপিত করিয়া চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, রমাবাই-এর ধর্মের আদর্শ রক্ষিত হইল।

ইহাই সতীর গল্পাংশ। শ্মশানক্ষেত্রের একটি মাত্র দৃশ্যে নাটকের সূচনা ও পরিণাম; পিতা ও কন্যার সংলাপের মধ্য দিয়া নাটকের পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে; পিতা, মাতা ও কন্যার সংলাপ ও কন্যাকে দাহ ঘটনারূপে দেখানো হইয়াছে; আগেই বলিয়াছি এই কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে সতী নাটকেই নাটকের গুণ সবচেয়ে বেশি। এই নাটকটিকে একটি পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির পঞ্চম অঙ্ক বলিয়া মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে না; পঞ্চমাঙ্কের অনিবার্য পরিণামের প্রায় সকল লক্ষণই ইহার মধ্যে আছে।

বিনায়করাও ধৃতরাষ্ট্রের ছাঁচে ঢালাই-করা; ধৃতরাষ্ট্রের মতোই সন্তানবাৎসল্য ও ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব তাহার চরিত্রে; ধৃতরাষ্ট্রের মতোই সে পত্নীর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া ধর্মবোধকে লঙ্ঘন করিয়া অসহায় সন্তানকে আশ্রয় করিয়াছে; ধৃতরাষ্ট্রের মতোই ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের তরঙ্গাভিঘাত তাহাকে সবলে ঠেলিয়া পাঠকের সমবেদনার সিক্তবলোভূমিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু কত প্রভেদ! ধৃতরাষ্ট্র যে ধর্মকে উপেক্ষা করিয়াছে তাহা নিত্যধর্ম, বিনায়কের ধর্মবোধ কেবল সামাজিক সংস্কার মাত্র; পূর্বোক্ত নাটকের ধর্মের উদ্ভব মানব-হৃদয়ের অমর গ্রন্থে, পরবর্তী নাটকের ধর্মের আশ্রয় শাস্ত্রের খানকতক জীর্ণ পাতা মাত্র।

রমাবাই-চরিত্র গান্ধারী-চরিত্রের মতোই ক্লাসিকাল শিলাখণ্ড

কুঁদিয়া কাটা; তাহার ধর্মাদর্শের সঙ্গে পাঠকের সহানুভূতি না থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তির প্রভায় মহিমময়ী এই বীররমণী বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া ছাড়ে না; ইহাকে দেখিয়া গ্রীক ট্র্যাজেডির মীডিয়া ও ক্লাইটেম্‌নেস্‌ট্রাকে মনে পড়িয়া যায়। এই নাটকে সত্যই যদি কেহ করুণার পাত্র থাকে তবে সে বিনায়ক বা অমাবাই নয়; সে এই নিষ্করুণ জননী; শাস্ত্রাচার কতখানি প্রবল হইয়া উঠিলে হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে। কিংবা এই নিষ্ঠুরতা আদৌ ধর্মরক্ষার জন্য নয়!

কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গার সম সে কলঙ্ককালী
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।

কন্যার মৃত্যুর দ্বারা ইহা কি তবে আত্মসমর্থনেরই উপায় মাত্র। যে রকম অনায়াসে সে মরিতে পারিত—তাহাই যেন সে কন্যার উপরে আরোপ করিয়াছে, কারণ এখনো সে কন্যাকে ভালোবাসে—কন্যার ব্যক্তিত্বকে নিজেরই ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করে। বিনায়কের চেয়ে সন্তানস্নেহ তাহার অল্প নয়; কিন্তু বিনায়ক এখন কন্যাকে আত্মনিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে দেখে; তাহার হৃদয় যেন অপরের দুঃখে বিগলিত হইয়াছে; রমাবাই কন্যাকে এখনো আত্মনিরপেক্ষ ভাবে দেখে না—নিজেরই অংশ বলিয়া দেখে; প্রয়োজন হইলে মানুষ যেমন নিজের অঙ্গে অস্ত্রোপচারের কষ্ট সহ্য করে—তেমনি ভাবেই রমাবাই কন্যার মৃত্যু সহ্য করিতে প্রস্তুত।

ইহা তো গেল রমাবাই-এর মনোভাবের বিশ্লেষণ কিংবা পাঠকের উপরে তাঁহার চরিত্রের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তাহার মনে কোনো দ্বন্দ্ব নাই; সে জানে সে যাহা করিতেছে তাহাই একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথের দ্বিধা তাহার চরিত্রে নাই। কন্যাকে দগ্ধ করিয়া মারা—সে-তো কন্যারই মঙ্গলের জন্য, তাহাতে দ্বন্দ্ব কোথায়? নিজের

অঙ্গে অস্ত্রোপচারের কষ্ট কি ট্র্যাজেডির কষ্ট? সে-তো নিরাময়ের পূর্বাভাস। ধর্মাদর্শের ভেদ ছাড়িয়া দিলে গান্ধারী ও রমাবাই-চরিত্রে মৌলিক ঐক্য আছে: দ্বন্দ্বহীন, কৃতনিশ্চয়, স্থিরপন্থা, অনমনীয়, প্রবল ইচ্ছাশক্তিময়ী এই দুই রমণী। তবে ইচ্ছার প্রবলতা যেন রমাবাই-এর চরিত্রে কিছু বেশি, কিংবা ঘটনাস্রোত গান্ধারীর বেলায় প্রবলতর; গান্ধারী যে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে স্থাপিত তাহার প্রসার ভারতবর্ষব্যাপী রাজনীতির জটিলতায়, আর রমাবাঈ-এর ট্র্যাজেডির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, ইহাকে স্থানিক মাত্র বলা যাইতে পারে। ইহারা উভয়েই পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে, কিন্তু সমবেদনা আকর্ষণ করে না, কারণ আদর্শ চরিত্র পাঠকনিরপেক্ষ, আর রমাবাই-চরিত্রকেও এক হিসাবে আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে—নিজের আদর্শের সঙ্গে, সে আদর্শ পাঠকের আদর্শ না হইতে পারে, লেখকের তো নিশ্চয়ই নয়, সে একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কাজেই গান্ধারীর মতো সে-ও অন্যনিরপেক্ষ।

রমাবাই-চরিত্রেও দ্বন্দ্ব নাই। মৃত্যুর কষ্ট আছে, শিশু সন্তান ত্যাগের দুঃখ আছে, পরপুরুষের সঙ্গে সহমরণে মরিবার অপরিসীম লজ্জা আছে, মাতার বিবেকহীনতায় ধিক্কার আছে, কিন্তু বিভিন্ন আদর্শের ইশারায় উদ্‌ভ্রান্তি তাহরে চিত্তে নাই। সে জানে, যাহা সে করিয়াছে তাহাতে লজ্জিত হইবার, গ্লানিবোধ করিবার কিছু নাই।

এক সময়ে তাহার চরিত্রে দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু সে-কাল অনেকদিন অতিক্রান্ত। প্রেম ও সংস্কার, শাস্ত্রাচার ও চিত্তাচারের সংঘর্ষ তাহার জীবনে একসময়ে আসিয়াছিল, সে-দ্বন্দ্ব কাটাইয়া উঠিয়া এখন তাহার জীবনে পত্নীধর্ম ও সতীধর্ম এক হইয়া গিয়াছে; শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা নয়, প্রেমের অভিজ্ঞতার দ্বারা সে সমাজ-অতিক্রামী মানুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছে; সে স্বজাতীয় বর পায় নাই, প্রেমবৃত স্বামী পাইয়াছে। সেই সময় সত্যই তাহার দ্বন্দ্বের সময়—কিন্তু সে তো নাট্যঘটনার বাহিরে।

হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে। মাঝে মাঝে তবু
সংস্কার উঠিত জাগি; কোনোদিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণার বেগ শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুৎকম্প—অবাধ্য শরীর
সংকোচে কুঞ্চিত হ'ত; কিন্তু তারো পরে
সতীত্ব হয়েছে জয়ী। পূর্ণভক্তিভরে
করেছি পতির পূজা; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী,
পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধী সম।

জননীর ধিক্কারের প্রতিবাদে সে বলিতেছে—

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যেমনে
পূজিয়াছি পতি বলি; মোরে করে ঘৃণা
এমন কে সতী আছে? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে, হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

বিনায়ক-ও পত্নীর মতো শাস্ত্রাচার-মূঢ়; শাস্ত্রের চেয়ে মহত্তর কিছু আছে বলিয়া জানিত না; কিন্তু আজ রণক্ষেত্রে, শ্মশানক্ষেত্রে, কন্যার দুঃখের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আঘাতে তাহার দীর্ঘাচরিত সংস্কারের জীর্ণ খোলস ভেদ করিয়া নব আদর্শের গগনগামী অমৃত-প্রয়াসী বিষ্ণুবাহন বাহির হইয়া আসিল। অমাবাই যে-জ্ঞান দিনে

দিনে ঠেকিয়া ঠেকিয়া লাভ করিয়াছে, রমাবাই যাহা কখনো লাভ করিতে পারিল না, বেদনার বজ্রাঘাতে সেই উৎস এক মুহূর্তে বিনায়কের চিত্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এখন পিতার অভিজ্ঞতা ও কন্যার অভিজ্ঞতা অভিন্ন। নিম্নোদ্ধৃত বাক্য অমাবাই-এর হইতে পারিত, তাহা বিনায়কের—

সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টি সম; আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে—
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়।

কিন্তু বাস্তব নির্মম, রমাবাই নির্মমতর। চিতাশয্যায় শায়িত অসহায় অমাবাই ধর্মরাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

জাগো জাগো জাগো ধর্মরাজ!
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব! তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

অমাবাই-এর মনে যে দ্বন্দ্ব নাই ধর্মরাজের প্রতি এই আবেদন হইতেই তাহা বোঝা যায়। নিজের মৃত্যুতে তাহার দুঃখ নয়, নিত্য-ধর্মের পরাজয়ে তাহার গ্লানি। অমাবাই-এর এই আর্ত-আবেদন ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে বিদীর্ণ করিয়া বিশ্ববেদনায় পরিণত হইয়াছে; জগতের ধর্মব্যবস্থায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া আজ সে পীড়িত; সে যেন এখন বিশ্ব-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত, নিজের ক্ষুদ্র সত্তা কোন্ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ধর্মরাজকে আহ্বানের পর সে রক্ষা পাইবার জন্য পিতাকে ডাকিয়াছে—

পিতা, পিতা, পিতা মোর !

বাহ্য দৃষ্টিতে ইহাকে Bathos বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা একমাত্র অসাধারণ কবিশ্রেষ্ঠের পক্ষেই সম্ভব ; এই আপাত Bathos-এর প্রকৃত ব্যবহার গ্রীক-ট্র্যাজেডি-লেখকরা জানিত, ফরাসী ক্লাসিক্যাল রীতির শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদ্বয় জানিত,—মানবচরিত্রের অন্তর্দর্শন যাহাদের না ঘটিয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা জানা সম্ভব নয়।

এমন মর্মভেদী, মর্মান্তিক, অসহায় আর্তনাদ বাংলাসাহিত্যে আর নাই বলিলেই চলে। মনের গুহার ভিতরে এই ধ্বনি সহস্র প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিয়া সুপ্ত করুণার স্রোতস্বিনীতে বন্যা জাগাইয়া দেয় ! মাঝে মাঝে এইরকম দু'একটি ছত্র নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দেয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অলৌকিক নাট্য-প্রতিভার অঙ্কুর ছিল, যাহাকে সফল করিয়া তুলিবার দিকে তাঁহার মনোযোগের কেন যেন একান্ত অভাব

নরকবাস

বিদেহরাজ সোমক বহু আরাধনা ও যজ্ঞাদি করিয়া প্রাচীন বয়সে এক পুত্র লাভ করিয়াছিল। তাহারই স্নেহে মুগ্ধ হইয়া সে রাজকর্মে অবহেলা করিত। একদিন রাজা পুত্রের ক্রন্দন শুনিয়া অকালে রাজসভা ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যায়। রাজা ফিরিয়া আসিলে রাজপুরোহিত তাহাকে ধিক্কার দিলে লজ্জিত রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করে। ঋত্বিক বলে যে, এই পুত্র-মোহ কাটাইবার শাস্ত্রীয় উপায় আছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত কঠিন ; তাহা পালন করিলে মহিষীরা শতপুত্রবতী হইবেন। রাজা এই ব্রত পালন করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। ঋত্বিক বলিল—হোমাগ্নিতে শিশুপুত্রকে আহুতি দিতে হইবে।

রাজ্যের প্রজাগণ ইহাতে তীব্র আপত্তি জানাইল, কিন্তু রাজা প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল। হোমাগ্নিতে রাজার শিশুপুত্র নিক্ষিপ্ত হইল।

তার পরে বহু কাল চলিয়া গিয়াছে। দেহান্তের পরে বিদেহরাজ দেবরথে চাপিয়া স্বর্গে চলিয়াছে। এমন সময়ে 'স্বর্গের পথের পার্শ্বে'র 'বিষাদলোক' নরক হইতে ঋত্বিক ও প্রেতগণ তাহাকে আহ্বান করিল।

এখানে প্রেতগণের অনুরোধে সোমক ও ঋত্বিক তাহাদের মর্ত্য জীবন বিবৃত করিল। এমন সময়ে স্বর্গ হইতে ধর্ম আসিয়া সোমককে ত্বরায় স্বর্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন—দেবতারা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। ঋত্বিক রাজাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিল যেন সে তাহাকে ছাড়িয়া না যায়। সোমক ঋত্বিককে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে সম্মত হইল না এবং যতকাল তাহার নরকবাস লিখিত আছে ততকাল নরকে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ধর্ম তাহাকে নরকবাসের অনুমতি দিয়া ফিরিয়া গেলেন।

নরকবাসের মূল ভাব পূর্বোক্ত দুইখানি নাটকের অনুরূপ হইলেও একটু ভিন্ন। গান্ধারীর আবেদনে সন্তানকে রক্ষা করিয়া ধর্মত্যাগের কাহিনী; সতীতে পিতা-কর্তৃক সন্তানকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় ধর্মত্যাগ; এখানে ধর্ম-রক্ষার জন্যই পিতার সন্তানকে পরিত্যাগ, তাহাকে হোমানলে সমর্পণ।

এ কথা সত্য বটে যে, এইসব নাটকের বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকলেই ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে, আর, যেমনি হোক ধর্মের একটা আদর্শ প্রত্যেকের মনে আছে।

সোমকের চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র, বিনায়কের চরিত্রের মতোই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, আবার সোমক-চরিত্র পূর্বোক্ত দুইটি চরিত্রের মতোই ট্র্যাজিক সৃষ্টি; তাহার হৃদয়ে বিভিন্ন ভাবের দ্বন্দ্বজাত সংঘর্ষ আছে।

একদিকে রাজকর্তব্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞার অহংকার, অন্যদিকে অন্ধ পুত্রস্নেহ—দুইটিতে মিলিয়া সোমকের হৃদয়ে সমুদ্রমন্থনের আন্দোলন তুলিয়াছে; সমুদ্রের জল চঞ্চল, কিন্তু সীমা স্থির; সোমকের হৃদয়ে আন্দোলন আছে বটে, কিন্তু চরিত্র অটল। পুত্রস্নেহের উপরে রাজধর্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম জয়ী হইয়াছে।

তার পরে বহু কাল চলিয়া গিয়াছে। জীবলীলা অবসানে সোমক দেবরথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকালেও সেই দারুণ মুহূর্তের স্মৃতি সে ভুলিতে পারে নাই—তবে দুঃখের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝিয়াছে যাহাকে সে ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহা ধর্ম নয়, তাহা ধর্মের ছদ্মবেশী আত্মাভিমান। সত্যই তাহা ধর্ম হইলে তাহার পালনে সোমকের দুঃখ হইতে পারিত, কিন্তু গ্লানি বোধ হইত না। সে পাপের ফলে ঋত্বিকের মতো তাহাকে নরকানল ভোগ করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু দীর্ঘজীবন সে হৃদয়ানলে দগ্ধ হইয়াছে—এখনো তাহা নির্বাপিত হয় নাই। নরকানল হৃদয়ের মধ্যেই জ্বলে, তবে যে হতভাগ্যের সেখানে অগ্নি জ্বলে না, তাহার জন্যই নরকের বাহ্যরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

তব সাথে মোর গতি নরক-মাঝারে
হে ব্রাহ্মণ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্র অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
নিন্দুক সমাজ-মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম, রাজধর্ম, পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম। সে পাপজ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ, এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।
... ...

হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ অন্তরতাপ। আমি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান?

স্বর্গ-গমনোদ্যত সোমক-চরিত্র শেষ মুহূর্তে তাহার নিদারুণ মর্ত্য মাহাত্ম্যকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ঋত্বিকের ধারণা, এক পাপে দুইজনেই সমপাপী; এতদিন পরে যখন মর্ত্য জীবনের কথা প্রায় সে ভুলিয়াছে এমন সময়ে সোমক স্বর্গে চলিয়া যাইবে আর সে পড়িয়া থাকিবে নরকে! সে সোমককে বলিল—

যেয়ো না যেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ! সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক।

সোমক পরমতম শত্রুর সঙ্গে অকারণে নরকবাস করিতে সম্মত হইল। 'দ্বিতীয় নরক' সোমকের পক্ষেই সত্য হইল, অন্তরের নরকাগ্নির সহিত বাহিরের নরকাগ্নি মিলিত হইল।

এই মহিমার উদারতা এমনই মর্মস্পর্শী যে, নরকের প্রেতগণ পর্যন্ত তাহাতে বিচলিত হইয়াছে।

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী!
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহা বৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।

সোমক এক সময়ে পার্থিব সুখ ত্যাগ করিয়াছিল পুণ্যের আশায়, এবারে সেই পুণ্যফলকেও সে পরিত্যাগ করিল।

ঋত্বিক-চরিত্র রঘুপতির ছাঁচে ঢালা। ইহারা শাস্ত্রাভিমান ও আত্মাভিমানকেই ধর্ম বলিয়া জানে; দেবতার স্থানে ইহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ধর্মের নামে রঘুপতি শিশুহত্যা, রাজহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ধর্মের নামে ঋত্বিক শিশুহত্যা করিয়াছে। রঘুপতির চেয়েও তাহার দায়িত্ব বেশি, সে পিতাকে ইহার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। হত্যার আঘাত যে কত নিদারুণ জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতি তাহা বুঝিয়াছে, তাহার নরকভোগ পৃথিবীতেই ঘটিয়া গিয়াছে, সে অভিজ্ঞতা ঋত্বিকের জীবনে হয় নাই বলিয়াই মৃত্যুর পরে এখানে আসিতে সে বাধ্য হইয়াছে।

শাস্ত্রদম্ভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অহঙ্কার মানুষকে যে কত নিষ্ঠুর, কত অন্ধ, কত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ইহাদের মতো লোক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইহারা এইসব হত্যাকাণ্ডকে সত্য সত্যই ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছে; কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে ইহাদিগকে খুব বেশি দোষী করা যায় না। তাহারা এমন একটা আচারবিচার কর্মকাণ্ডের জগতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে ব্যক্তিগত বিচার ও রুচির স্থান নাই বলিলেই হয়। বাল্যকাল হইতে সেই আবহাওয়ায় মানুষ হওয়াতে ধর্মের আর কোনো রূপ যে থাকিতে পারে তাহা এই দুর্ভাগারা জানিতেও পারে নাই। ভুল করিয়া হোক, নির্ভুল করিয়া হোক, ধর্মপালন করিতেছে —এই বোধ তাহাদের চরিত্রে একপ্রকার প্রস্তরোপম অটলতা দিয়াছে—তাহারা আর যাহাই হোক দুর্বল জীব নয়।

এই নাটকে একদল ছায়াশরীরী প্রেত আছে। আজ সদ্য পৃথ্বীচ্যুত সোমককে তাহাদের মাঝে পাইয়া পুরাতন পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ হঠাৎ তাহাদের ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। স্বদেশের জন্য, স্বস্থানের জন্য, স্বজনের জন্য মানুষের মনে যে চিরন্তনী

ব্যাকুলতা আছে, বিরহের নিত্য-হৃৎস্পন্দনের সেই নিগূঢ় বেদনা বড় সুন্দরভাবে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্য ছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের গন্ধ, ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার,
বহিয়া এনেছ তুমি—ছয়টি ঋতুর
বহু দিন-রজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।

এই নাটকে নরকের ধারণাটিতেও নূতনত্ব আছে। নরক আর কোথাও নয়—পৃথিবী ও স্বর্গের মাঝখানে, স্বর্গের পথের ঠিক পার্শ্বেই এই বিষাদপুরী।

স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্ষা-জর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি, সপ্তপারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

এখান হইতে কাম্যলোক স্বর্গ দেখা যায়, একদা প্রিয় পৃথিবীও অদৃশ্য নয়—কাম্য ও দুর্লভ, ভূত ও ভবিষ্যের মাঝখানে নরক।

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হ'য়ে এই মহা-অন্ধকারলোক—
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন মতন
নভস্তল ;

বিষাদ ও ঈর্ষার উপাদানে এই নরক গঠিত।

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বদিন সন্ধ্যায় কুন্তী সন্ধ্যা-সবিতার বন্দনায় রত কর্ণকে পরিচয় দিয়া ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরের ভাঁজ খুলিয়া ধীরে ধীরে কুন্তী আপন পরিচয় দান করিলেন, কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন, কর্ণকে আপন ভ্রাতাদের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মাতৃহীন কর্ণের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার ফিরিবার পথ বন্ধ ; সে কুন্তীকে ফিরাইয়া দিয়া বিধি-নির্দিষ্ট নিয়তির পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বনিকেতনে ফিরিয়া গেল। ইহাই কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এখানেও দেখিতে পাই, পূর্বোক্ত নাটকগুলির মতো ধর্মরক্ষার ইচ্ছা হইতেই এই ট্র্যাজেডির উদ্ভব।

কুন্তী কানীন পুত্র শিশু কর্ণকে অসহায়ভাবে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, ধর্মরক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আবার আজ কর্ণ যে আজন্ম স্বপ্নিত মাতা ও ভ্রাতাদের মধ্যে ফিরিতে পারিল না, তাহারও মূলে কর্ণের ধর্মরক্ষার ইচ্ছা। দুর্যোধনের কাছে সে বাক্যপণে আবদ্ধ, অর্জুনের সঙ্গে সে যুদ্ধ করিবে ; ক্ষত্রিয় সমাজ বহুকাল হইতে এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আজ ঠিক তার পূর্বাহ্নে কি করিয়া সমস্ত অঙ্গীকার, কৃতজ্ঞতার ঋণ জলে ভাসাইয়া দিয়া আবাল্যের শত্রুদের সঙ্গে গিয়া সে মিত্রতা করিবে ?

এই কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্মবোধই কর্ণের চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি। এই দিক দিয়া কচের চরিত্রের সঙ্গে কর্ণ-চরিত্রের মিল আছে। দেবযানীর আকর্ষণে ধরা দিতে কচের পক্ষে বাহিরের কোনো বাধা নাই, বরঞ্চ তাহাই স্বাভাবিক; আবার কর্ণের পক্ষে মাতা ও ভ্রাতাদের পক্ষে যোগদান করাই স্বাভাবিক; কিন্তু গোড়ায় যে দুর্যোধনের কাছে সে অঙ্গীকার করিয়া বসিয়া আছে। কচ ও কর্ণ উভয়েই স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধে কর্তব্যের ব্রত মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। একজনের প্রেমের আকর্ষণ, আর একজনের স্নেহ ও সৌভ্রাত্রের আকর্ষণ। হৃদয়ধর্ম ও কর্তব্যের দড়ি টানাটানিতে তাহারা শেষেরটির দিকেই হেলিয়াছে।

কর্ণের মধ্যে ধর্মবোধ কত প্রবল তাহা দানশীল কর্ণের একটি উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কুন্তী

পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ

ভিক্ষা মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা করো দিব চরণে তোমার।

দেবযানীর অনুরোধে কচও ঠিক এই উত্তর দিতে পারিত।

কর্ণ-চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে বটে, কিন্তু সে দ্বন্দ্বে ট্র্যাজেডির দুঃখ নাই; ধর্মই একমাত্র রক্ষণীয়; সে সম্বন্ধে তর্কের কোনো অবকাশ কর্ণ-চরিত্রে নাই।

কর্ণ-চরিত্রের দ্বন্দ্বের চেয়ে তাহার জীবনের irony, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসটাই অধিকতর লক্ষণীয়। সে জানে না যে, শ্রেষ্ঠ রাজকুলে তাহার জন্ম, অর্জুন তাহার ভ্রাতা। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ তাহার জীবনের চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আজ বহু বৎসর অপেক্ষার পরে সেই সুযোগ প্রত্যাসন্ন; আগামী কল্যই তাহার কীর্তিসৌধের

উপরে শেষ প্রস্তরখানা বসাইবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নিদারুণ বিধি বলিয়া গেল—ভুল! ভুল! সমস্তই ভুল! কুন্তী তোমার মাতা, অর্জুন তোমার ভ্রাতা।

যে মুহূর্তে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখনি তো কর্ণের জীবনের ট্র্যাজেডির উপরে যবনিকা পড়িয়া গেল! তারপরে সে মাতার সঙ্গে ফিরিল কি না, যুদ্ধ করিল কি না, সে যুদ্ধের কি ফলাফল হইল—তাহা একান্ত অবান্তর। যথাকালে যে পরিচয় তাহার সৌভাগ্যের চরম হইতে পারিত, কালাত্যয়ে সেই পরিচয় আসিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।

কুন্তী আত্মপরিচয় দানের মুখে,

কুন্তী

ধৈর্য ধর্,
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক্ অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে। কহি তোরে বীর,
কুন্তী আমি।

কর্ণ

তুমি কুন্তী! অর্জুন-জননী!

'তুমি কুন্তী! অর্জুন-জননী!' এই তিনটি শব্দের মধ্যে যে ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল, রহস্যবোধ আছে তাহার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে নাই; অন্য সাহিত্যেও আমার চোখে পড়ে নাই। বজ্রের অকস্মাৎ অট্টকরতালি ও দিগ্‌বক্ষোবিদারী বিদ্যুতের অগ্ন্যুচ্ছ্বাস এই শব্দ তিনটিতে একত্র ধ্বনিত ও প্রতিফলিত; স্বয়ং Irony-র ইহা যেন নিদারুণ অট্টহাসি! ওই ছত্রটির নির্মেঘ, নির্মম, সংক্ষিপ্ত বজ্রাঘাতে কর্ণের সমাপ্ত-প্রায় কীর্তিসৌধ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ওই ছত্রটি যুগপৎ তাহার জীবনের ব্যর্থতার সূচনা ও পরিণাম বহন করিতেছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই অত্যাশ্চর্য ছত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চয়িতার পরবর্তী এক সংস্করণে পরিবর্তিত করিয়া লিখিয়াছেন—

"তুমিই কি কুন্তী, তুমি অর্জুন-জননী !

দুটিমাত্র অক্ষর 'ই' ও 'কি' ছত্রটির সমস্ত মহিমা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।

'তুমিই কি কুন্তী' ইহা চিন্তার ভাষা, যেন কর্ণ একেবারে এ বিষয়ে অচেতন ছিল না, এখন যেন ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতেছে। আর 'তুমি কুন্তী !' বিস্ময়ের ভাষা। এখানে কর্ণের তো কিছু ভাবিয়া দেখিবার নাই, চমকিয়া উঠিবার কথা। 'তুমিই কি কুন্তী'তে নাটকীয় সেই চমক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভাবিবার মতো। এই ছত্রটিকে কবি যখন পরিবর্তন করিলেন, তখন বুঝিতে হইবে ইহার নাটকীয় চমৎকার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। সচেতন নাট্যপ্রতিভা তাঁহার বিশেষ শক্তি নহে বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ইহা যেমন অনায়াসে বদলানো সম্ভব, তেমনি অলৌকিক কবিপ্রতিভা ও মানব-হৃদয়ঙ্গমতা আছে বলিয়াই অবচেতনভাবে এমন একটা শেক্সপীয়র-সুলভ ছত্র তাঁহার পক্ষে লেখা অসম্ভব নয়।

কুন্তী কর্ণকে ফিরাইয়া লইবার জন্য একে একে ধীরে ধীরে মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, এবং সিংহাসনের কথা তুলিয়াছেন। যতক্ষণ মাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃস্নেহের কথা চলিতেছিল, কর্ণ একটা মোহ, একটা nostalgia অনুভব করিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল—

তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে ; নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ, মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয় পরাজয়।

কিন্তু সিংহাসনের কথা উঠিতেই এই স্নেহ-বিরহের মোহ ভাঙিয়া গেল।

সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস!

কুন্তীর খেদোক্তিতে কর্ণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছে—

মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।…
যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী,
দীপ্তিহীন, কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে—
জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

কর্ণ আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছে বটে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে এমন মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, কুন্তীর চেয়ে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রকারান্তরে কুন্তীকেই সে যেন বরদান করিয়াছে। ওই শেষ ছত্র কয়টিতে সে নিজের প্রাণ দান করিয়াছে, পাণ্ডবদের রাজ্য দান করিয়াছে, কুন্তীকে পুত্রের জীবন দান করিয়াছে—নিজের জন্য কেবল সে রাখিয়াছে 'বীরের সদ্‌গতি', 'আপন পৌরুষ ও ধর্ম'; বাস্তবিক-পক্ষে ইহা ছাড়া আর সমস্তই কুন্তীর চরণে জীবনের প্রথম ও চরম মাতৃ-প্রণামীরূপে সে দান করিয়াছে।

এই কাব্যে কুন্তীই সত্যিকার ট্র্যাজিক চরিত্র, এবং তাহার জীবনের

irony-টাও বড় কম নয়। কন্যাবয়স হইতে তাহার সমস্যা—ধর্ম রাখিবে, না পুত্র রাখিবে? ধর্মরক্ষার জন্য কানীন পুত্রকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম রক্ষা করিয়াও তো মনে কখনো শান্তি পায় নাই। তবে কি যাহাকে সে ধর্ম বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল আদৌ তাহা ধর্ম নয়? আবার জীবনের শেষে কন্যাবয়সের সেই সমস্যা ফিরিয়া আসিল। ধর্ম রাখিবে না পুত্র রাখিবে? তখন পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তবেই ধর্মরক্ষা চলিত, এখন পুত্রকে আহ্বান করিয়া তবেই ধর্ম রক্ষা করা চলে। যে লজ্জা সে বিশ্বের কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিয়াছে, নিয়তির পরিহাসে, ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষে আজ তাহা নিজ মুখে তাহারই কাছে প্রকাশ করিতে হইল, বোধ করি যাহার কাছে প্রকাশ করা সবচেয়ে লজ্জাজনক।

কিন্তু ধর্মের গতি সূক্ষ্ম এবং অভাবিত। আজ কুন্তী পুত্রকে ফিরাইতে আসিয়াছে, কিন্তু পুত্রের যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ। মাতার ধর্মে এবং পুত্রের ধর্মে যে বহুকাল হইতে বিরোধ বাধিয়া বসিয়া আছে।

Irony-র লঘু অঙ্গুলি জীবনে কি সূক্ষ্ম ও নিষ্করুণ জালই না বুনিতে পারে! কুন্তীর কানীন পুত্র ও বিবাহজ পুত্র আজ ভ্রাতৃঘাতী রণে উদ্যত। পরিত্যক্ত পুত্র কোন্ গুপ্ত পথের সূত্র ধরিয়া কেমন করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধর্মলঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত বোধ করি এমনি করিয়াই হয়, লঙ্ঘনকারীকে মারিয়া ফেলে না, বাঁচাইয়া রাখিয়া দণ্ড দেয়—তাহার সম্মুখে প্রিয়জনেরা হানাহানি করিয়া মরে। ধর্ম এইভাবেই ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীকে দণ্ডিত করিয়াছে। কুন্তীও ধর্মের দণ্ড সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত সচেতন।

বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি! হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেই দিন কে জানিত হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,

সে কখন্ বল বীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে.
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ!

এই ক্ষুদ্র কাব্যের বিস্তৃত আলোচনার কারণ, রবীন্দ্রনাথের যে কয়টি রচনা জন্মমুহূর্তেই অমরতার টিকা লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে যে ইহা শ্রেষ্ঠ শুধু তাহা নয়, রবীন্দ্রকাব্যেও এমন 'কালের কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল' সৃষ্টি অল্পই আছে, বাংলা সাহিত্যে নাই, পৃথিবীর সাহিত্যেও অল্প থাকিবার কথা।

সাধারণ লক্ষণ

এই কাব্যগুলিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে।

ধর্মাদর্শের আলোচনা এই কাব্যগুলির প্রধান সাধারণ লক্ষণ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাসমতো ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে। কিন্তু একের আদর্শের সঙ্গে অপরের আদর্শে ভেদ থাকায় বিরোধ বাধিয়া নাটক চলমান হইয়া উঠিয়াছে।

কচ প্রতিশ্রুতি-পাশে আবদ্ধ। এই কর্তব্যই তাহার কাছে ধর্ম।

দেব-সন্নিধানে, শুভে, করেছিনু পণ—
মহা-সঞ্জীবনীবিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাব; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন; কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।

দেবযানীর কোনো ধর্মাদর্শ নাই; কিংবা কচের জীবনে প্রতিজ্ঞাপালনের আকাঙ্ক্ষা যে দৃঢ়তা দিয়াছে, দেবযানীর মনে ভালোবাসার সর্বগ্রাসী আকর্ষণের সেই স্থান।

পাপিষ্ঠ দুর্যোধন অমিতসাম্রাজ্যলিপ্সাকে একটা ধর্মের pattern-ভুক্ত করিয়াই প্রকাশ করিয়াছে। তাহার মতে রাজার পক্ষে রাজধর্মই একমাত্র ধর্ম এবং এই

রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি।

গান্ধারী ধর্মের জন্যই দুর্যোধনকে ত্যাগ করিতে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র

কী রাখিব তারে ত্যাগ করি?

গান্ধারী

ধর্ম তব

ধৃতরাষ্ট্র

কী দিবে তোমারে ধর্ম?

গান্ধারী

দুঃখ নব নব।

গান্ধারী

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

বিনায়কের ধর্মের ধারণায় ক্রমবিকাশ আছে। প্রথমে যাহাকে সে ধর্ম বলিয়াছে তাহা সামাজিক আচার মাত্র। সে কন্যাকে বলিতেছে—

ওরে দুর্ভাগিনী নারী,
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি
সে তো বজ্রাহত, দগ্ধ, যাবি কার কাছে
ইহকাল-পরকাল-হারা।

কিন্তু শেষদিকে কন্যার আর্তি দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইয়াছে। সে বলিতেছে—

সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টি সম।

এখানে নিত্যধর্ম ও পিতৃধর্ম এক হইয়া গিয়াছে।

রমাবাই যাহাকে ধর্ম বলিতেছে তাহাও সামাজিক আচার মাত্র—

যবনের গেহে
কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম আপনার?

এই ধর্ম তাহার কাছে এত সত্য যে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য কন্যাকে অসঙ্কোচে চিতায় তুলিয়া দিতে তাহার বাধে নাই।

অমাবাই চিতায় উঠিয়া আহ্বান করিয়াছে—

জাগো জাগো জাগো ধর্মরাজ।
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

যবন-গৃহিণী অমাবাই যে ধর্মরাজকে আহ্বান করিয়াছে তিনি কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের নহেন, তিনি মানুষের দেবতা; যে ধর্মকে সে শ্রেয় মনে করে তাহা কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম নহে, তাহা

নিত্যধর্ম, তাহা মানুষের ধর্ম ; অমাবাই-এর জীবনে পতিধর্ম, সতীধর্ম, ও নিত্যধর্ম এক হইয়া উঠিয়াছে।

নরকবাস কাব্যে সোমকের ধর্মধারণাতেও কিছু বিবর্তন আছে। একদা সে শিশুপুত্রকে ধর্মরক্ষার ছলে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বীর্য আপনার
নিন্দুক-সমাজ-মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম।

এ কথা তখন সে বুঝিতে পারে নাই—দুঃখের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরে এখন বুঝিতে পারিয়াছে। এখন সে ভাবিতেছে জীবনে এমন কি সুকৃতি করিয়াছে যাহার ফলে স্বর্গে যাওয়া তাহার সম্ভব ?

আমি যাব স্বর্গদ্বারে !
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম-অভিমান ?

সোমক প্রথমে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাপালনকেই ধর্ম মনে করিয়াছিল, সে ধর্ম যতই হৃদ্‌ধর্ম-বিরোধী হোক না কেন ; এখন সে নিত্যধর্মের দ্বারে উপনীত।

কর্ণের কাছে পৌরুষ ও অঙ্গীকার-ই ধর্ম।

কুরুপতি-কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন ক'রে ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক্ মোরে।

আগেই সে কুন্তীকে বলিয়াছে—

আপন পৌরুষ ছাড়া ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।

আর কুন্তীর ধর্ম কি ? একদা সামাজিক সম্মানকেই সে ধর্ম মনে করিয়াছিল, তাই কানীন পুত্রকে জলে ভাসাইয়া দিয়া সেই ধর্ম সে

রক্ষা করিয়াছিল। আর আজ যখন সেই পুত্র তাহার আর এক পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত, যখন রাজ্যলোভেও মাতৃক্রোড়ে ফিরিল না, তখন ধর্মের স্বরূপ, ধর্মের বিচার, ধর্মের নিষ্ঠুরতা খানিকটা সে যেন বুঝিতে পারিল!

হায়, ধর্ম, একি সুকঠোর
দণ্ড তব!

এই তো নানাজনের নানারকম ধর্মের আদর্শ গেল। এখন, কবি নিজে কোন্ ধর্মকে আদর্শ মনে করেন? অবশ্য, নিত্যধর্মই তাঁহার আদর্শ। কিন্তু তাহা হইলে কি সমাজে রাজধর্ম, পিতৃধর্ম, ভ্রাতৃধর্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম সমাজধর্মের স্থান নাই? কবি বলিবেন, সমাজ রাজধর্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রভৃতির শুধু যে স্থান আছে তাহা নয়, আবশ্যক আছে; কিন্তু কেবলমাত্র ততক্ষণই যতক্ষণ তাহা নিত্যধর্মের প্রতিকূল না হইয়া উঠিতেছে; নিত্যধর্মের সঙ্গে বিরোধ বাধিলে বুঝিতে হইবে রাজধর্ম, পিতৃধর্ম প্রভৃতি খণ্ডধর্ম ভ্রান্ত; তাহাতে পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। বস্তুত নিত্যধর্মের সঙ্গে খণ্ডধর্মের বিরোধ নাই; খণ্ডধর্ম স্বতন্ত্র নয়, তাহা অখণ্ড নিত্যধর্মেরই অংশ মাত্র।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনকে রক্ষা করা যেমন অন্যায়, সোমকের পুত্রকে ত্যাগ করাও তেমনি অন্যায়, কারণ দুটাই নিত্যধর্মের বিরোধী। ঋত্বিকের শাস্ত্রীয় নিষ্ঠুরতা ও রমাবাইয়ের অপঠিত আচারগত নৃশংসতা—দুই-ই অন্যায়ের সমশ্রেণীভুক্ত। কুন্তীর কানীন পুত্রকে ভাসাইয়া দেওয়া যেমন অন্যায়, আজ সেই কুলে ফিরিয়া গেলে কর্ণের পক্ষেও ঠিক তেমনি অন্যায় হইত।

ধর্মের ফল হইতে মানুষকে পথভ্রান্ত করিতে কে না পারে? স্নেহ পারে—যেমন ধৃতরাষ্ট্রকে করিয়াছে; আচার পারে—যেমন রমাবাইকে করিয়াছে; শাস্ত্র পারে—যেমন ঋত্বিককে করিয়াছে; অহঙ্কার পারে—যেমন সোমককে করিয়াছে; আবার কুলমর্যাদা পারে—যেমন কুন্তীকে করিয়াছে!

এখন, নিত্যধর্ম ও মানুষের ধর্ম কথাগুলি খুব প্রাঞ্জল নয়। নিত্যধর্ম বা মানুষের ধর্ম খণ্ড খণ্ড ধর্মের মহত্তম মূর্তি; ইহা ধর্মের সমগ্রতা, বা সংক্ষেপে ইহাকে ধর্ম বলা যাইতে পারে।

এই ধর্ম বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন?

"সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভুক্ত, তাহাই মনুষ্যত্বের ছোট বড় অন্তর বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।"[১]

আবার?

"প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন্ নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র, তাহার মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে 'রিলিজন্' 'পলিটিক্স' সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই।"[২]

এখানে কবি যাহাকে ধর্ম বলিয়াছেন তাহা গান্ধারীর রমাবাই-এর নিত্যধর্ম, তাহা কুন্তীর ধর্ম। কবির মতে আমাদের দেশে ধর্ম ও সমাজ একর্থক, কাজেই ধর্মে আঘাত পড়িলে সমাজ কাতর হইয়া ওঠে। আর ইহা সামাজিক দুর্যোগ বলিয়াই গান্ধারী পাপী দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। গান্ধারী ব্যক্তিগতভাবে স্বামীপদতলে আসে নাই, 'সমস্ত নারীর হ'য়ে নয়নের জলে' সে রাজপদতলে প্রার্থনায় আসিয়াছে, কারণ ধর্মহানি আমাদের

১ ধর্মপ্রচার, ধর্ম, পৃঃ ৬৫।

২ সমাজভেদ, স্বদেশ, পৃঃ ১০৩।

দেশে ব্যক্তিগত বিপদ নয়, সামাজিক বিপদ, আর রাজা তো সমাজ ও ধর্মকে রক্ষার কর্তা।

কবি উপরি-উক্ত অংশে যাহাকে 'রিলিজন্' বলিয়াছেন তাহা রমাবাই-এর আচার, ঋত্বিকের শাস্ত্রানুশাসন; যাহাকে 'পলিটিক্স' বলিয়াছেন তাহা দুর্যোধনের রাজধর্ম। কারণ, প্রাচ্য সভ্যতায় ধর্ম এ সমস্তকেই অঙ্গীভূত করিয়া বিরাজ করে, তাহা 'অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না।'

এখানে আর একটি সাধারণ লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্য-গুলিতে ন্যায় ধর্মের উপরে খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। সামাজিক সর্বগুণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ন্যায়ধর্মকে, justice-কে প্রধান মনে করেন। ন্যায়ধর্ম কেবল রাজনীতির ব্যাপার নয়, ইহা ধর্মনীতির অঙ্গ। আর সমাজ ও ধর্ম এ দেশে একার্থক হওয়াতে ন্যায়বিচারে যে কেবল সমাজরক্ষা হয় এমন নহে, প্রকৃতপক্ষে ধর্মরক্ষাই হয়। সেইজন্য এ দেশে ন্যায়ধর্মের গুরুত্ব অন্যদেশের চেয়ে অনেক বেশি। রাজার উপরে একাধারে সমাজ ও ধর্মের ভার থাকাতে ন্যায়ধর্মরক্ষার জন্য তাঁহার দ্বিগুণ সজাগ থাকা উচিত। ন্যায়বিচার উপেক্ষা করিবার দৃষ্টান্ত যেমন ধৃতরাষ্ট্র, তেমনি আবার ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ভুল করিবার দৃষ্টান্ত সোমক। সোমকের বিচারে ভুল হইতে পারে, কিন্তু বিচারের সঙ্কল্পে যে তিনি আদর্শ তাহাতে তো ভুল নাই।

কেবল এই সব নাটকে নয়, বহুত্র এই ভাবটি আছে।

বিসর্জন নাটকের ট্র্যাজেডির উৎস গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায়ধর্মের রক্ষায় অটল সঙ্কল্প।

আবার, রাজা ও রাণীতে ঠিক তাহার বিপরীত। বিক্রমের ন্যায়ধর্মের প্রতি অবহেলা হইতেই নাটকীয় ঘটনাচক্রের আবর্তন শুরু হইয়াছে।

এসব ক্ষেত্রে ন্যায়ধর্মের রক্ষক যেমন রাজা, তেমনি অন্যত্র দেখি যিনি রাজার রাজা, ঈশ্বর, সেই ভগবানের ঐশ্বর্যের দিকটাই

রবীন্দ্রনাথকে যেন বেশি আকর্ষণ করিয়াছে, তিনিও জগতের শ্রেষ্ঠ বিচারক, ন্যায়ধর্মের চরম রক্ষক।[১]

আর একটি সাধারণ লক্ষণেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস এবং কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে প্রধান পাত্র-পাত্রী পিতা, মাতা এবং পুত্রকন্যা। ইহাতে কোনো গভীরার্থ আছে কি না? আগেই বলিয়াছি ধর্মাদর্শের পরীক্ষা এই সব কাব্যে চলিয়াছে। ধর্মের জন্য মানুষ কতখানি ত্যাগ করিতে পারে, কতটা সহ্য করিতে পারে—তাহারই যেন ইহা বীক্ষণাগার। ধর্মের জন্য মানুষ ছোটখাট ত্যাগস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু চরম পরীক্ষা যখন আসে মর্মস্থানে আঘাত পড়ে। পুত্র, কন্যা মানুষের মর্মতম স্থান। একেবারে সেই কোমলতম মর্মে আঘাত করিয়া ধর্মের সোনা যাচাই করিতে ইচ্ছা কবি যেন করিয়াছেন; কাজেই এইজাতীয় নাটকে মানুষের কামনার উপরিতলের বস্তুগুলিকে বাদ দিয়া কবি একেবারে অস্তিত্বের তলদেশে গিয়া আঘাত হানিয়াছেন; তাহাতে কতক কৃত্রিম বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, আবার অকৃত্রিম রত্ন ও উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

ইহাতে ছন্দকে নূতন একটি কাজে কবি ব্যবহার করিয়াছেন। মুখের কথার ছন্দকে স্পন্দকে ইহাতে সংলাপের ছন্দে ধরিবার চেষ্টা। এই নাটকের আবহাওয়া ঘরোয়া, ইহার বিষয়বস্তুর সীমানা অন্তঃপুরের বহির্ভূত নয়, চরিত্রগুলি সমস্তই নারীর, এ রকম ক্ষেত্রে ঘরোয়া ছন্দটিকে পরীক্ষার একটা অপূর্ব সুযোগ কবি পাইয়াছেন।

এই পরীক্ষার ক্ষেত্র ও সুযোগ বাংলা কাব্যে এখনো যথেষ্ট রহিয়াছে।

অত্যন্ত সহজ, সরল ও সরসভাবে বহু উচ্চাঙ্গের ভাব ইহাতে

১ দ্রষ্টব্য নৈবেদ্য ৭০, বলাকা ১১, ৩৭।

কথিত হইয়াছে। 'কণিকা'তে যে কাজ কবির করিবার চেষ্টা, সেই কাজ অধিকতর কৌশলে ও আয়াসহীনতায় এখানে সম্পন্ন হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই লঘু সরস নাট্যখানি হইতেই কবির সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃতি প্রবাদ ও বাক্যাংশরূপে বাংলা ভাষায় চালু হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা ও লামিয়া, দুইজন কবির তরুণ বয়সের রচিত কাব্য ; ইহাদের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা কেবল ঘটনার নহে, ভাবনারও বটে, দুইজন তরুণ কবির জীবনদর্শনের চিহ্ন ইহাতে আছে, আর আসল ঐক্য সেই জীবনদর্শনের ভঙ্গীতে। অন্তরের কল্পলোক হইতে বাস্তবের বহির্জগতে বাহির হইয়া পড়িবার প্রয়াস এই দুইখানি কাব্যে আছে ; এই অন্তর্লোক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হৃদয়-অরণ্য, কীট্‌সের ভাষায় রোমান্স।

স্বল্পস্থায়ী কবি-জীবনে কীট্‌স্ দ্রুতপদে নিশ্চিত সন্ধানে এই অন্তর্জগৎ হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন—প্রত্যেকটি কাব্য তাঁহার বহির্মুখী পদচিহ্ন বহন করিয়া সাক্ষ্য দিতেছে। কীট্‌সের কাব্য আছে, আবার তাঁহার চিঠিপত্র ও বন্ধুবান্ধবদের স্মারক আছে, এখন এই দুইয়ে মিলাইয়া একটিকে অপরটির প্রতিপূরক ভাবে ব্যবহার করিয়া আমরা জানি যে, কীট্‌সের জীবনে রোমান্সের মোহভঙ্গের একটা পালা চলিতেছিল ; যে মোহভঙ্গে ভগ্নহৃদয় হইয়া লামিয়া কাব্যের নায়ক Lycius প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তদনুরূপ একটি অভিজ্ঞতা কবির জীবনেও ঘটিতেছিল ; Lycius প্রাণত্যাগ করিয়াছিল—রোমান্স-বিজয়ী কবিচিত্ত তাহাতে মরে নাই, বাস্তবের সত্যতর জগতে নূতনতর জন্ম লাভ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের বেলাতে আমরা কেবল অর্ধেক জানি ; কাব্যকে জানি, অন্তর্জীবনের কোনো ইতিহাস এ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই,

কিন্তু অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, অনুরূপ একটা অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনেও চলিতেছিল, আর কেবল চিত্রাঙ্গদা কাব্যে নয়—পরবর্তী বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতার একই ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাই মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, অভিজ্ঞতার এই চংক্রমণ শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনে চলিতেছে।

২

কাব্যের প্রথমেই দেখি চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন দুইজন দুই ধরনের অবাস্তবতার কল্পলোকে বাস করিতেছে, এই কল্পলোক উভয়েরই স্বেচ্ছাসৃষ্টি—এবং দুইজনেই ইহাকে মানবস্বভাবের উপরে ব্যক্তিগত অভিরুচির বিজয় মনে করিয়া গৌরব বোধ করিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ঘটনাস্রোতে দুইজনে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইতেই ইহার অবাস্তবতা ধরা পড়িয়া গেল—আর শুধু তাই নয়—তখন এই গৌরবের চিহ্নকে ধূলায় লুটাইয়া দিতে দুইজনের কত প্রয়াস!

চিত্রাঙ্গদার অবাস্তবতা তাহার নারীস্বভাব-লোপকারী পুরুষের পরিচ্ছদ ও পুরুষের বীর্য; ইহাতে সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত।

মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য
মাতৃগর্ভে পশি, দুর্বল আরম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

কিন্তু যেদিন তাহার পরুষ নারীত্ব অর্জুনের মনোহরণ করিতে অসমর্থ হইল সেদিন বুঝিতে পারিল, যাহাতে গর্ব তাহাতে তৃপ্তি নাই, বুঝিতে পারিল ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা মানবস্বভাবকে জবরদস্তি করিয়া চাপিয়া ধরিলে তাহাতে নিজেরই শ্বাসরোধ হইয়া আসে। এতদিন যাহাকে অটল দুর্গ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহার দুর্গতি হইতে

রক্ষা করিবার জন্য সে বসন্ত ও মদনের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। বাস্তবের ধাতুকলসের আঘাতে রোমান্সের মৃৎকলসে প্রথম বারের জন্য টোল্ পড়িল ; প্রথমবার এইজন্য যে, এখনো শেষ হয় নাই, মৃৎকলসটা শতখণ্ড হইয়া অতলে তলাইয়া যাওয়া দরকার।

অর্জুনের অবাস্তবতা আবার আর এক রকমের। সে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আর একটা বড় রকমের অপরাধ করিতেছিল —সেটারও তো প্রায়শ্চিত্ত হওয়া দরকার। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সে ব্রহ্মচারী সাজিয়াছিল—অর্থাৎ মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করিতে বসিয়াছিল ; মানবপ্রকৃতি ছাড়িবে কেন—ঘটনার আবর্ত তাহাকে সেই ঘাটে আনিয়া ফেলিল, যে ঘাটের সে ভয় করিতেছিল ; ব্রহ্মচারীর গৌরবকে ঘটনাস্রোত নারীর পদপ্রান্তে আছাড় মারিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল।

যে অর্জুন একদা দেবতার বরলাভের আগের চিত্রাঙ্গদার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া বলিয়াছিল—

ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।—

সেই অর্জুনের রূপময়ী চিত্রাঙ্গদার কাছে নিজের একদা অহঙ্কৃত ব্রহ্মচর্য ভাঙিবার সে কি প্রয়াস !

চিত্রাঙ্গদা

শুনেছিনু, ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি'! হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ ?

অর্জুন

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

এইরূপে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের স্বেচ্ছারচিত মোহদুর্গের প্রথম প্রাকার ভাঙিয়া পড়িল—কিন্তু এই অলঙ্ঘ্য দুর্গের প্রাকার তো আর একটা নয়, একটার পরে আর একটা; কাব্যের পরবর্তী অংশ এই প্রাকারভঙ্গের ইতিহাস।

৩

এবারে চিত্রাঙ্গদা দেখিল যে, সে এক মোহ ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে আর এক গভীরতর মোহের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে, আর এ মোহ তাহার স্বয়ংবৃত, এ মোহের দ্বন্দ্ব মায়াতে মানবে, দেহে মনে, রূপে অরূপে। অর্জুনের চোখ ভুলাইবার জন্য সে বসন্ত ও মদনের নিকট হইতে বর্ষভোগ্য মোহিনীকান্তি ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, এই ভিক্ষালব্ধ সৌন্দর্যই শেষে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

চিত্রাঙ্গদা নিজের বাস্তব কুরূপকে ঢাকিবার জন্য যে রোমান্টিক মায়ার সাহায্য লইয়াছিল অবশেষে তাহাকে সেই রোমান্টিক ছলনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইল—ইহা বাস্তবতার প্রতিশোধ।

দেবতার বরে রূপময়ী চিত্রাঙ্গদার কাছে অর্জুন ধরা দিতে আসিলে সে সুখী না হইয়া অননুভূতপূর্ব একপ্রকার ঈর্ষা বোধ করিল।

মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন।

… … …

হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা—
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।

আবার—

আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা।
... ... মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে।

এখানে মিথ্যা বলিতে চিত্রাঙ্গদা যাহা বুঝিতেছে তাহা নিজের দেবদত্ত রূপ; পার্থ এই দেবদত্ত রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছে, অন্তরের আসল ব্যক্তিটিকে সে দেখিতে পায় নাই; কিংবা আসল ব্যক্তিটিকে অর্জুন দেখিয়াছিল, চিত্রাঙ্গদার সেই রূপহীন রূপ তাহাকে মুগ্ধ করে নাই। তখন সৌন্দর্যহীন সত্যকে মিথ্যা সৌন্দর্যের দ্বারা কোনোমতে ঢাকিয়া দিবার জন্য দেবতাদের সাধনা করিয়াছিল—আর এখন বুঝিতে পারিল—সৌন্দর্যহীন সত্য, মিথ্যা সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক-গুণে বরণীয়: বাস্তব আমাদের যতই আঘাত করুক শেষ পর্যন্ত তাহাই শেষনির্ভর।

৪

চিত্রাঙ্গদাকাব্য রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা; শকুন্তলা কাব্যে একটি মাত্র নায়িকার দ্বারা বিরহমিলনের শেষ কথাটি বলা হইয়াছে, এমন বোধহয় আর কোনো সংস্কৃত কাব্যে হয় নাই। চিত্রাঙ্গদাকাব্যেতে একমাত্র নায়িকা চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু এই একের মধ্যে দুই সৃষ্টি করা হইয়াছে, আর এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে প্রেমের অভিজ্ঞতা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রাঙ্গদার দুইটি সত্তা : বাহিরে সে রূপময়ী, অন্তরে সে প্রেমময়ী ; বাহিরের রূপ দেবদত্ত, অন্তরের প্রেম স্বাভাবিক। অর্জুন যাহাতে আকৃষ্ট চিত্রাঙ্গদার তাহা সত্য রূপ নয়, প্রেমময়ী ত্রাসমিশ্র ঈর্ষার সঙ্গে দেখিতেছে অর্জুনের হৃদয়ের অর্ঘ্য ঐ মিথ্যার পদপ্রান্তে পড়িতেছে—কাজেই

কারে, দেব, করাইলে পান। কার তৃষা
মিটাইলে। সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার সম, সে তো মোর নহে।
... ...
মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাত!

আবার

অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
বাসরশয্যায়
... ...
ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

একদা যে বর পাইয়া নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিল, আজ তাহা ফিরাইয়া দিবার জন্য কি আগ্রহ! অনঙ্গের

কাছে অঙ্গের প্রার্থনা করিলে বোধহয় এইরূপ দণ্ডই হইয়া থাকে।

মদন জিজ্ঞাসা করিল এখন তাহার রূপ কাড়িয়া লইলে অতৃপ্ত অর্জুন কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? অর্জুন কি তাহাকে আক্রোশে পরিত্যাগ করিবে না? চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি আমি রব।

'এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে', অর্থাৎ মিথ্যা সৌন্দর্যের চেয়ে সত্য রূপহীনতা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, রোমান্টিক ছলনার চেয়ে রূঢ়বাস্তব শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু

'মার যদি আমি, তবু আমি আমি রব'।···

বৈষ্ণব কবিদের রাধিকা হইলে অন্য উত্তর দিত; সে বলত, আমি মরি আর বাঁচি তাহা ভাবিবার নয়—আমার প্রিয় তৃপ্ত হইলেই হইল; তাহাতেই আমার তৃপ্তি। প্রেমের আসল লক্ষণ আত্মবিস্মৃতি চিত্রাঙ্গদার প্রেমে নাই, সে 'আমি'টাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। 'আমি'-বিস্মরণের বৈরাগ্য তাহার মধ্যে নাই।

কবি লিখিয়াছেন—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়!'

তিনি জগৎকে ভালোবাসেন বলিয়াই বৈরাগ্যব্রত তাঁহার নয়; কিন্তু প্রেমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য আর কী আছে? যে প্রেম প্রেমাস্পদকে ছাড়া আর সকলকে, এমন কি নিজেকে পর্যন্ত ভুলিয়া যায়, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য; সে হিসাবে রাধা প্রেমের বৈরাগী, চিত্রাঙ্গদা কেবল অনুরাগী মাত্র।

চিত্রাঙ্গদার দেবদত্ত সৌন্দর্য ফিরাইয়া দিবার আগ্রহ দেখিয়া বসন্ত বলিতেছেন,

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে, হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।

মিথ্যাই হোক, আর সত্যই হোক, প্রেমের বিকাশে রূপেরও সার্থকতা আছে। রূপ ও প্রেম, বাহির ও অন্তর, দেহ ও আত্মা, দুইয়ে মিলিয়াই পরিপূর্ণ সত্তা।

গ্রীক শিল্পীরা এ সত্য জানিতেন; আবার এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ গ্রীক প্লেটো ইহাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন; তিনি অন্তর্লোকের উপরে অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমান্টিক সাহিত্যের আমলে এই দু'য়ের সন্ধি ভাঙিয়া গিয়া বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে—

'Life, life a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of eternity,
Until death tramples it to fragments.'

সূর্যের শুভ্রকিরণ ও সপ্তচ্ছদ বর্ণমালা বস্তুত একই, তবে চিত্রবর্ণ জীবনদেউলের স্ফটিক ভাঙিয়া ফেলিয়া নিরঞ্জন শুভ্রতাকে দেখিবার অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন? কারণ, রোমান্টিক মনোবৃত্তির কাছে বহিঃ অপেক্ষা অন্তঃ-র মূল্য অধিক; দেহ অপেক্ষা আত্মার দাবী বড়; তথ্যনিরপেক্ষ সত্যর প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা অত্যুগ্র। রোমান্টিক মনোবৃত্তি জানে না যে, বহিঃ ও অন্তঃ মিলাইয়াই সত্তার সমগ্রতা, দেহ ও আত্মা, তথ্য ও সত্য মিলিয়াই সত্তার সম্পূর্ণ রূপ। রোমান্টিক মনোবৃত্তির ট্র্যাজেডি এই যে, জীবনকে সে ভালোবাসে, কিন্তু

ভালোবাসায় যে ধৈর্য, যে সহিষ্ণুতার আবশ্যক সে গুণ তাহার নাই; জগৎকে সে জানিতে চায়, কিন্তু জ্ঞানের জন্য যে অবিচলিত নিষ্ঠার আবশ্যক সে নিষ্ঠা তাহার নাই; রোমান্টিক মনোবৃত্তির ট্র্যাজেডি এই যে, কাজ সে করিতে চায়, কিন্তু কর্মে প্রতিপদে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ আবশ্যক সে নিয়মানুবর্তিতা তাহার নাই; রোমান্টিক মনোবৃত্তি "a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain."

প্রেমের বিকাশে রূপের প্রয়োজন আছে বসন্ত তাহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হয় না—কারণ এই ধার-করা রূপে তাহার 'আমিত্ব' তৃপ্ত হইতেছে না; অর্জুনকে তৃপ্তি দিতে গিয়া তো আর সে নিজের আমিত্বকে খর্ব করিতে পারে না। ধার-করা রূপে যে তাহার আমিত্ব খর্ব হয়—তাহার প্রেমের লক্ষ্য প্রেমিক নয়—সে নিজে, তাহার বিশ্বগ্রাসী 'আমি'।

এই পর্যন্ত গেল চিত্রাঙ্গদার রূপের ট্র্যাজেডি। এবারে তাহার প্রেমের ট্র্যাজেডি দেখা যাক্। সে জানিত তাহার বাহিরের রূপ অন্তরের 'আমি'র শত্রু। তাহার ভয় ছিল একদিন অর্জুন রূপের এই ছলনা ধরিয়া ফেলিবে, তাই সে নিজে হইতেই ছলনাকে দূর করিয়া দিবার জন্য মদনবসন্তকে অনুরোধ করিয়াছিল। অনুরূপ একটা ভীতি প্রেম সম্বন্ধেও তাহার মনে ছিল; বিশ্ববিহীন, সমাজসম্বন্ধহীন, উন্মাদনসর্বস্ব, আরণ্য প্রেম চিরস্থায়ী নয়; অরণ্যের পরিবেশ হইতে ইহাকে ছিন্ন করিয়া সংসারে লইয়া গেলে ছিন্নবৃন্ত অরণ্যের ফুলের মতোই ইহা ঝরিয়া যায়; জীবনের সমগ্র দাবিকে উপেক্ষাকারী এ প্রেম টিকিতে পারে না, এ-মোহ একদিন ভাঙিবেই। কিন্তু মোহ-ভঙ্গের আগে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই লাভ; কালের দৈর্ঘ্যে আনন্দের বিচার নয়, স্বল্পস্থায়ী বলিয়াই আনন্দ আনন্দদায়ক, হীরার টুকরা ছোটই হয়।

এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে চিত্রাঙ্গদা পুরাপুরি রিয়ালিস্ট,

প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে এতটুকু ভ্রান্তিও তাহার মনে ছিল না। বরঞ্চ অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাহার দৃষ্টিকে স্বচ্ছতর বলিয়া মনে হয়।

চিত্রাঙ্গদা জানিত প্রেমের উন্মাদনায় শ্রান্তি আছে; যে-প্রেমের জীবন তাহারা যাপন করিতেছে, সেই রোমান্টিক প্রেমের স্থান সংসারে নয়: সমাজ বংশ গোত্রের দ্বারা ধরিতে গেলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়: অর্থাৎ প্রণয়িনী আর গৃহিণী একসঙ্গে পাওয়া যায় না; প্রণয়িনীর কালক্রমে গৃহিণী হইয়া উঠিতে আপত্তি নাই, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে প্রণয়িনী তখন আর প্রণয়িনী থাকে না।

অর্জুন এমন স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি ধরিতে পারে নাই; সে প্রণয়িনীকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া চিত্রাঙ্গদার নামধাম বংশপরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল। অথবা আরও সত্য কথা এই যে, অর্জুন চিত্রাঙ্গদার মধ্যে প্রণয়িনী ও গৃহিণীর সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা সেদিক দিয়াই গেল না—সে এই দুইটাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে চায়; সে গৃহিণী হইবে, কিন্তু এখন নয়; প্রণয়িনীর পালা ফুরাইলে গৃহিণীরূপে সে দেখা দিবে। বসন্তের উক্তিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া লইলেই আমাদের কাজ চলিবে—

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল।

ফুলের স্থানে প্রণয়িনী আর ফলের স্থানে গৃহিণী।

এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে চিত্রাঙ্গদাকাব্যকে প্রেমের বিকাশের কাব্য বলা যাইতে পারে—প্রণয়িনী হইতে গৃহিণীর বিকাশ; পত্নীরূপ হইতে মাতৃরূপের বিকাশ; এই হিসাবেও ইহা শকুন্তলাকাব্যের সগোত্র।

অর্জুনের বীরচিত্তকে প্রেমের মদিরা বেশিদিন মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই; মোহ তাহার হইয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে

মোহভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিল ; একে একে বিরাট বিশ্ব আবার তাহার চোখে পড়িয়াছে। প্রেমের সংগ্রাম হইতে পৃথিবীর সঙ্গলিপ্সা আবার তাহার মনে দেখা দিল ; সে বুঝিল প্রেম যত বড়ই হোক বিশ্ব তাহার চেয়ে বড়। তাই সে একদিন চিত্রাঙ্গদাকে বলিল—প্রেমের পালা সাঙ্গ হইয়াছে ; প্রেমের স্মৃতিকে বহন করিয়া এখন গৃহে ফিরিবার দিন আসন্ন।

শঙ্কিত চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

এ প্রেমের গৃহ আছে ?

অর্জুন

গৃহ নাই ?

চিত্রাঙ্গদা

নাই।

গৃহে নিয়ে যাবে ! বোলো না গৃহের কথা !
গৃহ চিরবরষের ; নিত্য যাহা থাকে
তাই গৃহে নিয়ে যেয়ো।

গৃহ শাশ্বত, শাশ্বতগৃহে প্রেমের শাশ্বতী মূর্তি—গৃহিণীমূর্তি সাজে ; প্রেমের উন্মাদিনী মূর্তি, যে অবাস্তব রোমান্টিক প্রেমজীবন তাহারা যাপন করিতেছে, তাহার যথার্থ স্থান এই অরণ্যেই, সেখানে সমাজ নাই, সংসার নাই, বিশ্ব নাই—কেবল তাহারাই আছে।

কিন্তু অর্জুনের মন আজ লোকালয়ের জন্য আকুল ; চিত্রাঙ্গদার প্রেমের প্রতিযোগিতার এই কি যোগ্য উত্তর—

ওই শোনো

প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

৬

চিত্রাঙ্গদা চায় মোহকে দীর্ঘায়িত করিতে—কারণ, মোহ তো একসময়ে ভাঙিবেই ; অর্জুন চায় মোহাতীত মানুষকে। মোহের ক্ষণস্থায়িত্ব তাহাকে ভীত করে, মোহকে ধরা-ছোঁয়া যায় না ; মানুষকে সে নামগোত্রবংশ দশ রকমে দৃঢ় করিয়া ধরিতে চায়।

চিত্রাঙ্গদা যখন দেবদত্ত রূপ দেবতাদের ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল—তারপরে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে! এখন অর্জুন সেই রূপের আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া আসল মানুষটাকে চায় আর আসল মানুষ রূপের আড়াল ছাড়িয়া এখন বাহির হইয়া আসিতে রাজী নয়।

অর্জুন

কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয় পরিজন ?
... ...

চিত্রাঙ্গদা

তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন !

অর্জুন

কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে ? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে প'ড়ে
গেছে ? ... ...
তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এসো।
নামধাম-গোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধন-পাশে ধরা দাও প্রিয়ে !
... ...

চিত্রাঙ্গদা

নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানে নি। ... ...

অর্জুন

তাহারে যে ভালবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম! বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে।

এখানে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার দ্বন্দ্বের মূলে দুটি বিভিন্ন বস্তু, অর্জুন ভালোমন্দ-ভুলত্রুটি-পূর্ণ মানুষের কথা বলিতেছে—আর চিত্রাঙ্গদা নিখুঁত, নিটোল নিছক প্রেমের কথা বলিতেছে, যে প্রেম—"মেঘের সুবর্ণ ছটা, গন্ধ কুসুমের, তরঙ্গের গতি।"

অর্জুনের বীরচিত্তের জাগরণের মুখে এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে কাহিনীর গতি ত্বরিত হইয়া উঠিয়া পরিণামকে অবশ্যম্ভাবীর মুখে ঠেলিয়া দিল। পার্বত্য জাতির অকস্মাৎ আক্রমণে মণিপুর রাজ্যে হাহাকার উঠিয়াছে; আগে চিত্রাঙ্গদা রাজ্যের রক্ষক ছিল—এখন সে তীর্থযাত্রা করাতে অসহায় প্রজাদের কে আর রক্ষা করিবে! চিত্রাঙ্গদার নর্মালাপের আহ্বানে অর্জুন বলিল—

আজ নহে
প্রিয়ে।

চিত্রাঙ্গদা

কেন নাথ?

অর্জুন

শুনিয়াছি, দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা বলিল, কোনো ভয় নাই। তীর্থযাত্রাকালে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা চিত্রাঙ্গদা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু

অর্জুন

তবু আজ্ঞা করো, প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে আসি কর্তব্যসাধন। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।

তারপরে চিত্রাঙ্গদা অন্যমনস্ক অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে সে কাহার কথা ভাবিতেছে। চিত্রাঙ্গদার? অর্জুন জানিত না যে চিত্রাঙ্গদাই তাহার সম্মুখে; সে তাহাকে পাইয়াও পায় নাই। কেন? কেবল কি জানিত না বলিয়াই? না। সে কেবল চিত্রাঙ্গদার দেহটাকে পাইয়াছিল, দেহ ও দেহাতীত সত্তায় মিলিয়া যে সম্পূর্ণ মানুষ তাহাকে পায় নাই; প্রেমের উন্মাদনাকে পাইয়াছিল, উন্মাদনা ও শান্তি মিলিয়া যে প্রেমের পূর্ণতা তাহাকে সে পায় নাই; Irony-কে প্রকাশ করিবার জন্যই কবি অর্জুনকে দিয়া বলাইতেছেন—

বুঝিতে পারি নে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন-রত্ন, আলিঙ্গন-সুধা;
... ... অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে। তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
... ...

সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে-সত্য তাই লও।

এতক্ষণে অর্জুনের মোহ সম্পূর্ণ ভাঙিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার মোহ ভাঙিবার ভয় ছিল—কিন্তু মোহ ছিল না। তাহার আশঙ্কা ছিল—

যামিনীর নর্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের অনুচর, সে কি-ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে?

কিন্তু অর্জুনের ব্যাকুলতা দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল অর্জুন সত্যই বীর অর্থাৎ সে মোহের চেয়ে সত্যকে বড় মনে করে; বহিঃ অপেক্ষা অন্তরকে মূল্যবান মনে করে; সুন্দর অবাস্তবের চেয়ে নিষ্করুণ বাস্তবকে বাঞ্ছনীয় মনে করে,—তাহার আত্মপ্রকাশে অর্জুন আর আঘাত পাইবে না—বরঞ্চ আত্মপ্রকাশ না করিলেই আহত হইবে। দেবদত্ত রূপের উল্লেখ করিয়া সে বলিতেছে—

যে-ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে-ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে, কত দৈন্য আছে; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা। কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণীহৃদয়।

... ...

আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ।

চিত্রাঙ্গদার এই আত্মপ্রকাশের উক্তির সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের আত্মনিবেদনের কেমন মিল !

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবারে পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।

চিত্রাঙ্গদার আর শেষের কবিতার মধ্যে কত বৎসরের দূরত্ব, কিন্তু কবির দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য অবাস্তবের মোহভঙ্গের কাব্য ; তাঁহার কাব্যের মোহভঙ্গের সূচনা আছে, কিন্তু কোথাও সম্পূর্ণতা নাই।

"অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে, তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেললাইনের ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে, আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি না হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে, সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্র্যশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ

লাভ, যুগলজীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়; এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধুলি-প্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্র্যশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল; সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।”[১]

চিত্রাঙ্গদা কাব্যকে রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা বলিয়াছি—ইহা অতিরঞ্জনের অত্যুক্তি নহে, সূক্ষ্ম দর্শনের ফল। শকুন্তলা ও চিত্রাঙ্গদার প্রেমের বিকাশে অনুরূপত্ব আছে। আর শুধু শকুন্তলা কেন, কুমার-সম্ভবের সঙ্গেও ইহার আন্তরিক ঐক্য। চিত্রাঙ্গদা মদনের সহায়তায় অর্জুনের চিত্ত জয় করিতে চাহিয়াছিল, সিদ্ধিলাভও করিয়াছিল, কিন্তু দেখিতে পাইল তাহাতে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। উমা ও শকুন্তলা উভয়েরই এই এক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল।

> “কুমারসম্ভব ও শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। দুইটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে-মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন, অসম্পূর্ণ হইয়া, আপনার বিচিত্র কারুকার্যখচিত পরমসুন্দর বাসরসজ্জার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে।……
>
> স্পর্ধিত মদন যে-মিলনের কর্তৃত্বভার লইয়াছিল, তাহার আয়োজন প্রচুর। সমাজ-বেষ্টনের বাহিরে দুই তপোবনের

১ সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড।

মধ্যে অহেতুক আকস্মিক নবপ্রেমকে কবি যেমন কৌশলে, তেমনি সমারোহে, সুন্দর অবকাশ দান করিয়াছেন।"[১]

শকুন্তলাতে যাহা দৈবশাপ, চিত্রাঙ্গদাতে তাহা নায়িকার মনস্তাপ— এই মাত্র প্রভেদ। মদনের যে কি প্রতাপ তাহা কালিদাস জানিতেন, রবীন্দ্রনাথও জানেন, কেহই তাহাকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু কেহই সেই প্রতাপ মাত্রে থামিয়া থাকেন নাই; কাম হইতে প্রেমে, বাহিরের রূপ হইতে অন্তরের আশ্রয়ে, উন্মাদনা হইতে মঙ্গলে নিজেদের কাব্যপরিণামকে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন।

"দেশকালপাত্রকে মুহূর্তের মধ্যেই এমন করিয়া যে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, সেই মীনকেতনের যে কি শক্তি, কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু কবি সেইখানেই থামেন নাই। এই শক্তির কাছেই তিনি তাঁহার কাব্যের সমস্ত রাজকর নিঃশেষ করিয়া দেন নাই। তিনি যেমন হঠাৎ জয়সংবাদ আনিয়াছেন তেমনি অন্য দুর্জয় শক্তি দ্বারা পূর্ণতর চরম মিলন ঘটাইয়া তবে কাব্য বন্ধ করিয়াছেন।

... ...

যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্নপ্রাসাদের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। ... ...

যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেই-জন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।"[২]

---

১ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃ ১৬, প্রাচীন সাহিত্য।

২ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃ ১৭-১৮, প্রাচীন সাহিত্য।

ইহা যেমন উমার পক্ষে সত্য, শকুন্তলার পক্ষে সত্য, তেমনি চিত্রাঙ্গদার পক্ষেও সত্য।

কালিদাসের মতে প্রেমের পরিণাম মাতৃত্বে; কুমারসম্ভবের জন্যই এত আয়োজন; স্বর্গকে দৈত্যকবল হইতে মুক্ত করিতে হইলে কুমার-সম্ভবের আবশ্যক; আবার শকুন্তলাকাব্যও কুমারসম্ভব ছাড়া আর কিছু নয়—তাহাকে ভরতসম্ভব নাম দেওয়া যাইতে পারে। সত্য কথা বলিতে কি, কালিদাসের সমস্ত কাব্য, বিক্রমোর্বশী হইতে রঘুবংশ পর্যন্ত কুমারসম্ভাবনার কাব্য; তাঁহার একমাত্র বক্তব্য মানবের জন্মকথা।

চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

গর্বে

আমি ধরেছি যে-সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে
তখন জানিবে মোরে।

সেই পুত্রের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার যথার্থ পরিচয়; অর্জুন সেইদিন তাহাকে যথার্থভাবে জানিতে পারিবে।

"জননীপদ আমাদের দেশে নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গল ব্যাপার। সেইজন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ',—তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। সমস্ত কুমারসম্ভবকাব্য কুমারজন্ম-রূপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। শকুন্তলাতে প্রথম অঙ্কে প্রেয়সীর সহিত দুষ্মন্তের ব্যর্থপ্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরতজননীর সঙ্গে তাঁহার সার্থক মিলন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।"[১]

---

১ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃ ২৩-২৪, প্রাচীন সাহিত্য।

"দেখা গেল, কুমার ও শকুন্তলার কাব্যে বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহার আরম্ভ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত ; দেখাইয়াছেন ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব, এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠরূপ ; বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি।

তাঁহার [কালিদাসের] মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।"[১]

উদ্ধৃত অংশ কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, চিত্রাঙ্গদার পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য। কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্বের শান্তি সন্তান-জন্মে—যে সন্তান প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে বিশ্ব-বিস্মৃত সংকীর্ণতা হইতে বাহির করিয়া মানুষের মধ্যে পুনরানয়ন করে। কুমারসম্ভবের ইঙ্গিতে চিত্রাঙ্গদা কাব্যখানিকে সেই বিরাট পটভূমিকার উপরে স্থাপিত করা হইয়াছে।

মদনের প্রতাপ যে শুধু চিত্রাঙ্গদা বুঝিয়াছে এমন নয়, অর্জুনও বুঝিয়াছে ; ক্ষণকালের জন্য মোহগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু চরম মোহের অবস্থাতেও সে বীরের কর্তব্যকে বিস্মৃত হয় নাই ; আর্ত মানুষের ক্রন্দন শুনিবামাত্র তাহার বীর্য জাগিয়া উঠিয়াছে, সে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে ; এদিক দিয়া দুষ্মন্তের সঙ্গে তাহার ঐক্য আছে। কি কণ্বের তপোবনে মোহের অবস্থায় কি প্রাসাদের উপবনে বিরহের অবস্থায় সে রাজকর্তব্য ভুলিয়া যায় নাই ; একবার সে মত্তহস্তীর আক্রমণ হইতে তপোবন রক্ষার জন্য, আর একবার দৈত্যহস্ত হইতে স্বর্গ উদ্ধারের জন্য দ্বিধামাত্র না করিয়া যাত্রা করিয়াছে ; অর্জুন তাহার পূর্বপুরুষের রক্তসম্বন্ধ ভুলিতে পারে নাই।

১ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃ ২৬-২৭, প্রাচীন সাহিত্য।

গ্যেটের শকুন্তলা-সম্বন্ধীয় শ্লোকটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে—চিত্রাঙ্গদার "আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়াছে।"

প্রারম্ভে Lamia-র সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার তুলনা করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম দুইটিই মোহভঙ্গের কাব্য; 'লামিয়া'তে কেবল মোহভঙ্গের কথাই আছে, চিত্রাঙ্গদাতে মোহভঙ্গ ছাড়া মোহভঙ্গের পরিণামও আছে। একটিমাত্র আইডিয়াকে অবলম্বন করিয়া বিকাশের ফলে কাব্য হিসাবে লামিয়া যে নিটোল অনবদ্যতা লাভ করিয়াছে, আইডিয়ার জটিলতার জন্য চিত্রাঙ্গদাতে তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ। চিত্রাঙ্গদা পড়িতে পড়িতে বারংবার এই কথা মনে হইয়াছে যে, মোহভঙ্গের আইডিয়াকে আপন নিয়ম অনুসারে বাড়িয়া উঠিতে দেওয়া হয় নাই; তাহার স্বাভাবিক গতিকে কবির সততব্যগ্র হাত নিজের ইচ্ছানুসারে মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে; কবির ব্যস্তবাগীশ ফিলজফি সর্বদা একপোঁচ রং লাগাইয়া দিতে আগ্রহশীল; কাব্যখানি ফিলজফির গুরুত্বে যে পরিমাণ লাভবান্ হইয়াছে, কাব্যসৌন্দর্য সেই পরিমাণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই ক্ষীণ কাহিনীর উপরে যে পরিমাণ তত্ত্ব চাপানো হইয়াছে কাহিনীটি তাহা বহনক্ষম নয়। কালিদাস যে কাজ কুমারসম্ভবের সপ্তসর্গে ও শকুন্তলার সপ্তাঙ্কে করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা বড় বড় অক্ষরে ছাপা সত্তরটি পৃষ্ঠায় করিতে উদ্যত। পত্রাঙ্ক গুনিয়া কাব্য-বিচারের রীতি নাই জানি—কিন্তু ইহাও জানি যে, একটা আইডিয়া ডালপালা মেলিয়া বিকশিত হইতে কিছু স্থান অধিকার করে—সেই স্থানের সঙ্কীর্ণতা হইলে তাহার বিকাশে বাধা ঘটে। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সঙ্কীর্ণ স্থান মোহভঙ্গের আইডিয়ার পক্ষেই যথেষ্ট; তাহার পরিণামের বিকাশের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়; স্বল্প পরিসরে বহু আইডিয়াকে ভরিতে গিয়া একটা অন্ধকূপহত্যার ব্যাপার ঘটিয়াছে। কবির ঐশ্বর্যই এখানে তাঁহার

শক্র ;—কবির যে পরিমাণ ভাবপ্রাচুর্য [কালিদাস তো আছেনই] সে পরিমাণ শিল্পজ্ঞান যেন নাই ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কবির বয়সও তখন মাত্র ত্রিশের কোঠার প্রথম ধাপে।

আরও একটি কথা বারংবার মনে হইয়াছে, কাব্যখানিকে নাট্যরূপ না দিয়া কাহিনীরূপ দিলেই যেন সুবিচার হইত। ইহাতে নাটকীয় লক্ষণ বা গুণ বিশেষ নাই ; পাত্রপাত্রীর মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া হইলেও সেগুলি কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। পাত্রপাত্রীর নাম তুলিয়া দিয়া সামান্য একটু পরিবর্তন করিলেই ইহাকে কাহিনীতে পরিণত করা যাইতে পারে—কারণ, আকৃতির বিচারে নাটক হইলেও প্রকৃতির বিচারে ইহা কাহিনী। আর কাহিনীরূপ পাইলেই কথোপকথনের ফাঁকগুলি ভরিয়া উঠিয়া সমগ্র কাব্য সংহত হইয়া উঠিত, তাহাতে দীপ্তিও বাড়িত—নাট্যরূপের দ্বারা অযথা বাধাগ্রস্ত কবিও অনেকটা স্বাধীনতা পাইতেন।

মালিনী

মালিনী কাব্যনাট্যগুলির প্রায় সমসাময়িক রচনা। কাব্যনাট্যগুলি রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের যে প্রক্রিয়া চলিতেছিল মালিনীতেও তাহা কাজ করিতেছে।[১] বস্তুত বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মধ্যে ধর্মের স্বরূপ লইয়া যে মতভেদ ঘটিয়াছে—তাহা হইতেই ইহার নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলিতেছেন—

"আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নিশ্চল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে,

১ সতী নাটকের মতো এখানেও কন্যাকেই আশ্রয় করিয়া ধর্মবিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে।

মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি; সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।"[১]

রাজকুমারী মালিনীর হৃদয়ে অকস্মাৎ সত্যধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে; তাহার গুরু কাশ্যপের উপদেশ তাহাকে লালন করিয়াছে। তখনকার হিন্দুসমাজে, ধর্মের রক্ষক রাজপরিবারে, অভ্যস্তআচার পৌরজনের মধ্যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিয়াছে। মালিনীর পিতা ও মাতা, রাজা ও মহিষী কন্যার এই নূতন ধর্ম বুঝিতে পারেন না; পৈতৃক ধর্মেই তাঁহারা অভ্যস্ত। পৌর ব্রাহ্মণগণ এই নবধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মালিনীর নির্বাসন দাবি করিয়াছে; ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়, দুই বন্ধু ইহাদের নেতা।

ক্ষেমঙ্কর চিরাচরিত ধর্মের নেতা হইলেও অন্য ব্রাহ্মণদের মতো দুর্বলচরিত্র মূঢ়বুদ্ধি নয়। আবার সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের প্রিয়তম বন্ধু হইয়াও বন্ধুর প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। ক্ষেমঙ্করের ধর্ম-মতই তাহার ধর্ম-মত; অন্তত মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহাই ছিল। মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তাহার চরিত্রে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ক্ষুদ্র ফাটল অচিরকালের মধ্যে বৃহত্তর হইয়া সর্বনাশের বন্যাকে নাটকের মধ্যে প্রবেশের পথ দিয়াছে। মালিনী, ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়—এই তিনজনই নাটকের প্রধান চরিত্র।

এখন, এই নাটকের অধিকাংশ পাত্রপাত্রী নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে ধর্মের ব্যাখ্যা ও স্বরূপোদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা

১ মালিনী, সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড।

করিয়াছে। তন্মধ্যে কতক কেবল গতানুগতিক মাত্র, আবার কতক অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, কারণ আকস্মিক অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে অভাবিতের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

মালিনীর নবধর্ম প্রচারে প্রজাগণের বিদ্রোহোন্মুখতায় ভীত রাজা কন্যাকে বলিতেছেন—

হায়রে অবোধ মেয়ে, নবধর্ম যদি
ঘরেতে আনিতে চাস্, সে কি বর্ষানদী
একেবারে তট ভেঙে হইবে প্রকাশ
দেশবিদেশের দৃষ্টিপথে? লজ্জা ত্রাস
নাহি তার? আপনার ধর্ম আপনারি,
থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী
দেখে যেন নাহি করে দ্বেষ, পরিহাস
না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস্
রাখ্ মনে মনে।

স্পষ্টই বুঝা যায় রাজা ধর্মের আধ্যাত্মিকতার ধার ধারেন না; ইহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই তাঁহার একমাত্র দ্রষ্টব্য। মালিনী যদি বৌদ্ধ হইতে চায় তা হোক, কিন্তু তাহা যেন প্রকাশ হইয়া না পড়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দু—উভয় ধর্মের প্রতিই তাঁহার অবিশ্বাসীর মনোভাব; তাঁহার কাছে ধর্ম বৃহত্তর রাজনীতির একটা প্রত্যঙ্গ মাত্র। অপ্রকাশিত নবধর্ম যেমন তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত, তেমনি বুঝিতে পারা যায় যে, রাজ্যরক্ষার জন্য কন্যাকে ত্যাগ করিতেও তাঁহার বাধিবে না।

কন্যা ও তাহার নবধর্মের প্রতি রাজা শ্রদ্ধা ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কখন্? বিদ্রোহী প্রজাগণকে মালিনী যখন শান্ত করিয়া ফেলিল; বিদ্রোহীরা সোল্লাসে যখন তাহাকে রাজগৃহে ফিরাইয়া আনিল; মালিনীর কৃতিত্বে পতনোন্মুখ রাজসিংহাসন যখন আবার অটল হইল, মাত্র তখনই রাজা বলিতেছেন—'

কি সৌন্দর্যময়
আজিকার ছবি। সমুদ্রমন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন—তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে ঊর্মিগুলি সবে,
সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।

ইহাতে কন্যাস্নেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম হিসাবে ধর্মের প্রশংসা নাই; ধর্ম যে ক্ষমতাশালী একটা রাজনৈতিক অস্ত্র—এই বোধই ইহাতে স্পষ্ট। একদা এই ধর্মের জন্যই রাজার সিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছিল, আবার এখন ইহার জন্যই তাঁহার সিংহাসন দৃঢ় হইল, দুটাই বৃহত্তর রাজনীতির প্রতিক্রিয়া। মালিনীর প্রতি তাঁহার যে সপ্রশংস মনোভাব, তাহা আদৌ কন্যার ধর্মের জন্য নয়—কন্যার লোকচালনার ক্ষমতার জন্য।

মহিষীর ধর্মমতও গতানুগতিক, কিন্তু তাহার সঙ্গে কন্যাস্নেহ মিশ্রিত বলিয়া তাহাকে দুই বিপরীত কোটির মধ্যে দোদুল্যমান দেখি। তিনি অবশ্যই নবধর্ম পছন্দ করেন না।

এ ধর্ম কোথায় পেলি, এ শাস্ত্রবচন?
আমার পিতার ধর্ম সে তো পুরাতন
অনাদি কালের। কিন্তু মাগো, এ যে তব
সৃষ্টিছাড়া, বেদছাড়া ধর্ম অভিনব
আজিকার গড়া। কোথা হ'তে ঘরে আসে
বিধর্মী সন্ন্যাসী? দেখে আমি মরি ত্রাসে।

তেমনি আবার তিনি হিন্দুধর্মের জ্ঞানমার্গীয় অনুষ্ঠানকেও পছন্দ করেন না—

শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতেরা মরুক ভাবিয়া
সত্যাসত্য ধর্মাধর্ম কর্তাকর্মক্রিয়া

অনুস্বার-চন্দ্রবিন্দু লয়ে। পুরুষের
দেশভেদে কালভেদে প্রতিদিবসের
স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম ; সদা হাহা করে
ফিরে তারা শান্তি লাগি সন্দেহ-সাগরে,
শাস্ত্র লয়ে করে কাটাকাটি।

তাঁহার ধর্ম মুখ্যত নারীর ধর্ম, কন্যার ধর্ম, মাতৃধর্ম, এবং সে হিসাবে চিরন্তন ধর্ম।

ধর্ম কি খুঁজিতে হয় ?
সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময়,
চিরকাল আছে। ধর তুমি সেই ধর্ম
সরল সে-পথ। লহ ব্রতক্রিয়াকর্ম
ভক্তিভরে। শিবপূজা কর দিনযামী,
বর মাগি লহ বাছা তাঁরি মত স্বামী।
সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা,
শাস্ত্র হবে তারি বাক্য, সরল এ-কথা।
... ...
রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।

রাজা যখন কন্যাকে নবধর্ম গ্রহণের জন্য তিরস্কার করিলেন তখন মহিষী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—

কি শিক্ষা শিখাতে এলে আজ
পাপ রাষ্ট্রনীতি ? লুকায়ে করিবে কাজ,
ধর্ম দিবে চাপা ! সে মেয়ে আমার নয়।
সাধু সন্ন্যাসীর কাছে উপদেশ লয়,
শুনে পুণ্যকথা, করে সজ্জনের সেবা,
* আমি তো বুঝি না তাহে দোষ দিবে কেবা
ভয় বা কাহারে ;

ইহা কেবল যে কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্যই মহিষী বলিলেন এমন মনে করিবার কারণ নাই; এই অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্মের নয়, হিন্দুধর্মেরও বটে, যে কোন ধর্মেরই হইতে পারে; ভক্তি ইহার মূলে; ইহা মানবধর্ম, বিশেষ করিয়া নারীর ধর্ম, কাজেই মনে করা যাইতে পারে কন্যার এইসব অনুষ্ঠানে মাতার অনুমোদন ছিল।

মহিষীর দোদুল্যমান মত সত্ত্বেও প্রধানত তাঁহার মন মাতৃ-মন, গৃহিণী-মন; গৃহধর্মে, সংসারধর্মেই তাঁহার সবচেয়ে বেশি আস্থা। রাজা যখন মালিনীর লোকপরিচালন-ক্ষমতায় কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তখন মহিষী বলিতেছেন—

নবধর্ম নবধর্ম, কারে বল তুমি
কে আনিল নবধর্ম, কোথা তার ভূমি
আকাশকুসুম? কোন্ মত্ততার স্রোতে
ভেসে এল—কন্যারে মায়ের কোল হতে
টানিয়া লইয়া যায়—ধর্ম বলে তায়?
তুমিও দিয়ো না যোগ কন্যার খেলায়
মহারাজ। বলে দাও, গ্রহবিপ্রগণ
করুক সকলে মিলে শান্তিস্বস্ত্যয়ন
দেবার্চনা। স্বয়ংবর-সভা আনো ডেকে
মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে
খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক্ বরমালা—
দূর হবে নবধর্ম, জুড়াইবে জ্বালা।

সরলস্বভাবা মহিষী কি করিয়া জানিবেন রাজা আদৌ নবধর্মের জন্য ব্যস্ত নহেন; নবধর্মের লোকশান্তিকর রাজনীতির স্বরূপ তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছে মাত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে রাজার রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ মস্তিষ্কের চেয়ে মহিষীর মাতৃহৃদয়ের দৃষ্টিই সত্যতর।

পৌর ব্রাহ্মণগণের ধর্মমত একান্ত গতানুগতিক। রাজকন্যার

নবধর্মগ্রহণের সংবাদে যেমন অকারণে উত্তেজিত ব্রাহ্মণগণ মালিনীর নির্বাসন দাবি করিল, বিদ্রোহের মুখে মালিনীর অতর্কিত দুঃসাহসিক আবির্ভাবে তেমনি অকারণে তাহারা মাথা নত করিয়া পড়িল। তাহারা সগৌরবে রাজকন্যাকে রাজগৃহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া ভক্তের দলে ভিড়িল। যে ধাতুতে বিদ্রোহীর সৃষ্টি হয়, সে ধাতুতে তাহারা গঠিত নয়, ধর্মমতের জন্য ত্যাগ ও দুঃখস্বীকার করিতে তাহারা একেবারেই প্রস্তুত নয়।

কিন্তু তাহাদের দলের সকলেই এমন মাটির মানুষ নয়। ক্ষেমঙ্কর জন্মবিদ্রোহীর রক্তমাংসে গঠিত। ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহার যেটুকু মিল তাহা ধর্মমতের মিল, আর সব দিক দিয়াই তাহারা ভিন্ন। সেইজন্যই স্বমতের প্রতিষ্ঠার জন্য সে দুঃখ, নির্বাসন, অপমান ও বন্ধু-বিরহ সহ্য করিতে প্রস্তুত। নিষ্ঠাপিনদ্ধ দৃঢ় চারিত্র্যের উন্নত ভিত্তির উপরে সে স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সবচেয়ে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মতের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতাকে তার ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় না; সমতল হইতে তাহা এত উর্ধ্বে উত্থিত যে, তাহাকে পার্থিব মনে না হইয়া চিরন্তন জ্যোতিষ্কলোকের সগোত্র বলিয়া মনে হয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ক্ষেমঙ্করের বৈশিষ্ট্য নয়; স্ফটিককঠিন চারিত্র্য-ই তাহার প্রধান সহায়। এই স্বচ্ছ স্ফটিকে নানা ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কিন্তু স্ফটিকের পরিবর্তন হয় নাই; প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহা সমান অনমনীয়, সমান দৃঢ়পিনদ্ধ।

ক্ষেমঙ্কর কর্তব্যনিষ্ঠ, কিন্তু হৃদয়হীন বা ভাবাবেগহীন নয়। শেষ মুহূর্তে সুপ্রিয়ের নবধর্ম-ব্যাখ্যা শুনিয়া সে বলিতেছে—

আমি কি দেখিনি ওরে? [মালিনীকে]
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধ'রে
কঠিন পুরুষ মন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপানে? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে

জন্মে নি কি স্বপ্নাবেশ ? অপূর্ব সঙ্গীতে
বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মতো,—সর্ব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মুঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমেষের মাঝে। তবু কি সবলে
ছিঁড়িয়া মায়ার বন্ধ, যাইনি কি চলে ;
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের মতো।

ক্ষেমঙ্করের চোখেও ঘোর লাগিয়াছিল, চিত্তে সৌন্দর্যাবেশ জন্মিয়াছিল, কিন্তু চারিত্র্যবেগ তাহাকে কর্তব্যের মুখে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার চরিত্র আলোচনার সময়ে তাহার হৃদয়ের এই ভাবাবেগ অনুভূতির ক্ষমতা মনে রাখিলে তাহার ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারের গভীরতাকে কতক বুঝিতে পারা যাইবে।

গোড়াতে সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করের ধর্মমতে কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু তাহারা এক উপাদানে গঠিত নয়। বন্ধুপ্রণয় সুপ্রিয়ের হৃদয়ে অগাধ বলিয়াই বোধ করি বন্ধুত্বের খাতিরে সে ক্ষেমঙ্করের মতকে নিজের বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। অন্তত এ পর্যন্ত কোন কঠিন পরীক্ষা আসে নাই বলিয়া উভয়ের প্রভেদ বুঝিবার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু অভাবিতভাবে যখন পরীক্ষা আসিল, বিশেষ চারিত্র্যসম্পদে সমৃদ্ধতর ক্ষেমঙ্কর যখন দূরে চলিয়া গেল—তখনই অত্যন্ত দ্রুত তাহার স্বকীয় ধর্মমতের বিবর্তন ঘটিল। শুধু তাই নয়—তাহার ধর্মমতে ও হৃদয়াবেগে এমন সূক্ষ্ম গ্রন্থি পাকাইয়া গেল যে, সে জটিল জাল ছেদন করিবার শক্তি আর তাহার রহিল না।

সুপ্রিয় শাস্ত্রগত ধর্ম সম্বন্ধে স্বভাবত সন্দিগ্ধ, তাহার হৃদয় কবিসুলভ-অনুভূতি-প্রবণ ; প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রভাবের সে অধীন ; ইতিপূর্বেই সে ক্ষেমাঙ্করের প্রেমে ধরা দিয়াছে ; তাহার বন্ধুত্বের

জন্যই যেন সে তাহার ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছে; বন্ধুত্ব পরিত্যাগের চেয়ে সুপ্রিয়ের কাছে ধর্মমত পরিত্যাগ অনেক সহজ।

মালিনীকে প্রত্যক্ষ করিবামাত্র সুপ্রিয়ের চিত্তে সুপ্ত সৌন্দর্যানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে। সে ক্ষেমঙ্করকে বলিতেছে—

মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমঙ্কর—ভ্রমিলাম
বৃথা এ-সংসারে এতকাল। পাই নাই
কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজি আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর হৃদয়ের বড় কাছাকাছি।
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা,
আমার অন্তরমাঝে কই কহে কথা,
কি প্রশ্নের দেয় সে উত্তর—কি ব্যথার
দেয় সে সান্ত্বনা! আজি তুমি কে আমার
জীবনতরণী 'পরে রাখিলে চরণ,
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
এ কী গতি দিলে তারে। এতদিন পরে
এ মর্ত্যধরণীমাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর।

সুপ্রিয় স্বভাবত হৃদয়াবেগপ্রবণ, কাজেই ধর্মকে সে হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে চায়; শাস্ত্র তাহার হৃদয়কে নাড়া দেয় না; হৃদয়কে নাড়া দিল কিনা ইহাই সুপ্রিয়ের কাছে ধর্মের সত্যকার পরীক্ষা।

ইহাতে আপত্তিকর কিছু নাই। কিন্তু মালিনীর সঙ্গে পরিচিত হইবামাত্র—অত্যন্ত প্রত্যাশিত পথে তাহার ধর্মমতের বিষম বিবর্তন ঘটিয়াছে। মালিনীর 'ধর্মমত' ও 'ব্যক্তি মালিনীর মধ্যে সুপ্রিয়ের হৃদয়ে ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে'। মালিনীর ধর্মমতকে ভালোবাসিতে

গিয়া, সে মালিনীকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতেও আপত্তির কারণ নাই—কারণ ইহা অধর্ম নহে। কিন্তু সত্যকার অধর্ম এই যে, সে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে—ক্ষেমঙ্করের বিদ্রোহের রহস্য রাজার কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বন্ধুর পরিণামের জন্য সে শঙ্কিত—কিন্তু এই ষড়্‌যন্ত্রভেদকে সে অধর্ম বলিয়া মনে করে নাই। ক্ষেমঙ্কর বন্ধুর দুর্বলতা জানিত—সে এইরূপ আশঙ্কা লইয়াই বিদেশ-যাত্রা করিয়াছিল।

তার পরে সুপ্রিয়ের ধর্মমতের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত।

ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী—তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হ'তে

আবার—

প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষুদ্র জীবন। আমার সকল চিত্ত
সরল নির্মল করি, বুদ্ধি করি শান্ত
সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত
তব কাজে।

আবার—

একাকিনী
দাঁড়াইয়া পূর্ণ মহিমায়, কি রাগিণী
বাজাইলে! বংশীরবে যেন মন্ত্রাহত
বিদ্রোহ করিল আসি ফণা অবনত
তব পদতলে।
... ...
লভিলাম যেন আমি নব জন্মভূমি
যেদিন এ শুষ্ক চিত্তে বরষিলে তুমি
সুধাবৃষ্টি।

সুপ্রিয় নিতান্ত আবেগবিমূঢ় না হইলে বুঝিতে পারিত—ইহা ধর্মাগ্রহ নহে, ইহা প্রেম, মালিনীর প্রতি নিতান্ত অন্ধ ব্যক্তিগত প্রেম মাত্র।

মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়াইয়া সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের কাছে স্বীকার করিয়াছে যে,

মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি।

শৃঙ্খলাহত হইয়া পড়িবার সময়েও শেষবাক্য সে বলিয়াছে—"দেবী, তব জয়।"

শাস্ত্রগত ধর্মে সংশয়, হৃদয়গত ধর্মে আগ্রহ, মত ও মানুষে অভেদ, মতের চেয়ে মানুষের প্রতি অধিকতর আগ্রহ—অবশেষে ব্যক্তিগত প্রেমে জীবনের চরিতার্থতা লাভ, ইহাই সংক্ষেপে সুপ্রিয়ের ধর্মমতের বিবর্তন।

মালিনীর ধর্মমত আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে নবধর্ম তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে। আবির্ভাব সংজ্ঞাটির উপরে বিশেষ জোর দিতে হইবে। এই আবির্ভাব তাহার কাছেও অত্যন্ত বিস্ময়ের ; ইহার মূলে দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মজীবনের সাধনা তাহাকে করিতে হয় নাই। সেইজন্য যতদিন আবির্ভাবের দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল ততদিন মালিনী যেন পথ দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু সাধনাহীন আবির্ভাব মিলাইতেই তাহার চোখে সব অন্ধকার হইয়া গেল, মালিনী সাধারণ রাজকন্যায় পর্যবসিত হইল আর ঘটনাপ্রবাহ অনিবার্য বেগে সর্বনাশের মুখে ছুটিয়া চলিল।

নবধর্মের আবির্ভাব মালিনীর কাছে এমনই অপ্রত্যাশিত যে, ইহাকে স্পষ্টভাষায় বুঝাইবার ক্ষমতা তাহার নাই ; আভাসে ইঙ্গিতে, চিত্রে ইহাকে সে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে মাত্র।

মহাক্ষণ আসিয়াছে! অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল

পদ্মদলে। নেত্র মুদি শুনিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল ; কাহারা কে জানে
কি করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্য মূরতি। কভু বিদ্যুতের মতো
চমকিছে আলো, বায়ুর তরঙ্গ যত
শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথাসম
কি যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা যেন ডাকিছে আমারে।

আবার আছে—

আমি স্বপ্ন দেখি জেগে,
শুনি নিদ্রাঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে,
নদীতে উঠিছে ঢেউ, রাত্রি অন্ধকার,
নৌকাখানি তীরে বাঁধা—কে করিবে পার
কর্ণধার নাই—গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস—মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি—আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান—মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ—যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে ; কোথা হ'তে বিশ্বাস আমার
এলো মনে ? রাজকন্যা আমি, দেখি নাই
বাহির সংসার—বসে আছি একঠাঁই
জন্মাবধি, চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,

নহি রাজসুতা, যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।

জনতাকে সে বলিতেছে—

আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়,—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে। দেখ দেখ নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।
কি বৃহৎ লোকালয় কি শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির,
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি, দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা, আশ্চর্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে,
কোথা হ'তে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।

মালিনীর এই তিনটি বক্তৃতা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, ইহা শাস্ত্রের ধর্ম নয়—আবিভূর্ত ধর্ম। ইহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশের ভাষা নাই, কারণ এরূপ অভিজ্ঞতা কদাচিৎ হয়; ইহাকে চিরকাল ধারণের শক্তি তাহার নাই—কারণ সাধনালব্ধ ধর্মজীবনসম্পদে সে গরীয়সী নহে।

এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতাকে কেহ বোঝে, কেহ বোঝে না। কিন্তু এই আবির্ভাবের ফলে মালিনী এমন একটা শক্তি কিছুকালের জন্য লাভ করিয়াছিল যাহাতে জনতাকে সে বিচলিত করিতে, মুগ্ধ

করিতে পারিয়াছে। জোয়ান অব্ আর্ক-এর চরিত্র ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মালিনীর অভিজ্ঞতার যেন একটা ঐক্য আছে। জোয়ানকেও দৈব আবির্ভাব শেষজীবনে পরিত্যাগ করিয়াছিল। যে সব দৈববাণীর সে উল্লেখ করিত তাহার সঙ্গে নাটকের পূর্বোদ্ধৃত অংশ তিনটির মিল আছে। জনসঙ্ঘ সঞ্চালনেও জোয়ানের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মালিনী-চরিত্র অঙ্কনের সময়ে কবির মনে যে জোয়ানের স্মৃতি আভাসে ছিল না—এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

চতুর্থ দৃশ্যে মালিনী আর দৈবী নারী নয়—সে সাধারণ রাজকন্যা। তখনো সে নবধর্মের কথা মুখে বলিতেছে বটে, কিন্তু সুপ্রিয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। মহৎ কথার অন্তরালে বিশ্বপ্রেম কখনো ব্যক্তিগত প্রেমে, মানবপ্রেম কখনো নরনারীর সম্পর্কে, নবধর্ম কখনো অতি পুরাতন প্রেমধর্মে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সাধনালব্ধ ধর্মজীবনের ভিত্তি না থাকিলে অকস্মাৎ আবির্ভূত ধর্ম দাঁড়াইবে কোথায়? এমন না হইলেই বিস্ময়ের ব্যাপার হইত বটে।

মালিনীর গুরু কাশ্যপ স্বীয় ধর্মমত প্রকাশ করিয়াছে। ইহাকে ধর্মমত না বলিয়া ধর্মের অনুশাসন বলা উচিত। কিন্তু তাহার উক্তি হইতে ধর্ম সম্বন্ধে তাহার ধারণা বোঝা একেবারে অসম্ভব নহে।

ত্যাগ কর, বৎসে, ত্যাগ কর সুখ-আশা,
দুঃখ-ভয়; দূর কর বিষয়পিপাসা;
ছিন্ন কর সংসারবন্ধন; পরিহর
প্রমোদপ্রলাপ চঞ্চলতা; চিত্তে ধর
ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রজ্ঞার আলোক
রাত্রিদিন; মোহশোক পরাভূত হোক্।

পুনরায়—

জ্ঞানসূর্য-উদয়-উৎসবে
জাগ্রত এ জগতের জয়জয়রবে

শুভলগ্নে সুপ্রভাতে হবে উদ্ঘাটন
পুষ্পকারাগার তব।

ইহাকেও শাস্ত্র বলা যাইতে পারে—কিন্তু এই শাস্ত্রবচনের সঙ্গে এখনো মানব-অভিজ্ঞতার ছেদ ঘটে নাই। ইহাতেও জ্ঞানমার্গের কথা আছে বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের আলোতে ধর্মের সরল রাজপথটাই দেখিতে সাহায্য করে। পৌরব্রাহ্মণগণের শাস্ত্র হইতে ইহা কত ভিন্ন! আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, কাশ্যপের ধর্মমতের পশ্চাতে তাহার ধর্মজীবন আছে, মালিনীতে যাহার একান্ত অভাব। কাশ্যপ তীর্থভ্রমণে না গেলে মালিনীকে হয়তো সে এমন দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হইতে দিত না। শিষ্যাকে ধর্মসাধনার নিমিত্ত গুরু রাখিয়া গেল—আর শিষ্যা সাধনা শেষ হইবার পূর্বেই ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হইয়া পড়িল।

প্রধান প্রধান চরিত্রের বিচিত্র ধর্মমতের আলোচনা করা গেল। এখন এই সব বিচিত্র ধর্মমতের সংঘর্ষেই মালিনী নাটকের ঘটনাস্রোত পরিণামের মুখে বিতাড়িত; আর দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সাধনাহীন ব্যক্তির অপরিণত ধর্মানুসরণের ফলেই মালিনী নাটকের ট্র্যাজেডি সংঘটিত হইয়াছে

ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের মতো বিরুদ্ধপ্রকৃতি, বিপরীতমত, একজন চারিত্র্য-প্রবল, আর একজন তীব্র অনুভূতিপ্রবণ যুগল চরিত্রসৃষ্টি রবীন্দ্রসাহিত্যে অবিরল। গোরা ও বিনয় ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারা বিরুদ্ধ স্বভাব বলিয়াই পরস্পরকে বন্ধুত্ববন্ধনে আকর্ষণ করে; সমস্বভাব লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হয় না। গোরা দুর্বলতর প্রকৃতির, অথচ তীব্রতর অনুভূতিপ্রবণ এবং বুদ্ধিমত্তর বিনয়কে লইয়া স্বীয় চিহ্নিত পথে চলিতেছিল; বিনয় গোরার বন্ধুত্বের খাতিরেই তাহার সঙ্গী হইয়াছিল—নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা সেদিকে তেমন ছিল না। গোরা যখন জেলে গেল—সেই অবকাশে সে সম্পূর্ণরূপে ললিতার কাছে ধরা দিল। ক্ষেমঙ্করের বিদেশে

প্রস্থানে সুপ্রিয় যেমন ট্র্যাজেডির অবতারণ করিয়া বসিয়াছিল বিনয়ও তেমনি গোরার অনুপস্থিতিতে গোরার অপ্রিয় কাজ করিয়া বসিল,—যদিচ সুপ্রিয়ের কাজের গুরুত্বের সঙ্গে বিনয়ের কাজের তুলনা করা সঙ্গত হইবে না।

ক্ষেমঙ্কর বন্ধুর স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তাই সে বিদেশে যাইবার আগে বারংবার তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছিল। যখন বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ মালিনীর অনুবর্তী হইয়া পড়িল তখন ক্ষেমঙ্কর বলিতেছে—

হে সুপ্রিয়, তুলে চাও আঁখি।
কথা কও। বল তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্যোগে, প্রলয়ের রাতে ?

সুপ্রিয়

কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।

ক্ষেমঙ্কর বলিতেছে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে, সুপ্রিয়ের প্রতি তাহার প্রেম অটল থাকিবে।

শুধু মনে ভয় হয়
আজি বিপ্লবের দিন বড় দুঃসময়,
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ধ্রুববন্ধুচয়,
ভ্রাতারে আঘাত করে ভ্রাতা, বন্ধু হয়
বন্ধুর বিরোধী! বাহিরিনু অন্ধকারে,
অন্ধকারে ফিরিয়া আসিব গৃহদ্বারে ;
দেখিব কি দীপ জ্বালি বসি আছ ঘরে
বন্ধু মোর! সেই আশা রহিল অন্তরে।

ক্ষেমঙ্করের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের

মৃত্যুজাল পাতিবার কারণ হইল। কিন্তু মতের ও পথের ভেদ সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল।

সুপ্রিয় মালিনীর প্রতি প্রণয়ের মোহের বশবর্তী হইয়া ষড়্‌যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু মনে তার শান্তি নাই।

রাজারে দেখানু পত্র! মৃগয়ার ছলে
গোপনে গেছেন রাজা সৈন্যদলবলে
আক্রমিতে তারে। আমি হেথা লুটাতেছি
পৃথ্বীতলে—আপনার মর্মে ফুটাতেছি
দন্ত আপনার।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যখন উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনো দু'জনের জীবনদৃষ্টির প্রভেদ চমৎকার ফুটিয়াছে।

সুপ্রিয়

ওগো বন্ধু, এ ভুবন
নহে কি বৃহৎ? নাহি কি অসংখ্য জন,
বিচিত্রস্বভাব? কাহার কি প্রয়োজন
তুমি কি তা জানো? গগনে অগণ্য তারা
নিশি নিশি বিবাদ কি করিছে তাহারা
ক্ষেমঙ্কর? তেমনি জ্বালায়ে নিজ জ্যোতি
কত ধর্ম জাগিতেছে, তাহে কোন্ ক্ষতি?

সুপ্রিয়ের যুক্তি হয়তো সত্য, কিন্তু এই যুক্তির বলে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা সমর্থন করা যায় না। ক্ষেমঙ্কর বলিতেছে—

মিছে আর কেন বন্ধু! ফুরালো সময়,
বাক্য লয়ে মিথ্যা খেলা, তর্ক আর নয়।
সত্য মিথ্যা পাশাপাশি নির্বিরোধে রবে
এত স্থান নাহি নাহি অনন্ত এ ভবে।...
হে সুপ্রিয়, প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়।
ছিল চিরদিবসের বিশ্রব্ধ প্রণয়,

আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষোমাঝে তার
বন্ধু মোর, উদারতা এত কি উদার!
কেহ বা ধর্মের লাগি সহি নির্যাতন
অকালে অস্থানে মরে চোরের মতন,
কেহ বা ধর্মের ব্রত করিয়া নিষ্ফল
বাঁচিবে সম্মানে সুখে, এ ধরণীতল
হেন বিপরীত ধর্ম এক বক্ষে বহে—
এত বড় এত দৃঢ় নহে কভু নহে।

সুপ্রিয়

ক্ষেমঙ্কর, তুমি দিবে প্রাণ।
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস! তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার!

ক্ষেমঙ্কর স্বহস্তে বন্ধুকে যে মৃত্যু-আঘাত হানিল তার মূলে আছে তার প্রণয়, বন্ধুকে ভালোবাসে বলিয়াই বন্ধুর প্রায়শ্চিত্তে ক্ষেমঙ্করের সাহায্য করিবার ইচ্ছা। সে বলিতেছে, বাল্যকালে তাহারা যেমন সারারাত্রি তর্ক করিয়া প্রভাতে গুরুর কাছে সত্যনির্ণয় করিবার আশায় যাইত—আজও তেমনি দুইজনে জীবনতর্কের মীমাংসার জন্য ধর্মরাজ মৃত্যুর কাছে যাইবে। কারণ

সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল উন্নত ;
মুহূর্তে পর্বতপ্রায় বিচারবিরোধ
বাষ্পসম কোথা যাবে! দুইটি অবোধ
আনন্দে হাসিবে চাহি দোঁহে দোঁহাকারে।

সুপ্রিয়ের কাছে ধর্ম ও জীবনে বিরোধ ছিল—তাহাদের অভিন্ন করিয়া সে দেখিতে পারে নাই। চারিত্র্যপ্রবল ক্ষেমঙ্করের কাছে জীবন ও ধর্ম অভিন্ন। বন্ধুর প্রণয় ও নিজের ধর্মমত তাহার কাছে

তুল্যমূল্য। ক্ষেমঙ্করের ধর্মমত হয়তো সঙ্কীর্ণ, দুর্বল লোকের হাতে এই ধর্মমত শুষ্ক আচার মাত্র হইয়া ওঠে, কিন্তু ক্ষেমঙ্করের চরিত্র-মাহাত্ম্য তাহাকে ক্ষুদ্রতা হইতে সবলে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছে। এ যেমন একদিকে, আবার তেমনি সুপ্রিয়ের ধর্মমত ক্ষেমঙ্করের চেয়ে উদারতর হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল চরিত্রের জীর্ণ মঞ্চ ভাঙিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

ক্ষেমঙ্কর ও রঘুপতির চরিত্র নানা কারণে তুলনীয়। দু'জনেই চারিত্র্য-প্রধান; দু'জনেরই ধর্মমত সঙ্কীর্ণ; দু'জনেই ধর্মের জন্য রাজদ্রোহী; নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য দু'জনেই বিদেশে সৈন্য-সংগ্রহে গিয়াছে [রাজর্ষির রঘুপতি, বিসর্জনের নহে] এবং তাহাদের চারিত্র্যবেগের স্রোতে বিতাড়িত হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বলপ্রকৃতি, বিশ্বাসপ্রবণ সুপ্রিয় ও জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। রঘুপতির চরিত্রের ক্ষেত্র প্রশস্ততর, ক্ষেমঙ্করের সঙ্কীর্ণ; কিন্তু সঙ্কীর্ণতার চাপেই সংহত হইয়া, ঘনীভূত হইয়া, স্ফটিকের দীপ্তি ও সংহতি লাভ করিয়া ক্ষেমঙ্কর-চরিত্র রঘুপতি-চরিত্রের চেয়ে অধিকতর সজীব ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মালিনী-চরিত্র আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার ধর্মের প্রেরণা সাধনাজাত নহে, তাহা আবির্ভাবজাত, তাহা মূল্যহীন অর্থে অমূলক। যতক্ষণ তাহার চিত্তে এই আবির্ভাবের দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল ততক্ষণ সে অসাধারণ, আবির্ভাবের দীপ্তি ম্লান হইতেই সে সাধারণ রাজকন্যা মাত্র। প্রথম তিন দৃশ্যে সে অসাধারণ; চতুর্থ বা শেষ দৃশ্যে সে আর পূর্বের ধর্মরাগোজ্জ্বল দেবী নয়, পূর্ব-রাগোজ্জ্বল প্রণয়িনী মাত্র। কেন এমন হয় পূর্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি; অপ্রত্যাশিত দৈব আবির্ভাবের তলাতে সাধনা না থাকিলে সে দীপ্তি দীর্ঘকাল থাকে না। যদি এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবকে সে সাধনায় নিয়োগ করিয়া ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে এমন ঘটিত না, কিন্তু সদ্যোজাত আবির্ভাবের

অভিজ্ঞতাকে সে জীবনে লালন করিয়া না তুলিয়াই সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, অভ্যাসের মধ্যে তাহার শিকড় গজাইবার অবসর দেয় নাই ; সেই জন্য ব্যক্তিগত প্রেমের প্রবল অভিজ্ঞতা যখন কুমারীচিত্তকে স্পর্শ করিল তখন তাহা দিব্যপ্রেরণার চেয়ে প্রবলতর হইয়া দেখা দিল ; হঠাৎ দেবীর চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া প্রণয়াতুর সুপ্ত মানবকন্যা বাহির হইয়া আসিল। নাটকের ট্র্যাজেডির ইহাই প্রকৃত স্বরূপ।

ইতিপূর্বে প্রথম তিন দৃশ্যের দেবী মালিনীর চরিত্রালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে শেষ দৃশ্যের মানবী মালিনীর চরিত্রালোচনা করা যাইতে পারে।

রাজ-উপবনে মালিনী ও সুপ্রিয় কথাবার্তা বলিতেছে। প্রথমেই লক্ষণীয় যে, ইতিপূর্বে নবধর্ম সম্বন্ধে, লোকচালনা সম্বন্ধে মালিনীর মনে যে অসংশয় ভাব ছিল এখানে তাহা চলিয়া গিয়াছে।

যে-মালিনী এক সময়ে বলিয়াছিল—

নৌকাখানি তীরে বাঁধা, কে করিবে পার,
কর্ণধার নাই ; গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস, মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান, মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে ; কোথা হ'তে বিশ্বাস আমার
এলো মনে ?

সে এখন সুপ্রিয়কে বলিতেছে—

মহাধর্ম-তরণীর বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়
বড় একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,

নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে।

মালিনী ঠিকই বুঝিয়াছে 'দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিকের তরে আসে।' দিব্যজ্ঞানের অভাবে নিজের উপর হইতে তাহার বিশ্বাস যে পরিমাণে চলিয়া গিয়াছে সেই পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে সুপ্রিয়ের প্রতি।

তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর ?...
অকস্মাৎ
আপনার 'পরে যেন দৃষ্টিপাত
সহস্র লোকের মাঝে, সেই দুঃসময়ে
তুমি মোর বন্ধু হবে ? মন্ত্রগুরু হয়ে
দিবে নবপ্রাণ ?

মালিনীর মনে আত্মবিশ্বাস এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে, নিজ ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে উদ্যত।

অনেক সময়েই প্রশংসা প্রেমের অগ্রদূত। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। মালিনী নিজের অগোচরে সুপ্রিয়কে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—তবু এখনো এই 'নূতনধর্ম' তাহার নিজের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই,—কিন্তু অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতেও হইল না। এই দৃশ্যের শেষের দিকেই মালিনী মনের পরিবর্তন বুঝিতে পারিয়াছে।

প্রতিহারী যখন আসিয়া বলিল—'প্রজাগণ দরশন যাচে' তখন মালিনী যে লোকমাতা বলিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে বলিয়া পাঠাইল—আজ নয়, আজ সে একাকী বিশ্রাম করিতে চায়। লোকমাতা এক্ষণে ব্যক্তিগত প্রণয়িনী হইবার মুখে।

তারপরে মালিনীর প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রিয় তাহাদের বন্ধুত্বের কাহিনী, ষড়্যন্ত্রের সংবাদ, ষড়্যন্ত্রভেদের তথ্য প্রকাশ করিয়াছে।

মালিনী ক্ষেমঙ্করের প্রতি বিরূপ না হইয়া কৃপাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত ইহা ক্ষেমঙ্করকে কৃপা নয় প্রণয়ীর বন্ধু বলিয়াই তাহার প্রতি একরূপ পরোক্ষ প্রীতি অনুভব।

এমন সময়ে রাজা প্রবেশ করিলেন, তিনি সুপ্রিয়ের সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া মৃগয়াচ্ছলে গিয়া সসৈন্যে আগতপ্রায় ক্ষেমঙ্করকে পরাজিত করিয়া আসিয়াছেন। রাজা সুপ্রিয়কে পুরস্কৃত করিতে চান। সুপ্রিয় কী পুরস্কার কামনা করে? রাজ্যখণ্ড? না। তবে কি সে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী?

বেশিদিন নহে, বিপ্র, সে কি মনে পড়ে
এই কন্যা মালিনীর নির্বাসন তরে
অগ্রবর্তী ছিলে তুমি। আজি আরবার
করিবে কি সে প্রার্থনা? রাজদুহিতার
নির্বাসন পিতৃগৃহ হ'তে? সাধনার
অসাধ্য কিছুই নাই—বাঞ্ছা সিদ্ধ হবে,
ভরসা বাঁধহ বক্ষোমাঝে। শুন তবে
জীবনপ্রতিমে বৎসে, যে তোমার প্রাণ
রক্ষা করিয়াছে, সেই বিপ্র গুণবান্
সুপ্রিয় সবার প্রিয়। প্রিয়দরশন,
তারে—

এই স্পষ্টভাষণে সুপ্রিয় আপত্তি করিয়াছে, বন্ধুর সর্বনাশ করিয়া সে নিজে সার্থকতা লাভ করিতে চায় না। কিন্তু মালিনী আভাস-মাত্রেও আপত্তি করে নাই। এ কোন্ মালিনী? কোন সাধারণ মানবকন্যা হইলেও সে বোধ করি এমন বিবাহে অন্তত একবারের জন্যও মৌখিক আপত্তি প্রকাশ করিত। আর বন্ধুঘাতী, বিশ্বাসঘাতী, তাহার নবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী এই লোকটাকে বিবাহ করিতে মালিনী একবারও দ্বিধা করিল না! আশ্চর্য! ক্ষেমঙ্করের প্রাণদণ্ড হইবে জানিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্য সে রাজাকে অনুরোধ করিয়াছে

বটে। কিন্তু তাহা নবধর্মের অহিংসার আদর্শের অনুরোধে, না ক্ষেমঙ্করের প্রাণদানে আশা করিয়া নিজের প্রণয়ী সুপ্রিয়কে দুঃখ ও চরম আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই, কে বলিবে? ইহাকে নিষ্কাম বলিতে পারি না।

মালিনীর ব্যবহারে রাজা পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যা আর দেবী নহে, নিতান্তই মানবী।

কন্যা, কোথা ছিল এ সরম
এতদিন। বালিকার লজ্জা ভয় শোক
দূর করি দীপ্তি পেতো অম্লান আলোক
দুঃসহ উজ্জ্বল। কোথা হ'তে এলো আজ
অশ্রুবাষ্পে ছলছল কম্পমান লাজ—
... ...
বহু দিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার
যখন রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হ'তে দেরী নাই আর।
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি—বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল; দেবী না দয়া
ঘরের সে মেয়ে।

ঘরের মেয়ের মধ্যে দেবী মালিনীর এইখানে বিসর্জন। যাঁহারা গৃহিণীপনার মধ্যে দেবী চৌধুরাণীর আত্মবিলোপকে অসম্ভব মনে করেন—তাঁহারা এসম্বন্ধে কি বলিবেন?

সুপ্রিয়ের মৃত্যুর পরে মালিনী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিতে কেন অনুরোধ করিল?

ইহা কি ক্ষেমঙ্করের প্রতি দূরবর্তী প্রেমের প্রথম ইঙ্গিত? ক্ষেমঙ্করের আদর্শনিষ্ঠার কথা সে শুনিয়াছিল; শৃঙ্খলিত ক্ষেমঙ্করকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিয়াছিল—

লোহার শৃঙ্খল
ধিক্কার মানিছে যেন লজ্জায় বিকল
ওই অঙ্গ 'পরে। মহত্ত্বের অপমান
মরে অপমানে। ধন্যি মানি এ পরান
ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্তি হেরি।

ইহা প্রেম নয়, প্রশংসা। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে প্রশংসা প্রেমে পরিণত হইতে কতক্ষণ? সুপ্রিয়ের বেলাতেও ইহা দেখা গিয়াছে। তবে তর্ক উঠিতে পারে সুপ্রিয়ের হত্যাকারীকে সে কি ভালবাসিতে পারে? যে নিজের সাধের নবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভালবাসিতে পারে, বন্ধুঘাতী, বিশ্বাসঘাতীকে ভালোবাসিতে পারে, কালক্রমে সে যে প্রণয়ী-ঘাতীকে ভালোবাসিতে না পারিবে তাহা কে বলিল? দুর্বল প্রকৃতি অনেক সময়েই প্রবলকে, নিষ্ঠুরকে, নরঘাতী অপরাধীকে ভালোবাসিতে উদ্গ্রীব। আর মালিনী কত যে দুর্বল তাহা তো দেখা গেল!

কিংবা এমনও হইতে পারে যে, ক্ষেমঙ্করকে দণ্ডদানের আশাতেই মালিনী তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছে। ষড়্যন্ত্রভেদের ফলে ক্ষেমঙ্করের জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন তাহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল মৃত্যু। কিন্তু বন্ধুকে ছাড়িয়া মরিয়াও সান্ত্বনা নাই। তাই সে বন্ধুকে নিহত করিল। এখন ক্ষেমঙ্করের একমাত্র কাম্য, একমাত্র সার্থকতা, একমাত্র সান্ত্বনা মৃত্যু। মালিনী খুব সম্ভবত তাহাকে সেই শেষসান্ত্বনা হইতেও বঞ্চিত করিবার জন্যই জীবনদান করিতে রাজাকে অনুরোধ করিয়াছে। তাহার প্রণয়ীর মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ এই লোকটিকে দণ্ডিত করিবার এই একটিই শেষ উপায় তাহার হাতে মাত্র ছিল।

কোন্ মতটি সত্য নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না—পাঠক নিজের অভিরুচির অনুসারে যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন।

পরবর্তী কালে মালিনীর ভূমিকা লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এই ভাবের উপর মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা-আপনি দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির প্রতিশোধে সেকথা ভেবে দেখবার যোগ্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।"[১]

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ইহাকে প্রকৃতির প্রতিশোধের অঙ্গীভূত দেখিয়াছেন তাহা সত্য কি না বলিতে পারি না—তবে অন্য একভাবে মালিনীর ট্র্যাজেডি, যে প্রকৃতির প্রতিশোধ তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানবপ্রকৃতিকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে ক্ষুধিত রাখিয়া, সেই শূন্যতার উপরে মহত্তর জীবনের বেদী-রচনা করিতে গেলে অকস্মাৎ তাহা ধ্বসিয়া পড়ে, মালিনী নাটক হইতে এই ইঙ্গিতটা পাওয়া যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর চিত্ত ক্ষুধিত ছিল বলিয়াই সে তপস্যায় শান্তি পায় নাই—তাহাকে রঘুর কন্যার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ফিরিতে হইয়াছিল।

মালিনীরও কি সেই একই ট্র্যাজেডি নয়? প্রথম অংশের মালিনী মানব-প্রকৃতির দাবী এড়াইয়া নবধর্মের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল, নাটকের শেষ অংশে প্রকৃতি তাহার বলি সংগ্রহ করিয়াছে। সেই অপরাধে দেবী মালিনী কলঙ্কের গ্লানি মাথায় তুলিয়া মানবত্বের মধ্যে, এবং তাহা আদৌ গৌরবময় মানবত্ব নহে, আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহাই মানবপ্রকৃতির প্রতিশোধ। ইহাই

১ মালিনীর ভূমিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড

স্বাভাবিক, ইহা না হইলেই মানবধর্ম ও কাব্যধর্ম দুই-ই ক্ষুণ্ণ হইত। কবি মালিনীর এই পরিবর্তনটি লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না, যদি না করিয়া থাকেন তবু বিস্ময়ের কিছু নাই—কবিপ্রকৃতি অগোচরে কবির কলমকে কবিধর্মের চিহ্নিতপথে চালনা করিয়া সার্থকতায় লইয়া গিয়াছে।

২

মালিনী চারিটি দৃশ্যে বিভক্ত একাঙ্ক নাটক। কিন্তু ইহাকে দুই অঙ্কে ভাগ করিলেই নাটকীয় টেকনিকের মর্যাদা রক্ষা করা হইত।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দৃশ্য—প্রথম অঙ্ক, এবং চতুর্থ দৃশ্যটিকে দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত করা উচিত ছিল।

তৃতীয় দৃশ্য ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান আছে; তাহা ছাড়া চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান দুইটি ব্যক্তির, মালিনীর ও সুপ্রিয়ের চরিত্রের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে; অন্তত ইহা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যও অঙ্কপাতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নাটকের এই জাতীয় আবশ্যিক অঙ্গবিন্যাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিরকালই মনোযোগের অভাব। ইহার দৃষ্টান্ত আরো মিলিবে। ইহাতে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, জটিল নাট্যশিল্প তাঁহার বাধা-অসহিষ্ণু লিরিকপ্রতিভার অনুকূল নহে।

সৌভাগ্যবশত মালিনীর টেকনিক সম্বন্ধে কবি স্বয়ং কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

"বোধ করি এই নাটিকায় আমার রচনার একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল, সেটা অনুভব করেছিলুম যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে বাসকালে এর ইংরেজি অনুবাদ কোনো ইংরেজ বন্ধুর চোখে পড়ল। প্রথম দেখা গেল এটা আর্টিস্ট রোটেস্টাইনের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কখনো কখনো এটাকে তাঁর ঘরে অভিনয় করবার ইচ্ছেও তাঁর হয়েছিল। আমার মনে হল এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি

তাঁর শিল্পীমনে মূর্তিরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারপরে একদিন ট্রেভিলিয়ানের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন—এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন। তার অর্থ কী আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি, কারণ যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি তবু গ্রীকনাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক বরাবর আমাদের কাছে নাটকের আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।”[১]

*　　　*　　　*　　　*

গ্রীক নাট্যশিল্প সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা বর্তমান লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যকলার সঙ্গে তাহার প্রভেদটা উগ্র। শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকে যে চঞ্চলতা লক্ষিত হয় গ্রীকনাট্যে তাহার একান্ত অভাব। গ্রীক নাটকের অভিনেতাদের সঙ্গে সজীব মানুষের চেয়ে ভাস্কর্যের যেন মিল অধিক। অভিনেতারা যেন খোদাই-করা বিরাট মূর্তি। এমনটি কেন হইল বলা সহজ নয়; গ্রীক ট্র্যাজেডি ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল, স্বভাবতই বাচালতা ও চঞ্চলতার স্থান তাহাতে সঙ্কীর্ণ। ট্র্যাজেডির হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি উগ্র ঘটনা নেপথ্যে ঘটিত, কাজেই রঙ্গমঞ্চে কায়িক ঔদ্ধত্যের অবসর ছিল না; বিশেষ, যে ভারী পাদুকা ও মুখোশ পরিয়া অভিনেতারা অবতীর্ণ হইত তাহা লইয়া শেক্‌স্‌পীয়রীয় অভিনেতার মতো ছুটাছুটি করিবার ক্ষমতাও হয়তো সব সময়ে থাকিত না। ফলত এই মূর্তিবৎ স্থাণুতা যদি গ্রীক নাট্যকলার একটি গুণ হয় তবে তাহা মালিনীতে আছে।

দ্বিতীয়ত, গ্রীক নাটকে অভিনয়ের চেয়ে আবৃত্তির ভাবটাই

১ মালিনী, সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড।

যেন কিছু অধিক। পাত্রপাত্রীর মধ্যে কথোপকথন গৌণ; কোরাসের ও পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ ভূমিকা নিছক আবৃত্তি। মালিনীর সুদীর্ঘ ভূমিকাগুলি এইরূপ আবৃত্তিরস-প্রধান।

তৃতীয়ত, স্থান, কাল, ঘটনার অদ্বিতীয়ত্ব গ্রীক নাটকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য না হইলেও একটি প্রধান লক্ষণ বটে। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন বা রাজা ও রাণীতে যেমন তিনি এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ মালিনীতে তেমন নহেন। তাঁহার ভাষায় "মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।"

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরি-উক্ত এই তিনটি গুণ কেবল মালিনীতে নয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলিতে, যেখানে নাট্যকারের চেয়ে কবির কলম প্রবলতর, সুপ্রচুর। "বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতে"র মধ্য দিয়া নাটককে নিশ্চিত পরিণামের দিকে লইয়া যাইতে ঠিক যে ক্ষমতার দরকার—তাঁহার প্রতিভায় তাহার যেন কিঞ্চিত অভাব আছে। বরঞ্চ সংযত, সংহত একটিমাত্র ঘটনাকে স্থাণুপ্রায় দু'চারটি চরিত্রের আবৃত্তির অনুরূপ কথোপকথনের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিতে যে, ক্ষমতার প্রয়োজন—তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষ অনুকূল।

এইরূপ দু'চারটি টেকনিক্যাল সাদৃশ্য ছাড়া গভীরতর কোনো সাদৃশ্য মালিনী ও গ্রীক নাট্যের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না।

নৃত্যনাট্য

যেসব নাটককে আমরা নৃত্যনাট্য বলিতেছি সেগুলি কবির শেষজীবনে লিখিত। আবার ঋতুনাট্যগুলিও শেষজীবনের রচনা। স্থূল বিচারে দুই শ্রেণীর নাটককে একজাতীয় মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ধরা পড়ে। এই দুই শ্রেণীর নাটকই সঙ্গীত ও নৃত্য-প্রধান হইলেও নৃত্যনাট্যে নৃত্যই ভাবের একমাত্র বাহন, অর্থাৎ যে কথাটি কবি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নৃত্যের সাহায্য ছাড়া তাহা কখনোই সেভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়ত, ঋতুনাট্যের নৃত্যকে সমূহলের আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই নৃত্য বহুলের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে। রাজপুরীতে উৎসব, সেই সাধারণ উৎসবের আনন্দকে পুরবাসীরা নাচের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে। রাজসভায় উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, সেই উৎসবের সমষ্টির উল্লাসকে নর্তকীর দল রূপ দিতেছে।

কিন্তু নৃত্যনাট্যগুলির নৃত্যের সঙ্গে বহুলের মনোভাবের কোনো যোগ নাই; তাহা এককের সুখ-দুঃখকে, এককের আশা-আনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে সঙ্গীত যেমন তাঁহার প্রতিভার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার নাট্যপ্রবাহের আলোচনা করিলেও তেমনি দেখা যাইবে যে, শেষজীবনের নাটকের মধ্যেও গানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য দ্বারা কবি তাঁহার নাট্যজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন—ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানের দ্বারাই সে জীবনের শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রথম গীতিনাট্যে ও শেষজীবনের এই শ্রেণীর নাটকে কত প্রভেদ!

ঋতুনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে চারিটি বস্তুর সম্মেলন ঘটিয়াছে—কাব্য,

সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্র। ইহাকে কবির নাটকীয় টেক্‌নিকের চতুরঙ্গ রীতি বলা যাইতে পারে। এই চারিটির মধ্যে কাব্যের স্বাদ যে-কোনো পাঠক গ্রন্থ পড়িলেই পাইতে পারেন। সুরের স্বাদ পাওয়াও দুরূহ নয়; স্বরলিপি আছে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন; কিন্তু অপর দুটির স্বাদ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যাঁহাদের এই সব অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সেই নৃত্যের ছন্দঃ-সৌন্দর্য জানেন; রঙ্গমঞ্চ-সজ্জায়, আলোক ও বেশভূষায়, অভিনেত্রীদের অঙ্গাভরণে যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিত তাহা দর্শকের স্মৃতিতে থাকিলেও লুপ্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছে। সে সব হয়তো আর পুনরুদ্ধার করা যাইবে না, কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই হয়তো তাহারা প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে তাঁহার শেষজীবনের এই শ্রেণীর নাটকের প্রকৃত মহিমা নির্ভর করিতেছে কাব্য, সুর, নৃত্য ও চিত্রের চতুরঙ্গ রীতির সম্মিলিত সমাবেশের উপরে। কেবল গ্রন্থের দ্বারা বিচার করিলে ইহার কাব্যাংশই প্রকট হইবে অথচ প্রচ্ছন্ন অন্য তিনটি অঙ্গ অন্তত কল্পনাতেও না দেখিতে পারিলে ইহাদের প্রতি অবিচার করিবার আশঙ্কাই সমধিক।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উত্তরোত্তর তাঁহার নাটকে গানের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিংবা একখানা নাটককে যখন পরবর্তী কালে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে গানের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সংস্করণভেদেও এই একই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটক নিরবচ্ছিন্ন গানের মালায় পরিণত হইয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে এক গানের সঙ্গে অন্য গানের জোড়া দিবার জায়গায় একটু করিয়া গদ্য বা পাত্রপাত্রীর উক্তি। গ্রীক নাটক মূলে যেমন গীতি-সর্বস্ব ছিল, কালক্রমে তাহাতে সঙ্গীতের প্রাধান্য কমিয়া নাটকীয় অংশ বাড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহার বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায়। গদ্য বা পদ্য নাটকীয় উক্তি ক্রমে সঙ্কীর্ণতর হইতে হইতে শেষবয়সে

একেবারে সঙ্গীতকে আসর ছাড়িয়া দিয়া নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছে।

এমন যে হইয়াছে তাহার অবশ্য কারণ আছে। জীবন-পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইতেছিল সঙ্গীত ছাড়া যাহা প্রকাশযোগ্য নয়। সেইজন্য শেষজীবনে সঙ্গীত তাঁহার ভাবের প্রধান বাহন। নাটকের মধ্য দিয়াও কবি ক্রমে কতকগুলি সূক্ষ্মশরীরী, ছায়ারূপী বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাব যতই সূক্ষ্ম হইতে লাগিল তাহার সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য ততই সুরের সারথ্য অধিকতর আবশ্যক হইতে লাগিল। ভাব সূক্ষ্মতর হইয়া পড়িল, সুরও যেন আর তাহাকে সম্যক্ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তখন সুরের সঙ্গে নৃত্যের যোগের প্রয়োজন হইল। যে-ভাবের সংজ্ঞা নাই, যে-আকুলতার ভাষা নাই, কিছু ছন্দ যাহার আভাস মাত্র দিতে পারে, সুর যাহার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু জানে না, শিক্ষিত অঙ্গের ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সেই অনঙ্গ আকৃতিকে আভাসিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করে—ইহাই নৃত্য। ভাবের পরিবর্তন ও পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নূতন নূতন বাহনের সন্ধান করিতে হইয়াছে। এইরূপ সন্ধানের ফলে তিনি ক্রমে কথা হইতে সুরে, সুর হইতে নৃত্যে, এবং শেষে নৃত্য হইতে চিত্রের চতুরঙ্গ রীতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে শাপমোচন, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা যথার্থ নৃত্যনাট্য। নটীর পূজা নৃত্যনাট্য পর্যায়ের নয় কিন্তু নটীর পূজাতেই যেন নৃত্যনাট্যের সূচনা। এই নাটকখানিতে নৃত্য যে কেবল প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নয়—নটীর চরম নৃত্যই ইহার প্রাণবস্তু। ওই নৃত্যটি ছাড়া নাটকের বক্তব্য কিছুতেই প্রকাশ করা যাইত না; নৃত্যটিকে বাদ দিলে নাটক অন্য রূপ ধারণ করিবে। নৃত্যই এই পর্যায়ের নাটকের বাহন আগে

বলিয়াছি—এবারে তাহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নাটকের সমস্ত গতি গোড়া হইতে এই চরম পরিণামের দিকে ধাবিত এবং শেষ মুহূর্তে কেবল শ্রীমতী নয় সমগ্র নাটকখানি আত্মোৎসর্গের নৃত্যের মধ্য দিয়া শান্তি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নাটক হিসাবে নটীর পূজার আলোচনার ক্ষেত্র ইহা না হইলেও এখানে এই তথ্যটি উল্লেখ করা আবশ্যক।

জীবনপরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্প গীত ও নৃত্যরসের দিকে অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে মোড় ঘুরিতেছিল একথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র এই ভিতরের তাগিদেই নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। ভিতরের তাগিদ যতই প্রবল হোক ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যনাট্যের কোনো সজীব আদর্শ নাই ; যে-নৃত্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের রুচিকর নয়, আর কতক তো তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু ইহা তো কেবল নৃত্য মাত্র নয়, ইহা নৃত্যনাট্য ; অর্থাৎ একটা জটিল কাহিনীর আদ্যন্ত দেহের ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ। চোখের সম্মুখে এই সজীব আদর্শের অভাবই তাঁহার প্রতিভাকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময়ে ১৯২৭-এ তিনি জাভা ও বালি দ্বীপ ভ্রমণে যান। সেখানে নৃত্যনাট্য এখনো সজীব। সেই সজীব আদর্শই তাঁহার প্রতিভার শেষ বাধাকে দূর করিয়া দিল। নৃত্যনাট্যের একটা আদর্শ লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করিলেন। এই পর্যায়ের চারিখানি নাটকই ১৯২৭-এর অনেক পরে লিখিত।

নটীর পূজা অবশ্য ১৯২৬-এ লিখিত, কিন্তু তাহাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় যে, নৃত্যনাট্য রচনার আকৃতি তাঁহার মনে কাজ করিতেছিল, কিন্তু আদর্শের অভাবেই আকৃতি রূপ লাভ করিতে পারিতেছিল না।

এখানে যে-সবপত্র উদ্ধৃত করিতেছি তাহার সমস্তই ‘জাভা-

যাত্রীর পত্র' হইত। এই গ্রন্থের অধিকাংশ পত্রেই ওদেশের নৃত্য-নাট্যের উল্লেখ আছে। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় জাভার এই প্রাণ-বস্তুটিই কবিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অগোচরে মনের মধ্যে যেন একটা সজীব নৃত্যনাট্যের আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছিল।

"এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে-পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে যে আপন আবেগ-সঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায়, তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায় ফেরায়, যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেল এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।"[১]

জাভার নৃত্যাভিনয় হইতে কবি যে তাঁহার নৃত্যনাট্যের আদর্শ পাইয়া থাকিবেন—ইহার পরে আর সন্দেহ করা উচিত নয়। কিন্তু জাভার নৃত্যনাট্যকে গ্রহণ করিবার সময়ে তিনি তাহাতে একটি বড় রকমের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। জাভার বাণীহীন নৃত্যের সঙ্গে তিনি বাণীর যোগ করিয়া দিয়াছেন; জাভায় যাহা ছিল

১ যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

কেবলমাত্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা সঙ্গীতসনাথ নৃত্য-নাটিকায় পরিণত হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন, "এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে।" জাভায় "নারকেল বন যেমন সমুদ্র হাওয়ায় দুলছে, তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।" আর "বাংলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।" জাভার নৃত্যাদর্শের সঙ্গে বাংলার আত্মপ্রকাশের পন্থা সঙ্গীতের যোগসাধনেই তাঁহার কৃতিত্ব—এবং সেই জন্যই হয়তো তাঁহার নৃত্যনাট্য জাভার নৃত্যাভিনয়ের চেয়ে পূর্ণতর।

দ্বিতীয়ত, কবি বলিতেছেন, "এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে দুই ধারাই লক্ষিত হয়। 'শাপমোচনে' ঘটনা নাই বলিলেই হয়, কেবল বিশুদ্ধ ভাবের আবেগের প্রকাশ—নৃত্যে এবং সঙ্গীতে। কিন্তু চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামাতে ঘটনার ধারা স্তিমিত হইলেও তাহা বর্তমান—এবং ঘটনা ও ভাবনা যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে—নৃত্যে ও সঙ্গীতে।

"আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা আর একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন, মেয়ে দু'জন পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জুন আর সুবলের যুদ্ধ।...খানিকটা কথাবার্তার পরে দু'জনের লড়াই।...নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝ্‌তে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ যারা নাচছে তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কি সেইটেই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে

বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।”[১]

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও কবি মেয়েকেই পুরুষের ভূমিকা দিতেন। বাঙালী বালিকার অর্জুনের ও বজ্রসেনের ভূমিকা গ্রহণে ওই একই রসের উদ্ভব হইত—“কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।”

“কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্ব রাত্রে যে-দুজন বালিকা নেচেছিল, তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোশ প'রে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবে ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পূরো মাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোশের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হোলো না। বেশভূষার সৌন্দর্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয়নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেক্‌লো। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকে বিরূপ করতে পারে না—এদের রাক্ষসেরাও নাচে।”[২]

এই বিদ্রূপনৃত্যের কিছু আভাস যেন 'তাসের দেশ' নাটকে আছে। সে দেশের তাসের জনতার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সঙ্গীতে এই বিদ্রূপনৃত্যের ভঙ্গী।

“সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোশপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোশ এনেছিলুম, তার থেকে বেশ বোঝা যায়—মুখোশ-তৈরি একপ্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপনা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমন শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ

১ যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

২ যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

ছাঁদ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক এক রকম শ্রেণীনির্দেশ করে। মুখোশ-তৈরি যে গুণী করে সে সেই শ্রেণী-প্রকৃতিকে মুখোশে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ শ্রেণীর মুখের ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোশ পরে এলে আমরা তখনি দেখতে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত অভিনেতা ভাব-অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোশে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোশেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা। মূল ধূয়োটা তার বাঁধা, এমন করে তাল দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিছু অসঙ্গত না হয়। এই অভিনয়ই দেখলুম।"[১]

মুখোশ-নৃত্য রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই জাতীয় নাটক রচনায় তিনি মনোযোগ দেন নাই। মুখোশ-নৃত্য রচনা করিয়া গেলে বাংলা সাহিত্য আর একটা দিকে যে কেবল সমৃদ্ধতর হইত তাহা নয়, রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভারও একটা নূতনতর পরিচয় পাওয়া যাইত। আমার তো মনে হয় মুখোশ-নাট্য তাঁহার প্রতিভার বিশেষ অনুকূল ছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেণীর বিকাশেই অধিকতর দক্ষ ছিলেন। নাটকে ব্যক্তির মনে যে দ্রুত লয়ে ঘন ঘন ভাববিবর্তন ও পট-পরিবর্তন ঘটে, শ্রেণীর মনে সে রকমটি ঠিক ঘটে না; শ্রেণী-মনের ভাব ও পট-পরিবর্তন ঢিমে তালে ঘটিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ঘটনার তাল ও ব্যক্তির ভাবনার তাল একসঙ্গে চলিতে পারে না; অর্থাৎ নাটকে যে রকম আকস্মিক অপ্রত্যাশিত মুহুর্মুহু ভাববিপর্যয় দর্শক আশা করে, তাহাতে ঠিক তেমনটি নাই। অভিনেতার মুখে অবিরাম ভাব-বলাকার সঞ্চরণ না ঘটাতে মুখটা অনেক পরিমাণে অবিচলিত মুখোশের সগোত্র

১ যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাট্যে অভিনেতা যে পরিমাণে ব্যক্তি তাহার চেয়ে বেশি করিয়া যেন সে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। অভিনেতার মুখের উপরে একটা মুখোশ তুলিয়া দিলে মুখের এই মৌলিক ত্রুটি ঢাকা পড়িয়া গিয়া যেন একটা গুণে পরিণত হইতে পারিত।

বিশেষ করিয়া তাঁহার 'তাসের দেশ' একান্তভাবে মুখোশ-নৃত্যের উপযোগী। এই নাটকে তাসের জনতায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের চেয়ে শ্রেণী-ব্যক্তিত্ব অধিকতর। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র ব্যক্তি, কিন্তু তাস ও তাসানীগণ শ্রেণীস্বরূপ। এক্ষেত্রে তাহাদের মুখে মুখোশের ব্যবস্থা হইলে অভিনয়ের অঙ্গহানি না হইয়া, শ্রেণীরূপটি স্পষ্ট হইয়া উঠাতে রস-বর্ধন হইত বলিয়াই মনে হয়।

এই যে নৃত্যনাট্যের কথা বলিলাম—ইহার মূলের তত্ত্বটি কি? আগেই বলিয়াছি যে, জীবনদর্শনের পরিণতির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহার আর্টে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল—এবং এই পরিবর্তনের তাগিদেই তিনি প্রথম বয়সের গীতিনাট্য হইতে গতানুগতিক কমেডি, ট্র্যাজেডি ও তত্ত্বনাটোর ভিতর দিয়া শেষবয়সের ঋতুনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথম বয়সের গীতিনাট্যে নিছক ঘটনার ও আবেগের মাত্র প্রকাশ; তাহার মূলে কোনো সচেতন তত্ত্বরূপ নাই। শেষবয়সের ঋতুনাট্যের মূলে একটি সচেতন তত্ত্ব নিহিত আছে। কবির দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধীর অথচ অনিবার্য গতিতে এই তত্ত্বের দিকে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অতি সংক্ষেপে এই তত্ত্বকে বলা যাইতে পারে নটরাজ শিবের আইডিয়া। যে শিল্পী নটরাজমূর্তি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন বিশ্বের কারণস্বরূপ মূল আবর্তচ্ছন্দে লীলায়িত হইয়া জীবনে ও জগতে এক রহস্যময় বিচিত্র দিব্যশক্তির লীলা চলিতেছে; তাহারই নৃত্যচ্ছন্দের পদপাতে ভাঙিতেছে, গড়িতেছে; বীভৎসতা ও সৌন্দর্য, ভীষণতা ও মাধুর্য, নিঃস্বতা ও পরিপূর্ণতা তাহার নৃত্যচঞ্চল দুই চরণের যেন দুই বিরুদ্ধ গুণ। যে-হতভাগ্য

খণ্ডিত দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখিতেছে তাহার চোখে ইহা রিক্ত, ভীষণ, বীভৎস, ভাঙন-মুখী ও অসম্পূর্ণ; সে কেবল তাণ্ডবের চন্দ্র-সূর্য-তারা-খসিয়া-পড়া ভগ্ন বিশ্ব-অট্টালিকাটাই দেখিতে পাইল; কিন্তু যে-সৌভাগ্যবানের দৃষ্টি পরিপূর্ণ, সে নটরাজের দুই চরণের লীলাই প্রত্যক্ষ করিতেছে বলিয়া জীবন ও জগৎ তাহার কাছে সুন্দর, মধুর এবং চির-পরিপূর্ণ; সে দেখিতে পায় চন্দ্র-সূর্য-তারা খসাইয়া লইয়া নূতনতর বিশ্বহর্ম্য গড়িয়া উঠিতেছে; সে দেখিতে পায় সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর উপাদান ছাড়িয়া মহত্তর জীবন-গঠনের লীলা চলিতেছে, তাহার চোখে জীবন ও জগৎ পরিপূর্ণ এবং সুন্দর। খণ্ডদৃষ্টি ব্যক্তি নটরাজের রঙ্গমঞ্চের বাহিরের পর্দাখানা মাত্র দেখিয়া বলে—ইহাই বাস্তব, আর বাস্তব বীভৎস এবং নিষ্ঠুর। পরিপূর্ণ-দৃষ্টিবান্ রঙ্গমঞ্চের পর্দাখানা উঠাইয়া নটরাজের নৃত্যলীলা দেখিয়া বলে—সব সুদ্ধ মিলিয়া কি সুন্দর, আর পরিপূর্ণ!

এখন জীবনের সাধনায় এই পরিপূর্ণতার দৃষ্টির অধিকারী কবি হইয়াছেন বলিয়াই তিনি আর পর্দাখানা মাত্র দেখিয়া হতাশ হন নাই; একেবারে নৃত্যের আসরে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং নটরাজের নৃত্য দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন ভাঙন নূতন গড়নের ভূমিকা মাত্র; মৃত্যু জীবনেরই অঙ্গ; বিরহ নিবিড়তর মিলনেরই সূচনা—আর সবসুদ্ধ মিলিয়া জগৎ ও জীবন স্বকীয় মহিমায় পরিপূর্ণ, স্বয়ংবিধৃত।

জগৎ ও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের নিকষে কবি এই তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায়, বিশ্বের অণুপরমাণুর বিবর্তনে (নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা); মানুষের জীবনের বিরহমিলনের লীলায় (শাপমোচন); রূপ ও রূপাতীত সত্তার দ্বন্দ্বে (নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা); প্রেম ও দেহের বিপরীত দাবির সংগ্রামে (নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা); অর্থাৎ এই তত্ত্ব আর রবীন্দ্রনাথের কাছে তত্ত্ব মাত্র থাকে নাই, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একার্থক হইয়া

উঠিয়া ইহা নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে ; ইহা তাঁহার কাছে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব বলিতে রবীন্দ্রনাথ এই পূর্ণতাকেই বোঝেন।

এক্ষণে তাঁহার রচনা হইতেই এই তত্ত্বরূপটি প্রকাশের চেষ্টা করা যাক্।

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইয়া থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের ইহাই মর্ম।"

আমরা যাহাকে জগৎ বলিয়াছি, কবির ভাষায় তাহা 'বহিরাকাশে রূপলোক', আর আমরা যাহাকে জীবন বলিয়াছি কবির ভাষায় তাহা 'অন্তরাকাশে রসলোক।' যে-সৌভাগ্যবান্ নটরাজের লীলায় যোগ দিয়া তাঁহার নটসঙ্গী হইতে পারিয়াছে, তাহার মন 'বন্ধন-মুক্ত' হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহারাই সন্ন্যাসী, ইহাই সন্ন্যাস। সংসারত্যাগী গতানুগতিক সন্ন্যাসীরা কেবল নটরাজের ভাঙন-মুখী চরণখানাই দেখিতে পাইয়াছে, তাই কবির কাছে তাহাদের কোনো গুরুত্ব নাই।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা[১] নৃত্যনাট্যের অন্তর্গত না হইলেও এক্ষেত্রে তাহার আলোচনা অসঙ্গত নয়, কারণ কবির নৃত্যতত্ত্বটি অত্যন্ত সচেতনভাবে ইহাতে প্রকট।

জগৎ ও জীবন মিলিয়া যে বিশ্বব্যাপার তাহার মধ্যে কবি নটরাজের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্তিসুরের ছন্দ হে।"

১ নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

নটরাজের নৃত্যের তালেই কবির রসলোক হইতে সুপ্ত নির্ঝরিণী স্বপ্ন ভাঙিয়া জগতের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়ে।

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁদে নৃত্যের ছায়া।"

... ...

"নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র-ভানু।"

নটরাজের এক পদক্ষেপ কবির রসলোকে আর এক পদক্ষেপ বহির্লোকের পদপাতে অণুপরমাণু যে কেবল উন্মথিত হইতেছে, তাহা নয়, বিদ্রোহী বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতেছে।

"তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।"

সুখদুঃখ সেই নৃত্যচ্ছন্দের তরঙ্গের ওঠাপড়া এবং জীবন-মৃত্যুর আক্ষেপ ও উল্লাসে সেই নৃত্যের ডমরুধ্বনি। এ-হেন নটরাজের কবিশিষ্য তিনি।

"নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।"

... ...

"প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণ-তলে, তুমি মোর গুরু ;"
... ...
"অবসাদে যেন অন্যমনে
তালভঙ্গ নাহি করি,"

নটরাজের কবিশিষ্যের ইহাই সন্ন্যাস, কারণ গুরুর সঙ্গে বিশ্বনৃত্যে যোগ দেওয়াতে তাঁহার মন বন্ধন-মুক্ত। এই বিশ্বনৃত্যে তালভঙ্গ হইলেই নটরাজের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়, তখন আবার দীর্ঘ সাধনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় (শাপমোচন)।

"এই পর্যন্ত কাল লিখেছি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্‌শা কাট্‌তে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ ধরা, ছেঁড়াখোঁড়া কাটাকুটিতে ভরা। তার মধ্যে এর সঙ্গতি কোথায়। যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব-সংসারে দুঃখদৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ তো নাচ শেখেননি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছট্‌ফট্‌ করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই।' এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হতো তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগতো না, এটাকে পাগলামি বল্‌তুম।

"দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখবো না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না, তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাধ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি

কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আহ্বান করবো যাঁরা 'বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ'। যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার লীলা।"[১]

কবি যাঁহাদের লোকহিতব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী বলিয়াছেন তাহারা নটরাজের ভাঙন-ধরানো চরণখানার লীলাই দেখিতে পান, কাজেই তাঁহারা দেখেন 'বাস্তব সংসারে দুঃখদৈন্যশ্রীহীনতার অন্ত নেই।' কিন্তু কবির দৃষ্টি পূর্ণতর, তিনি নটরাজের নৃত্যের সবটা দেখিতে পান, কাজেই তাঁহার কাছে সবসুদ্ধ মিলিয়া বিশ্বব্যাপার সুন্দর—'বাস্তবের ময়লা ছেঁড়া পর্দাখানাই একান্ত নয়। আর এই বাস্তবের অপরচ্ছিন্ন জীর্ণ পর্দাখানা অপসারিত করিয়া দিবার উপায় নৃত্য, শিল্প। নৃত্যের আনন্দের অভিঘাতে পর্দাখানা সরিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় বাস্তবের লক্ষ্মীছাড়া দরিদ্রনারায়ণই বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণ।

এই পত্রখণ্ডে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। কবি 'দরিদ্রনারায়ণে'র রূপক লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া শিবের রূপে বারংবার ফিরিয়া আসিয়াছেন—নটরাজ যে শিবের অন্যতম রূপ!

উপরিউদ্ধৃত অংশগুলির সাহায্যে কবির নৃত্যতত্ত্ব হয়তো কিয়ৎ-পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে; এবারে তাঁহার নৃত্যনাট্য চারিখানি লইয়া আলোচনা করা যাক্।

শাপমোচন

শাপমোচনকেই যথার্থভাবে নৃত্যনাট্য বলা চলে—কারণ শাপ-মোচনের শাপের হেতু গন্ধর্ব সৌরসেনের সঙ্গীতকলায় তালভঙ্গ। নটরাজ জন্মমৃত্যু, ভাঙাগড়ার মধ্যে তাল রক্ষা করিয়া বিশ্বনৃত্য করিতেছেন, যে-হতভাগ্য তাঁহার তালের সঙ্গে তালরক্ষা করিয়া না চলিতে পারিতেছে জীবনে তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে।

১ পথে ও পথের প্রান্তে; পত্র ৪৭।

এইরকম এক তালভঙ্গের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের উদ্ভব।

কিন্তু আর এক হিসাবে 'শাপমোচনে'র চেয়ে পরবর্তী তিনখানি নাটক সম্পূর্ণতর; প্রথমখানিতে কেবল ভাবাবেগের প্রকাশ; শেষের তিনখানিতে ভাবাবেগের সঙ্গে ঘটনার বেগও আছে।

"গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সঙ্গীতসভায় কলানায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে সূর্য প্রদক্ষিণে। সৌরসেনের মন ছিল উদাসী। তাই অনবধানে তার মৃদঙ্গে তাল গেল কেটে, উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে। স্খলিতচ্ছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল, অরুণের নাম নিয়ে তার জন্ম হল গান্ধার রাজগৃহে।"

এইরূপে সৌরসেনের প্রায়শ্চিত্ত-জীবনের সূত্রপাত।

আবার এদিকে—

"মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বললে, 'বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না দেবী, একই লোকে আমাদের গতি হোক্, একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।' শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন—'তথাস্তু, যাও মর্ত্যে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।' মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে—নাম নিল কমলিকা।"

সৌরসেন তালভঙ্গের অপরাধে বিকৃতসৌন্দর্য অরুণেশ্বর হইল। তাহার কারণ নটরাজের দুই চরণের লীলা-সামঞ্জস্য যে দেখিতে না পায় জগৎ তাহার কাছে অসুন্দর।

মদ্ররাজ-কন্যা কমলিকার সঙ্গে অরুণেশ্বরের বিবাহ স্থির হইল।

"রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায় এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্ক-বিহারিণী বীণা। স্তব্ধ সঙ্গীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।

যথাকালে রাজবধূ এলো পতিগৃহে।”

এবারে কমলিকার প্রায়শ্চিত্ত-পরীক্ষা আরম্ভ হইল—কারণ ভগ্নতাল স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী বলিয়া দুঃখের অর্ধভাগও যে তাহার।

“নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতিরাত্রে স্বামীর কাছে বধূ-সমাগম। কমলিকা বলে—প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।”…

“রাজা বললেন—প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না এই মিনতি।”

মহিষীকে দুঃখিত দেখিয়া রাজা বলিলেন, কাল চৈত্রসংক্রান্তির দিনে নাগকেশরের বনে সখাদের সঙ্গে তাঁহার নৃত্যের দিন। রাণী তখন যেন তাঁহাকে দেখিয়া লন।

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন। রাণী বলিলেন—নাচ তো দেখিলাম কিন্তু সেই দলের মধ্যে একজন কুশ্রী কেন?

“রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল। কিছু পরে বললে, ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান; কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু; মরুনীরস কালো মর্ত্যের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।”

“রস-বিকৃতির পীড়া সইতে পারিনি—এই বলে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল। রাজা তার হাত ধরে বললে, ‘একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে। কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা’।”

রাণী সূর্যোদয়ের মুহূর্তে রাজাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

“রাজা বললে—‘তাই হোক, ভীরুতা যাক্ কেটে।’ দেখা হল। টলে উঠল যুগলের সংসার। কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা—বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।”

কমলিকা রাজগৃহ হইতে দূরে আত্মনির্বাসন করিল। রাণীর দুঃখের কারণ—সুন্দর ও কুশ্রী, আনন্দ ও দুঃখ মিলাইয়াই যে জগতের পরিপূর্ণ রূপ—এ তত্ত্ব সে বোঝে নাই। অসুন্দর-ছাঁটা জগৎকে, দুঃখ-ছাঁটা জীবনকেই সে একান্ত ভাবিয়াছিল, কাজেই প্রিয়তমও তাহার চোখে কুশ্রী। বিরহের তপস্যায় এই পূর্ণতার বোধ তাহার মনে উদিত হইল—তখন চোখের দৃষ্টির উপরে আর তাহার ভরসা রহিল না, তখনই সে প্রিয়তমকে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিল।

রাণীর নির্বাসনের বনের প্রান্তে রাত্রির পরে রাত্রি রাজার বীণাধ্বনি ও নৃত্য চলিতে থাকে। এমনি করিয়া কিছুদিন যায়।

"রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আজ আমি যাবো। আমার চোখকে আমি আর ভয় করিনে।"

"বীণা থামলো। মহিষী থমকে দাঁড়ালো। রাজা বললে—ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।...

"আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হল—এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে। কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, একী সুন্দর রূপ তোমার। কখন্ দুইজনেরই অগোচরে বিরহবেদনার তাপে ইন্দ্রের শাপ স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে।"

রাণীকে যে দৃষ্টিতে রাজার কুশ্রী মনে হইয়াছিল তাহা অসম্পূর্ণ, এখন যে-দৃষ্টিতে রাজাকে সুন্দর মনে হইল তাহা পূর্ণ। এই পূর্ণতা লাভের জন্য তপস্যার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিরহের দুঃখই সেই তপস্যার তাপ। রাজাও বিরহের দ্বারা, দুঃখের গ্লানির দ্বারা ছন্দঃ-স্খলনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্যকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য

শাপমোচন ও নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার তত্ত্ব অনুরূপ। প্রেমের মোহ ও প্রেমের মুক্তি মিলিয়াই প্রেমের পূর্ণতা। প্রেমে দুই-ই আছে, কিন্তু কোনো-টাই একান্ত নহে। যে-কোনো একটাকে একান্ত করিয়া দেখিলেই ছন্দঃপতন ঘটে—এবং দুঃখের দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন দু'জনেই প্রেমের মোহটাকেই একান্ত বালয়া মানিয়াছিল, কিন্তু পরে ভিতর হইতে আঘাত পাইয়া প্রেমের মুক্তিকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রেমের সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার রঙ্গমঞ্চের পুস্তিকায় ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে। এই ছায়াভিনয়ের প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে খুব সম্ভবত এই ধারণাটিও কবি জাভা হইতে পাইয়াছেন। জাভাযাত্রীর পত্রে একাধিকবার ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে।

"সেখানে মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এ দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখিনি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে, তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাত পাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প অনুসারে ছবিগুলোকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গামেলান বাজে।"[১]

চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা সুপরিচিত গ্রন্থ; কাজেই তাহাদের কাহিনীর বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

কমলিকা ও চিত্রাঙ্গদা দু'জনেই একই ভুল করিয়াছিল। খণ্ডদৃষ্টি-

১ যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র।

বশত প্রকৃত সৌন্দর্য কাহাকে বলে তাহারা বুঝিতে পারে নাই। কমলিকার চোখে রাজা কুশ্রী, আবার অর্জুনের প্রত্যাখ্যানে চিত্রাঙ্গদা বুঝিতে পারিল নারীর ললিত সৌন্দর্য তাহাতে নাই। বিরহের তপস্যাতেই দুইজনের পূর্ণ দৃষ্টিলাভ ঘটিল। স্বামী-বিরহিতা তাপিতা কমলিকা পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বামীকে দিব্য সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিতে পাইল। আর চিত্রাঙ্গদার বিরহ আত্মদ্বৈতে। দেবদত্ত-সৌন্দর্যময়ী নারী প্রকৃত চিত্রাঙ্গদাকে আড়ালে রাখিয়া সব সুখ যেন ভোগ করিতেছে—এই দুঃখই চিত্রাঙ্গদার চিত্তে বলদান করিল; তখনই সে অনায়াসে দেবদত্ত রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বল্প-সৌন্দর্য অস্তিত্বের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইতে সাহস সঞ্চয় করিল।

চিত্রাঙ্গদা ও প্রকৃতি চণ্ডালিকা দুইজনেই প্রেমাস্পদকে পাইবার জন্য অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল; মদনের বর ও মাতার নাগপাশ মন্ত্র। অলৌকিক উপায়েই দুইজনে সিদ্ধকাম হইল। ইহাতে প্রেমের মোহের পরিচয়।

কিন্তু আবার দু'জনেই মোহভঙ্গের সাহস অর্জন করিয়া অলৌকিকতার পাশ মুক্ত করিয়া প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রেমের পূর্ণতার প্রাচুর্যেই চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে কীর্তির পথে ছাড়িয়া দিল; প্রকৃতি আনন্দকে ছাড়িয়া দিল তাহার ধর্মসাধনার পথে। একজনের বীর্যসাধনা, অপরের ধর্মসাধনা নষ্ট করিয়া তাহাদের প্রেমাস্পদকে খর্ব না করিবার ইচ্ছা। এমন যে করিতে পারিল তাহার কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে মিলন ও বিরহ মিলাইয়াই প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ।

নাগপাশমন্ত্রাবদ্ধ যে আনন্দকে প্রকৃতি পাইবার মুখে ছিল, সে তো তৃষ্ণার জলপ্রার্থী সাধন-সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্তি নয়; প্রকৃতি দেখিল, মন্ত্রাহত এই পরিম্লান পুরুষ আগেকার মূর্তির ভগ্নাংশ মাত্র। হস্তগত প্রণয়াস্পদের ভগ্নাংশের চেয়ে ছাড়া-পাওয়া পূর্ণ মূর্তিকে প্রকৃতি কাম্যতর মনে করিল, তাই সে অনায়াসে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে

পারিল। চিত্রাঙ্গদাও যে অনায়াসে অর্জুনকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে, তাহার ভয় ছিল পাছে তাহার মুগ্ধ সৌন্দর্যের লীলা-তরঙ্গিণীতে বীরকীর্তি বিসর্জন দিয়া বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন পূর্বতন অস্তিত্বের খণ্ডাংশে পরিণত হয়।

শ্যামার সমস্যা নিদারুণ, এবং তাহার পরিণামের মধ্যে সান্ত্বনার লেশমাত্র নাই। কমলিকা, চিত্রাঙ্গদা শেষ পর্যন্ত প্রেমের সার্থকতা লাভ করিয়াছে; প্রকৃতির ত্যাগের মধ্যেই তাহার তৃপ্তি আছে। কিন্তু শ্যামার ভাগ্যে নিদারুণ অভিলাঞ্ছনা ছাড়া আর কি জুটিল? উত্তীয়ের মৃত্যুর পাপের জন্য বোধ করি এইরূপ পরিণামের প্রয়োজন ছিল। পাপের দ্বারা লব্ধ প্রেম ভোগ করিবার সৌভাগ্য তাহার হইল না।

অরুণেশ্বর, অর্জুন ও আনন্দ শেষ পর্যন্ত সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বজ্রসেনের ট্র্যাজেডি এই যে, শ্যামাকে যে সত্যই ভালবাসে, কিন্তু পাপবোধের চেতনা তাহাকে গ্রহণ করিবার পথের অন্তরায়। তাহার অর্ধেক শ্যামাকে চাহে, অপরার্ধ সেই তৃষ্ণার ভৃঙ্গার হাত হইতে ছিনাইয়া লইতেছে। সে জানে বিধাতা পাপীকে ক্ষমা করেন, কিন্তু তাহার ক্ষমাহীনতার জন্য তাহার ক্ষমা নাই।

"জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা।"

নৃত্যনাট্য কয়খানির বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইহাদের ভাবের সঙ্গে ভাব-প্রকাশের বাহনের কি নিগূঢ় যোগ। যে-কোন ঘটনাকে নৃত্যের দ্বারা প্রকাশ করিলে চলিবে না, অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। আবার নৃত্যনাট্যগুলিতে ভাব ও

ভাব-প্রকাশের বাহনের মধ্যে এমন দেহাত্মযোগ আছে—এরূপ মনে করা চলে না। ভাব ও তাহার বাহনের মধ্যে অনিবার্য যোগসাধনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব; এই নৃত্যনাট্যগুলিতে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অতি পুরাতন সত্য; তাঁহার যৌবনের রচনাতেই তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই ভাবকে নূতন বাহনের হাতে সমর্পণ করিবার দৃষ্টান্ত নৃত্যনাট্যগুলি। জাভাতে নৃত্যনাট্যের সজীব আদর্শ দেখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আংশিক ঋণী; তাহার পূর্ণাদর্শ আমরা রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে দেখিতে পাইলাম বলিয়া কবির কাছে আমাদের ঋণ পূর্ণতর।

ঋতুনাট্য

রবীন্দ্রনাথের কোন্ পর্যায়ের নাটকগুলিকে ঋতুনাট্য বলিতেছি, সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কা আছে। ঋতু-উৎসব নামে কবির যে নাট্যসমষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শেষবর্ষণ, বসন্ত, সুন্দর-এর সঙ্গে শারদোৎসব ও ফাল্গুনী স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে মনে করা চলে যে, শারদোৎসব ও ফাল্গুনীকেও কবি ঋতুনাট্য মনে করিতেন। এইখানে তাঁহার সঙ্গে আমাদের মতভেদ।

আগে একবার বলিয়াছি, আবার মনে করাইয়া দিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাট্যের তিনটি ধাপ আছে। এক শ্রেণীর নাটকে মানব অভিনেতাই দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির কোনো স্থান নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানুষ প্রধান অভিনেতা, প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় পটভূমিকা। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতি প্রধান অভিনেতা, মানুষ পটভূমিতে মাত্র আছে, কখনো ব্যাখ্যাতা-রূপে, কখনো কেবল দর্শক রূপে মাত্র।

আমরা এই তৃতীয় শ্রেণীর নাটককেই প্রকৃত ঋতুনাট্য বলিতে চাই। ফাল্গুনী ও শারদোৎসব-এ মানব অভিনেতা প্রধান, প্রকৃতি সজীব ও গভীর অর্থপূর্ণ পটভূমিকা; প্রকৃতি প্রধান অভিনেতা হইয়া ওঠে নাই।

শ্রেণীবিচারের যে সঙ্কেত দিলাম তদনুসারে আমাদের মতে নিম্নলিখিত পাঁচখানি নাটককে প্রকৃত ঋতুনাট্য বলা চলে। শেষ-বর্ষণ, বসন্ত, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, নবীন ও শ্রাবণগাথা।

গীতোৎসব, সুন্দর ও বর্ষামঙ্গল প্রায় এই শ্রেণীর রচনা, কিন্তু কোনোক্রমেই এগুলিকে নাটক বলা চলে না—এগুলিকে বিশেষ বিশেষ ঋতু-অভিনন্দন উপলক্ষে রচিত বা সঙ্কলিত গানের মালা মাত্র; নাটকীয় লক্ষণদানের কোনো প্রচেষ্টা এগুলিতে নাই।

কিন্তু যে পাঁচখানিকে ঋতুনাট্য বলিয়া উল্লেখ করিলাম তাহাও ঋতু-অভিনন্দন উপলক্ষে রচিত; কিন্তু পাত্রপাত্রীর সমাবেশ, প্রবেশ ও প্রস্থান প্রভৃতি ইঙ্গিতের দ্বারা এগুলিকে নাটকীয় করিয়া তুলিবার সচেতন চেষ্টা আছে।

এই সব নাটকে দুই শ্রেণীর অভিনেতা দৃষ্ট হয়, মানব ও প্রকৃতি। হয়তো কোনো রাজসভাতে ঋতু-উৎসব লাগিয়াছে। রাজসভার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রাজা আছেন, সভাকবি আছেন, পারিষদগণ আছে, নাট্যাচার্য আছেন, নটরাজ আছেন, আবার আভাসে সামাজিক শ্রোতাগণও আছেন। আবার আর এক দিকে প্রকৃতির প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন ঋতু আছে; নদী আছে; দক্ষিণহাওয়া আছে; শালবীথিকা, বেণুবন, আম্রকুঞ্জ, করবী, বকুল, মাধবী, মালতী ইত্যাদি আছে। শেষোক্ত দলই প্রধান অভিনেতা; পূর্বোক্ত মানুষেরা দর্শক এবং ব্যাখ্যাতা মাত্র।

শ্রাবণগাথা ও শেষবর্ষণের নটরাজ, এবং বসন্তের কবি নাট্য-ব্যাপারের ব্যাখ্যাকারী। যেমন কোনো কোনো চলচ্চিত্রে একটি অশরীরী বাণীকে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে শোনা যায়—অনেকটা সেই রকম আর কি। আবার ওই তিনখানিতে রাজা উপস্থিত আছেন, তাঁহাকে আদর্শশ্রোতা বলা যাইতে পারে। গ্রীক্ নাটকের কোরাস্‌কে 'Ideal Spectator' বলা হইয়াছে; তাহারা কেবল আদর্শশ্রোতা মাত্র নয়, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঘটনার গ্রন্থি-উন্মোচনে সাহায্য করিয়া অনেক পরিমাণে ব্যাখ্যাতার কাজও করিয়া থাকে। কোরাসের সেই দায়িত্ব এখানে রাজা এবং নটরাজ বা কবির মধ্যে যেন দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

এই সব নাটকে মানব অভিনেতারা গদ্যে কথা বলিতেছেন। গদ্য ব্যাখ্যার জন্যও বটে, আবার এই গদ্যের সাদা পটের উপরে গানের সুর ও পাত্রপাত্রীর নৃত্য উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে বলিয়াও বটে। নৃত্য ও গীত ইহার প্রধান অঙ্গ; গদ্যাংশ

গানের সঙ্গে গানকে, ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাকে জোড়া দিতে সাহায্য করিয়াছে মাত্র।

নবীন নাটকখানিতেও গদ্য আছে বটে, এবং তাহার উদ্দেশ্যও পূর্ববর্ণিতমতো রসব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তাহা যে কে বলিতেছে তাহার উল্লেখ নাই; অভিনয়ের সময় স্বয়ং কবি বলিতেন। যিনিই বলুন তিনি একাধারে আদর্শ দর্শক ও ভাষ্যকার ছাড়া আর কিছু নহেন।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালায় গদ্য আদৌ নাই। তৎপরিবর্তে গানে ও কবিতায় এটি মিশ্রিত। কবিতাংশ ইহার পটভূমিকা। এই কবিতাগুলিও অভিনয়কালে স্বয়ং কবি আবৃত্তি করিতেন; তাঁহার কাজ ছিল দর্শকের চিত্তে রসোদ্‌বোধনে সাহায্য করা—এখানেও তিনি ভাষ্যকার ও আদর্শ দর্শকের কাজ একাধারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এবারে ঋতুনাট্যের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন, কৈশোর হইতেই, এই ঋতুরস-উপলব্ধির দিকেই যেন চলিয়াছে। পূর্বে তাঁহার নাটকের যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ের নাটক মানবরস-প্রধান, তাহাতে প্রকৃতির সচেতন উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তবু তাহার গুরুত্ব গৌণ, মানুষই প্রধান। তৃতীয় পর্যায়ে মানব অভিনেতা গৌণ হইয়া পড়িয়া প্রকৃতিকে রঙ্গমঞ্চের পুরোভূমিকা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, কেমন ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে প্রকৃতির রূপ-উপলব্ধির গুরুত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। ঋতুনাট্যগুলি কবিজীবনের এই প্রকৃতিমুখী বিবর্তনের চরম-ধাপ। জীবনের শেষ দিকে তাঁহার কাছে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাঁহার কাছে মানুষকে বুঝিবার দোসর প্রকৃতি; মানবজীবনকে যতক্ষণ না প্রকৃতির মধ্যে আরোপ করিতে

পারিতেছেন ততক্ষণ যেন তিনি তাহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। মানবজীবনের তীব্র সূর্যালোকের দিকে তাকানো যায় না বটে, কিন্তু সেই আলো যখন প্রকৃতির চন্দ্রালোক হইতে স্নিগ্ধতর হইয়া বিচ্ছুরিত হয় তখন সেদিক হইতে চোখ ফিরাইতে আর ইচ্ছা করে না। এই যে প্রকৃতিকে মানুষের*বিকল্প করিয়া বুঝিবার প্রয়াস—ইহার সূচনা নাটকে। বর্তমান ঋতুনাট্যগুলির মতোই ফাল্গুনীতেও দু'টি ভাগ আছে—প্রকৃতির গীতিভূমিকা ও মানুষের অভিনয়: মানুষের জীবনের রহস্যের চাবিকাঠি যেন প্রকৃতির হাতেই রহিয়াছে—

'গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা কি আলাদা নাকি?'

'না, মহারাজ—বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।'

অর্থাৎ মানুষের প্রাণের লীলাকে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা। কবির কাছে প্রকৃতি যেন মানবজীবনের ব্যাখ্যাতা, ভাষ্যকার। মানবজীবনের দুরূহ কালিদাসকে প্রকৃতির মল্লিনাথ সঞ্জীবনী টীকা দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া যেন সরস করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমান ঋতুনাট্যগুলি ফাল্গুনীর গীতিভূমিকারই পরিবর্ধিত সংস্কার মাত্র। কিংবা ফাল্গুনীর মানব-অংশকে বাদ দিয়া গীতিভূমিকার ঋতু-অংশগুলিকে বাড়াইয়া গদ্য জুড়িয়া দিয়া, প্রবেশ প্রস্থান সংযোজিত করিয়া দিলে যাহা দাঁড়ায় ঋতুনাট্যগুলি তাহা ছাড়া আর কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে বনবাণী নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। পাঠকসমাজে বোধ করি ইহার বহুলপ্রচলন ঘটে নাই। কিন্তু, ইহা কবির বিশিষ্ট স্বকীয়তাপূর্ণ একখানি কাব্য। প্রকৃতি যে মানুষের বিকল্প হইয়াছে—বনবাণীর পত্রে পত্রে তাহা

মর্মরিত হইতেছে। বনবাণীর মধ্যেই যেন তিনি মানববাণীর সার্থক প্রতিধ্বনি পাইয়াছেন। এই কাব্যের ভূমিকায় প্রকৃতির সহিত তাঁহার, প্রকৃতির সহিত মানুষের, একাত্মতার স্পষ্ট উল্লেখ কবি করিয়াছেন।—

'আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

'ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

'বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে, গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর; সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসঙ্গীতে বদ্‌সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন—দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন

গাছের বাণী: 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।' শুনেছিলেন: 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।' তাঁরা গাছে গাছে চির-যুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন: 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না; রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

এই ভূমিকাটিতে দেখা যায়, বনবাণী কবির কাছে জীবজগতের আদিবাণী, মানুষের বাণী তাহার তুলনায় অর্বাচীন; বিশ্বের প্রাণের বিশুদ্ধ রহস্য যেন ওই গাছপালার প্রাণের মধ্যে নিহিত। আরণ্যক ঋষিদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধদেবের বোধিদ্রুমলীন সাধনার ভিতর দিয়া, লৌকিক সাধিকা বোষ্টমী পর্যন্ত যেন এই সত্যটিকে প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বসৃষ্টির প্রাণবেগ গাছপালার প্রাণ-প্রৈতির মধ্যে স্পন্দিত; পৃথিবীর অরাজকতার কোলাহলে বনবাণীর একতারা বিশ্বসঙ্গীতের ধুয়াটি ধ্বনিত করিতেছে—এই সঙ্গীতের স্নানে কবিচিত্ত নির্মল হইয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করে।

প্রকৃতিকে কবি কী দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহার কাছে প্রকৃতির গুরুত্ব কতখানি, তাহার প্রকাশ ও ব্যাখ্যা এই ভূমিকাটিতে যেমন আছে, অন্য কোথাও তেমনি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এই কাব্যে জগদীশচন্দ্র বসুর নামে একটি কবিতা আছে। আচার্য বসুর উদ্দেশে ইহার আগেও কবি একাধিক কবিতা লিখিয়াছেন। আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক জীবনের সম্বন্ধে কবির গভীর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা ছিল। ইহার কারণও কবির প্রকৃতির প্রতি সমবেদনার মধ্যে নিহিত। জগদীশচন্দ্র যদি নিছক পদার্থবিদ্ বৈজ্ঞানিক হইতেন তবে বিজ্ঞানসাধনায় কবির এমন সকৌতূহল

সমবেদনা লাভ করিতেন কি না সন্দেহ। জগদীশচন্দ্রের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল বনবাণীর স্বরূপ উদ্ঘাটন। পৃথিবীর আদিম অধিবাসী তরুলতার রহস্য-উদ্ভেদের চেষ্টায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও স্বকীয় কবিপন্থায় কৈশোর হইতেই এই সাধনায় নিযুক্ত আছেন; প্রভেদের মধ্যে এই যে, একজনের পন্থা বিজ্ঞানসম্মত, আর-একজনের পন্থা ধ্যানগম্য; লক্ষ্য কিন্তু একই। এখন, সাধনার এই সমলক্ষ্যতাই রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার প্রতি অনুরক্ত ও কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত সবগুলি কবিতাতেই বিজ্ঞান-সাধনার এই বিশেষ-লক্ষ্যটির সবিশেষ উল্লেখ আছে এবং বিজ্ঞানের অন্য কোনো লক্ষ্যের উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুইজনে দুইদিক হইতে একই রহস্য-উদ্‌ঘাটনের পথে যাত্রা করিয়াছেন।

শেষবর্ষণ

এই পালাগানের উপজীব্য বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন। রবীন্দ্রনাথের কোনো পালাই নিছক যাওয়াতে পরিসমাপ্ত নয়; যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসার সূচনা দিয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হন।

এখানে যে কেবল বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন তাহা নয়—পালাসমাপ্তির মুখে দেখা গেল, বাদললক্ষ্মীই মেঘের অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া শরৎশ্রী-রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন; বাদললক্ষ্মীই অবস্থাভেদে শরৎশ্রী, ইহাই এই পালার মর্মকথা।

কোনো রাজসভায় শেষবর্ষণ পালার উৎসব শুরু হইয়াছে। মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাজা, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গানের দল। আর আছেন রাজকবি ও পারিষদগণ। পালার রচয়িতা কবি পলাতক।

নটরাজ ও নাট্যাচার্যকে পালাগানের প্রযোজক বলা যাইতে পারে, তাঁহারা নাটকের ঘটনা ও মর্মকে ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন।

রাজা আদর্শ দর্শক, অর্থাৎ যে-ভাবে পালাটিকে গ্রহন করা উচিত সেইভাবে তিনি করিতেছেন। রাজকবি ও পারিষদগণ সাধারণ দর্শকের প্রতিনিধি, অর্থাৎ যে-ভাবে পালাটি গৃহীত হইবার আশঙ্কা সেই মনোভাবটি তাঁহাদের কথাবার্তায় দেখানো হইয়াছে।

প্রকৃতির পাত্রপাত্রীর মধ্যে আছে বাদললক্ষ্মী, শরৎশ্রী (দুই-ই এক সত্তা) আর সুন্দর।

আরো একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে সংলাপ চলিতেছে গদ্যে, কিন্তু পালার আসল ব্যাপার অথাৎ প্রকৃতির রসোদ্‌বোধন চলিতেছে গানে; সঙ্গীতগুলি যেন এখানে কাব্যাংশ, আর গদ্য হইতেছে তাহার ভাষ্য ও টীকা। আলোচনাকালে এই টীকাই গুরুতর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বর্তমান সমালোচক এখানে টীকাকারের টীকা করিতে বসিয়াছেন।

বর্ষার রূপ বাহিরে জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনুরূপ একটা লীলা মানুষের অন্তরে চলিতেছে—তাহা যদি না হইত তবে মানুষের পক্ষে বর্ষার কোনো মূল্য থাকিত না।

'নটরাজ। সে [বর্ষা] তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, : রজনী শাওন-ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিম্‌ ঝিম্‌ শবদে বরিষে।

রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি, প্রাণের আকাশে পূব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।'

অন্তর ও বাহিরের মিলনের ঘটক হইতেছে গান ও সুর। সুরের

সারথ্যে দর্শকের চোখের সম্মুখে শ্রাবণের কোন্ রূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়িল ?'

'শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না।'

শ্রাবণ আপনার পূর্ণতার আনন্দে রিক্ত হইয়াছে, সেই পূর্ণতাজাত রিক্ততাই তাকে ঘরের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া উদাসীন সন্ন্যাসী করিয়া পথে বাহির করিয়াছে। এই আইডিয়া রবীন্দ্রকাব্যে অত্যন্ত অবিরল; বসন্ত ঋতুর তাৎপর্য-ব্যাখ্যার বেলাতেও পুনরায় ইহা চোখে পড়িবে।

এমন সময়ে পূর্বদিক আলোকিত হইয়া শ্রাবণের পূর্ণচন্দ্র আভাসে দেখা দিল—

'রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমার পূর্ণতা কোথায় ? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই, কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে, 'আমার জিত', কান্না বলছে 'আমার'। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালাবদল।'

শ্রাবণের পূর্ণিমা জীবনের সগোত্র, তাহাতে একাধারে হাসি ও কান্না আছে, আর সেইজন্যই হাসিমাত্র-সম্বল বসন্তপূর্ণিমার চেয়ে পূর্ণতর সে। কিন্তু, বর্ষায় তো কেবল মাধুর্য নাই; কঠোরতাও আছে, নহিলে পূর্ণতা কিসের ? মধুরে কঠোরে মিলিয়া বর্ষার হরপার্বতীর রূপ।

'বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।...
সবুজ সুধার ধারায় ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্যা মরণ-ঢালা।'

বর্ষার রূপের মধ্যে বজ্রমানিক আছে, শ্যামল শোভার সঙ্গে বিদ্যুৎ-বহ্নি আছে; একদিকে তাহার কোমল সবুজসুধা প্রাণদায়িনী, আর-একদিকে তাহার মরণ-ঢালা ভয়ঙ্করী বন্যা—এই সব বিরুদ্ধের সমাবেশই তাহাকে জীবনের জটিল পূর্ণতা দান করিয়াছে।

কিন্তু, ইহাই বর্ষার রূপের সবটা নয়। তাহার মধ্যে বিরহ অন্যতম প্রধান।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।

বিরহ আছে বলিয়াই মিলনও আছে। 'খুব বড় মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের।'

এবারে রাজা বলিতেছেন, 'কান্না হাসি, বিরহ মিলন সবরকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।'

গানের আবহাওয়া বেশ জমিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া রাজার ইচ্ছা, বাদলের পালাটাই চলুক। কিন্তু, পালা তো বাদলের নয়, বাদল-বিদায়ের। বিদায়ের সুর বাঁশিতে ধ্বনিত না হইলে শরতের আগমনী হইবে কিরকমে? কারণ, ইহা যে একাধারে বাদলবিদায় ও শরৎ-আগমনের পালা। 'শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগলমিলন।'

শরতের আগমনী বহন করিয়া শুকতারা ও শেফালি দেখা দিল।

'রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে।

নটরাজ। শুভ্র শান্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক, আকাশে আলোকশতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন ; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে, মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়।...বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে।...প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদ্‌গদ্‌, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।...

অবগুণ্ঠন মোচন

নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল। কিন্তু, এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী ? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে।'

শরৎপ্রতিমা একাধারে বাহিরেও বটে, অন্তরেও বটে।—

'রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে। বলো তো এবার কে আসবে।

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।...

শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি [সুন্দর] এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন।

নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদামেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গমর্ত্যের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।'

সুন্দরের স্বভাবই এই। ক্ষণিকতা সৌন্দর্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বাস্তবে সৌন্দর্য অত্যন্ত ক্ষণস্থ। বিদায়ের আকস্মিকতায় হতাশ হইয়া রাজা শুধাইলেন—

'রাজা। এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা, তার পরে ?

নটরাজ। তারপরে প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা। এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিত ব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম।'

ইহাই সংক্ষেপে শেষবর্ষণ পালার মর্ম। মানবজীবনের সত্যকে প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া ছায়াচিত্রের মতো দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতি অভিনয় করিয়া চলিয়াছে; মানব দর্শক সাজিয়া, বিবিক্ত হইয়া বসিয়া, নিজের স্বরূপকে সত্যতর ভাবে উপলব্ধি করিয়া লইতেছে।

বসন্ত

বসন্ত পালাগানের কাঠামোটাও শেষবর্ষণের অনুরূপ। পাত্রপাত্রী দুই শ্রেণীর, মানব ও প্রকৃতি। মানব অভিনেতা পটভূমিকাশ্রয়ী, প্রকৃতি পুরোভাগে। কবি ব্যাখ্যাতা, রাজা আদর্শ দর্শক—একে অপরের পরিপূরক।

রাজা রাজকোষের দীনতা দেখিয়া আমত্যদের সঙ্গ পরিহার করিয়া পালাগানের আসরে আসিয়া উপস্থিত। কবি তাঁহাকে ভরসা দিলেন, এখানে তিনি রাজসঙ্গী পাইবেন ঋতুরাজ বসন্তকে—ইনিও পলাতক।

'রাজা। ঋতুরাজ ? বসন্ত ?

কবি। হাঁ, মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।

কবি। পৃথিবীর রাজকোষে পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কী দুঃখে।

কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।'

ঋতুরাজ বসন্ত পরম ঐশ্বর্যে পূর্ণ; সেই পূর্ণতার আনন্দে তিনি সর্বস্ব নিঃশেষে দান করিয়া দিয়া রিক্ত হন। যিনি ছিলেন রাজা, তিনি সন্ন্যাসীবেশে দেখা দেন। বসন্ত একাধারে রাজা ও সন্ন্যাসী, তিনি এক সত্তায় রাজসন্ন্যাসী।—

'রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কি রকম করে তুলেছ? বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ঐ যে এই খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ঐ জীর্ণ বসন প'রে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না, ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি; ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী; তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। তাহলে নবীন মূর্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।

কবি। ঐ যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতন-পুরাতনের মাঝখানকার নিত্যযাতায়াতের পথে।

রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে পথেই থাকেন?

কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।'

বসন্তের রাজসন্ন্যাসী, পথিক, বাস্তুছাড়া আখ্যাগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ও পুরাতন আইডিয়া। ইহা মনে না রাখিলে তাঁহার ঋতুরাজকে ও ঋতুনাট্যকে বুঝিতে অসুবিধা হইবে।

এই রাজসন্ন্যাসীর কর আদায় করিবার উদ্দেশ্যে বসন্তের পরিচারকগণ উপস্থিত হইয়া প্রকৃতির কাছে দাবি জানাইতেছে—

সব দিবি কে, সব দিবি পায়! আয় আয় আয়!
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়, আয়, আয়, আয়!
আসবে সে যে স্বর্ণরথে, জাগবি কারা রিক্ত রথে
পৌষরজনী তাহার আশায়!

ঋতুরাজ আসেন স্বর্ণরথে বটে, কিন্তু তিনি সানন্দে ভিক্ষুকের মতো দানযাচ্ঞা করিয়া ফেরেন; রবীন্দ্রনাথের ভগবানেরও এই একই লীলা।[১]

ঋতুরাজ সর্বস্ব দান করেন বলিয়াই তিনি সর্বস্ব আকাঙ্ক্ষা করেন। আর, যাহারা দান করে তাহারা রিক্ত না হইয়া পূর্ণতর হইয়া ওঠে।

'কবি। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে ওঠেন।...

রাজা। দাবি তো কম নয়।

কবি। দাবি বড় হলেই দান সহজ হয়; ছোটো হলেই কৃপণতা জাগায়।

রাজা। তা এরা সব [প্রকৃতি] রাজি আছে?

কবি। এদের মুখেই শুনে নিন।'

বসন্তের আহ্বানে নিখিল প্রকৃতি সাড়া দিয়াছে। বনভূমি বলিতেছে—

'বাকি আমি রাখব না কিছুই,
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।'

---

১ দৃষ্টান্তস্বরূপ খেয়া কাব্যের 'কৃপণ' কবিতা উল্লেখযোগ্য।

আম্রকুঞ্জ বলিতেছে—

'ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে,
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।'

রাজা বুঝিলেন, 'ফল ফলাবো বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে ফল চাইনে বলতে পারলে ফল আপনি ফলে ওঠে।'

একদিকে ইহারা যেমন সর্বস্বদানের জন্য উদ্‌গ্রীব, তেমনি আর-একদিকে একদল নিঃশেষে আত্মসমর্পণের জন্য উৎকণ্ঠিত। করবী বলিতেছে, আমি যদি তাহাকে না-ই চিনিতে পারি সে তো আমাকে চিনিয়া লইবে। কুঁড়ির কানে কথা বলিয়া আমার ফুল ফোটানোকে সার্থক করিবে। বেণুবন বলিতেছে, দখিনহাওয়া তাহার শাখায় শাখায় সুপ্ত গানকে জাগাইয়া তুলুক—

নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তিদোলা করে যে দান।

দীপশিখা মিনতি করিতেছে—

ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে মৃদু মৃদু কও।

এমন সময় ঋতুরাজের আগমন আসন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি চাঁপা-করবীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নাই। মাধবী, শালবীথিকা, বকুল, নদী অভ্যর্থনার ঐকতানে তাঁহার আগমনী জগতে প্রচার করিয়া দিল। দখিন হাওয়া বলিতেছে—

শুক্‌নো পাতা কে যে ছড়ায় ঐ দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে।
ঘর-ছাড়া এ কে বৈরাগী
জানি না সে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্যবনে যায় ঘুরে।...

ছদ্মবেশে কেন খেলো,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো—
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে।

মাধবী-মালতীর 'তুমি কার' এই প্রশ্নের উত্তরে ঋতুরাজ বলিতেছেন—

আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে,
ও মাধবী, ও মালতী।

বনপথের প্রশ্নের উত্তরে ঋতুরাজ বনফুলের সঙ্গে, কৃষ্ণচূড়া বকুল শিরীষ প্রভৃতির সঙ্গে, তাঁহার কি সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। এমনি করিয়া মিলনের হাওয়াটি যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে তখন কবি বলিতেছেন—

'কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়?

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।...বলেইছি তো পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ও-ও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।'

পূর্ণতার মুহূর্তটির চরম লগ্নে ঋতুরাজ বিদায়ের সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। মিলন হইতে বিরহ একধাপ মাত্র, পূর্ণতা হইতে রিক্ততা একধাপ মাত্র, রাজত্ব হইতে সন্ন্যাস একধাপ মাত্র। ঋতুরাজের গায়ের কাপড়খানার কথা স্মরণীয়। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই!' তাঁহার কাছে বিরহ-মিলন খণ্ড নয়, জীবনসত্তার এ পিঠ ও পিঠ মাত্র।

সেখানে মিলনদিনের ভোলাহাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে কথাটি হয় না বলা
সে কথা রয় কানে গো রয় কানে।

কবি যত সহজে, যত আনন্দময় বৈরাগ্যে বিদায়কে দেখিতেছেন সবাই তেমন দেখিতেছে না। ঝুমকো লতা বলিতেছে—

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসি মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।

একদিকে যেমন মিলনপিয়াসি বিদায়ব্যথাতুর ঝুমকোলতা, মল্লিকা প্রভৃতি আছে, অন্যদিকে আকন্দ ধুতুরা ও জবা আছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী।

আকন্দ। এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো।
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো···
ধুতুরা। আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুরের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।···
জবা। ভয় করব না রে
বিদায়বেদনার।'

কবি এখানে প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভেদ দেখাইয়াছেন। আকন্দ ধুতুরা জবা বিদায়ের দুঃখ সত্ত্বেও তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত। আকন্দ ধুতুরা মহাদেবের প্রিয় পুষ্প। ধ্বংসের দেবতার সাহচর্যে বিদায় ও দুঃখে তাহার অনভ্যস্ত নয়। জবা কালীর প্রিয় পুষ্প, ধ্বংসের দেবীর সান্নিধ্যে মৃত্যুতে অশ্রুতে সে অভ্যস্ত। তখন সকলে বিদায়মুহূর্তের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া গাহিতেছে—

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।

মিলনের পূর্ণতার পক্ষে বিচ্ছেদ অত্যাবশ্যক, নতুবা মিলন

খণ্ডসত্তা মাত্র। এই আইডিয়াও রবীন্দ্রকাব্যের একটি অতি পুরাতন ও বনিয়াদী আইডিয়া। 'তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগি হয়ে বেরিয়ে চলেছে।' এ যেন মহারাজ হর্ষবর্ধনের সর্বস্বদানের অন্তে চীরবাস মাত্র আশ্রয়ের মতো। পূর্ণের কাছে ঐশ্বর্যে বৈরাগ্যে, মুক্তিতে বন্ধনে, রাজবেশে কৌপীনে, মিলনে বিরহে, গৃহে ও পথে তিলমাত্র বিরোধ নাই; বসন্ত সেই যথার্থ সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার প্রতীক।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

পূর্বোক্ত দুটি পালাগানের কাঠামো হইতে নটরাজের কাঠামো ভিন্ন; ইহাতে গদ্য নাই, সংলাপ নাই, মানব পাত্রপাত্রী নাই। পুরোভূমিকা ও পটভূমিকায় ভেদ করিবার চেষ্টা নাই। পূর্বোক্ত দুটিতে গদ্য ও গান আছে, এখানে তৎপরিবর্তে কবিতা ও গান। কবিতাগুলি আবৃত্তি করিবার জন্য—অভিনয়কালে স্বয়ং কবি এগুলি আবৃত্তি করিতেন। এই কবিতাগুলিকে ইহার পটভূমিকা বলিলেও বলা যাইতে পারে; এগুলি যেন একাধারে প্রযোজক, ব্যাখ্যাতা ও আদর্শ দর্শকের বক্তব্য।

পূর্বোক্ত পালাগানগুলির সঙ্গে ইহার আরো প্রভেদ আছে। আগের দুটি ছিল একটিমাত্র ঋতুর পালা; শেষবর্ষণে বর্ষা, বসন্তে বসন্ত। নটরাজ অখণ্ড ঋতুচক্রের পালা। পূর্বোক্ত পালাতে ঋতুই প্রধান অভিনন্দনীয় ছিল, এখানে প্রধান অভিনন্দনীয় ঋতুবিশেষ নয়—স্বয়ং নটরাজ, যিনি ঋতুচক্রের ভিতর দিয়া বিশ্বনৃত্য করিয়া চলিয়াছেন।

এই ঋতুচক্রের ভিতরে নটরাজের বিশ্বনৃত্য দর্শন করিবার আশায় বসন্তের আসরে কবি উদ্‌গ্রীব। বিশ্বনৃত্যে নটরাজের সঙ্গী হইয়া যোগ দিতে পারিলে বন্ধন স্খলিত হইয়া মুক্তিলাভ করা যায়; নটরাজ সেই আদর্শ মুক্ত পুরুষ, আর তাঁহার কবি-সঙ্গীরা তাঁহার আদর্শ পরিচয়।—

'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের ইহাই মর্ম।'

নটরাজের এক পদক্ষেপ ঋতুচক্রের মধ্যে, অন্য পদক্ষেপ রসিকের চিত্তে ; এই দুই পদক্ষেপের ছন্দের সমীকরণ কবিজীবনের উদ্দেশ্য, নটরাজের উদ্দেশ্যও হইাই।

নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণভঙ্গী, রঙ্গেশ্বব, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে—যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশষ্পদল ;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কাল-পানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে…
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি।

এখানে লক্ষ্য করিবার মতো দুটি বিষয় আছে। যে কবির কথা বলা হইয়াছে তাঁহার সঙ্গে যোগী ও সাধকের প্রভেদ নাই ; উভয়েরই লক্ষ্য এক, মুক্তি ; তবে সাধনমার্গের তফাত আছে, এই মাত্র।

কবি এই মুক্তির রূপটি দেখিতে চান ঋতুলীলার মধ্যে ; মুক্তি মানুষের জন্যই, কিন্তু তাহার শিক্ষাস্থান ঋতুরঙ্গশালা যেখানে নটরাজ্যের নৃত্য ঋতুর প্রহরে প্রহরে চলিতেছে। কেহ বা এই

মুক্তির রূপ মানুষের মধ্যে দেখিতে পায়, কেহ প্রকৃতির মধ্যে; রবীন্দ্রনাথ প্রধানত প্রকৃতির মধ্যেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; কারণ, রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের সত্যকে প্রকৃতির জীবনে আরোপ করিয়া উপলব্ধি করিতে অভ্যস্ত, ইহাই যেন তাঁহার পক্ষে প্রকৃতিসিদ্ধ।

ঋতুনৃত্যের প্রারম্ভে বৈশাখ। বৈশাখ তপস্বী, তাহার তপের তাপে জগৎ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু এ তপস্যা নীরস নয়, আষাঢ়ের সরসতার ভূমিকা মাত্র। রসোদ্‌বর্তনের পক্ষে, রসোপভোগের পক্ষে তপঃসংযমের প্রয়োজনেই বৈশাখের এই তপঃক্লিষ্ট মূর্তি। এবং

রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্যমাল্য সাঙ্গ হয় সংগোপনে সুন্দরের লাগি।

বৈশাখের রৌদ্রতপস্যার মধেই আষাঢ়ের প্রত্যাশা রহিয়া গিয়াছে।—

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে।

আষাঢ় সন্ন্যাসী। কিন্তু সন্ন্যাসের রূপটিই আষাঢ়ের সমস্ত রূপ নয়। বর্ষা বিরহের ঋতু, আষাঢ়ের একটি বিরহী মূর্তি আছে। ঘরছাড়া এই সন্ন্যাসীর জন্য কোন্ উমা কোথায় যেন বিরহের তপঃশয্যায় দিবসের নিশীথায়িত দীর্ঘ প্রহরগুলি যাপন করিতেছে।

আজি এ বিরহদীপদীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

শ্রাবণ যাইবার সময়ে 'অভিষেকস্নানে' আলোককে সুপ্রসন্ন করিয়া ধরণীর 'নিগূঢ় বক্ষতলে তৃষ্ণার সম্বল' রাখিয়া, মেঘম্লান আকাশকে আলো দিয়া নিকাইয়া নির্মল শুভ্র করিয়া দিয়া, শরতের আসর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।—

আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ।

শরৎ দৈত্যদমন চিরকালের বালক বীর।

মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস,
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তমো রে।

উমার পুত্র কুমারের দৈত্যজয়ের উদ্দেশ্যে জন্ম; শারদার পুত্র শরৎও তেমনি কুয়াসা ও অন্ধকারকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ।

হেমন্ত লক্ষ্মী। 'হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতা' তাঁহার। কবি বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—

স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে···
অমরার স্বর্গ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রানে।
তোমার অমৃতনৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন্ ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি—
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।

এই গেল হেমন্তের একরূপ, আর-এক রূপ হইতেছে—

হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো;
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।

এক দিকে হেমন্তলক্ষ্মী স্বর্গের স্বর্ণকে পক্বশস্যের আশীর্বাদের ভিতর দিয়া পৃথিবীর করগত করিয়াছেন; আবার আর-এক দিকে তিনি

তারার দীপগুলিকে আবৃত করিয়া নিজের দীপে দীপান্বিত হইবার সুযোগ মানুষকে দিয়া থাকেন, মানুষ যাহাতে নিজের আলোয় তামসীকে জয় করিবার গৌরব লাভ করিতে পারে। হৈমন্তী বিশেষ ভাবে মানুষেরই লক্ষ্মী, স্বর্গের নহেন।

শীত রুদ্র সন্ন্যাসী। তাঁহার নির্দেশ কী?

জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো, এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল পুষ্পের দুঃসাহস।

কিন্তু বিনাশের রূপ সন্ন্যাসীর সবটা নয়, ইহা নবতর জীবনের ভূমিকা মাত্র—

হে নির্মল
সংশয়-উদ্‌বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল;
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা।
…বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি, সে শূন্য তোমারি আয়োজন।

বসন্তের সূচনা শীত; তপস্যা যৌবনরসেরই ভূমিকা মাত্র। তপস্বী সন্ন্যাসীকে

কুন্দ মালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন।
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র, এবারে বরবেশে তারে করো গো ধন্য।

কারণ, শীতের ধরণী তপস্বিনী, সে উমা; শীতের সন্ন্যাসীই

বসন্তের বরবেশে তপোবনপ্রান্তে উপস্থিত, সে নবযৌবনকান্ত, সে মহাদেব।[১]

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন, বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধরো ভুবনমোহন নব বরবেশে।
তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ—
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ তোমার উদ্দেশে।

বসন্তের এই মিলন ক্ষণস্থায়ী, কারণ মিলন ও বিরহ মিলিয়াই প্রেমচক্রের সম্পূর্ণতা। বিরহ দুঃখের বটে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ নয়।

ফুরায় ফুল ফোটা, পাখিও গান ভোলে,
দখিনবায়ু সেও উদাসি যায় চলে।
তবু কি ভরি তারে
অমৃত ছিল না রে।
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি।

এই ক্ষণস্থায়ী মিলন স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে-- দোলের স্মৃতি। যে-দোলায় বসন্ত ধরণীকে লইয়া দুলিতেছেন, সেই দোলরজ্জুর এক প্রান্ত আবদ্ধ স্বর্গে, এক প্রান্ত মর্ত্যে ; এক প্রান্ত মানুষের ঘরে, আর-এক প্রান্ত প্রকৃতিতে—

সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্যে দোলে ছন্দভরে।

স্বর্গ মর্ত্য, প্রকৃতি মানুষ, সকলকে দোলের প্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়া বরবধূর মধুর মিলনদোল চলিয়াছে।

লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে, বিরহিণীর মনে।

১ শরতের রূপে কুমারের রূপক ; বসন্তের রূপে উমা-মহাদেবের রূপক ; কুমারসম্ভবের আইডিয়াটি বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার মতো আর কোনো কাব্য বোধ করি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে প্রভাবিত করে নাই।

এই দোলের আনন্দে তাল রাখিয়া নিখিল যোগ দিয়াছে। 'মাধবী তাই আসিল সেজে', মানুষও আসুক।

এসো গো পীত বসনে সাজি,
কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক্ বয়ে।

মানুষে প্রকৃতিতে, সংসারে সংসারাতীতে, কবিতে যোগীতে দোলের প্লাবনে সব ভেদ ঘুচিয়া একেবারে একাকার হইয়া গেল। এই নিখিলপ্লাবী দোললীলার উৎসবতরঙ্গে কবি নিজের চিত্তকে ভাসাইয়া দিতে উদ্‌গ্রীব।

অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হল।

কেন এই নিখিলব্যাপী বিশ্বনৃত্যের আয়োজন, ইহার সঙ্গে কবিরই বা কেন যোগ দিবার উৎকণ্ঠা? 'অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।'

এইরূপে ঋতুচক্রের আবর্তনের ভিতর দিয়া নটরাজের নৃত্যলীলা সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু শেষ হইল না। এ লীলা অফুরন্ত, নূতন বৎসরের আভাস দিয়া পালাগানখানির পরিসমাপ্তি।

নবীন

নবীন বসন্ত-আগমনীর পালাগান। ইহাতেও পটভূমিকা ও পুরোভূমিকার পর্যায় আছে। গদ্য আছে, তবে তাহা মানব পাত্রপাত্রীর মধ্যে সংলাপরূপে নহে, একজন মাত্র বলিতেছেন, অভিনয়কালে কবিই বলিতেন; নটরাজে কবিতার যে দায়িত্ব এখানে তাহা গদ্যাংশের।

ইহার ভাব-উপজীব্য 'বসন্ত' পালাগানেরই অনুরূপ; কতকগুলি গানও উহা হইতে গৃহীত।

শ্রাবণগাথা

এ পালাগানটির কাঠামো শেষবর্ষণের মতোই সমুখের ও পিছনের ভূমিকায় বিভক্ত। রাজা, নটরাজ, সভাকবি প্রভৃতি মানব পাত্রপাত্রীর মধ্যে গদ্যসংলাপ আছে। রাজা ও নটরাজ দুজনে মিলিয়া আদর্শ দর্শক ও ব্যাখ্যাতা; সভাকবি যেন প্রাকৃতজনের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন।

ইহার ভাব-উপজীব্য বা তত্ত্ব নূতন নয়। বৈশাখের রুদ্রমূর্তিই পরিণামে শ্রাবণের রসিক বরবেশে তপস্বিনী ধরণীর পাণিপ্রার্থিরূপে উপস্থিত, এবং তাঁহাদের মিলনের বাসরঘরের প্রান্তে বালক শরতের আবির্ভাব।[১]

ঋতুনাট্যের নৃত্যের সঙ্গে নৃত্যনাট্যের নৃত্যের একটা প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঋতুনাট্যে রসোদ্‌বোধনের বহু পন্থার মধ্যে নৃত্য একটি প্রধান পন্থা সংগীত, নৃত্যকে বাদ দিলেও রসের একেবারে হানি হইত না। নৃত্যনাট্যে নৃত্যই প্রধান পন্থা; তাহাকে বাদ দিয়া রসোদ্বোধন একেবারেই অসম্ভব; অন্য কথায় বলিতে গেলে, নৃত্যনাট্যে নৃত্য যেমন অপরিহার্য, ঋতুনাট্যে সেরূপ নহে; ঋতুনাট্যে নৃত্য নটরাজের লীলাকে প্রকাশের উপায় মাত্র, কিন্তু নৃত্যানাট্যে নটরাজ ও নৃত্য অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

---

১ আবার কুমারসম্ভবের রূপক ও আইডিয়া

তত্ত্বনাট্য

এই পর্যায়ে আলোচিত নাটকগুলিকে তত্ত্বনাট্য বলা হইয়াছে। যতদূর জানি আগে এ নাম ব্যবহৃত হয় নাই; এখন এ নাম কেন ব্যবহার করিলাম সে বিষয়ে কিছু বলিয়া লওয়া আবশ্যক। এই পর্যায়ের নাটকগুলিকে নানা জনে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রূপক, সাঙ্কেতিক, প্রতীকী, সমস্যামূলক প্রভৃতি বিচিত্র নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিলেই দেখা যাইবে ইহাদের কোন একটি নামের দ্বারা সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতিবর্ণনা সম্ভব নয়। ইহাদের কোন কোন নাটক রূপক (আংশিক রূপক), কোন কোন নাটক প্রতীকী বা সাঙ্কেতিক এবং কোন নাটককে সমস্যামূলক বলা চলে সত্য কিন্তু তাহাতে নাটকবিশেষের প্রকৃতিমাত্র প্রকাশ পায়, সমগ্র পর্যায়ের প্রকৃতি প্রকাশ পায় না। এই অসুবিধার জন্যই সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারে এমন একটি সামান্য বা সাধারণ নামের অভাব অনুভব করিতে থাকি। 'তত্ত্বনাট্য' সেই অভাব দূর করিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কোন নাটক রূপক, প্রতীকী বা সমস্যামূলক যেমনি হোক, তাহা যে তত্ত্বপ্রধান সন্দেহ নাই। ইহাই এই শ্রেণীর নাটকের সামান্য বা সাধারণ লক্ষণ। প্রকৃতির প্রতিশোধ বা মুক্তধারাতে পার্থক্য যতই হোক, দু'য়ের মধ্যেই তত্ত্বের প্রাধান্য অবিসংবাদী। আবার ফাল্গুনী ও কবির দীক্ষায় পার্থক্য যতই প্রকট হোক—দু'য়ের ঘনিষ্ঠতা তত্ত্বের প্রাচুর্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বের প্রকটতা ও প্রাচুর্য এইসব নাটকের শ্রেণীলক্ষণ।

আরও একদিক হইতে বিচার চলিতে পারে। মুক্তধারা ও প্রায়শ্চত্তের মধ্যে গল্পসূত্রের মিল আছে, কোন কোন চরিত্রও দুই নাটকে অভিন্ন, তৎসত্ত্বেও নাটক দু'টি যে ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ প্রায়শ্চিত্তে কাহিনীর প্রাধান্য আর

মুক্তধারায় প্রাধান্য তত্ত্বের। রাজা ও রাণীর রূপান্তর তপতী; কিন্তু তপতীকে তত্ত্বনাট্যপর্যায়ের মনে করা চলে না, তত্ত্ব ওখানে কাহিনীকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই, যদিচ কাছ ঘেঁষিয়াই গিয়াছে।

এই শ্রেণীর নাটকগুলি পড়িলেই বা অভিনয়কালে দেখিলেই পাঠক বা দর্শকের মনে এই বোধ জন্মিবে যে, কাহিনী এখানে পুরোভাগে স্থাপিত হইলেও প্রাধান্য তাহার নয়, কাহিনীর পশ্চাতে যে তত্ত্বটি বিরাজ করিতেছে তাহাই মুখ্য, শিখণ্ডীর অন্তরালস্থিত অর্জুনের মতো তাহারই নিশিততম বাণটি পাঠকের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এখন তত্ত্বরূপই যদি ইহাদের প্রধান রূপ হয়, তবে সেই প্রাধান্যের দ্বারাই ইহাদের পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আবার নূতন নামের আমদানী কেন—পুরাতন একটা দিয়া কি কাজ চলিতে পারে না? কেন চলিতে পারে না অংশতঃ আগেই বলিয়াছি। রূপক, সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী কোন নামের দ্বারাই সমগ্রের রূপ প্রকাশ পায় না। সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী বলিতে মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রথের রশিকে বুঝায়, এমন কি অচলায়তনকেও বুঝাইতে পারে—কিন্তু আর কোনটির বেলায় কি ঐ নাম খাটিবে? রূপক বলিতে রাজা ও ডাকঘরকে বুঝাইতে পারে (আমার মতে আংশিক রূপক মাত্র); কিন্তু শারদোৎসব ও প্রকৃতির প্রতিশোধের বেলায় কি হইবে? সমস্যা নাটক-ব্যবহারেও ঐরূপ অসম্পূর্ণতা দোষ দেখা দিবে। এইসব বিষয় বিচার করিয়াই আমাকে একটি সামান্য নাম অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে—তত্ত্বনাট্যের চেয়ে যোগ্যতর নাম খুঁজিয়া পাই নাই, নামটি গদ্যগন্ধী হইতে পারে, অতিরিক্ত পরিমাণে বাস্তবঘেঁষা হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র শ্রেণীটির রূপটিকেও প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। 'তত্ত্বনাট্য' বলিতে তত্ত্বপ্রধান এক শ্রেণীর নাটককে বুঝি, আরও বুঝি যে ইহা কাহিনীপ্রধান নাটক হইতে ভিন্ন গোত্রের রচনা, সেই সঙ্গে আরও

বুঝি যে এক শ্রেণীর মধ্যে উপশ্রেণীগত প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, তত্ত্বনাট্যের বেড়াজালে সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদই ধরা পড়িবে; কি এবং কি নয় এবং কোন্ কোন্ সূক্ষ্ম প্রভেদ ইহার অন্তর্গত প্রভৃতি অনেক রহস্যই নামটিতে প্রকাশ পায়। এইসব কার্যকারিতাই এই নামটির যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

২

পর্ববিভাগ—

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যগুলিকে তিন পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

দ্বিতীয় পর্বে শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর।

এবং তৃতীয় পর্বে ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ এবং কবির দীক্ষা।

প্রথম পর্ব। প্রকৃতির প্রতিশোধের প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল, তখন কবির বয়স তেইশ বৎসর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ ছাড়া এই পর্বে রচিত আর কোন নাটককে কিংবা আর কোন রচনাকে তত্ত্বপ্রধান বলা চলে না। বরঞ্চ বিসর্জন, রাজা ও রানী এবং কাব্যনাট্যগুলি আকৃতি ও প্রকৃতির বিচারে ঠিক তত্ত্বনাট্যের বিপরীত। এই যুগটাতে রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডিতে, প্রহসনে, ছোট গল্পে ও উপন্যাসে কাহিনীবিন্যাস ও সজীব বাস্তব চরিত্রসৃষ্টিকেই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধে নাটকের যে আকৃতি ও প্রকৃতি দৃষ্ট হয় তাহা নিঃসঙ্গ, তাহার কোন দোসর এ পর্বে মেলে না। এরকম ক্ষেত্রে এই সময়টাকে তত্ত্বনাট্যের প্রথম পর্ব বলা যায় কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির প্রতিশোধ পরবর্তী কালের তত্ত্বনাট্যসমূহের পূর্বাভাস, নিঃসঙ্গ এই নাটকখানি নিঃসঙ্গ

সন্ধ্যাতারকার মতোই আসন্ন তারকারাজির অগ্রদূত। তবু ইহার গুরুত্ব সমধিক এই কারণে যে কবির মতে এই নাটকখানার মধ্যেই তাঁহার জীবনতত্ত্বের বীজ নিহিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতির প্রতিশোধে কবির জীবনতত্ত্ব বীজের চেয়ে অধিক প্রকট নয়। ইহা নাট্যাকারে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে অনেক পরে—যে সময়টাকে তত্ত্বনাট্যের দ্বিতীয় পর্ব বলিয়াছি।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ১৯০৮ সালে যখন শারদোৎসব নাটক প্রকাশিত হয়, তখন কবির বয়স সাতচল্লিশ বৎসর। এই সময়টা রবীন্দ্র-জীবনে নানা কারণে বিশেষ অর্থপূর্ণ। কবির জীবন ও প্রতিভা তখন মোড় ঘুরিবার মুখে। এটাকে তাঁহার পূর্ণতর বিকাশের প্রস্তুতির সময় বলা যাইতে পারে। নাটকের ক্ষেত্রে দেখি যে তিনি প্রচলিত ধরনের ট্র্যাজেডি ও প্রহসন লেখা ত্যাগ করিয়াছেন—অথচ তখনও তিনি নাট্যরচনার স্বকীয় রীতিটির পুরাপুরি সন্ধান পান নাই; যেমন নাট্যবিষয়ে তেমনি রচনার অন্য শাখা সম্বন্ধেও বটে—একই সত্য প্রযোজ্য। ক্ষণিকা ও কল্পনার পালা অনেককাল শেষ হইয়া গিয়াছে—অথচ গীতাঞ্জলি তখনো রচিত হয় নাই, মাঝখানে আছে খেয়া। খেয়ার সঙ্গে নৈবেদ্যকে জড়িত করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, নৈবেদ্যে যে পরিবর্তনের সূচনা খেয়ায় তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—যদিচ এখনো আমরা গীতাঞ্জলি পর্বের দেখা পাই না। নৈবেদ্য কাব্যের আকৃতিটা পূর্বতন রীতির সাক্ষ্য দেয়—প্রকৃতিতে তাহা পরবর্তী কালের সূচক। খেয়া কাব্যের স্বল্পভাব ভূষণবিরল সন্ধ্যাক্লান্ত ছন্দে ও শিল্পে আসন্ন পরিবর্তনকে অত্যাসন্ন বলিয়া জানাইয়া দেয়। খেয়া কাব্য পূর্বতন ও পরতন আত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্যে খেয়া পারাপার করিতেছে। ঠিক এই সময়টাতে তিনি পুনরায় তত্ত্বনাট্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

গঠনরীতির বিচারে এগুলি প্রকৃতির প্রতিশোধের চেয়ে অনেক ঘনপিনদ্ধ। প্রকৃতির প্রতিশোধে যে তত্ত্ব নীহারিকারূপে অস্পষ্ট ও

অদৃশ্যভাবে বিরাজমান এখানে তাহা অনেক প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল, আর বিশ্বপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির প্রায় সমকক্ষ। বিসর্জন এবং রাজা ও রানীর মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে। শিল্পহিসাবে গীতাঞ্জলি প্রভৃতির যে লক্ষণ ও ধর্ম, রাজা, ডাকঘর ও শারদোৎসবেরও প্রায় সেই লক্ষণ ও ধর্ম—এমনকি অচলায়তনের নাট্যবিষয় কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তাহাকেও অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করিতে আদৌ বেগ পাইতে হয় না। সেকালে রবীন্দ্রনাথের যাঁহারা বিরূপ সমালোচনা করিতেন, রূপান্তরে তাঁহারাও এই সত্যটি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে খেয়া, গীতাঞ্জলি, ডাকঘর ও রাজা সমান দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছিল। কবির জীবনে সহজবোধ্য শিল্পের যুগ চলিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পর্বে পাই অনেক কয়খানি নাটক। ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ ও কবির দীক্ষা। ফাল্গুনীর রচনাকাল ১৯১৬, তখন কবির বয়স পঞ্চান্ন বৎসর।

এই পর্ব সম্বন্ধে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথম, বলাকা যেমন কবির প্রতিভার মোড় ঘুরিবার আর একটা সময়, ফাল্গুনীও তাহাই। বলাকা ও ফাল্গুনীকে একত্র বিচার করিতে হইবে। যথাস্থানে তাহা করিয়াছি, এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বনাট্যগুলি এই পর্বে লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বনাট্য কোন্‌খানা, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে মতভেদ হইবে। আমার নিজের ধারণা, তত্ত্বনাট্য হিসাবে মুক্তধারাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এ লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া লাভ নাই।

আর এই পর্ব সম্বন্ধে তৃতীয় সাধারণ লক্ষণ এই যে, এ সময়কার নাটকগুলি মাত্র নয়, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি প্রায় সমুদায় শ্রেণীর রচনাই তত্ত্বভারাক্রান্ত এবং সেই কারণেই অনেক পরিমাণে সূক্ষ্মশরীরী হইয়া উঠিয়াছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, নাটকে ব্যতিক্রম নটীর

পূজা, উপন্যাসে ব্যতিক্রম যোগাযোগ। সচেতন তত্ত্বশিল্পের স্পর্শ ইহাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই, পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে এ দুটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু এই জাতীয় ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে যে, এই পর্বের প্রায় সমস্ত রচনাই, কেবল নাটক নয়— তত্ত্বপ্রকাশকেই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কবির তেইশ বৎসর বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধে যাহার সূচনা দেখিয়াছিলাম কবির শেষ জীবনে আসিয়া তাহা যেন সর্বব্যাপী। মাঝখানে অনেক ব্যতিক্রম, অনেক বিপরীত স্বভাবকে তাঁহার অতিক্রম করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন, তাহাও তেমনি সত্য।

৩

এবারে তত্ত্বনাট্যগুলিতে আলোচিত বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহাতে তত্ত্বনাট্যের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মনীষার ব্যাপকতা সম্বন্ধেও একটি ধারণা জন্মিবে—সেই সঙ্গে দেখিতে পাইব রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন পর্বে নূতন নূতন সমস্যাকে কিভাবে শিল্পবস্তুতে পরিণত করিতে এবং স্বভাবতঃ দুরন্বয় তত্ত্ব ও শিল্পের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার সার্থক অনুধাবনের ফলে তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ দু'জনারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তত্ত্বনাট্যগুলিতে আলোচিত সমস্যাসমূহকে নির্গলিত করিয়া লইলে তিনটি মূলসমস্যায় গিয়া দাঁড়ায়। সে তিনটি বিষয় এই—

(১) মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্ক
(২) মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক
(৩) মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক

এইসব সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিবিষয়ে সকলে একমত হইবেন এমন আশা করা অন্যায়, দৃষ্টির গভীরতা সম্পর্কেও দ্বিমত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান, যেসব ক্ষেত্রে সমাধানের ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহাও কাহাকেও স্বীকার করিয়া লইতে বলি না —কিন্তু একটি প্রসঙ্গে সকলকেই বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় একমত হইতে হইবে, সেটি তাঁহার চিন্তাক্ষেত্রের সর্বময় ব্যাপকতা। প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিনটি সত্তা লইয়াই জগৎ গঠিত, দেখিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎও তাহার সমব্যাপক। ব্যাপ্তির অসীমতাই, কেবল এ ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রমনীষার প্রধান লক্ষণ। অনেকে বলিতে পারেন যে, ব্যাপ্তিতে ন্যূনতা ঘটিয়া গভীরতায় বাড়িলে আরও ভালো হইত। কিন্তু 'আরও ভালোর' মরীচিকা-শিকারে আমাদের আসক্তি নাই, তাহাতে কদাচিৎ সুফল পাওয়া যায়।

তত্ত্বনাট্যের প্রথম পর্বে একটি মাত্র রচনা আছে—প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই রচনাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ সচেতন, তাঁহার এই সচেতনতার উপরে আমরাও জোর দিয়াছি—এবারে তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই অপরিণত রচনাটির মধ্যে, বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি থাকে সেইভাবে তিনটি তত্ত্বই নিহিত। সমস্তই অপরিণত, সমস্তই অস্পষ্ট এবং খুব সম্ভব সমস্তই কবির অজ্ঞাত, কিন্তু সমস্তই যে বিদ্যমান সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী তত্ত্বজগতের চতুষ্পথের মোড়ে দণ্ডায়মান। সে নিজেকে ভগবানের সহিত, প্রকৃতির সহিত এবং মানুষের সহিত সমসূত্রে রাখিয়া বিচার করিয়াছে। সিদ্ধিজনিত অহঙ্কারে সে এমনি মত্ত, এমনি অন্ধ যে সে নিজেকে তিনটি সত্তার চেয়েই প্রবলতর কল্পনা করিয়াছে। ভগবদুল্লেখ বিশেষ নাই, করিবার সে আবশ্যকবোধ করে নাই, সে যখন সিদ্ধপুরুষ, তখন সে তো

ভগবানের সমকক্ষ, সমকক্ষের উল্লেখ কে কবে করিয়া থাকে। আর প্রকৃতি ও মানব তাহার নির্জিত, নির্জিতের উল্লেখে গৌরব আছে, তাই বারংবার তাহাদের উল্লেখ সে করিয়াছে।

যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
পেয়েছি, পেয়েছি সেই আনন্দ আভাস।

অর্থাৎ এখন সে মহাদেবের সমকক্ষ। আর—

কি কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসি প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে।

অর্থাৎ এক সময়ে সে প্রকৃতির অধীন ছিল, এখন সে স্বাধীন; বুঝি শুধু স্বাধীন নয়, প্রকৃতিই যেন তাহার অধীন।

আর মানুষ সম্বন্ধে—

এ কি ক্ষুদ্রধরা! এ কি বদ্ধ চারিদিকে···
এই কি নগর! এই মহারাজধানী!
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা।

কি অসীম অবজ্ঞা! কি বিবিক্ত অনুকম্পা!

এই তিন তত্ত্বসূত্রের টানাপোড়েনের পরিণাম প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্বক্ষেত্রে আছে—এখানে শুধু এইটুকু বলিবার ইচ্ছা যে, তাঁহার পরবর্তী সমস্ত তত্ত্বনাট্যের মূলতত্ত্বগুলি প্রথম তত্ত্বনাট্যখানিতেই বীজাকারে বর্তমান।

দ্বিতীয় পর্বে চারখানি নাটক পাই, শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর ও অচলায়তন। নাটক চারখানাকে যদি তিন ভাগে সাজাই তবে দেখিতে পাইব যে, ইহাদের মধ্যে মূলতত্ত্বগুলি সবই দেখা দিয়াছে।

শারদোৎসবে মানুষের সহিত প্রকৃতির, রাজা ও ডাকঘরে মানুষের সহিত ভগবানের এবং অচলায়তনে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের বিচার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

প্রকৃতি মানুষের উদ্দেশ্যে অসীম ঐশ্বর্য, অগাধ সম্পদ্ ঢালিয়া দিতেছে, মানুষকে তাহা কেবল গ্রহণ করিলেই চলিবে না, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা, দুঃখসহনের দ্বারা প্রকৃতির দানের প্রতিদান দিতে হইবে—এ ঋণশোধের পালা এমনি আনন্দময় যে তাহাতেই শারদোৎসবের প্রাণ। আর এই দান-প্রতিদানের সমবায়ে মানুষ ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতর হইয়া একাত্মতর ও পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাই শারদোৎসব তত্ত্বনাট্যের নির্গলিত মর্ম।

রাজা ও ডাকঘরে মানবহৃদয়ের সহিত ভগবানের সম্বন্ধবিচার। নাটক দু'খানিতে যাঁহাকে রাজা বলা হইয়াছে তিনি ভগবান ছাড়া আর কেহ নহেন, আর সুদর্শনা ও অমল স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মানবহৃদয়ের প্রতিনিধি।

অচলায়তনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এখানে আর মানুষে ভগবানে কিংবা মানুষে প্রকৃতিতে সম্বন্ধবিচার নয়—এখানে বিচার মানুষে মানুষে সম্বন্ধের—বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জনসঙ্ঘের মধ্যে সংঘাত এখানে বিচার্য বিষয়; অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সভ্যতার সঙ্কটরচনায় বেদনার Last Testament প্রকাশিত হইয়াছে—অচলায়তন নাটক তাহারই পূর্বসূত্র। আরও আগের কোন রচনাতে এ সূত্রের সন্ধান মিলিলেও মিলিতে পারে—কিন্তু অচলায়তনে তাহা প্রথম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রথম শিল্পমূর্তি লাভ করিয়াছে। প্রথম বলিলাম এইজন্য যে, পরে এই সমস্যাটিকে আরও ব্যাপকভাবে আরও গভীরভাবে তিনি একাধিক নাট্যরূপ দিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার তৃতীয় পর্বের প্রায় সমস্ত নাটকে এই তত্ত্বটিই মূল উপজীব্য। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বর্তমান যুগে মানুষে মানুষে সংঘাতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সভ্যতার সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যাটি বা সমস্যাটির বিশেষ রূপটি কবিকে শেষজীবনে সবচেয়ে ব্যথিত, সবচেয়ে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। কবিতায়, প্রবন্ধে এবং নাট্যাকারে এই বেদনা ও

সংবেদনকে তিনি বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, কবির দীক্ষা, তাসের দেশ সমস্তই এই তত্ত্বের বাণী-বেদনামূর্তি। ফাল্গুনী নাটকখানাতেও অংশতঃ এই তত্ত্ব—কিন্তু আরও কিছু আছে—সেই আরও কিছুর জন্যই তাহার স্থান একটু বিচিত্র।

ফাল্গুনীতে কবির ব্যক্তিগত যৌবন (ভূমিকায় কথিত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজার যৌবন), প্রকৃতির যৌবন (গীতিভূমিকায় কথিত) এবং মানবসমাজের যৌবন (মূলনাটকে কথিত)—এই তিন যৌবনের সমস্যা জড়িত। অর্থাৎ এই নাটকে কবিব্যক্তি, প্রকৃতি ও মানবসমাজ এক সমস্যার গ্রন্থিতে যুক্ত। কালে কালে লোকে লোকান্তরে যৌবনের জয়—ফাল্গুনী গীতিনাট্যের বিষয়। রূপান্তরে ইহাই অচলায়তন এবং তাসের দেশেরও ভাব-উপজীব্য। অচলায়তনে অন্য দেশাগত শোণপাংশু বা যূণক (যুবক) জাতির আঘাতে অচলায়তন ধ্বংস হইয়াছে। তাসের দেশে অন্য দ্বীপাগত যুবক রাজপুত্রের প্রভাবে তাসের দেশের জড়বৎ নরনারী মানবীয় যৌবনে জাগিয়া উঠিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। ফাল্গুনীতে যাহা সাধারণভাবে কথিত, অচলায়তনে ও তাসের দেশে তাহা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—ফাল্গুনীতে জয় যৌবনের—আর অন্য দুইখানি নাটকে জয় যুবক জাতির, যুবক রাজপুত্রের। ইহা ঠিক সভ্যতার সঙ্কট নয়, কিন্তু তাহারই প্রায় ধার-ঘেঁষা, মানুষের যৌবনের সঙ্কট, তিনখানিতেই মানুষের যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে।

মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সভ্যতার সঙ্ঘর্ষ বা সভ্যতার সঙ্কটবিষয়ক নাটক। শেষের দু'খানা নাটক হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও মূলভাবের বাহন হিসাবে বিশেষভাবে বিচার্য। ইহাদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ করা চলে। মুক্তধারা ও রক্তকরবী একত্র বিচার্য, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সগোত্র। প্রথম দু'খানিতে সভ্যতার সঙ্কটের বিশেষ একটা দিক চিত্রিত, শেষের দু'খানিতে সভ্যতার সঙ্কটের সাধারণ চিত্র।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে সভ্যতার সঙ্কট দৃষ্ট হইতেছে তাহার মূলগত কারণ যন্ত্রবাদের অতিচার ও অতিপ্রসার। যন্ত্রজাত সভ্যতা মানবজীবনের মুক্তধারাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, মানবের স্বরূপকে জটিল জালের আড়ালে ফেলিয়া তাহাকে খণ্ডিত ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন মুক্তধারাকে নির্বাধ করিবার উপায় কি? খণ্ডিত ও বিকৃত মানুষকে জালের রাহুকবল হইতে উদ্ধারের উপায় কি? অভিজিৎ ও রঞ্জন সেই উপায় দেখাইয়া দিয়াছে। যন্ত্রকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিয়া প্রাণের বিনিময়ে মুক্তধারাকে ও মানুষকে মুক্তিদান করিতে হইবে। যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রেরই জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাই যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যন্ত্র ধ্বংস না হইয়া কেবলি আপন শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে, অস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অস্ত্রের ধ্বংসকারিতা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, মানুষের মুক্তির উপায় আর চোখে পড়িতেছে না। ইহা মুক্তির পথ নহে।

রবীন্দ্রনাথ যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র। রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন রাম, যন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী তেমনি প্রাণ। তাহাতে প্রাণের আপাতবিনাশ হইলেও যন্ত্রের যে সমূলে বিনাশ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিজিৎ মরিয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তধারাও তেমনি মুক্তিলাভ করিয়াছে। রঞ্জন মরিয়াছে বটে, কিন্তু রাজাও তেমনি জালায়ন হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। যন্ত্র বনাম প্রাণ—ইহাই রবীন্দ্রনাথের সমাধান। এখানেই গান্ধীজির আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাম্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যাহা রক্তকরবী, গান্ধীজির ক্ষেত্রে তাহাই চরকা—দুই-ই Symbol বা প্রতীক; দুর্জয় যন্ত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অজেয় মানব-শক্তির প্রতীক। ইঁহারা আপাত প্রচণ্ড শক্তিমানের বিরুদ্ধে দৃশ্যতঃ দুর্বলকে উপস্থাপিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, যেমন করেন নাই আদিকবি বাল্মীকি রাবণের সম্মুখে রামকে উপস্থিত করিতে।

মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে সভ্যতার বর্তমান সঙ্কটের সমাধান আছে এমন মনে করিবার কারণ নাই, সভ্যতার যন্ত্রজাত সঙ্কটই প্রদর্শিত হইয়াছে—আর প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মুক্তির পথটা। কবি বলিতে চাহিয়াছেন মুক্তি যখনই আসুক, যেভাবেই আসুক—ঐ প্রাণের পথেই আসিবে, বৃহত্তর যন্ত্রের পথে নয়, প্রচণ্ডতর অস্ত্রের পথে নয়। তাঁহার মতে শেষ পর্যন্ত প্রাণেরই জয় ঘোষিত হইবে, অচলায়তনে, ফাল্গুনীতে ও তাসের দেশে যেমন যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে। এসব স্থানে যৌবন ও প্রাণ মূলতঃ সমার্থক। যাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া প্রাণের জয় ঘোষিত হইয়াছে তাহারা সকলেই যুবক; পঞ্চক (অচলায়তন), রাজপুত্র (তাসের দেশ), জীবন সর্দার (ফাল্গুনী), অভিজিৎ (মুক্তধারা) এবং রঞ্জন (রক্তকরবী) সকলেই যুবক। জলের সঙ্গে জলের ফেনার যে সম্পর্ক, প্রাণের সঙ্গে যৌবনের সেই সম্পর্ক—যৌবন প্রাণবন্যার ফেনা।

কালের যাত্রার রথটা ইতিহাস, আর যে রজ্জুর টানে ইতিহাস চলে তাহা রথের দড়িটা। এতদিন ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও ধনিকদের টানে রথ চলিয়াছে—কিন্তু এখন আর সে টান যথেষ্ট নয়—রথ আর চলিতেছে না—এবারে শ্রমিকের টান আবশ্যক। এ তো স্পষ্টতঃ যুগসমস্যা। কিন্তু শ্রমিক যদি ভাবিয়া বসে যে রথ চালাইবার ভার একমাত্র তাহারই উপরে—তবে রথ আবার অচল হইয়া পড়িবে। এই শেষেরটুকুই কবির সতর্কবাণী, যদিচ কেহ শুনিবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কবির দীক্ষায় ইউরোপ ও ভারতের অবস্থাবৈষম্যে তাহাদের ভাববৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইউরোপ অর্জন করিতেই জানে—ত্যাগ করিতে জানে না, ভারত ত্যাগ করিতে চায় বটে—কিন্তু যে উপার্জন করে নাই, সে ত্যাগ করিবে কি? এখন এই ঐতিহাসিক হেরফের ঘুচাইবার উপায়, কবির মতে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই বাণী। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে যদি হয়, তবে ভারতকে প্রথম

ঐশ্বর্য-উৎপাদনের দীক্ষা লইতে হইবে, দরিদ্রের আবার ত্যাগ কোথায় —আর ইউরোপকে ত্যাগের দীক্ষা লইতে হইবে, কেন না, তাহার সঞ্চিত ধন মুক্তির পথ পাইতেছে না বলিয়া—ক্রমেই অধিকতর গুরুভার হইয়া তাহার অস্তিত্বকে নিষ্পেষিত করিতেছে—ইউরোপের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত সেই আর্তনাদ মানুষের ইতিহাসকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। কবির দীক্ষা এই যে, ইউরোপ ও ভারত ভোগ ও ত্যাগের হেরফের ঘুচাইয়া—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—এই ব্রতবাণী গ্রহণ করুক।

৪

এখানে একটা বিষয়ের আলোচনা সারিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এডওয়ার্ড টমসন-লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থের শেষাংশে একজন বাঙালী সমালোচকের একখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।[১]

এই অজ্ঞাত সমালোচক তাঁহার সমগোত্রীয় রসবোদ্ধাদের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি সাজিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত ভারতীয় সাহিত্যের নাড়ির যোগ নাই, এমনকি

১ Appendix A. 315-316, *Rabindranath Poet and Dramatist*—by Edward Thompson, 2nd Ed., 1948.

এই প্রসঙ্গে একটা ঋণ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভারতীয় ও বিদেশীয় ভাষায় যতগুলি বই লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে বর্তমান বইখানাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিলে অন্যায় হইবে না। একথা এখানে না বলিলেও চলিত—কিন্তু টমসনের বই প্রথম প্রকাশের সময়ে বাঙালী পাঠক-সমাজ ইহাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করে নাই,—বরঞ্চ বিপরীত মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছিল। কেন, জানি না। আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী, স্বভাষাভাষী হইয়াও যাহা পারিলাম না, একজন বিদেশী তাহাই করিল—এই সূক্ষ্ম ঈর্ষা-বোধবশতঃই কি? প্রথম অভিনন্দনের কাল বহুদিন গত সত্য, কিন্তু বিলম্বিত অভিনন্দনের কাল কখনো যায় না। এতদিন পরে, প্রথম সুযোগে সেই বিলম্বিত অভিনন্দন সারিয়া লইলাম।

ভাষাটাও বাঙালীর দুর্বোধ্য—তাঁহার মতে রবীন্দ্রসাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়।[১]

আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগটি কতদূর সত্য ?

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে একটা সময় ছিল যখন এই শ্রেণীর রসবোদ্ধাগণ কবি বা সাহিত্যিক কিছুই নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিত। এ পর্ব কিছুকাল চলিয়াছিল। তারপর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির ফলে রবীন্দ্রনাথের যখন জগৎজোড়া খ্যাতি—তখন তাহারা সুর বদল করিল। কবি বা সাহিত্যিক নয় একথা বলিতে তখন তাহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বাধিত—কাজেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির দল নূতন যুক্তির অবতারণা করিল—রবীন্দ্রসাহিত্য অভারতীয়, দেশের প্রাণবস্তুর (?) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাড়ির যোগ নাই—এই হইলে রবীন্দ্রবিদূষণার পরবর্তী স্তর। টমসন-উল্লিখিত পত্রখানি সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি।

রবীন্দ্রসাহিত্য কি সত্যই অভারতীয়, সত্যই দেশের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে তাহার নাড়ির যোগ নাই ? বিচারে নামিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মতোই রবীন্দ্রসাহিত্য একান্তভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে ভারতীয় জীবন হইতে উদ্ভূত, ভারতের সভ্যতার সঙ্গে জড়িত—এবং ঠিক সেই কারণেই বিশ্বের আদরণীয় বস্তু। বর্তমান ক্ষেত্রে সম্যক্ রবীন্দ্রসাহিত্যবিচারের অবকাশ নাই, কেবল তত্ত্বনাট্যগুলিরই বিচার চলিতে পারে। তাহাই করিব, আর দেখাইতে চেষ্টা করিব যে আপাত অভারতীয়ত্ব সত্ত্বেও রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যগুলির মূলতত্ত্বসমূহ অভারতীয় তো নয়ই বরঞ্চ একান্তভাবে ভারতীয়। দেশের মর্মবাণী মহাকবিগণকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়—ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচারী সমালোচক তাহা জানিবে কি প্রকারে ?

১ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সংস্কারের দ্বারা সমালোচনা যে কতদূর রঞ্জিত হইতে পারে—পত্রখানা তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লেখকের নামটি জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করা যায় না।

৫

প্রথমে নাটকগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির বিচারে নামা যাইতে পারে, পরে প্রয়োজন হইলে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যাইতে পারিবে। প্রথমে প্রকৃতির কথাই ধরা যাক।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, 'সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালাই' তাঁহার সমস্ত রচনার মূলকথা। একথা প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখন, এই পালাটি কেবল রবীন্দ্রসাহিত্যের নয়—ভারতীয় সাধনারও মূলকথা। ভারতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে এই বাণীটি জড়িত, ঋগ্‌বেদ হইতে শুরু করিয়া উপনিষদের ধারা বহিয়া এই বাণী গীতা, চণ্ডী এবং মধ্যযুগের সাধকগণের রচনা পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষৎ, তন্মধ্যে আবার ঈশোপনিষৎ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়। ঈশোপনিষদের যে-কোন পাতা উল্টাইলে এই বাণীবহ শ্লোক পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতেই ইঙ্গিতটি পাইয়াছেন এবং নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা, প্রতিভার দ্বারা, তাহাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন—পুরাণী প্রজ্ঞাকে আধুনিক জীবনের গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ এই বাণীরই শিল্পরূপ। ইহার রহস্যসন্ধানের জন্য ভারতের বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর ভ্রমটা কি? সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে ব্রহ্ম সংসারাতীত নহেন, তিনি দূরেও আছেন, নিকটেও আছেন, তিনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন—তিনি সর্বত্রব্যাপী, সর্বত্রকে অতিক্রম করিয়া কোথাও গুহাহিত হইয়া নাই।[১]

"যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে, আর যাহারা কেবল দেবতাচিন্তায় নিরত থাকে তাহারা তদপেক্ষাও

১ ঈশোপনিষৎ—শ্লোকসংখ্যা ১॥৫॥

মূল নির্দেশের জন্য লেখক শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর নিকট ঋণী।

অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে।"[১] সন্ন্যাসী কি তাই করে নাই? রবীন্দ্রনাথের মতে উক্ত নাটকের প্রাকৃত নরনারীর চেয়ে সন্ন্যাসীর ভ্রম অধিক মারাত্মক। বিদ্যা ও অবিদ্যা (ব্রহ্ম ও জগৎ) সম্ভূতি ও অসম্ভূতির (প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভাদ) উপাসনা একত্র করিবার বুদ্ধি সন্ন্যাসীর হয় নাই বলিয়াই প্রকৃতি অবশেষে তাহার উপরে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিল।[২] যে হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত, সাধনার দ্বারা সন্ন্যাসী তাহা খুলিবার চেষ্টা করে নাই। বেচারা ঐ হিরণ্ময় মুখাবরণে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে তাহার সত্যদর্শন ঘটিয়াছে।[৩] এই মৌলিক ভ্রম হইতেই সন্ন্যাসীর সাধনার ব্যর্থতা। ইহার মধ্যে কোথায় অভারতীয়ত্ব? ইহা তো ভারতীয় সাধনার মূল কথা।

এবারে শারদোৎসবে আসা যাক। শারদোৎসবের মূলকথা প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির ঋণশোধের চেষ্টা। এই কারণেই শারদোৎসবের পরবর্তী সংস্করণের নাম ঋণশোধ। আমাদের শাস্ত্রে দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ-শোধের উল্লেখ আছে। প্রকৃতির ঋণশোধের উল্লেখ অবশ্য নাই। কিন্তু স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত প্রকৃতির ঋণশোধের মূলে ঐ পুরাতন ঋণশোধের ভাবটাই সক্রিয়। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতিকে উপকরণরূপে ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু উপকরণরূপে ব্যবহার করিবার সময়েও যদি আমরা সচেতনভাবে করি, কৃতজ্ঞতার ভাব অনুভব করি—তাহা হইলেই ঋণশোধ হয়। এই ভাবটি আমাদের লোকজীবনে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। এখনো দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঠুরিয়াগণ গাছ কাটিবার জন্য কুড়াল তুলিবার পূর্বে বৃক্ষটির উদ্দেশে তিনবার সেলাম করিয়া লয়। সেও ঐ ঋণশোধের

---

১ তদেব শ্লোকসংখ্যা ৯॥

২ তদেব শ্লোকসংখ্যা ১১॥১২॥১৪॥

৩ তদেব শ্লোকসংখ্যা ১৫॥

অঙ্গ। তাহারা যেন বলিতে চায়—তোমার কাষ্ঠ ব্যতীত আমার জীবনধারণ অসম্ভব, কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ নহি, তুমি যে কাষ্ঠ দান করিতেছ, আমি তজ্জন্য তোমাকে অভিবাদন জানাইতেছি। কাজেই কি শাস্ত্র, কি লোকব্যবহার সর্বত্র—ঋণশোধের ভাবটি পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবটিকেই অপরূপ কলাকবিত্বময়, আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ শিল্পবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। ইহার রহস্যের মূল এই দেশেই আছে—অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই।

এবারে রাজা। ইহাতে দাস্য, সখ্য ও মধুরভাবে রাজাকে ভজনার যে ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কি বিশেষভাবেই এদেশের কথা নহে? রাজা যিনি অরূপরতন (রাজার পরবর্তী সংস্করণের নাম অরূপরতন), যিনি একাধারে বীতরূপ ও সর্বরূপ—তিনি তো বিশেষভাবেই ভারতীয় ধর্মসাধনার লক্ষ্য! প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী যে ভুল করিয়াছিল, রাণী সুদর্শনাও সেইরকম ভুলই করিয়াছিল। তবে দুজনের ভুল দুই ভিন্ন পথে আসিয়াছে। সন্ন্যাসী জগৎকে বাদ দিয়া ব্রহ্মকে নির্বিশেষরূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল আর সুদর্শনা নির্বিশেষকে বাদ দিয়া রাজাকে বিশিষ্ট মানব মূর্তিতে দেখিতে চাহিয়াছিল। রাণী কেবলমাত্র অবিদ্যার বা অসম্ভূতির সাধনা করিয়াছিল আর সন্ন্যাসী কেবলমাত্র বিদ্যার বা সম্ভূতির সাধনা করিয়াছিল। এ দুই ভুলের মধ্যে সন্ন্যাসীর ভুলটাই বেশী মারাত্মক। সেইজন্যই দেখিতে পাই যে, সন্ন্যাসীর জীবন ট্র্যাজেডিতে পরিসমাপ্ত হইল আর রাণী দুঃখসাধনার অন্তে লক্ষ্যে পৌঁছিতে সিদ্ধকাম হইয়াছিল।

অতঃপর ডাকঘর। ডাকঘরে অমল ও মাধব দত্তের সম্পর্কটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, কিন্তু একজনের মুখ বিশ্বের দিকে আর একজনের মুখ গৃহের দিকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখী' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণযোগ্য। বনের পাখী ও খাঁচার পাখীর মধ্যে সম্পর্ক প্রেমের—কিন্তু কেহ

কাহাকেও বুঝিতে পারে না। অমল ও মাধব দত্তের মধ্যেও কি সেই সম্পর্ক নয়? পাখী দুটির এবং অমল ও মাধব দত্তের বিচিত্র সম্পর্কের মূলে একটি প্রাচীন শাস্ত্রীয় ইঙ্গিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহারা সর্বত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন এবং অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।"[১]

অবশ্য এ দুটি পাখীর একটি জীবাত্মা অপরটি পরমাত্মা। অমল ও মাধব দত্ত সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য নয়। সে সম্বন্ধ আরোপের প্রয়োজনও নাই। আমার বক্তব্য এই যে শাস্ত্রে যে অর্থেই এ শ্লোকটি কথিত হইয়া থাক্—পরস্পর সখ্যভাবে বদ্ধ পাখী দুইটির চিত্র অমল ও মাধব দত্তের চিত্র অঙ্কনে খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিল। দুজনে একই গৃহে অবস্থিত, দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, অথচ একজন উদাসীন, অপরজন আসক্ত—এসব কথা মনে রাখিলে আমার এই কল্পনাকে অলীক বা একেবারে অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে না। আর এ সম্পর্কটির চিত্র বিশ্লেষণই তো ডাকঘরের নাটকীয় রস। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও আমরা দেশের সাধনপন্থার উপরেই আছি।

এবারে অচলায়তন নাটকে আসা যাইতে পারে। এই নাটকখানাতেও দেখিতে পাইব যে, ভারতীয় সাধনপন্থার কথাই উক্ত হইয়াছে। অচলায়তনিকদের পন্থা জ্ঞানমার্গ, শোণপাংশুদের পন্থা কর্মমার্গ আর দর্ভক পল্লীবাসীদের পন্থা ভক্তিমার্গ। এই তিনটি ভিন্ন মার্গের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে অচলায়তন নাটকে। আর এই তিনের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা কি ভারতীয় সাধনারও চরম কথা নয়? তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, শাস্ত্রে যাহা সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেখানে কবি ও মনীষী হিসাবে তাঁহার

১ ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০ ; মুণ্ড ৩।১।১ ; শ্বেতা ৪।৬

কৃতিত্ব। কিন্তু মূলভাবটি তিনি প্রাচীন শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এসব কথা চিন্তা না করিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত ভারতীয় সাধনার বা ভারতীয় জীবনের যোগ নাই, এমন কথা অশ্রদ্ধেয়।

সত্য বটে ফাল্গুনী নাটকের মূলে কোন প্রাচীন শাস্ত্রীয় নজির নাই। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক নাটকটি কবির ব্যক্তিগত জীবন-বেদনা হইতে উদ্ভূত। একদিকে এই বেদনার সাক্ষ্য—অন্যদিকে প্রকৃতির সাক্ষ্য। ঋতুপরম্পরার মধ্য দিয়া অনন্ত যৌবনের যে লীলা বিশ্বে নিত্য প্রত্যক্ষ, যে লীলার নজিরে মানবের সমষ্টিগত যৌবনকেও কবি নিত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাই ফাল্গুনী নাটকের উপজীব্যের মূলে। ভারতীয় শাস্ত্রের পরিবর্তে বিশ্বপ্রকৃতির শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। যৌবনবেদনাজাত আরও একটি নাটক আছে—তাসের দেশ। ইহার মূলে শাস্ত্রের ইঙ্গিত নাই বটে, তবে জীবনের ইঙ্গিত আছে। তাহা ছাড়া অচলায়তনে যেমন যৌবনের দূত বিদেশী শোণপাংশুগণ, এখানে তেমনি যৌবনের দূত দ্বীপান্তর হইতে আগত রাজপুত্র। এ দুটি ঘটনার মূলেই ঐতিহাসিক একটি ঘটনার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। বিদেশী ইংরেজ আমাদের স্থবির দেশে আসিয়া যে বিরাট বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছে, খুব সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে সে ভাবটি কবির মনে কাজ করিতেছিল। তাহা যদি হয় তবে বুঝিতে হইবে অচলায়তন ও তাসের দেশের পরিবর্তন বুঝিবার জন্য কবিকে অন্যত্র যাইতে হয় নাই—দেশে বসিয়াই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

যে নাটকগুলিকে সভ্যতার সঙ্কট-সম্পর্কিত বলিয়াছি তাহাদের বিষয়ে বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয়, তেমনি তিনি স্বকালীয়ও বটেন। ভারতের প্রাচীন বাণী তাঁহার প্রতিভায় যেমন নূতন জীবন পাইয়াছে, তেমনি তাঁহার স্বকালের অনেক জীবন-সমস্যাও তাঁহার প্রতিভায় আশ্রয় খুঁজিয়াছে। বর্তমানে সভ্যতার

যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে ঠিক এমনটি এভাবে প্রাচীনকালে দেখা দেয় নাই। এ সমস্যা বিশেষভাবে একালেরই, আর যেহেতু তিনি বিশেষভাবে এই কালের লোক—তাঁহাকে এ সমস্যা সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইয়াছে, চিন্তার ফলকে একদিকে যেমন প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন—আর একদিকে তাহাকে তেমনি বাণীমূর্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বাণীমূর্তিগুলিই এক্ষেত্রে সভ্যতার সঙ্কট-সম্পর্কিত নাটক, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা।

মহাকবিমাত্রকেই স্বকাল সম্বন্ধে, স্বকালের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়, আর স্বকালের উপাদানে তাঁহারা চিরকালের মূর্তি গড়িয়া রাখিয়া যান। হোমার হইতে শেক্সপীয়র গ্যেটে পর্যন্ত, ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেহই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের প্রাচীন বাণীকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তেমনি বর্তমান জীবনের নূতন বাণীকেও চিরকালীন ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। তাঁহার উপরে স্বকালের যে দাবী আছে তাহাকে স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে যদি বিরুদ্ধ সমালোচকগণ প্রাচীন বাণী খুঁজিয়া না পান, তবে তাহা দোষ নহে, বরঞ্চ ইহার বিপরীত ঘটিলেই দোষ হইতে পারিত, স্বকালের দাবীকে অবহেলার মহৎ দোষ। তবু ভারতীয় বাণীর যে একেবারে অভাব আছে এমন নয়। কবির দীক্ষায় ইউরোপ ও ভারতের স্বভাবের হেরফের ঘুচাইবার নিমিত্ত প্রতিকারের যে উপায় কবি নির্দেশ করিয়াছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—তাহা একান্তভাবেই ভারতীয়, বোধকরি এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়।

প্রাচীন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে এমন কোন সমালোচক উদ্যত হইলে রবীন্দ্রসাহিত্য এবং প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে আরও গভীর, আরও নিবিড় যোগ আবিষ্কার করিতে পারিবেন। কিন্তু এখানে যতটুকু বলা হইল তাহাতেই নিশ্চয় প্রমাণিত হইয়াছে যে,

রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয়তার নাড়ির যোগ নাই—এই দায়িত্বহীন উক্তি যেমন অবাস্তব, তেমনি অশ্রদ্ধেয়।

এবারে নাটকগুলির আকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহাতেও দেখা যাইবে যে, তাঁহার নাটকগুলির, অন্ততঃ তত্ত্বনাটকগুলির টেকনিকের মূলে কোন বিদেশীয় নাটকের আদর্শ নাই, আছে দেশীয় লোকজীবনের Pattern বা কাঠামোর আদর্শ। গোড়া হইতেই সেই আদর্শকে তিনি অনুসরণ করিতে ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—আর অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধের আলোচনায় বলিয়াছি যে, এই নাটকখানিতেই কবির নিজস্ব নাটকীয় টেকনিক প্রথমে নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। সেটি কি? নাটকখানির অধিকাংশ দৃশ্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—এগুলি একটি পথ ও বিচিত্র জনসমাবেশের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহার পরবর্তী তত্ত্বনাট্যসমূহ এই ছুটি বস্তুকেই ক্রমে অধিকতর বাস্তব, অধিকতর সুষ্ঠু ও শিল্প-সম্মত রূপে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত যে Pattern বা কাঠামোয় তিনি উপনীত হইয়াছেন তাহা একটি মেলা ও মেলাটির নিকটবর্তী একটি পথ। এটাই তাঁহার আদর্শ। তবে প্রয়োজন ও অবস্থাভেদে ইহার সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে।[১]

প্রকৃতির প্রতিশোধের পরে অনেকদিন তিনি তত্ত্বনাট্য লেখেন নাই। এই সময়টায় বিসর্জন, রাজা ও রাণী, গান্ধারীর আবেদন, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কাব্যনাট্য লিখিত হয়। এগুলি হয় শেক্সপীরীয় ধরনের ট্র্যাজেডি, নয় কাব্যধর্মী নাটক, কাজেই এখানে পূর্বোক্ত টেকনিক-প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। শারদোৎসব নাটকে পুনরায় তত্ত্বনাট্যের ধারা দেখা দেয় এবং সেই পূর্বোক্ত টেকনিকও দেখা দিতে থাকে।

১ টমসন তাঁহার গ্রন্থে এটি প্রথম লক্ষ্য করিয়াছেন।

শারদোৎসব নাটকের ঘটনাস্থান বেতসিনী নদীর তীর ও নদীর তীরবর্তী পথ।

রাজা নাটকের অনেকটা জায়গা জুড়িয়াই পথ এবং সেই পথ গিয়াছে বসন্তোৎসবের মেলার দিকে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার ঘর—আর শেষ দৃশ্যে একটি পথ, যে পথে রাজা সুদর্শনাকে বাহির করিয়াছেন। শুধু রাণী নয় কবি নিজেও ঐ পথে বাহির হইয়াছেন; রাণী বরণ করিয়াছে পথকে রাজার সহিত মিলনের সূত্ররূপে, কবি বরণ করিয়াছেন পথকে তাঁহার চরম টেকনিকরূপে।

ডাকঘরে দেখি অমলের রোগশয্যা যে বাতায়নের ধারে তাহার সম্মুখে একটি পথ—এই পথেই নাটকের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছে।

অচলায়তনেও এই পথের প্রাধান্য। প্রথম দৃশ্যটি পথের দৃশ্য, পঞ্চকের মুখের প্রথম গানটি 'এ পথ গেছে কোন্‌খানে'।

ফাল্গুনীর নাট্যদৃশ্য 'পথে প্রান্তরে বনে বাদাড়ে' ঘটিয়াছে এবং যে চরম পথকে অনুসরণ করিয়া নবযৌবনের দল যাত্রা করিয়াছে—তাহার চূড়ান্ত পরিণাম পরম রহস্যময় গুহামুখে।

মুক্তধারাকে তত্ত্বনাট্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি, সেটি এই কারণেও বটে। পথ ও মেলার দৃশ্যটি এখানে প্রায় পূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে। নাট্যদৃশ্য সমস্তটাই একটানা পথের উপরে ঘটিয়াছে, ঘটনায় কোথাও ছেদ নাই এবং এই পথিক জনতার লক্ষ্য ভৈরবমন্দির, সেখানে পূজোপলক্ষে সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীর সমবেত হইবার কথা।

রক্তকরবী নাটকেরও একটিমাত্র দৃশ্য, রাজার জালায়নের বাহিরের পথ। এই পথকে অবলম্বন করিয়াই ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

কালের যাত্রা তো পথেরই নাটক, যে পথে রথ অচল আর জনতা চলমান।

বাংলা দেশের লোকজীবনের একটি প্রধান অঙ্গ পথপার্শ্ববর্তী

মেলা। এইসব মেলায় বিচিত্র ধরনের, বিচিত্র স্বভাবের এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যের লোক সমবেত হইয়া থাকে। ইহার Pattern-এ একদিকে যেমন বৈচিত্র্য, আর একদিকে তেমনি সরলতা। লোক-জীবনের এই অতি সাধারণ, অথচ মনোরম ও বিচিত্র ছবিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তত্ত্বনাট্যের ছাঁচ বা প্যাটার্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অধিকাংশ নাটকে যে জনতা দৃষ্ট হয় তাহা এই প্যাটার্নেরই অঙ্গ ; যে গানের দল ও ঠাকুর্দা দৃষ্ট হয় তাহাদেরও অনুরূপ মেলাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফকির ও বাউলের দল নাই, এমন মেলা বাংলা দেশে বিরল। যাত্রা গানে যে জুড়ি ও গানের দল দেখা যাইত, (এখনকার থিয়েটার-ঘেঁষা যাত্রায় ওসব আর থাকে না) তাহা এই মেলার গায়কদলের আদর্শেই গঠিত। রবীন্দ্রনাথের গানের দল ও ঠাকুর্দার মূলে মেলার ও যাত্রার প্রভাব দুই-ই আছে বলিয়া বিশ্বাস।

আমার এইসব উক্তি ও অনুমান যদি সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যেসব "খাঁটি বাঙালী" নাট্যকার শেক্সপীরীয় ধরনের ট্র্যাজেডি বা মোলিয়ার-ভাঙা কমেডি লিখিয়াছেন —রবীন্দ্রনাথের নাটক, এখানে তত্ত্বনাট্যগুলি, কি আকৃতির বিচারে, কি প্রকৃতির বিচারে তাঁহাদের নাটকের চেয়ে অনেক বেশী "খাঁটি দেশী" এবং সেইজন্যই অনেক বেশী বাস্তব। লোকজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া যাঁহারা খেদ করিয়া থাকেন তাঁহারাও অবহিত ও আশ্বস্ত হইতে পারেন। তাঁহাদের খেদের কারণ নাই, কেননা, এমনভাবে লোকজীবন ও দেশের গভীরতর জীবনোপলব্ধির উপরে আর কাহারও রচনা প্রতিষ্ঠিত নহে।

৭

রবীন্দ্রসাহিত্যে যে অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ও অভারতীয় বোধ হয়, তাহার একটা কারণ অপঠিত পাণ্ডিত্য। অনেকেই রবীন্দ্রসাহিত্য আংশিকমাত্র পড়িয়া বা একেবারেই না পড়িয়া, কিংবা জনশ্রুতিযোগে মাত্র শুনিয়া সমালোচনা করিতে বসেন—এমনস্থলে সুবিচার যে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। এই ধরনের সমালোচনারীতি আগে খুব প্রচলিত ছিল, এখন যে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এমন বলা চলে না। তারপর সমালোচকগণের ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব কথা কথিত হয়, বা যেসব চিন্তা চিন্তিত হয়, তাহাকেই তাঁহারা দেশের তথা ভারতীয় বাণী বলিয়া মনে করেন, আর রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার প্রতিধ্বনি না পাইলে তাহাকে সরাসরি অভারতীয় বলিয়া মনে করেন। এখন ইহার প্রতিকার কি? আর যা-ই হোক কবিকে এজন্য দায়ী করা চলে না।

রবীন্দ্রসাহিত্য দুর্বোধ্য লাগিবার আরও একটি কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের বাগ্‌ভঙ্গী অনেকাংশে নূতন। প্রত্যেক মহাকবির বাগ্‌ভঙ্গীই নূতন, ইহা তাঁহার মহাকবিত্বেরই বিভূতি। তিনি যে ঈশ্বরগুপ্ত বা অন্য প্রাচীনতর বাঙালী কবির প্রতিধ্বনি করিবেন না—ইহাই তো স্বাভাবিক। তারপরে তিনি এমন অনেক উপমা ও অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা বাংলা সাহিত্য কেন সংস্কৃত সাহিত্যেও নূতন—ইহাও তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক বিভূতি। এসব তাঁহার গুণ, দোষ নয়। আর এজন্য তাঁহাকে অভারতীয় বলিব কেন? ভারতীয় সাহিত্যের বাগ্‌ভঙ্গী চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এমন হইতেই পারে না। লৌকিক কবিগণ যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহার অনুসরণ করেন, মহাকবিগণ নূতন বাণীমার্গ রচনা করিয়া সেই পথে চলেন। কালিদাসের কাব্য প্রথম রচনাকালে এইজাতীয় সমালোচকের কাছে নিশ্চয় তাহা "অভারতীয়"

বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাছে ইংরাজি সাহিত্য সুপরিচিত, কাজেই তাহার প্রভাবও তাঁহার কাব্যে অর্থাৎ চিন্তায় ও বাগ্‌ভঙ্গীতে পড়িয়াছে—ইহাও স্বাভাবিক, নিন্দার নয়। একটি মহৎ সাহিত্য পড়িলাম অথচ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইলাম না—ইহা প্রশংসার নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আত্মস্থ হইয়া রবীন্দ্রনাথীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে, কাজেই তাহাকে আর বিদেশীয় বলা উচিত নয়। টমসন কর্তৃক উদ্ধৃত সমালোচক বলিয়াছেন যে ইংরাজি-অভিজ্ঞ পাঠকই কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিতে সক্ষম। তাহা যদি হয় তবে উক্ত সমালোচকের বাধিল কেন? কারণ তিনি পূর্বসংস্কার লইয়া রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনায় নামিয়াছিলেন। আসল কথা এই যে, রসবোধের প্রসারের উপরে রবীন্দ্রসাহিত্য বা যে-কোন মহৎ সাহিত্যের রসোপলব্ধির নির্ভর। একালে ইংরাজি সাহিত্য আমাদের রসবোধকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে কালিদাসের কবিবিভূতি অধিকতর প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ তিনি কালিদাসকে পৃথিবীর মহাকবিগণের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত করিতে পারিবেন। রবীন্দ্রবিচারের পটভূমি কেবল ঈশ্বরগুপ্ত বা বৈষ্ণবগণ নহেন, এমনকি শুধু ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাসের পটভূমিতে তাঁহাকে স্থাপন করাও যথেষ্ট নহে। ভারতীয় ও বিদেশীয় মহাকবিগণের সান্নিধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিলে তবেই তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার কবিবিভূতি সম্যক্ উপলব্ধ হইবে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের দোষত্রুটিরও স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করুন বা না করুন, তিনি নিজেকে বিশ্ব-সাহিত্যিকগণের সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বা ইটালীর অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকে শেক্সপীয়র বা দান্তের কাব্য বোঝে কি না জানি না (বোঝে

না বলিয়াই আমার বিশ্বাস), কিন্তু তজ্জন্য কেহ তাঁহাদের অ-ইংলণ্ডীয় বা অ-ইটালীয় বলে নাই। তবে আমরাই বা অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিতের নজিরে রবীন্দ্রনাথকে অভারতীয় বলিব কেন? মহৎ সাহিত্যের রসবোধ সুশিক্ষার ফল। পাঠকের সে ত্রুটির দায় লেখক বহন করিতে যাইবেন কেন? রসবোধের ক্ষমতায় যিনি বঞ্চিত, কাব্যসমালোচনার ক্ষমতা তাঁহার সুপ্রচুর একথা কে মানিবে? ফলকথা উক্ত লেখকের উক্তি কাব্যসমালোচনা নয়, আপন ক্ষুদ্র মনের পূর্বসংস্কারের ছায়াপাত মাত্র। উক্ত সমালোচনার দ্বারা কেবল নিজেকেই তিনি অরসিক প্রতিপন্ন করেন নাই, যাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব-প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাদেরও অরসিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রসবোধের প্রবলতম অন্তরায় পূর্বসংস্কার।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে সন্ধ্যাসঙ্গীতের, বিশেষ প্রভাতসঙ্গীতের যে স্থান ও মূল্য, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকটির সেই স্থান ও মূল্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকাশযোগ্য কাব্য ও কবিতার সূত্রপাত সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে মনে করিতেন, তৎপূর্বে রচিত ও প্রকাশিত কাব্যাদি তিনি পরে আর প্রকাশ করেন নাই—রবীন্দ্ররচনাবলী-প্রকাশের সময়ে যেসব 'অচলিত সংগ্রহের' অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছে, তাহাও আবার প্রকাশক-মণ্ডলীর নিতান্ত নির্বন্ধাতিশয্যে। প্রকৃতির প্রতিশোধের পূর্বে লিখিত 'রুদ্রচণ্ড' নামে 'পূর্ণাঙ্গ' নাটকখানি সম্বন্ধেও কবি ঐ একই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, 'অচলিত সংগ্রহ'-প্রকাশের পূর্বে আর তাহা পুনমুদ্রিত হয় নাই।

কবি বিশ্বাস করিতেন যে, সন্ধ্যাসঙ্গীতের ভাঙা ছন্দে এবং ছায়াময়ভাবে প্রথম তিনি স্বকীয় রচনারীতিকে পাইয়াছেন—আর প্রভাতসঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও প্রভাত-উৎসব কবিতা দুটিতে

যে আকস্মিক অনুভূতির প্রকাশ—তাহাতেই তাঁহার স্বকীয় ভাব-জীবনের প্রথম অরুণোদয়। এইরূপ মনে করিতেন বলিয়াই পরবর্তী কালে এই দুইখানি কাব্য সম্বন্ধে তিনি যত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পরিণত কাব্যগুলি সম্বন্ধে তত নয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধেও কবির মনোভাব ও ব্যবহার অনুরূপ। বলা বাহুল্য, প্রকৃতির প্রতিশোধ কি নাট্য হিসাবে কি কাব্য হিসাবে অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অত্যন্ত অপরিণত, আর জীবনতত্ত্ব হিসাবে একান্ত অস্পষ্ট। প্রত্যেক পাঠকের মতো কবিও এই স্থূল সত্যটা জানিতেন। তবু যে এই রচনাটির উপরে এত মমত্ব, তার কারণ অপরিণত মাটির পুতুল যেমন তাহার সৃষ্টি-রহস্য সহজে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই অপরিণত রচনাটি কবির কাছে তেমনি সহজে রচনা-রীতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—আর জীবনতত্ত্বের অস্পষ্টতা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার প্রাতঃকালীন কুয়াশার ন্যায় অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া কবি তাঁহার ভাব-জগৎকে প্রথম দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কবির ধারণা, নাটকখানিতে সূত্রাকারে, বীজাকারে এবং বলা বাহুল্য, অস্পষ্টাকারে তাঁহার জীবনতত্ত্বই নিহিত। তাঁহার ধারণা, সেই জীবনতত্ত্বই পরবর্তী কালে লিখিত প্রবন্ধে-নিবন্ধে টীকা-ভাষ্যরূপে, পরিণত বয়সের কাব্য-নাটকে, পুষ্প-পল্লবে এবং কবির সাধনোজ্জ্বল দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে অপরূপ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ বিষয়ে কবি নিঃসংশয় ছিলেন বলিয়াই প্রথম বয়সের এই অপরিণত রচনাটির উপরে এতখানি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, এতবার টীকা-ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকেও কবির ইঙ্গিত মনে রাখিতে হইবে—আরও মনে রাখিতে হইবে যে, তত্ত্বনাট্য-পর্যায়ে প্রকৃতির প্রতিশোধ সর্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও সর্বজ্যেষ্ঠ। নদীমূল নদী-মোহানার তুলনায় যতই অকিঞ্চিৎকর হোক—তবু তাহার একটা

মৌলিক আকর্ষণ আছে—এখানেই তাহার গুরুত্ব, এইখানেই তাহার অবিসংবাদী প্রাধান্য।

প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে কবি দাবী করিয়াছেন যে, ইহাতেই তাঁহার জীবনতত্ত্ব প্রথম আভাসে দেখা দিয়াছে এবং আরও দাবী করিয়াছেন যে, সেই জীবনতত্ত্ব তাঁহার সমগ্র রচনার মূলসুর-রূপে বাজিয়া উঠিয়াছে। কবির দাবীর সহিত আমরা নিজেদের একটি দাবী যোগ করিয়া দিতে চাই, এই নাটকখানিতে কবির নিজস্ব নাটকীয় টেকনিক প্রথমে দেখা দিয়াছে—অবশ্য নিতান্ত অপরিণত-ভাবে এবং অস্পষ্টাকারে। অত্যাবশ্যক এই ভূমিকাটুকু করিয়া কবিকৃত আলোচনায় প্রবেশ করা যাইতে পারে। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্য-রচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

তত্ত্ব হিসাবে সে ব্যাখ্যার কোন মূল্য আছে কি না এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।"[১]

কবির স্বীকারোক্তি হইতেই দেখা গেল যে, প্রকৃতির প্রতিশোধের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব, যাহা নানাভাবে তাঁহার রচনায় লীলা করিয়া চলিয়াছে। এবারে সেই তত্ত্বটি কি সম্যক্‌রূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। এখানেও কবির সাহায্য পাওয়া যাইবে।

---

১ জীবনস্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ।

"এই কারোয়ারে প্রকৃতির প্রতিশোধ নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন, মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল, ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি, সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

"প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এ কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে, সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানের সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোন তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃত সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। (প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল,

গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মধ্যে তুচ্ছতা ও অসীমের মধ্যে শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিতে হইয়াছে।"[১]

জীবনস্মৃতি গ্রন্থেই আছে—"তখন 'আলোচনা' নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম, তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ-গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।"[২]

২

এবারে কবির পূর্বোক্ত দাবী স্মরণ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে প্রকৃতির প্রতিশোধের তত্ত্বই তাঁহার সমস্ত কাব্যরচনার একটি মাত্র পালা। জীবন-পরিণতির সঙ্গে তাল রাখিয়া এই পালাটিই বিচিত্ররূপে, পরিণততর আকারে দেখা দিয়াছে—ইহা তাঁহার অপর দাবী। এই পালাটি তাঁহার তত্ত্ব-নাট্যকে কতখানি প্রভাবিত

১ জীবনস্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ।

২ জীবনস্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ।

রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের ২য় খণ্ডের 'আলোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ডুব দেওয়া, ডুবিবার ক্ষমতা, জগৎ সত্য, প্রেমের শিক্ষা, জগতের বন্ধন, একটি রূপক নামে ছয়টি প্রবন্ধে প্রকৃতির প্রতিশোধের অংশবিশেষের কবিকৃত ব্যাখ্যা আছে।

করিয়াছে বা করে নাই, সে বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব—কিন্তু ইহা যে রবীন্দ্রকাব্যের মূলসুর, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অপরিণত যৌবনে প্রথম আবির্ভূত জীবন-সহচররূপ উক্ত তত্ত্বটির বিষয় স্মরণ রাখিলে, নাটিকার প্রধান পাত্র সন্ন্যাসীর সাধনার আপাতসিদ্ধি ও পরিণামগত নিদারুণ ব্যর্থতার কথা স্মরণ রাখিলে আর একখানি তত্ত্ব-নাট্যের সাদৃশ্য মনে উদিত না হইয়া পারে না। মহাকবি গ্যেটের 'ফাউস্ট' সেই তত্ত্ব-নাট্য। বোধ করি, ইহাকে পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব-নাট্য বলা যাইতে পারে। কেহ যেন মনে না করেন যে, উক্ত মহাকাব্যখানির সহিত প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো অকিঞ্চিৎকর ও অপরিণত কাব্যকে আমরা তুলনা করিতেছি; শিল্পসৃষ্টি হিসাবে এ দুয়ের মধ্যে তুলনার কথাই উঠিতে পারে না। শিল্প হিসাবে ওঠে না, কিন্তু তাই বলিয়া তত্ত্ব হিসাবে উঠিতে বাধা নাই। এ দুয়ের মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য তত্ত্বগত অর্থাৎ মিলটা ভিতরের দিকে, কিন্তু কিছু বাহিরের বা অবস্থাগত মিলও আছে। আগে সেইটাই দেখা যাক।

শৈশবকাল হইতেই গ্যেটে ফাউস্ট-কাহিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন। একুশ-বাইশ বৎসর বয়সে উক্ত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিবার সঙ্কল্প তিনি করেন। আরও কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর বয়সে ফাউস্ট কাব্যের একটা খসড়া লিপিবদ্ধ হয়। তারপরে অনেকদিন আবার কাজ বন্ধ থাকে। কখনো কখনো বাহিরের তাগিদে, যেমন শিলারের সহিত মিত্রতা জন্মিলে তাঁহার তাগিদে, কোন কোন দৃশ্য লিখিত হয়—কিন্তু ফাউস্ট-কাব্যের প্রথম খণ্ড বর্তমান আকারে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের আগে প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের রচনার ও প্রকাশের ইতিহাস আরও বিচিত্র। বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনা, মাঝে মাঝে কতক অংশ লিখিত হইয়া মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ইহা সমাপ্ত হয় এবং কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়া লোকসমাজে

আত্মপ্রকাশ করে। দুই খণ্ডকে একত্র লইয়া বিচার করিলে বলা অসঙ্গত হইবে না যে, কাব্যখানি কবির প্রথম যৌবন হইতে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার জীবন-সহচর ছিল। বস্তুত ফাউস্ট-কাব্য গ্যেটের মানস-জীবনের মেরুদণ্ড। গ্যেটে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত রচনাই তাঁহার আত্মজীবনীর অন্তর্গত। ফাউস্ট তাঁহার আত্মজীবনীর পরিপূর্ণতম প্রকাশ—'সত্য ও কল্পনা' নামে পরিজ্ঞাত তাঁহার আত্মজীবনীর চেয়েও ফাউস্ট পরিপূর্ণতর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে (ফাউস্ট-রচনার প্রথম সঙ্কল্পের বয়সে) রচিত। ফাউস্টের মতো রহিয়া-বসিয়া ইহা সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যখন মনে করি যে, প্রকৃতির প্রতিশোধের মূলতত্ত্বই কবির জীবন-সহচর, তাঁহার পরবর্তী সমস্ত কাব্য রচনার একটি মাত্র পালা, আর এই পালাটিকেই কবি আমরণ অনুসরণ করিয়াছেন—তখন ফাউস্টের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। প্রভেদের মধ্যে এই যে—গ্যেটে একটিমাত্র কাহিনীর সূত্রে যাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কাহিনীর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু এ সব তো বাহিরের মিল, আসল মিল ভিতরে এবং সেইটাই প্রধান বিষয়। ফাউস্ট জ্ঞানমার্গের সহায়ে জীবনরহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া শয়তানের শরণাপন্ন হইল। শয়তান বলিল যে, তাহার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইলে জীবনপাত্রের শেষবিন্দুটি পর্যন্ত উপভোগ করিবার ক্ষমতা তাহার হইবে। ফাউস্ট তাহাতেই সম্মত হইল। আগে যেমন সে জ্ঞানমার্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় নিযুক্ত ছিল, এখন তেমনি কামমার্গের পথিক হইল—কিন্তু না পাইল আনন্দ, না পাইল শান্তি, এমন কি শিশিরবিন্দুর মতো পবিত্র-মনোরম 'গ্রেশেন'-এর প্রেমও নিদারুণ ট্রাজেডিতে পরিণত হইল। ফাউস্ট দেখিতে পাইল, উপভোগের কবলে সে যাহা ধরিতেছে

তাহাই ভস্মে পর্যবসিত হইতেছে, যাহা রসনায় নিতেছে তাহাতেই ক্ষারস্বাদ ক্ষরিতেছে। অনেক ঠকিয়া সে বুঝিল আনন্দময় মুহূর্তকে চিরন্তন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। অনেক দুঃখ পাইয়া, অনেক দুঃখ দিয়া ফাউস্ট মানবপ্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল যে, সে অন্বেষক, 'পতনঅভ্যুদয়বন্ধুব পন্থা' বহিয়া সে সারা জীবন অন্বেষণ করিয়া মরিতেছে—অনন্তের, ফাউস্ট অনন্তের সন্ন্যাসী। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ, দুইই মানুষের আয়ত্তাতীত, এই নিদারুণ সত্য মানুষকে বুঝিতে হইবে; তাহাকে আরও বুঝিতে হইবে যে, অনন্ত আয়ত্তাতীত বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে 'আদর্শকে' উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কর্মসাধনা করিতে হইবে, তাহাতে অনন্ত আয়ত্তে আসিয়া পড়িবে কবি এমন আশ্বাস দেন না, তিনি বলেন যে, অনন্তের সাধনার ফল এই যে, মানুষ ভিতরে ভিতরে পূর্ণতর হইয়া উঠিতে থাকিবে। অনন্তের সাক্ষাৎ কোনকালেই মিলিবে না ইহা যেমন সত্য, অনন্তের সাধনায় মানুষ পূর্ণতর হইয়া উঠিবে—ইহাও তেমনি সত্য। এইখানেই মানবজীবনের সার্থকতা। এবারে বুঝিতে পারিব মানুষের ভাগ্য ও ফাউস্টের ভাগ্য অভিন্ন; কবির ভাগ্য ও ফাউস্টের ভাগ্য তো বটেই। ফাউস্ট-প্রসঙ্গে গ্যেটে বলিতেছেন—

"জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা আমি নাড়িয়া দেখিয়াছি যে, জ্ঞানমার্গ কত অসহায়। আবার জীবনের বিচিত্র মহলেও ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—কিন্তু সেখান হইতেও ভগ্নহৃদয়ে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।"

ইহাই গ্যেটে-জীবনের, ফাউস্ট-জীবনের, মানব-জীবনের মূলতত্ত্ব। মনে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, আকাঙ্ক্ষার বস্তু নাই, তাহার মনে অগস্ত্যতৃষ্ণা আছে, তৃষ্ণাহর সমুদ্র নাই, তাহার মনে সুধার আকিঞ্চন আছে, তাহার আকাশ সুধাকরহীন। তবু তাহাকে অন্বেষণ করিয়া

ফিরিতে হইবে—কারণ অন্বেষণই তাহার স্বধর্ম। মানুষ অনন্তের সন্ন্যাসী—যে অনন্ত স্বভাবতই আয়ত্তাতীত। তবে মানুষের সান্ত্বনা কোথায়? যথাসাধ্য কর্মসাধনায়, যথাশক্তি জ্ঞানচর্চায়, যথাসম্ভব অন্বেষণে, এই সবেই তাহার সার্থকতা। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প—সমস্তই অন্বেষণের সহায় বলিয়া মানুষের কাছে মূল্যবান—তাহারা লক্ষ্য নহে, লক্ষ্যে চালিত করিবার উপায়মাত্র। ফাউস্ট-রূপী গ্যেটে এ সমস্তর চরম পরখ করিয়া দেখিয়াছেন—কেবল অতৃপ্তি, কেবল ব্যর্থতা! এত অতৃপ্তি, এত ব্যর্থতার পরে কবি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, হতভাগ্য ফাউস্ট সে সিদ্ধান্তের সাক্ষাৎ পায় নাই। মোটের উপরে ইহাই হইল ফাউস্ট-রূপী গ্যেটের জীবনতত্ত্ব।

প্রকৃতির প্রতিশোধের 'সন্ন্যাসী' জ্ঞানমার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণের ছোটখাটো সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাহার একপ্রকার অনুকম্পার ভাব। সংসার-জ্বর তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তারপরে কি অবস্থায় পড়িয়া সে একটি অন্ত্যজ বালিকাকে আশ্রয় দিল এবং সেই সূত্রে তাহার মোহভঙ্গ করিয়া প্রকৃতি কিরূপে তাহার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করিল—পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ফাউস্ট ও 'সন্ন্যাসী' দু'জনেই অনন্তের সাধক, একজন সিদ্ধকাম, অপরজন সিদ্ধিলাভেচ্ছু। দু'জনেরই সাধনার মূলে একটা সুবৃহৎ ফাঁকি ছিল। কিন্তু দু'জনের ফাঁকি দুই দিক হইতে আসিয়াছে। অনন্তের সাধক ফাউস্ট জ্ঞানমার্গের দ্বারা অনন্তের রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ হইলে শয়তানের মন্ত্রণায় পড়িয়া 'সান্তের' চর্চায় মনোনিবেশ করিল। শয়তান তাহাকে বলিল—অনন্তের সাধনা রাখো, তার বদলে হাতের কাছে কামিনী, কাঞ্চন, সুরা যাহা পাও তাহাই উপভোগ করো,—তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। উপদেশ গ্রহণ করিল। সান্তকে অর্থাৎ সংসারকে ফাউস্ট অনন্তের অংশরূপে

দেখিতে পারে নাই, 'তাহাতেই তাহার শেষ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, ফলে বারংবার আনন্দলাভে ব্যর্থ হইল, কিন্তু তাহার চেয়েও মহত্তর দুঃখ সে সর্বদা অনুভব করিত। শয়তানের উপদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহার সার্থকতা বা গন্তব্যতা সম্বন্ধেও তাহার মনে সংশয় ছিল, এই সংশয়েরই বাহ্যরূপ তাহার সহচর 'মেফিস্টোফিলিস'। ফাউস্ট জানিত সে অনন্তের সাধক সে আরও জানিত শয়তানের পরামর্শে যে পথ সে ধরিয়াছে খুব সম্ভব তাহাতে সে সিদ্ধিতে পৌঁছিবে না, আবার আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হইবে। সান্তকে অর্থাৎ সংসারকে অবলম্বন করিয়াও অনন্তের সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব—এ কথা ফাউস্টকে কেহ বলিয়া দেয় নাই। তাই দেখিতে পাই অনন্তের সাধক সান্তকে স্বয়ংপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া জীবনটা নিষ্ফল করিয়া দিল। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর মনে গোড়াতে কোথাও সংশয় নাই, তাহার ধারণা অনন্তের সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাহার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গেল—ইহাই 'সন্ন্যাসীর' জীবনের ট্রাজেডি। তবেই দেখা গেল ফাউস্ট ও 'সন্ন্যাসী' দু'জনেই অনন্তের সাধক। ফাউস্ট শয়তানের পরামর্শে পড়িয়া অনন্তের আশা ছাড়িয়া সান্তকেই চরমরূপে স্বীকার করিয়াছিল। আবার 'সন্ন্যাসী' সান্তকে বাদ দিয়া অনন্তকেই সত্যের একমাত্র রূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল—পরিণামে দু'জনেই অন্ধকারে ডুবিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র স্পষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন—

"আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন ঋষি বলেছেন

অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তর মধ্যে পায় অমৃতকে।"[১]

কবি বলিতে চান যে, অনন্তকে বাদ দিয়া অন্তের উপাসনা করিয়া ফাউস্ট অন্ধকারে ডুবিয়াছিল আর অন্তকে বাদ দিয়া 'সন্ন্যাসী' অনন্তের উপাসনা করিয়া আরও বেশি অন্ধকারে ডুবিয়াছিল।

এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহাতেই ফাউস্ট ও প্রকৃতির প্রতিশোধের অন্তর্নিহিত ঐক্য কোথায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছি কি না জানি না। আমার বিশ্বাস যে, উভয় কাব্যের মূলতত্ত্ব এক, তবে উভয় কবির শক্তি, বিশ্বাস ও পরিবেশ অনুযায়ী কাব্য দুইখানির বাহ্যরূপ ভিন্ন হইয়াছে।

এখানে মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিবার আগে রবীন্দ্রনাথ কি ফাউস্ট পড়িয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, নাটকখানি লিখিবার আগে ফাউস্ট পড়িবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল—এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সব উপস্থিত করিবার আগে একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতে চাই। প্রকৃতির প্রতিশোধরচনার পূর্বে ফাউস্ট না পড়িলেও রবীন্দ্রনাথ নাটকখানিকে প্রায় এইভাবেই লিখিতেন, কারণ, ইহাতে প্রকাশিত জীবন তত্ত্ব—ইহার পূর্বে রচিত কাব্যে ও নাটকে ক্ষীণভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, প্রকৃতির প্রতিশোধে তাহা স্পষ্টতর, পরবর্তী রচনাসমূহে আরও ঘনপিনদ্ধ, আরও রূপধন্য। তাহা ছাড়া, কোন মহাকবি মুল জীবনতত্ত্ব অপর কাহারো নিকট হইতে অধমর্ণের মতো গ্রহণ করে না—যেমনভাবেই হোক তাহা জীবন হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। তবে নিজের জীবনতত্ত্বের সমর্থন সে অন্যত্র হইতে পাইতে পারে, এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। ফাউস্ট

১ সঞ্চয়, পৃষ্ঠা ৪১৭, র—র, ১৮শ খণ্ড।

নাটক পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বোদ্ভূত জীবন-তত্ত্বের সমর্থন পাইয়াছেন—গ্যেটের চিন্তার আলোকে তাহাকে স্পষ্টতর আকারে দেখিতে পাইয়াছেন—এই সময় ফাউস্ট নাটক হইতে প্রতিফলিত গ্যেটের চিন্তার আলোক তাঁহার মনে না পড়িলে খুব সম্ভব—আরও অনেকদিন নিজের জীবনতত্ত্বটা তাঁহার কাছে অস্পষ্ট থাকিয়াই যাইত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকগণ জানেন যে, চিরদিন গ্যেটের কাব্য ও জীবনের প্রতি কবি একটা আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, গ্যেটের উল্লেখ তাঁহার রচনায় বিরল নয়। গ্যেটের কিছু কিছু উক্তি সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষায় তিনি সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার একাধিক চিঠিপত্রে গ্যেটের ও মূল ফাউস্ট পাঠ-চেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] কিন্তু এ সমস্তই প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিবার অনেক পরবর্তী সময়ের কথা। গ্যেটে সম্বন্ধে তাঁহার ঔৎসুক্যের একটি প্রমাণ প্রকৃতির প্রতিশোধ-রচনার পূর্ববর্তী।[১] এ-প্রমাণগুলি সবই পরোক্ষ। ইহাতে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, নাটকখানি লিখিবার আগে জার্মান নাটকটি তিনি পড়িয়াছেন। কিন্তু এইসব প্রমাণকে পটভূমিরূপে ব্যবহার করিয়া প্রকৃতির প্রতিশোধ পড়িয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ফাউস্ট কাব্য মূলে হোক, অনুবাদে হোক,

১ (ক) ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, ছিন্নপত্র।

(খ) প্রথম চৌধুরীকে লিখিত ১৮৯০ সালের একখানি চিঠিতে আছে—জর্মান Faust অল্প অল্প পড়তে চেষ্টা করছি। তুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেতো।'—চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড।

(গ) বর্তমান লেখককে কবি একদা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, মূল ফাউস্ট পড়িবার উদ্দেশ্যেই তিনি জার্মান শিখিয়াছিলেন।

১ ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ—গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ—কার্তিক, ১২৮৫।

গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৪৭৭, র—র ১৭শ খণ্ড।

তিনি আগেই পড়িয়াছিলেন, কারণ উভয় গ্রন্থের মিলকে আকস্মিক মনে করিতে পারি না।[২]

৩

এবারে দেখা যাক, পূর্বোক্ত তত্ত্বটি নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে কিভাবে রসমূর্তি লাভ করিয়াছে।

প্রথমেই দেখিতে পাই, জগৎ-বিলয় সাধনা-সিদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রলয়ানন্দের উচ্ছ্বাস। নিজের সত্তা হইতে প্রকৃতির প্রেমময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় অস্তিত্বকে সমূলে বিলুপ্ত করিয়া দিবার সাধনায় এতদিন সে নিরত ছিল। তাহার বিশ্বাস, এতদিনে সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

বসে বসে চন্দ্রসূর্য দিয়েছি নিভায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙ্গে আশা ভয় মায়ার কুহক।

*　　*　　*

জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ;
পলে পলে যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে।
হৃদয় হ'য়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।

---

২ প্রকৃতির প্রতিশোধ-রচনায় পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে গ্যেটের কাব্য ও সাহিত্যের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন এই প্রবন্ধরচনার পরবর্তী কালে প্রকাশিত দুইটি নিবন্ধে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ও তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে। নিবন্ধ দুটির পরিচয় এইরূপ—

(ক) রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, দেশ, ৫ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৫০।

(খ) গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৫৭।

সন্ন্যাসীর বিশ্বাস, পরম জ্ঞানের চিতায় দয়া, প্রেম, আনন্দ সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি প্রকৃতির স্নেহের ধনগুলিকে সে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছে—

বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হ'য়ে গেছে জ্ঞান চিতানলে।
সেই ভস্মমুষ্টি আজ মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হ'তে হইব বাহির।

প্রকৃতির লীলাভূমি মানব-সংসারে সন্ন্যাসী কেন বাহির হইল তাহা সে নিজেই বিশদরূপে বলিয়াছে—

তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, বহিব তোমারে,
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

এই মহদুদ্দেশ্য লইয়া সন্ন্যাসী নির্ভয়ে বাহির হইয়া পড়িল; সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই—অকল্পিত-পূর্ব প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ওই সংসারের প্রান্তেই প্রকৃতি একটি স্নেহের অঙ্কুর বপন করিয়া রাখিয়াছে।

সংসারের পথে সর্বজন তাড়িত, নিরাশ্রয়, অস্পৃশ্য রঘু নামধেয় কোন ব্যক্তির দুহিতার সঙ্গে সন্ন্যাসীর দেখা হইল। সন্ন্যাসী তাহাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিল। বলা বাহুল্য এই আশ্রয়দানের মূলে সন্ন্যাসীর মনে স্নেহ ছিল না; ছিল সিদ্ধির অহঙ্কার। আর দশজন সংসারী লোক আচার বিচার, জাতি বর্ণের যে-সব সংস্কারে বদ্ধ, সন্ন্যাসী তো তাহা হইতে মুক্ত, সে-যে আর দশজনের মত সংসারী জীব নয়, প্রকৃতির অধীন নয়, এই অহঙ্কারের বশেই সে

অস্পৃশ্যকে আশ্রয় দিল। বিশেষ সন্ন্যাসী নিজের ও রঘু-দুহিতার মধ্যে একপ্রকার ঐক্যও দেখিতে যেন পাইল।

বালিকা যখন শুধাইল, একবার যখন আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, আর যেন আমাকে তাড়াইয়া দিও না, তখন সন্ন্যাসী তূরীয় অহঙ্কারে বলিতেছে—

মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইকো কাহারো পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে-আসে আসুক কাছে, যায় যাক্ দূরে
জেনো বৎসে মোর কাছে সকলি সমান।

* * *

বালিকা—আমি প্রভু দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই—

সন্ন্যাসী—আমারো তো কেহ নাই
দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।

বালিকা—তোমার কি মাতা নাই?

সন্ন্যাসী—নাই।

বালিকা—পিতা নাই?

সন্ন্যাসী—নাই বৎসে।

বালিকা—সখা কেহ নাই?

সন্ন্যাসী—কেহ নাই।

বালিকা—আমি তবে কাছে রব, ত্যজিবে না মোরে?

সন্ন্যাসী—তুমি না ত্যজিলে মোরে আমি ত্যজিব না।

বালিকা সকলের তাড়িত, সন্ন্যাসী সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছে; বালিকা স্নেহ প্রেম পায় নাই, সন্ন্যাসী স্নেহ প্রেমের মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। বালিকার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই—সন্ন্যাসীরও তাই; সব শেষে সন্ন্যাসী ছিন্নমোহ নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে বলিয়াছে—

তুমি না ত্যজিলে মোরে আমি ত্যজিব না।

বাল্মীকিপ্রতিভায় বাল্মীকিকে ছলনা করিবার জন্য সরস্বতী বালিকা বেশে আসিয়াছিলেন, এখানে তেমনি প্রকৃতি স্বয়ং এই বালিকার ছদ্মবেশে আসিয়াছে কি ?

এইরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে স্নেহ প্রেমের দ্বারা পিচ্ছিল অবরোহমুখী প্রকৃতির পথে সন্ন্যাসী প্রথম ধাপ ফেলিল ; তারপর হইতে অনিবার্য গতিতে সে নিদারুণ মোহভঙ্গের পরিণামের মুখে গড়াইয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে উদ্ধার পাইবার আশায় সে প্রাণপণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সবই বৃথা। মুহুর্মুহু ধাপে ধাপে সে সংসারের মাধ্যাকর্ষণের টানে নামিয়া চলিয়াছে আর প্রতিশোধ-পিপাসী প্রকৃতি নীরবে মৃদুমন্দ হাসিয়াছে।

এই প্রথম ধাপ ও চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির কালের মধ্যে সংসার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর মনে ধীরে ধীরে ভাব-বিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথমে আমরা দেখিয়াছি, সংসারে বাহির হইয়া পড়িবার পূর্বে সংসারকে কেমন যে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল—'বিশ্ব ভস্ম হ'য়ে গেছে জ্ঞান চিতানলে।'

বালিকার স্নেহে সগোচরে জড়িত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির লুপ্তপ্রায় সত্তার নূতন নূতন রূপ সন্ন্যাসীর চোখে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় ধাপটিতে দেখি, সন্ন্যাসী মোহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তখনো তাহার বিশ্বাস নিজে সে এই মোহের অতীত। সন্ন্যাসী বলিতেছে—

> বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে ?
> হায় হায় একি ভ্রম ! জানেনা সরলা
> নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহ-রেখাহীন।
> তাই মনে ক'রে যদি সুখে থাকে, থাক্।
> মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

কিন্তু এত নির্বিকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও সন্ন্যাসীর এক একবার

সন্দেহ জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে—তবে কি সত্যই সে স্নেহপ্রেমের বশীভূত হইতে চলিয়াছে? প্রকৃতির জগদ্ব্যাপী পাশে ধরা পড়িবার মুখে আসিয়া সে দণ্ডায়মান?

একি রে মদিরা আমি করিতেছি পান।
একি মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!

* * *

পড়িছে জ্ঞানের চোখে মোহ আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেনরে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে।

তৃতীয় ধাপে দেখি সন্ন্যাসী প্রকৃতিকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু তখনো তাহার বিশ্বাস, নিজে সে এই সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে। নিজে সে রাজাধিরাজের বিবিক্ত-গৌরবে আত্মকর্তৃত্বের সিংহাসনে সমাসীন আর প্রকৃতি দাসীর মতো সৌন্দর্যের মায়াভিনয় করিয়া চলিয়াছে।

সহসা পড়িল চোখে একি মায়াঘোর,
জগতেরে কেন আজি মনোহর হেরি!
প্রকৃতি এমন তোরে দেখিনি কখনো;
এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর
দূর হ'তে ব'সে ব'সে দেখি না চাহিয়া!
হেথায় বসি না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।
খেলা কর সমুখেতে চন্দ্রসূর্য নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর মোর পূজা।

*   *   *

আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর
তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া !

চতুর্থ ধাপে দেখি সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসমোহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে ; সে নিঃসংশয়ে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছে। তখন জগৎ যে কেবল সৌন্দর্যময়, আনন্দময়, প্রেমময়, তাহা নয়—প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্যের সাতনরী হার দিয়া প্রকৃতিকে সে বরণ করিয়া লইয়াছে।

সন্ন্যাসী জগৎকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়া যে বালিকাকে পিতৃস্নেহে গ্রহণ করিয়াছে এমন বলা চলে না, বরঞ্চ বালিকার স্নেহের সেতুপথেই সে জগৎ-সত্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সন্ন্যাসী বালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে—

আমি তো ডাকিনি তোরে নিজে এসেছিস্
একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভাল ক'রে।
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হ'তে কে তোরে পাঠালে ?
সেথা হতে সাথে ক'রে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ ?
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর।
মরি কি অমিয়াময়ী লাবণ্য প্রতিমা।
সরলতায় তোর মুখখানি দেখে
জগতের পরে মোর হ'তেছে বিশ্বাস।

*   *   *

জগৎ কি তোরি মত এত সত্য হবে !
চল্ বাছা গুহা হ'তে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের একপারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি ব'সে আছি,

মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ অতীত এই পারাবার হ'তে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।

বালিকা উপলক্ষ্য মাত্র; সংসারের কূলে পৌঁছাইয়া দিবার সে 'সোনার তরণী', সন্ন্যাসী এখনো তরণীটাকেই লক্ষ্য ভাবিতেছে, কিন্তু কবি কৌশলে তরণীখানাকে সরাইয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন আসল লক্ষ্য কোথায়।

সন্ন্যাসী বালিকার স্নেহের সূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে জগতের স্বরূপ বুঝিতে পারিতেছে।

আহা একি চারিদিকে প্রভাত বিকাশ।

জগৎ-রহস্যে প্রবেশের স্বর্ণময় দ্বারটি এতদিনে সে দেখিতে পাইয়াছে—

ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে তো দেখিতে পাবো স্বরূপ ইহার।

ভালবাসার দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিতেই জগতের চিরন্তন কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে অভাবিতপূর্ব স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল—

জগতের মুখে আজি একি হাস্য হেরি!
আনন্দ-তরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি।
আনন্দ হিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখীর গলায়,
আনন্দে ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

এখন এই আনন্দময় জগতে প্রেমসেতুমাত্র পথে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিল তাহার অনন্তের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। দিগম্বর অনন্ত জগতের কোণে সংসার পাতিয়া বসিয়া আছেন; একা অনন্ত নহে, অনন্ত ও অনন্তময়ী মিলিত হওয়াই 'জগতঃ পিতরৌ', এ জগৎ তাহাদেরই সৃষ্টি।

অসীম হ'তেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।

যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার।
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তার আয়ত্ত করিতে।
বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা তো কোথাও নাই—সীমা সে তো ভ্রম
ভাল ক'রে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখি করিব না ঘৃণা।
লোক হ'তে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থরূপ কে পায় দেখিতে।
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ
ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে তো দেখিতে পাবো স্বরূপ ইহার।

এই বোধটি সন্ন্যাসীর মনে উদিত হইয়া সীমা ও অসীমের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে; তাই সে আর লোকালয় হইতে দূরে থাকিতে চায় নাই, কমণ্ডলুমাত্র সহায় করিয়া জগৎ-সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছা করে নাই, কারণ এখন সে যে সাক্ষাৎ সোনার তরীর আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

যাক্ রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত!
দূর কর, ভেঙ্গে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু।
আজ হ'তে আমি আর নহিবে সন্ন্যাসী!
পাষাণ সঙ্কল্প ভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলি বাঁচি একেবারে।

হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না।

যে একদিন সংসার হইতে বিবিক্ত থাকাকেই জীবনাদর্শ মনে করিত, সংসারের দশজনের সঙ্গে একতম হইয়া মিলিতে আজ তাহার কি আগ্রহ!

কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদের সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সব বাঁধা আছি মোরা।
পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে ক'রে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,
যত ওড়ে, যত ওড়ে যত উর্ধ্বে যায়
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।[১]

একি সেই লোকের উক্তি প্রথম সংসারের পথে বাহির হইয়া জনপ্রবাহ দেখিয়া যে ধিক্কারে অবজ্ঞায় অনুকম্পায় বলিয়াছিল—

পথ দিয়া চলিতেছে, এরা সব কারা।
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারি নে,
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কি চায় কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা।

১ আত্মপরিচয়; পৃঃ ১৯—২৪।

এক কালে বিশ্ব যেন ছিলরে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মত,
আজ যেন এরা সব ছোট হ'য়ে গেছে।

সন্ন্যাসীর চোখে জগৎ-দৃশ্যের আজ একি আনন্দময় পরিবর্তন

আজ এ জগৎ হেরি কি আনন্দময়
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে।
নদী তরুলতা পাখী হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসি মুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধূলায় বসে' খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।

একি সেই লোকের উক্তি মোহভঙ্গের পূর্বে জগৎ দেখিয়া যে বলিয়াছিল—

একি ক্ষুদ্র ধরা! একি বদ্ধ চারিদিকে!
কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি গাছপালা গৃহ,
চারিদিক হ'তে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপর যেন চাপিয়া পড়িবে!
চরণ ফেলিতে যেন হ'তেছে সঙ্কোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা।
এই কি নগর! এই মহা রাজধানী!
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহ গুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা।

সন্ন্যাসীর তো সন্ন্যাসমোহ ভঙ্গ হইল। কিন্তু তাহা সহজে সাধিত হয় নাই—তাহার জন্য কঠিন আঘাতের প্রয়োজন ছিল। এই আঘাত আসিল, বালিকার, রঘু-দুহিতার মৃত্যুরূপে। সন্ন্যাসীর অবহেলার কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া বালিকার মৃত্যু হইল। জগতের আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসী গুহামুখে ফিরিয়া দেখে বালিকার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। প্রকৃতিকে অবহেলা করিবার ইহাই চরম প্রতিশোধ। এই অভিজ্ঞতা না ঘটিলে সন্ন্যাসীর পক্ষে জীবনোপলব্ধি পূর্ণ হইত না; জগতের প্রেমের আনন্দ সে বুঝিয়াছিল, এবারে সে প্রেমের দুঃখও বুঝিতে পারিল। এই মৃত্যু যেমন তাহার মোহভঙ্গের জন্য প্রয়োজন, তেমনি জীবনোপলব্ধির পক্ষেও সমানভাবে প্রয়োজন।

"প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মধ্যে তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল"।[১]

ইহাই নাটকখানির পরিপূর্ণ আদর্শ, কিন্তু নাটকের মধ্যে শুধু মোহভঙ্গের পালা প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হইলেও ইহার নাটকোত্তর পরিমাণ সেই আদর্শেরই সূচনা করিতেছে।

৪

সন্ন্যাসীর জগৎ ও ব্যক্তিত্ব ছাড়া প্রাত্যহিক বাস্তব জগতের অনেক দৃশ্য নাট্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য; জগতের বাস্তব রূপ প্রদর্শন আর সেই বাস্তব রূপের সঙ্গে সন্ন্যাসীর স্বকল্পিত রূপের দ্বন্দ্ব প্রদর্শন।

"প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক যতসব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে;

১ প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবনস্মৃতি।

আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে"।[২]

সন্ন্যাসী ও সংসারের নরনারী, দুয়েরই আদর্শকে কবি ভ্রান্ত বলিতে চান। সন্ন্যাসীর ভ্রান্তির অবসানই প্রদর্শিত হইয়াছে; বাস্তবের ভ্রান্তির অবসান দেখাইবার অবসর কবির ঘটে নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধের বহুকাল পরে লিখিত জীবন-স্মৃতিতে তাহার আলোচনা কিয়ৎ পরিমাণে কালাত্যয় দোষের দ্বারা খণ্ডিত। নাটকটি লিখিবার সময়ে সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে জীবন-স্মৃতিতে আলোচিত তত্ত্ব কবির মনে ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। তিনি যেন বলিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই সংসারের বাস্তব রূপ। হাসিকান্না, ভালমন্দ, তুচ্ছবৃহৎ; সত্যবিদ্রূপ মিলিয়া মিশিয়া সংসার এক সজীব, অদ্ভুত এবং মোটের উপরে আনন্দময় অভিজ্ঞতা। ইহারা পূজার নৈবেদ্য লইয়া যাত্রা করিয়া পথের মধ্যে রঙ্গ-তামাসা করিয়া নিরুদ্বেগে ঘরে ফিরিয়া আসে। "আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর একদিন আস্‌তে হবে।" ইহারা এমনই সংসার রসের রসিক। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, কি স্থূল হইতে সূক্ষ্ম নামক গভীর বিতর্কের সময়ে সামান্য বাক্যখণ্ড পাইয়া নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরিয়া যায়—ইহারা এমনই অদ্ভুত। নিতান্ত নিরাশ্রয় ব্যক্তিও স্পর্শদোষ বাঁচাইবার ইচ্ছায় অস্পৃশ্যের কুটির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে—ইহারা এমনই নির্বোধ। চুল-চেরা আদর্শের সঙ্গে না মিলিলে দুঃখ করিয়া ফল নাই। সংসারের চেহারা বদলাইবার সম্ভাবনা নাই—বরঞ্চ আদর্শটাকে গড়িয়া পিটিয়া পরিবর্তন করিয়া লও। ইহাই যেন নাটক রচনাকালে থাকিলে নাটকের মধ্যে প্রাত্যহিক নরনারীর বাস্তব মোহভঙ্গের আভাসের একটা ইঙ্গিতও অন্ততঃ থাকিত।

---

২ প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবনস্মৃতি।

এই নাটকে সন্ন্যাসীর চরিত্র ছাড়া অন্য চরিত্র পূর্ণাঙ্গ করিয়া আঁকিবার চেষ্টা নাই।

রঘু-দুহিতার ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ; এই চরিত্রটির একমাত্র উদ্দেশ্য সন্ন্যাসীর সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে উদ্বোধিত করা। অন্য সব নরনারীরা ছায়ামাত্র। কিন্তু এখানে তাহা দোষ না হইয়া গুণের বিষয় হইয়াছে, কারণ সন্ন্যাসীর চোখ দিয়াই ইহাদের দেখানো হইয়াছে আর সন্ন্যাসী সুদূর কল্পনার জগৎ হইতে ইহাদের ছায়ারূপেই যে দেখিতে পাইয়াছে।

রঘু-দুহিতার চরিত্রটি বৃহত্তর এক কারণেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে, প্রকৃতির প্রতিশোধের আগেও বটে, পরেও বটে, হঠাৎ নাটকের ঘটনাস্রোতের মাঝখানে একটি বালিকা আসিয়া পড়ে; অনেক সময়ে সে ব্যক্তিবিশেষের কন্যা, অনেক সময়েই আবার সে অজ্ঞাতকুলশীলা।[১] তাহার আবির্ভাবের পরে ঘটনাস্রোত অপ্রত্যাশিতপূর্ব পরিণামমুখী হইয়া পড়ে। এই বালিকাগুলির ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ, অধিকাংশ সময়েই তাহারা অল্পবিস্তর নিষ্ক্রিয়, অনেক সময়েই ঘটনাস্রোতের মোড় ঘুরাইয়া দিবার পরে তাহারা সরিয়া যায় কিংবা অর্ধ প্রচ্ছন্নভাবে পটভূমিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঘটনাস্রোতের তাহারা কারণ হইলেও কার্যের উপরে তাহাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বেশী থাকে না। রঘু-দুহিতা এই জাতীয় বালিকাদের অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে অনেক সময় স্থান ও কালের সন্নিবেশের মধ্যে গভীর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে। বিশেষ, যে নাটকগুলিকে আমরা তত্ত্বনাট্য বলিতেছি, তাহাতে স্থান ও কাল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের গুরুত্বে পূর্ণ। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে রসানুভূতি সম্পূর্ণতর হইবার আশা করা যায়।

১। প্রায় সমকালীন রচনার মধ্যে রাজর্ষির হাসি এবং বাল্মীকি প্রতিভার বালিকা' বিশেষভাবে তুলনীয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর 'গুহা' এইরকম একটি রহস্যময় স্থান, প্রথম দৃশ্যের স্থান এই গুহা, শেষ দৃশ্যের স্থান গুহামুখ। এই গুহা আর কিছুই নয়, ইহা সন্ন্যাসীর বিশ্ববিহীন আত্মকেন্দ্রী অন্ধকার ব্যক্তিত্ব মাত্র। এখানেই সন্ন্যাসীকে প্রথম আমরা দেখিতে পাই। বিশ্ববিনাশের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই গুহা ত্যাগ করিয়া সংসারের রাজপথে সে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইতে বসিয়াছিলাম অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া, দিল, এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে।[১]

সন্ন্যাসীর গুহা ও উপরে উল্লিখিত 'অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহা' একই বস্তু। ইহার পূর্ব বৎসরে লিখিত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' গুহাও একই ইঙ্গিতে পূর্ণ। নির্ঝর আত্মকেন্দ্রী ব্যক্তিত্বের অন্ধকার গুহা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নির্ঝর, সন্ন্যাসী ও কবি স্বয়ং তবে প্রত্যেকের পরবর্তী কালের ইতিহাস এক রকম নয় পরবর্তী কালে কবি যাহাকে 'হৃদয়অরণ্য' নাম দিয়াছেন তাহাও প্রকৃতির প্রতিশোধের গুহা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার পনেরো ষোলো হইতে বাইশ তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা এক অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। * * * অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলো সেইরূপ পরিমাণ

১। প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবনস্মৃতি, ৪০৯—৪১০, র-র, ১৭শ

বহির্ভূত অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।[১]

প্রকৃতির প্রতিশোধ কবির তেইশ বছর বয়সে লিখিত।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাত সঙ্গীতের কবিতাগুলিকে নিষ্ক্রমণ নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা।[২]

কবির মত প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীও হৃদয়ারণ্য পরিত্যাগ করিয়া বাহির বিশ্বে 'নিষ্ক্রমণ' করিয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল হৃদয়ারণ্য ও গুহা মূলত একই বস্তু এবং তাহা কবির জীবনের সাথে সম্বদ্ধ।

সপ্তম দৃশ্যের পর্বত শিখরও এমনি একটা প্রচ্ছন্ন আভাসে পূর্ণ। সন্ন্যাসী তখনো সংসারের মধ্যে নামিয়া পড়ে নাই; দূর হইতে, উচ্চ হইতে, সিদ্ধিজাত অহংকারের উর্ধ্ব লোক হইতে তখনও সেই সংসারকে দেখিতেছে—সংসারকে নীচু, দূরগত অথচ সুন্দর মনে হইতেছে, পর্বতশিখর হইতে যেমনটি মনে হয় আর কি। সন্ন্যাসীর এই বিবিক্ত উচ্চতার ভাবটি প্রকাশের জন্য পর্বতশিখরের অবতারণা করা হইয়াছে।

চতুর্দশ দৃশ্যের 'প্রভাতটিও' মহত্তর দ্যোতনায় উজ্জ্বল। ইহা কেবল জাগতিক প্রভাত নয়, সন্ন্যাসীর নবজীবনের প্রভাত; তাহার মোহভঙ্গের প্রভাত; ইহা 'প্রভাত সঙ্গীতের' প্রভাত; ইহা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও 'প্রভাত উৎসবের' প্রভাত। 'প্রভাত উৎসবের' ও চতুর্দশ দৃশ্যের প্রভাতে সংসারের যে বর্ণনা আছে ভাবের ঐক্য ছাড়াও বহুস্থলে প্রায় আক্ষরিক মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্থানের সূত্রে যেমন দেখিয়াছি, কালের সূত্রেও তেমনি দেখিলাম—প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির ব্যক্তি-

১। ভগ্নহৃদয়—জীবনস্মৃতি, ৩৭৩ র-র, ১৭শ

২। প্রভাত সঙ্গীত—জীবনস্মৃতি, ৪০১—৪০২, র-র, ১৭শ

জীবনের কতখানি ঐক্য। বাস্তবিক কবি ঠিকই বলিয়াছেন, প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি (কবির ব্যক্তিগত জীবনের) একটু অন্য রকম করিয়া লিখিতে হইয়াছে।

এই নাটকটিতে অনেকগুলি রাজপথ, পথ পথপার্শ্ব প্রভৃতি দৃশ্য আছে। এগুলি আর কিছু নয়—সংসারের আনাগোনা, চঞ্চল জীবনযাত্রাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এগুলি আবশ্যক। সন্ন্যাসীর জীবন ও বাস্তব জীবনে দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে, তেমনি রাজপথ ও পথের প্রত্যক্ষ প্রভেদ দেখানো হইয়াছে গুহা ও গুহামুখের সহিত।[১]

৫

প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাটকীয় টেক্‌নিকের প্রথম সূচনা দেখা যায় প্রকৃতির প্রতিশোধে, এখানে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নয়। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রবীন্দ্র প্রতিভায় বিশিষ্ট নাটকগুলি ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মেলার চঞ্চল, জটিল, কোলাহলময় ও সঙ্গীতময় জীবনযাত্রাকে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। বাংলাদেশের মেলা ও বাংলাদেশের পথ এই দুটি মিলিয়া যে রসের সৃষ্টি করে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পরিণত নাটকের সেই রস। এই নাটকখানির পথবহুল দৃশ্যগুলিতে, নানা জাতীয় লোকের নানা কারণে আনাগোনায়, হাসি-তামাসায়, উদ্দাম কোলাহলে, অকারণ উল্লাসে কবি মেলার ভাবটিকে প্রথম ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন; খুব সম্ভব এখনো ইহা তাঁহার সজ্ঞান প্রয়াস নয়—অচেতন মনের অন্ধ আবেগ। মেলাতে সংসারী লোক ছাড়াও কত অকাজের সন্ন্যাসী বাউল দেখা যায়—এই 'সন্ন্যাসী'টিকেও

১। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ফাউস্ট নাটকের দৃশ্যগুলির মধ্যেও অনুরূপ দ্বন্দ্ব ও ইঙ্গিত বর্তমান।

সেখানে দেখা গেল। পরবর্তী নাটকে শুধু সন্ন্যাসী নয়—বাউলকেও আমরা দেখিতে পাইব।

শারদোৎসব

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে সব নাটককে ঋতু উৎসব পর্যায়ের মনে করেন, শারদোৎসবে তাহাদের সূচনা।[১] কিন্তু আমরা তাঁহার নাটকের যে শ্রেণীভেদ করিয়াছি, তাহাতে শারদোৎসব ঋতুনাট্য পর্যায়ভুক্ত নহে। সূক্ষ্ম বিচারে ইহা ঋতুনাট্য শ্রেণীর না হইলেও প্রকৃতি ইহাতে মুখ্য হইয়া উঠিয়া মানুষের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চকে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ঋতুনাট্যে মানুষ যেমন একেবারে পটভূমিকায় গিয়া পড়িয়াছে, শারদোৎসব তেমন নয়—তবে ধারাটা সেই দিকেই চলিয়াছে বটে। কাজেই এখানে ঋতু-উৎসবের মূলতত্ত্ব আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সাহিত্যের উপজীব্য, আবার মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধও সাহিত্যের উপজীব্য। ঋতু-উৎসব এই শেষোক্ত সম্বন্ধজাত শিল্প-সৃষ্টি।

পৃথিবীতে মানবিক পরিধি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু মানুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই এই পরিধি বিস্তৃততর হয়; আবার মানুষ যখন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এই পরিধি ও চরাচর মিলিয়া অনন্তে পরিণত হয়—তখন সীমায় ও সীমাহীনতায় আর ভেদ থাকে না।

মানুষ যদি কেবল মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত, তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম ত কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম।

---

১ বিশ্বভারতী কর্তৃক ১৩৩৩-এ প্রকাশিত ঋতু-উৎসব নামক সংগ্রহ গ্রন্থে নিম্নোক্ত পাঁচটি নাটক আছে—শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত সুন্দর, ফাল্গুনী।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানারূপে জাগিয়া উঠিতেছে।[১]

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দুইটি সম্বন্ধ, একটি প্রয়োজনের, অপরটি প্রেমের। প্রকৃতির সম্পদ গ্রহণ করিয়া মানুষ জীবন ধারণ করিতেছে, সেখানে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর ভেদ নাই। এখানে প্রকৃতিকে সে উপকরণমাত্ররূপে দেখিতেছি। কিন্তু যখনই প্রেমের সম্বন্ধ আরম্ভ হয়, প্রকৃতি উপকরণরূপ ত্যাগ করিয়া সজীব সত্তা হইয়া উঠে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির কাজ মানুষের প্রাণের মহলে; প্রেমের ক্ষেত্রে তাহার কাজ মানুষের চিত্তে। এখানে প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া তাহার নূতন দ্যোতনার সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল-ফল-ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য কেবলমাত্র এক-মহলা; মানুষ যদি তাহার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে, তবে সেটা তাহার পক্ষে বড় লাভ নহে। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণ, মন, বিশেষ শক্তি, বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি, তখন আমাদের মিলন আরো বড় হইয়া ওঠে। তখন আকাশ, বাতাস, গাছপালা, পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে-প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্য-সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার কখনো নিষ্ফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র, তখন তাহা না থাকিবারই সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণ-মনের সম্বন্ধ অনুভবেই আমরা সৃজন ক্রিয়ার

১ গ্রন্থ পরিচয়,র-র, ৭ম খণ্ড।

সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি। চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজন-শক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে, তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে—সেই হৃদয়ে যদি কোন রঙ না লাগে, কোন গান না জাগিয়া ওঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।[১]

মানুষের নিজের জন্যই, নিজের আত্মোপলব্ধির জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হওয়া আবশ্যক। আত্মোপলব্ধি মানে নিজের সীমানাকে খুঁজিয়া পাওয়া। মানুষ নিজের সীমানা খুঁজিতে বাহির হইলে দেখে, মানুষের সংসার ছাড়াইয়া তাহা বহুদূর বিস্তৃত। প্রাণের প্রয়োজনে মানুষ ও প্রকৃতির জগতের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য সীমান্ত প্রদেশ আছে, কিন্তু প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতির জগতে বিচ্ছেদের কোন সীমান্ত রেখা নাই; মানুষ প্রেমের আলো হাতে অগ্রসর হইয়া দেখে দুই-এ মিলিয়া এক অখণ্ড বিরাট জগৎ; এই বিরাট জগতে পৌঁছিয়া মানুষ নিজেকে বিরাটতররূপে দেখিতে পায়—ইহাই তাহার যথার্থ আত্মোপলব্ধি।

ইউরোপীয় সাহিত্যে ঠিক এই জাতীয় ঋতুনাট্য আছে কিনা, জানি না; কিন্তু ইউরোপীয় প্রকৃতির চৈতন্যময় প্রেমঘোষিত রূপটি ঠিক বোঝে না। গ্রীকরা মানুষকে একান্ত করিয়া দেখিয়াছিল। প্রকৃতি যেখানে তাহাদের কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে, হয় সেখানে সে ভীষণ, মানুষের সঙ্গে তাহার প্রতিযোগিতা, সে একটা বিরুদ্ধ শক্তি, নয় সে মুগ্ধ খেলার সামগ্রী; খেলা শেষে তাহা বাহিরের মহলেই পুনঃস্থাপিত হয়, ভিতরের মহলের খেলার সামগ্রীর স্থান কোথায়? মধ্যযুগের 'গথিক' স্থাপত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে ইউরোপীয় শিল্পে প্রকৃতির স্থান সসঙ্কীর্ণ ও মানুষের অনেক নীচে। সংস্কৃত নাটকে

ইতর পাত্রপাত্রী যেমন প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিত, ইউরোপীয় শিল্পে প্রকৃতিও তেমনি সসম্ভ্রমে, সসঙ্কোচে কথা বলে—শিল্পের উচ্চ স্তরে তাহার প্রবেশ বাধাগ্রস্ত।

প্রকৃতিকে অসঙ্কোচে আত্মীয়রূপে চিত্তমহলে গ্রহণ করিবার ভাবটি একান্ত ভাবে ভারতীয় এবং এদিক হইতে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য প্রকৃতির সহিত প্রেমের সম্বন্ধ জ্ঞাপন ভারতীয় ধারার অন্তর্গত। যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে মূলত বৈদেশিক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি মনে করেন তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ অবগত নহেন বলিয়াই মনে হয়।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই নাটকের পালা।[১]

এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ঋতুনাট্য ও ঋতু-উৎসবের পালা মুখ্যত শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্যই রচিত। ঋতু-উৎসব এই বিদ্যালয়ের একটি প্রধান অঙ্গ; বস্তুত কবির ঋতু-উৎসবের পালা ও এই বিদ্যালয়কে ভিন্ন করিয়া দেখা একরকম অসম্ভব। তাঁহার ঋতু-উৎসবের যথার্থ পটভূমি ও পীঠস্থান এই আশ্রমবিদ্যালয়। ইহার কারণও আছে, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন, তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে প্রকৃতির বিশেষ স্থান আছে। তাঁহার বিদ্যালয়ে যেমন ধর্মোপদেশের দ্বারা ছাত্রদের কাছে ভগবানের ইঙ্গিতদানের চেষ্টা আছে, তেমনি ঋতু-উৎসবের দ্বারা ছাত্রদের মনকে প্রকৃতির প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টাও আছে, কারণ মানুষ, প্রকৃতি ও ভগবানে মিলিয়াই তাঁহার জগৎ সম্পূর্ণ।

আমাদের দেশে সাধারণত যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, যে-শিক্ষা তিনি নিজে বাল্যকালে পাইয়াছিলেন, তাহাতে ধর্মোপদেশের স্থান নাই,

১ গ্রন্থপরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড।

প্রকৃতি সেখানে নির্বাসিত। এইরূপে একপেশে শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে মানব-প্রকৃতি পঙ্গু হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এই পঙ্গুতার বিরুদ্ধেই তাঁর বাল্যকালের চিত্ত বিদ্রোহ করিয়াছিল ফলে বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে মানব-প্রকৃতিরও যে সম্পূর্ণ স্থান আছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। আমাদের বিদ্যালয়গুলি জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাতে মানুষের সবটা রূপ দেখিবার সুযোগ নাই; তাহার মধ্যে পিতামাতা, ভাইবোন-রূপে কেহ প্রবেশ করে না—সেখানে কেবল মানুষের শিক্ষক ও ছাত্র রূপটাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু সংসারে কেহ তো ছাত্র ও শিক্ষক হইয়া জন্মগ্রহণ করে না; পুত্র-কন্যা, ভাইবোন-রূপেই তাহার জন্ম। এই মানবিক সম্বন্ধচ্যুত শিক্ষক ও ছাত্রও মনুষ্যত্বের পঙ্গুরূপ। সেইজন্য আমাদের দেশে প্রাচীনকালের বিদ্যালয়গুলি আশ্রম ছিল, ছাত্র এখানে গুরুর পরিবারভুক্ত হইয়া মানব-সম্বন্ধের পরিপূর্ণতার স্বাদ পাইত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের টোলগুলিতেও এই আদর্শ অনেক পরিমাণে অনুসৃত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্রগণ আশ্রম-পরিবারভুক্ত হইত। অল্প দিনের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে পরিবারচৈতন্য শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রধান সম্পদ—অন্যত্র বাল্যকাল হইতে মানব-প্রকৃতি যেমন ক্ষুধিত থাকিয়া যায়, এখানে তাহা পূরণের ব্যবস্থা ছিল। এই যেমন মানব-সম্বন্ধের দিক, তেমনি বাল্যকাল হইতে ছাত্রদের প্রকৃতির সত্তার প্রতি সচেতন করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল—কারণ মানব আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলে তবেই তাহা পূর্ণতর হইয়া উঠে। আবার মানবকে পূর্ণতর করিবার উপায় ধর্মোপদেশের দ্বারা ভগবতসত্তার প্রতি তাহাকে সচেতন করিয়া তোলা পূর্বেই বলিয়াছি, তাহার ব্যবস্থাও এখানে আছে। এইভাবে মানবকে পূর্ণতার পথে চালিত করাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা।

কাজেই ঋতু-উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনের জীবনে একটা সৌখীন বিলাস মাত্র নয়; পড়াশুনা যেমন অত্যাবশ্যক, ঋতু-উৎসবগুলিও তেমনি অপরিহার্য; একই শিক্ষা-পদ্ধতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এইজন্যই শান্তিনিকেতন আশ্রম ও ঋতু-উৎসবগুলিকে অভিন্ন বলিয়াছিলাম। এই কথাটি আমাদের দেশের লোকে ঠিক বোঝেন বলিয়া মনে হয় না। পঙ্গুতাতেই আমরা এমন অভ্যস্ত যে, তাহাকেই স্বভাবের নিয়ম বলিয়া মনে করি। যতদিন আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মানব-সম্বন্ধের পূর্ণতার স্থান না হইবে এবং প্রকৃতি ও ভগবানের প্রবেশের পথ সেখানে বাধাগ্রস্ত থাকিবে, ততদিন এই পঙ্গুতাই চলিতে থাকিবে; সর্বাঙ্গীণ মানুষ সৃষ্টির রাজপথ প্রস্তুত হইবার কোন আশাই থাকিবে না।

ঋতু-উৎসবের তত্ত্ব সম্বন্ধে কবি এ পর্যন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব ঋতুর বিষয়েই সমানভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু ঋতুতে ঋতুতে ভেদ আছে; এক এক ঋতু এক এক রস বহন করিয়া আসে; শরৎ ঋতুর বিশেষ রসটি কি? অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের চোখে শরতের কোন বিশেষ মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়াছে? অর্থাৎ এই শারদোৎসব নাটকের বিশেষ রসটি কি? কবির কি বাণী ইহাতে আছে, এবারে দেখা যাক।

শারদোৎসব বড় সাধারণ রকমের নাম। রূপান্তরিত ঋণশোধ নামটিতে নাটকের মর্মকথা অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকৃতির প্রেম নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিলে মানুষ যে শুধু ঋণী হইয়া থাকে এমন নয়, ঋণের দুর্লঙ্ঘ্য বাধার ফলে মিলনটি খণ্ডিত হইয়া যায়। একদিকে প্রকৃতি যেমন প্রেম দিতেছে, মানুষকেও তেমনি প্রেমদান করিয়া তাহার ঋণশোধ করিতে হইবে তবেই যথার্থ মিলন হইবে ইহাই 'ঋণশোধে'র মর্মকথা।

শরৎপ্রকৃতির মধ্যে জগতের এই ঋণপরিশোধের মূর্তিটাই কবির চোখে পড়িয়াছে, বিশেষভাবে ইহাই শরৎপ্রকৃতির লক্ষণ।

সন্ন্যাসী

আমি অনেক দিন ভেবেছি, জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি, জগৎ আনন্দের ঋণশোধ করেছে। বড় সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি ত্যাগ করে করছে! সেইজন্যই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা

একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর একদিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চল্‌ছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কি, সেকথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে। মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠ্‌ছে।

প্রকৃতির আনন্দের ঋণপরিশোধের অনুরূপ লীলা মানুষের জগতেও চলিতেছে। সে মূর্তিটি ধরা পড়িয়াছে উপনন্দের চরিত্রে। সে গুরুর ঋণ বড় দুঃখে পরিশোধ করিতেছে, সেই দুঃখই তাহার আনন্দ হইয়া উঠিয়াছে।

উপনন্দ

আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা

উপনন্দ, জগতে আবার তোমার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ

ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়াছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী, সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

হায়, হায়, তোমার মত কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়, আর এমন দিনেও ঋণশোধ? ঠাকুর, আজ নূতন

উত্তরে হওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভ'রে উঠেছে। এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে, এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী

বল কী, এর চেয়ে সুন্দর আর কী আছে? ঐ ছেলেটিই তো আজ শারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখ তো। লেখো, লেখো, বাবা তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌ছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ, তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারবো না।

ঋণশোধের আনন্দে দুঃখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে উপনন্দের কাছে —আর তাহার ছুটিই সকলের চেয়ে সার্থক, কারণ সে ছুটি ঋণভার হইতে মুক্তি।

আবার এই ঋণশোধের আর এক মূর্তি সম্রাট বিজয়াদিত্যের মধ্যে। তিনি রাজ ঋণশোধ করিবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সিংহাসনের নির্বাসন হইতে মুক্ত হইয়া আজ তিনি দীনতম প্রজাটির সমকক্ষ হইতে চাহেন, আজ তিনি সামন্ত রাজা সোমপালের নিন্দা ও স্পর্ধাবাক্য স্বকর্ণে শুনিয়া নিজেকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

বিজয়াদিত্য

মন্ত্রীর মনে এই বড় ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে করবার জন্য আমার মন নেই।

শেখর

বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে, তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য

অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণশোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কি ক্ষমতা আছে বল? আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর

প্রেম ত সে অমৃত, মহারাজ![1]

এখন মানব প্রকৃতিতে এই ঋণশোধের অন্তরায় কি? তাহার কোন্ দোষে বিশ্বে যে উৎসব চলিতেছে, তাহা উজ্জ্বলতর না হইয়া ম্লান হইয়া যায়?

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, সেখানেই ঋণশোধ ঢিল পড়ে যাচ্ছে। সেখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।

ঠাকুরদাদা

সেইখানেই যে এক পক্ষ কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষেশ্বর—সে বণিক্ আপনার স্বার্থ লইয়া টাকা উপার্জন লইয়া সকলকে সন্দেহ করিয়া ভয় করিয়া ঈর্ষা করিয়া সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে? সেই রাজা, যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায়, সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া সুন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।[2]

---

১ ঋণশোধ নাটকের ভূমিকা।

২ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড।

এই উৎসবের বাধা লক্ষেশ্বর, তাহার মনে আনন্দ না থাকায় সে আনন্দের ঋণশোধ করিতে অক্ষম, আর এক বাধা সোমপাল, ঈর্ষাজর্জরিত সেই হতভাগ্য রাজত্বের ঋণশোধে অসমর্থ। আর এই উৎসবের সহায় উপনন্দ, সে গুরু ঋণশোধ করিতেছে, বিজয়াদিত্য রাজ ঋণশোধ করিতেছে, শেখর কবি কবিত্বের দ্বারা ঋণশোধ করিতেছে, আর ঠাকুরদাদা সর্ববন্ধনহীন ব্যক্তি ভক্তিতে, বাৎসল্যে সংসারের ঋণশোধ করিতেছে।

এই ঋণশোধেরই অপর নাম প্রকাশ। ধানের ক্ষেত প্রকৃতির ঋণ শস্যভারে প্রকাশ করিতেছে, সেই তাহার ঋণশোধ; নদীর ধারা আপন উদ্বেলতা প্রকাশ করিয়া বর্ষার ঋণশোধ করিতেছে। মানব প্রকৃতিও যেখানে আত্মপ্রকাশশীল, সেখানে তাহার ঋণশোধ হইতেছে; কবি কবিতার দ্বারা, শিল্পী শিল্পসৃষ্টির দ্বারা, কর্মী কর্মের দ্বারা, প্রেমী প্রেমদান করিয়া যুগপৎ আত্মপ্রকাশ ও ঋণশোধ করিতেছে। এই প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য—"বিশ্ব প্রকৃতিতেও এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য, আনন্দরূপমমৃতম্"। এই প্রকাশই মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে, ততই বন্ধনমোচন হয়—কর্মকে এড়াইয়া তপস্যায় ফাঁকি দিয়া পরিত্রাণ লাভ হয় না"।[১]

সেই জন্যই আত্মপ্রকাশের দ্বারা ঋণভার মুক্ত কবি, শিল্পী, সাধক, রাজসন্ন্যাসী সকলেই মুক্তপুরুষ; সেই জন্যই রাজসন্ন্যাসী বিজয়াদিত্যের যোগ্য সহচর শেখর কবি ও ঠাকুরদাদা, আর উপনন্দের সঙ্গে তাহাদের এমন একাত্মকতা!

এতো গেল তত্ত্বের কথা। কিন্তু এই তত্ত্বকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে কি উপায়ে? গল্প-গ্রন্থি, ঘটনাপ্রবাহ, নাটকীয় পরিণাম, চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি যেসব মাপকাঠির দ্বারা সাধারণ নাটকের বিচার হইয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব, ফাল্গুনী, ডাকঘর, রক্তকরবী

১ গ্রন্থপরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড।

প্রভৃতি তত্ত্বনাট্যে তাহার প্রয়োগ চলিবে না। এসব স্বতন্ত্র জাতির নাটক। এসব নাটকে রসোদ্বোধনের প্রধান উপায় সঙ্গীত ও সময়োপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি। সুর ও কথার দ্বারা সুকুমার একটি আবহাওয়া ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া ওঠে; এ যেন এক প্রকার কল্পনার কুহেলিকা; এই কুহেলিকা পাঠক ও দর্শককে বেষ্টন করিয়া ক্ষণকালের জন্য কবির বাণীর সঙ্গে একাত্ম করিয়া ফেলে তখন ইহার শিল্পরস ধীরে ধীরে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইয়া যায়। রসোদ্বোধনের এই নূতন উপায়টি অনেকে ধরিতে পারেন না। তাঁহারা সাধারণ নাটকের মানদণ্ড ইহাতে প্রয়োগ করিয়া ইহার অপমান করিয়া বসেন। শরৎকালের এই নাটকটি শরতের শিউলি ফুলের মতই সুকুমার, লঘু হস্তে ইহাকে গ্রহণ না করিয়া স্থুলহস্তাবলেপ চাপাইতে গেলে ইহা ম্লান হইয়া পড়ে। এ-সম্বন্ধে কবি সচেতন এবং পাঠককেও বারে বারে সচেতন করিয়া দিয়াছেন।

শারদোৎসবের প্রথম অভিনয় উপলক্ষে কবি একটি নান্দী রচনা করিয়াছিলেন—

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতু রসে ভরে দিন সবাকার মন।
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যার পানে উঠিছে চঞ্চলি,
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।[১]

পাঠকের হৃদয়কে গোড়া হইতে উদ্‌গ্রীব অবারিত করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে ঋতুস্বরূপের পক্ষে অনায়াসে তাহা চয়ন করিয়া লওয়া সহজ হয়। এইভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য পাঠককে

১ গ্রন্থপরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড।

কি করিতে হইবে, না সমস্ত ভারবিবর্জিত ছুটির প্রসন্ন লঘু মনোভাব লইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ শারদোৎসব ছুটির নাটক, ওর মধ্যে যদি কাজ থাকে, সে কাজেও কর্ম হইতে মুক্তির সাধনা।

ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে—'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'। ওর মধ্যে একা উপনন্দ কাজ করছে কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।[১]

দর্শককে এই ছুটির আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা আছে শারদোৎসবের ভূমিকায়। এ-নাটকখানিকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, বিশদভাবে কবি তাহা বিস্তারিত করিয়াছেন।

রাজা

তাকে (এই নাটককে) শরৎকালের উপযোগী বলবার মানে কী হ'ল ?

মন্ত্রী

কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্‌কা, তার কোন জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা

একথা সত্য বটে।

মন্ত্রী

কবি বলেন, শরৎকালের শিউলী ফুলের মধ্যে যেন কোন আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে, তেমনি ঝরে পড়ে।

রাজা

একথা মানতে হয়।

১ ভানুসিংহের পত্রাবলী পৃঃ ১৩৬-১৩৭।

মন্ত্রী

কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে-ঘাটে অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা

একথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী

কবি বলেন, শরতের কাঁচা ধানের যে ক্ষেত দেখি, কেবল আছে তার রঙ, আছে তার দোলা। আর কোন দায় যদি তার থাকে সে-কথা একেবারে সে লুকিয়েছে।

রাজা

ঠিক কথা।

মন্ত্রী

তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ওই রকমই হাল্‌কা, ও রকমই নিরর্থক। সে পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।[১]

ওর মধ্যে যে রাজা আছেন, তিনিও রাজত্ব হইতে ছুটি লইয়াছেন, যে ছেলের দল আছে, তারাও কাঁচা ধানের ক্ষেতের মত 'ছুটির ভিতরেই ফসলের আয়োজন' গোপন করিয়াছে—আর ঠাকুরদাদা তো মূর্তিমান ছুটি।

এই কথাটি এত করিয়া বলিবার কারণ—

রাজা

কিন্তু, মন্ত্রী সহজে খুশি হবার বিদ্যা তো পুরবাসীদের বিদ্যা নয়। এইসব হাল্‌কা, এইসব কাঁচা, এইসব না-শেখা ব্যাপারের মূল্য কি তাঁদের কাছে আছে?

---

১ গ্রন্থপরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড।

আবহাওয়ার পরিপূর্ণ মূর্তিটি শারদোৎসব নাটকের মধ্যে আছে। রাজ-সন্ন্যাসী ছেলের দলে যোগ দিয়া শারদার পুরোহিত সাজিয়া তাঁহার আবাহন করিতেছেন।

সন্ন্যাসী

এবারে অর্ঘ্য সাজানো যাক। এই যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র। বাবা, এইবার সব দাঁড়াও। একবার পূর্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদ মন্ত্র পড়ে নিই।[১]

শারদার আবাহন বেদমন্ত্রে এবং সঙ্গীতে।

সন্ন্যাসী

পৌঁছেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁছেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখ্‌তে পাচ্ছো কি, শারদা বেরিয়েছে।[২]

বালকরা তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিতেছে, কিন্তু কিসে আবির্ভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী বলিতেছেন,

কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছো না?

দ্বিতীয় বালক

পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী

তবে আর কি! চক্ষু সার্থক হ'য়েছে, শরীর পবিত্র হ'য়েছে, মন প্রশান্ত হ'য়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না, বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের ক্ষেত কি রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে![৩]

১, ২, ৩ শারদোৎসব, র-র, ৭ম খণ্ড।

এই আবির্ভাবই শারদোৎসবের মূল কথা—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ঋতু-উৎসবের মূল কথা। এই আবির্ভাবকে পাঠক হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে—আর তাহার জন্যই সুরে, কথায়, অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা। কবি ও অভিনেতা এবং দর্শক ও পাঠকের মধ্যে যোগ স্থাপনের প্রধানতম উপায়—অনুকূল আবহাওয়া। রবীন্দ্রনাথের ঋতু-উৎসব বিচারের সময় কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতায় ও তত্ত্বনাট্যে একটা ছায়াসম গুণ আছে, যেন সবটা ধরাছোঁয়া যায় না, ধরিয়াছি মনে করিতেই দেখা যায়, হাতের মধ্যে কিছুই নাই। এ ব্যাপারটা আমরা সকলেই অনুভব করি—কিন্তু কারণ নির্দেশ করিতে পারি না বলিয়া কবিকে দোষী করি, নিজেরাও যে দায়ী হইতে পারি, তাহা বিশ্বাস করি না।

তাঁহার শেষ বয়সের কবিতায় ও তত্ত্বনাট্যে এমন কতগুলি কথা তিনি বলিতেছেন, এমন একটা জগতের খবর দিতেছেন, যাহা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নয়। প্রাত্যহিক জীবনের চিহ্ন দ্বারা, প্রাত্যহিক জগতের ভাষার দ্বারা তাহার প্রকাশ সম্ভব নয়, কাজেই বাধ্য হইয়া ছায়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এই 'ছায়াসম' গুণই একমাত্র সেই জগৎকে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ; তাহার প্রকৃতির মধ্যেই এমন বাধা আছে, যাহাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ আদৌ সম্ভব নয়।

এই কারণেই এইসব নাটকের চরিত্রগুলি ছায়াসম করিয়া গঠিত। অধিকাংশ চরিত্রই type বা শ্রেণীরূপ, চরিত্রের সাধারণ সীমানা আছে, কিন্তু বিশিষ্টতা নাই। ছায়াসম জগতের অধিবাসিগণ শ্রেণীরূপমাত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়। এখানকার রাজা—রাজামাত্র, কোথাকার রাজা জানা অনাবশ্যক।

আবার এইসব নাটকের প্রকৃতিও—প্রকৃতির শ্রেণীগতরূপ, প্রকৃতির সাধারণরূপ, কোন বিশেষ স্থানের প্রকৃতির রূপ নয়। তৎস্থানিকতা ও তৎকালিকতা গুণ নাটকগুলিতে নাই বলিলেই চলে।

বরঞ্চ বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রকৃতির বিশেষরূপ সৃষ্টি করিলে নাটকের 'ছায়াসম' গুণ নষ্ট হইত—আর সে গুণ নষ্ট হইলে কবি কি করিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতেন ?

শারদোৎসব নাটকে এই 'ছায়াসম' গুণের সূচনামাত্র, ইহার পরিপূর্ণ রূপ পরবর্তী নাটকে আছে। ইহার সম্রাট বিজয়াদিত্য রাজসন্ন্যাসীর শ্রেণীরূপ, সোমপাল ঈর্ষাজর্জরিত ক্ষুদ্র সামন্তরাজের শ্রেণীরূপ, মানুষের অমায়িক উদারতা যেন দেহের সব গুণ বর্জন করিয়া ঠাকুরদাদারূপে বিচরণ করিতেছে। ঋণশোধের দুঃখ ও আনন্দকে একত্র ঢালাই করিয়া যেন উপনন্দ চরিত্র সৃষ্ট। ঠিক এই ঋণশোধের ভাবটি প্রকাশের জন্য যেটুকু গুণ অত্যাবশ্যক, উপনন্দ চরিত্রে মাত্র তাহাই দেওয়া হইয়াছে, তদতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয় নাই। সাধারণতঃ এভাবে বিধাতাপুরুষ মানুষ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু কবি তো বিধাতার সৃষ্ট জগতের কথা লিখিতেছেন না, তিনি বিধাতার জগতের পাশে, আর একটা নূতন জগৎ গড়িতেছেন, সেই জগতের প্রয়োজন অনুসারে চরিত্রগুলির সৃষ্টি করিয়া সব লোককে বিচার করিতে হইবে।

একমাত্র লক্ষেশ্বর চরিত্রে কিছু বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু চরিত্রটিতে নাটকীয় গুণের অসীম সম্ভাবনা ছিল, কবি ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের উন্মেষ না করিয়া কেবল তাহার কৃপণ রূপটাকে প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন। ক্ষেত্রান্তরে এই চরিত্রকে বিরাট ট্র্যাজিক চরিত্রে রূপান্তরিত করা যাইতে পারিত। তাহার গজমোতি ও ধনরত্নের পেটিকা সম্রাটের দ্বারা অপহৃত হইলে লক্ষেশ্বর শাইলকের ট্র্যাজিক মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত। কিন্তু শারদোৎসবের নাট্যক্ষেত্র তাহার যথার্থ স্থান নয়। কবি এ লোভ সংবরণ করিয়া অসীম শিল্পবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

শারদোৎসবের প্রকৃতিও বিশিষ্ট গুণবর্জিত। তাহা শরৎকাল, এই মাত্র—শরতের সাধারণতম গুণগুলি ছাড়া আর কোন উপাধি

তাহার নাই। নদীর নাম বেতসিনী দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা না দিয়া নদীমাত্র বলিলেও ক্ষতি ছিল না। মানুষ যেমন বিশিষ্টতাবর্জিত, প্রকৃতিও তেমন গতিবিশেষ। এখানকার মানুষ যে কোন মানুষ, এখানকার স্থান যে কোন স্থান, এখানকার কাল যে কোন কাল। শারদোৎসব ও তত্ত্বনাট্যগুলির বিচারের সময় কথাগুলি সর্বদা মনে না রাখিলে ইহাদের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় না।

অচলায়তন

'অচলায়তন' নাটকে প্রকৃতপক্ষে তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর অচলায়তন আছে। এই মূল তথ্যটি মনে না রাখিলে ইহার সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করা সহজ হইবে না।

প্রথম, অচলায়তনিকদের অচলায়তন

দ্বিতীয়, শোণপাংশুদের অচলায়তন

এবং

তৃতীয়, দর্ভকদের অচলায়তন।

কবির মতে এই তিনটিই অচলায়তন পর্যায়ভুক্ত, তবে নাট্য-শিল্পের খাতিরে মহাপঞ্চকের অচলায়তনের উপরেই শিল্পের আলো উগ্রভাবে ফেলিয়া তাহাকে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখানো হইয়াছে, অপর দু'টিকে তেমন উজ্জ্বলভাবে পাঠকের মনোযোগের কেন্দ্রে আকর্ষণ করা হয় নাই। ইহা কেবল নাট্যকলার অনুরোধে। তত্ত্বের বিচারে অচলায়তন সৃষ্টির অপরাধ তিন দলেরই সমান—তবে তিন দলের অচলায়তনের রূপ স্বতন্ত্র।

রূপ যে স্বতন্ত্র, তাহার কারণ তিন দলের সাধনার পথও ভিন্ন।

মহাপঞ্চকের অচলায়তনের সাধনা জ্ঞানমার্গে

শোণপাংশুর অচলায়তনের সাধনা কর্মমার্গে

এবং

দর্ভক দলের অচলায়তনের সাধনা ভক্তিমার্গে।

এই তিন দল বিভিন্ন তিন মার্গে সাধনা করিয়া চলিয়াছে, তিন মার্গের মধ্যে তাহারা কোনরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা করে নাই, তাহারা নিজ নিজ সাধন পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পন্থা বলিয়া ভাবিয়াছে, সেইজন্য কেহই গুরুর প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে পারে নাই অথচ তিন দলই একই গুরুর অন্বেষণ করিতেছে। ইহাই 'অচলায়তন' নাটকের একেবারে গোড়ার কথা।

মহাপঞ্চকের অচলায়তনিকগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের সাধনার একাগ্রতায় মন্ত্রকে মননের চেয়ে, আচারকে মানুষের চেয়ে এবং পুঁথিকে গুরুর চেয়ে বড় মনে করিয়াছিল—ফলে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া সৃষ্টিছাড়া এক সৃষ্টির মধ্যে তাহারা বাস করিতেছিল। তাহারা নিজেদের চারিদিকে যে প্রাচীর তুলিয়াছিল, তাহা কেবল পাথরের নয়, মোহের মশলার গাঁথুনিতে তাহা প্রায় দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল; এই মোহপিনদ্ধ প্রাচীর ভাঙিবার জন্যই গুরুর আবির্ভাব।

শোণপাংশুর দল কর্মমার্গী—তাহার কর্মরসিক বলিয়া কাজকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কর্ম যে লক্ষ্য নয়, আর কিছুর উপলক্ষ মাত্র তাহা যেন তাহারা ভুলিয়াই গিয়াছিল। জ্ঞানও যেমন উপলক্ষ, কর্মও তেমনি উপলক্ষ; মহাপঞ্চক প্রভৃতি ও শোণপাংশুর দল উভয়েই ভ্রান্ত—তবে ভ্রান্তির পথ ভিন্ন, প্রভেদ এইটুকু মাত্র।

অচলায়তনের ভাঙা প্রাচীর পুনরায় গাঁথিয়া তুলিবার উপলক্ষে দাদাঠাকুর পঞ্চককে উপদেশ দিতেছেন যে এমনভাবে প্রাচীর গড়িয়া আয়তন সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে ওখানে সবাইকে ধরিতে পারে।

পঞ্চক

সবাইকে কি কুলবে।

দাদাঠাকুর

না যদি কুলোয়, তাহলে এমনি করে দেয়াল আবার আর

একদিন ভাঙতেই হবে, সেই বুঝে গেঁথো—আমার কাজ আর বাড়িয়ো না।

পঞ্চক

শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর

হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বস্‌তে শিখুক।

পঞ্চক

ওদের বসিয়ে রাখা? সর্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙ্‌তে-চুরতে দিলে ওরা বেশী ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছট্‌ফট্ করাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর

ছোট ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশী হ'য়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেই রকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে একটা মজার জিনিস বলে জানে—কিন্তু জানে না স্থির হ'য়ে ব'সে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের ক'রে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্য তোমার মহাপঞ্চক দাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

শোণপাংশুরা অন্তরের ভিতর হইতে মুক্তি চায় না, বাহিরের স্বাধীনতা চায়—সে স্বাধীনতার অপর নাম কাজ করিবার অবাধ অবসর। কাজ করিতে করিতে তাহাদের মন শুকাইয়া উঠিয়াছে—তবু তাহারা রসের প্রার্থী নহে, কারণ রসের বর্ষণে কাজ নষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।

দাদাঠাকুর

যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদের রসের দরকার হবে তখন দূর থেকে ব'য়ে আনবে। কিন্তু দেখেছি ওরা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ

কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ঐ রকম ওদের স্বভাব।

এ বিষয়ে মহাপঞ্চক প্রভৃতির সঙ্গে ইহাদের বিস্ময়কর ঐক্য। মহাপঞ্চকও রস চায় না, তাহাতে তাহার সাধনার ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া বিশ্বাস।

অচলায়তনিকদের যেমন শান্তিভঙ্গ প্রয়োজন, শোণপাংশুদের তেমনি প্রয়োজন শান্তির।

দাদাঠাকুর

নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের মধ্যে কেউ দাঁড়াতে পারতো না।

পৃথিবীর শোণপাংশু যাহারা—কর্মমার্গই যাহাদের অবলম্বন—তাহাদের অবিরাম কাজের ঘর্ষণে সত্যই কি দাবানল লাগিয়া যায় নাই? গুরু কি তাহাদের রক্ষা করিতে পারিয়াছেন!

আগে বলিয়াছি, শোণপাংশুরা গুরুর স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই —তাহারা তাঁহাকে কেবল কর্মের সঙ্গী মাত্র মনে করিয়াছে—

যিনি সকল কাজের কাজী, মোরা তাঁরই কাজের সঙ্গী।

গুরুর কর্মরূপটুকু মাত্র তাহারা জানে, সমগ্র রূপ নয়, কাজেই স্বরূপ নয়।

শোণপাংশুদের কর্মের মধ্যে ভাঙা-চোরার কাজটাতেই তাহাদের যেন বেশী আনন্দ। 'তার চেয়ে ওদের ভাঙতে-চুরতে দিলে ওরা বেশী ঠাণ্ডা থাকে।' গুরু অবশ্য অচলায়তনের ভাঙা প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিবার কাজে তাহাদের নিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীর ভাঙিবার সময় যে রকম উল্লাসে তাহারা ছুটিয়াছিল—প্রাচীর গড়িবার সময়ে যে তেমনি উল্লাস তাহাদের হইয়াছে, তাহা কেমন যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; অন্ততঃ উল্লাসের কোন পরিচয় তাহাদের কথায় বা ব্যবহারে দেখা যায় নাই। প্রাচীর গড়ায় তাহারা নিযুক্ত কর্তব্যের অনুরোধে, প্রাচীর ভাঙায় তাহারা ধাবিত অন্তরের উল্লাসে।

দর্ভকরা নীরবে, নিরহঙ্কার ভক্তিমার্গে সাধনা করিয়া চলিয়াছে। শোণপাংশুদের কাছে যিনি খেলার সাথী, দাদাঠাকুর, অচলায়তনের কাছে যিনি জ্ঞানলভ্য গুরু, দর্ভকদের কাছে তিনিই গোঁসাইঠাকুর, যে 'পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তারপর এই এতদিন পরে দেখা।'

আচার্য

আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হ'য়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না?

দাদাঠাকুর

এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ ক'রে রাখনি।

দর্ভকপাড়ার পথ ভক্তির পথ—সে পথে সহজেই যাতায়াত চলে। তবু দর্ভকরাও গুরুর স্বরূপ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপ জানিতে পায় নাই—ভক্তির দ্বারা যে অংশটুকু জানিতে পারা যায় তাহাই মাত্র জানিয়াছে। ভক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপ জানা যায় কি না সে প্রশ্ন এইখানে অবান্তর। কবি তাহার কি ভাবে উত্তর দিয়াছেন তাহাই এখানে একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কবির মতে দাদাঠাকুর, গোঁসাই, গুরু—এই তিন মূর্তিতে মিলিয়া গুরুর সম্পূর্ণ রূপ; ইহাদের মধ্যে যে-কোন একটিকে বাদ দিলেই তাঁহাকে খণ্ডিত করা হইল। কবি বলিতে চান জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয়েই সাধনার সার্থকতা।

এখানে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানমার্গী অচলায়তনিকগণ, কর্মমার্গী শোণপাংশুগণ নাটকের মধ্যে যত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, ভক্তিমার্গী দর্ভকদের সে গুরুত্ব দান করা হয় নাই। ইহা কি কেবল দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে এমন নাটককে দ্রুত শেষ করিবার সুলভ পন্থা, না কবির অন্তরের সহানুভূতির কিয়ৎ পরিমাণে অভাব? অন্যত্র যাহাই হোক, আমার কেমন ধারণা হইয়াছে, এই নাটকখানিতে জ্ঞানপন্থা ও কর্মপন্থার

প্রতি কবির যে পরিমাণ সহানুভূতি, ভক্তিপন্থার উপরে ততটা নয়। মহাপঞ্চক ও শোণপাংশুর চরিত্রের ত্রুটির সঙ্গে মহিমাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দর্ভক চরিত্রে কেবলই যেন দীনতা। অচলায়তনের নূতন প্রাচীর গাঁথিবার জন্য গুরু যাহাদের আহ্বান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অচলায়তনের ব্রহ্মচারিগণ আছে, শোণপাংশুগণ আছে, কিন্তু দর্ভকগণ স্পষ্টত নাই।

গুরু না দাদাঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তরে দাদাঠাকুর বলিতেছেন, 'যে জানতে চায় না, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায়, আমি তার গুরু'।

এখানে জ্ঞানমার্গের উল্লেখ আছে, কর্মমার্গের উল্লেখ আছে, কিন্তু ভক্তিমার্গের দর্শকরা একেবারেই বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

ইহাতে আমার মনে হয়, এই নাটকের মধ্যে দর্ভকগণ অর্থাৎ ভক্তিমার্গ কতক পরিমাণে যেন সমস্যা পূরণের জন্যই আনীত হইয়াছে; অন্য দুটির প্রতি কবির যেমন দরদ, ইহার প্রতি দরদ তেমন গভীর নয়। অবশ্য এই মন্তব্য কেবল এই নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—অন্যত্র খাটিবে না।

২

✓এই নাটকে অচলায়তনিকদের প্রাণহীন আচারের ও মননহীন মন্ত্রের প্রতি কবির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানমার্গের মৌলিক মাহাত্ম্যকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জ্ঞানমার্গের তপস্যায় মানুষের মন যতই শুষ্ক হোক না কেন, এই শুষ্কতাই তাহার মনকে সংহত, সংযত করিয়া এক প্রকার রুদ্রশক্তি দান করে, জীবনের পক্ষে যাহা অপরিহার্য। ইহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মহাপঞ্চক চরিত্র। অচলায়তনের সাধনাকে সে-ই সবচেয়ে নিঃসংশয়ে, সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল; তার ফলে সাধারণ জীবনের মানদণ্ডের বিচারে সে হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু

যখন বিপদ আসিল, একমাত্র সে-ই বিপদের সম্মুখে সাহসের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারিল। উপাধ্যায় সাধনার কথা যতই মুখে বলুক, মনের মধ্যে তাহার ফাঁকি ছিল—সে সরিয়া পড়িয়াছে; উপাচার্য দুর্বল প্রকৃতির লোক, গুরু তাহার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নাই। তিনি এই হাস্যকর কঠিন জীবটিকে আঘাত করিয়াই সম্মান দেখাইয়াছেন।

মহাপঞ্চক

পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রয়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া, তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

প্রথম শোণপাংশু

এ পাগলাটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগাটা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক

কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু

ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই, আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর

ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কি বন্ধন তোমার হাতে আছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

ওকে কি কোন শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর

শাস্তি দেবে? ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

মহাপঞ্চক ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু অবিচলিত নিষ্ঠার দ্বারা যে শক্তি অর্জন করিয়াছে, তাহাকে সম্মান না করিয়া উপায় কি? জীবন-পথের সে যে দুর্লভ পাথেয়। সেই জন্যই তাহার মত নিষ্ঠাবান্ শক্তিমান্ লোককে গুরু নূতন আয়তন হইতে বাদ দেন নাই। মহাপঞ্চককেও অচলায়তনে প্রয়োজন আছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিতেছেন,

তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে মানুষ নাই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয়, সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, ভয়, জীবন-মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করবার রহস্য ওর হাতে আছে।

অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে আচার ও মন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—বস্তুতঃ তাহা নয়, বৃথা আচার ও মননহীন মন্ত্রের বিরুদ্ধেই তাঁহার অভিযান। আচার ও মন্ত্র যতক্ষণ উপলক্ষ, জীবনকে অগ্রসর করিয়া দিবার সহায়, ততক্ষণই তাহার প্রয়োজন, কিন্তু যখন সেগুলিই লক্ষ্য হইয়া উঠিয়া জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন এমন জঞ্জাল আর নাই; সেই জঞ্জাল সাফ করিতেই গুরুর আবির্ভাব।

যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে, সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীর ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি, দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে

আসে—আতঙ্কে সে দিক্-দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক

তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর

হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক

তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর

আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক

তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর

এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক

না, আমি তোমাকে প্রণাম করবো না।

দাদাঠাকুর

আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করবো না—আমি তোমাকে প্রণত করবো।

মহাপঞ্চক

তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর

আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ (প্রথম মহাযুদ্ধ) বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না।[১]

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেখানেই প্রকৃত গুরুর আগমন বর্ণিত, সেখানেই এই একই পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। গুরু জড়তাকে আঘাত করিয়া, বাধাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া, সযত্নসঞ্চিত জঞ্জালকে অপসারিত করিয়া শিষ্যদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, কোন ক্ষুদ্র দয়া, নিরর্থক মমত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদের অপমান করেন নাই। গুরু বলিতে রবীন্দ্রনাথ ভগবৎপ্রেরিত দূত বুঝিয়া থাকেন। রাজা নাটকের ঠাকুরদাদাও শেষ মুহূর্তে যোদ্ধবেশে আসিয়াছে। অচলায়তনের গুরু যেমন ভ্রান্তবুদ্ধি অথচ বীরচরিত্র মহাপঞ্চককে আঘাত করিয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলগণের প্রতি ফিরিয়াও তাকান নাই, রাজা নাটকের যোদ্ধবেশী ঠাকুরদাদা সমবেত রাজন্যগণের মধ্যে একমাত্র বীরচরিত্র কাঞ্চী রাজাকেই দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছেন, অপর সকলকে তিনি দৃষ্টিপাতের যোগ্য মনে করেন নাই।

৩

এ পর্যন্ত গেল ভাঙিবার কথা—বৃথা আচার ও শুষ্কমন্ত্র বর্জনের কথা। কিন্তু গড়িবার কথাও নাটকে আছে। সে দিকটাকে হয়তো তত জোর দেওয়া হয় নাই—ফলে পাঠকের মনোযোগ ভাঙিবার দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়।

অচলায়তনে গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, তখন তিনি কি বলেন নাই—না

১। আত্মপরিচয়, পৃঃ ৬৭-৬৯

তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে? গুরুর আঘাত, নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।...

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে একথা কখনই সত্য হইতে পারে না—যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননের সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।[১]

নাটকের শেষাংশে স্পষ্টতঃই গড়িবার উল্লেখ আছে। দাদাঠাকুর শোণপাংশুদের বলিতেছে;

আমাদের পঞ্চক দাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

সকলে

বেশ, বেশ রাজি আছি।

---

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃষ্ঠা ৫০৬—৫০৭, র র, ১১শ খণ্ড। অচলায়তন নাটক প্রকাশিত হইবামাত্র তাহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইতে থাকে। অচলায়তনের লেখকের বিরুদ্ধে সমালোচকগণের মুখ্য অভিযোগ দুইটি—প্রথম, ইহাতে কেবল ভাঙিবার কথাই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়, হিন্দুধর্মের মন্ত্র ও আচারগুলিকে নির্মম আঘাত করা হইয়াছে। সমালোচকগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার সরকার এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথকেও এইসব বাদানুবাদে যোগ দিতে হইয়াছিল। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অচলায়তন নাটকে গুরু যেমন ভাঙিবার উদ্দেশ্যে আঘাত করিয়াছেন, তেমনি গড়িবার উদ্দেশ্যে আদেশদানও করিয়াছেন। আর মন্ত্রের আবশ্যক কবি অস্বীকার করেন নাই, কেবল মন্ত্র যখন মননশক্তির বাহন না হইয়া 'স্বাধিকারঃপ্রমত্তঃ' হইয়া উঠে, তখনই তাহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহা পরিত্যাগের যোগ্য, ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। কবির উত্তরে সমালোচকগণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

দাদাঠাকুর

ঐ ভিতের উপর কালযুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর

সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিৎকে আকাশের আলোয় অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।

অচলায়তনের প্রাচীর আচার ও মন্ত্রের প্রতীক। পুরাতন প্রাচীর ভাঙিয়াছে যেমন সত্য, নূতন প্রাচীর গড়িবার আদেশও তেমনি সত্য। তাহা যদি হয় তবে মানুষের পক্ষে আচার ও মন্ত্রের প্রয়োজন নাই এমন দোষারোপ কবির উপরে করা চলে ন।

৪

এবারে নাটকখানির প্রধান কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। পঞ্চক কে? এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে পঞ্চক ও মহাপঞ্চকের মধ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। মহাপঞ্চক সাধনার নিষ্ঠা ও কঠোরতার দিক, পঞ্চক সাধনার সরসতা ও প্রাণ। এতদিন দুই-জনের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ সত্ত্বেও বিরোধ ছিল, কঠোরতা সরসতাকে সহ্য করিতে পারিত না। অথচ দুইজনে মিলিত না হইলে সাধনার পূর্ণতার আশা নাই। তাই গুরু আসিয়া পঞ্চককে মুক্তি না দিয়া নূতন আয়তনের আচার্য করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন, আবার মহা-পঞ্চককেও ছাড়েন নাই। গুরুর মতে ইহাদের সম্মিলনের ফলে আয়তন আর অচলায়তন হইয়া উঠিতে পারিবে না, আবার পঞ্চককে উচ্চতর পদ দেওয়াতে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, কঠোরতা ও

সরসতার মধ্যে সরসতাকেই তিনি বড়ো মনে করেন, কাজেই সরসতা চালক হইয়া বসিল। কঠোরতাকে উচ্চতর স্থান দিলে সাধন আবার বাঁধন হইয়া পড়িতে পারে এমন আশঙ্কা আছে। মহাপঞ্চক ও পঞ্চক মিলিয়াই আদর্শ আচার্য।

আচার্য ব্যক্তিগত ভাবে মুক্তপুরুষ, কিন্তু আয়তনের সংস্কার ও দায়িত্বের দ্বারা তিনি পীড়িত। আয়তনের ভার তাঁহাকে এমনি ভারগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, ব্যক্তিগত মুক্তিও তাঁহাকে মুক্তির আনন্দ দিতে পারিতেছিল না। তাঁহার বেদনা এইখানেই। গুরু তাঁহাকে আর নূতন কাজ দিলেন না, তাঁহার কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। আনন্দমঠের মহাপুরুষ কর্তৃক মঠাধিপতি সত্যানন্দকে কর্মশৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার সঙ্গে এই ঘটনা তুলনীয় বলিয়া মনে হয়।

এই নাটকের গুরু কে? জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির ত্রিমার্গের সন্ধিস্থলে যাঁহার মন্দির তিনিই গুরু। ভগবান কি? রবীন্দ্রনাথ কোন নাটকে ভগবানকে কিংবা ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্তিত কোন মহাপুরুষকে রঙ্গমঞ্চে আনেন নাই। রাজা নাটকের রাজা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া গিয়াছেন। চণ্ডালিকা নাটকে বুদ্ধদেবকে রঙ্গমঞ্চে আনিবার প্রচুর সুযোগ থাকাতেও তাঁহাকে আনা হয় নাই। দাদাঠাকুরের যোদ্ধবেশে প্রবেশের সঙ্গে নাটকের ঠাকুরদাদার যোদ্ধবেশ তুলনীয়। সেখানে ঠাকুরদাদা নিজেকে রাজার (ভগবানের) দূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অচলায়তনের যোদ্ধবেশধারী দাদাঠাকুরকে ভগবৎপ্রেরিত দূত বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

শোণপাংশু কাহারা? কোন্ জাতি তাহারা? 'যূণক কথাটি যবন, যোন প্রভৃতি কথারই সমর্থক। অর্থাৎ আমাদের রক্তহীন সংস্কৃতির বাহিরের সচল সক্রিয় কোন জাতি। শোণপাংশুও তাই। শোণ হইল লাল, অর্থাৎ যাহারা বিধিনিষেধকণ্টকিত রক্তহীন, সাদা

নয়। যারা রাজসিক উদ্যমী, যারা আপন রাজসিক উদ্যমে আপনি স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, তাকে শোণপাংশু বলা যাইতে পারে। যূণক হইল যাহাদের জাতিগত বা দেশগত নাম, শোণপাংশু হইল তাহাদের গুণগত ও ক্রিয়াগত নাম। উভয় শব্দেই আমাদের নিরুদ্যম শুদ্ধ শুভ্র সংস্কৃতির বাহিরের উদ্যমী রাজসিক সংস্কৃতির লোকের কথা, যাহারা আমাদের মতো বিধিনিষেধবদ্ধ নহে'।[১]

৫

এখন, কোন শিল্পসৃষ্টিকে তাহার সার্বভৌম ভিত্তি হইতে টানিয়া সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে দাঁড় করাইলে তাহার মর্যাদাহানি হয়—এ কথা সত্য। কিন্তু শোণপাংশু ও অচলায়তনের মধ্যে দ্বন্দ্ব এমন সুস্পষ্ট-ভাবে ভারতীয় ইতিহাসের পক্ষে প্রযোজ্য যে সমালোচকের পক্ষে এই লোভ সম্বরণ করা সহজ নহে। বিশেষ স্বয়ং কবিও এই নাটকখানিকে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে বহিরাগত সভ্যতার সংঘর্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২] কাজেই সমালোচকও এই স্বাধীনতা লইতে পারে।

শোণপাংশু 'বহিরাগত কোন উদ্যমী রাজসিক কর্মমার্গী জাতি' যাহাদের সংঘর্ষে ভারতবর্ষের অচলায়তনিক জড় শান্তি চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। নাটকে একথা স্পষ্টভাবেই আছে। দাদাঠাকুর বলিতেছেন—

অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যে লড়ায়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।

ভারতবর্ষ বিরামশীল জাতি। ইহার ভৌগোলিক পরিবেশ এই

১ পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা।

২ গ্রন্থপরিচয়, পৃষ্ঠা ৫০৪—৫১১, র-র, ১১শ খণ্ড।

ভাবের অনুকূল। সমুদ্রপরিখা ও পর্বত-প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত এই দেশ পৃথিবী হইতে যেন বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষের বিধাতা ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা রন্ধ্র রাখিয়া দিয়াছেন—যুগের পর যুগ এই রন্ধ্রপথে রাজসিক উদ্যমী জাতিরা ঝোড়ো হাওয়ার মত এই দেশে ঢুকিয়া পড়িয়া বারংবার ইহার অচলায়তনিক শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষও বারংবার এইসব জাতিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া পুরাতন প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিয়া বৃহত্তর পরিধির নূতনতর প্রাচীর গাঁথিয়াছে।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন।··· ঐক্যমূলক যে-সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠান করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।··· ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে বিস্তার করিয়াছে।··· এই ঐক্য বিস্তার ও শৃঙ্খলা স্থাপন কেবল সমাজ-ব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।[১]

ভারতবর্ষ অচলায়তন হইয়া উঠিলেও নূতনকে আত্মসাৎ করিবার মতো ক্ষমতা তাহার আছে এবং যখন নূতনকে গ্রহণ করে তখন নূতন করিয়া প্রাচীর গাঁথিবার ক্ষমতাও সে হারায় নাই। নাটকের শেষের দিকে দাদাঠাকুর এই শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

আচার্য

অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল—প্রাচীন,

---

১ নূতন ও পুরাতন, স্বদেশ, পৃঃ ৪৬৯, র-র, ১ঃশ খণ্ড।

প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলো না যে নূতনকে চাই—আমাদের আর সময় নেই।

অচলায়তন অতি প্রাচীন—ভারতবর্ষও যে প্রাচীন।

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময় নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগপূর্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে দেখি তখন দেখতে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি।[১]

কিন্তু এমন করিয়া তো চলে না, পশ্চিমোত্তরের রন্ধ্রপথে ঝোড়ো হাওয়া নূতন জাতিরূপে আমাদের বিশ্রাম, বৈরাগ্য এবং আত্মচিন্তার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে।

এমন সময়ে দেখা গেল অবস্থার পরিবর্তন হ'য়েছে।··· হায় ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে এই অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের কে এনে দাঁড় করালে।··· ভারতবর্ষ তখন একটি রুদ্ধদ্বার নির্জন রহস্যময় পরীক্ষাকক্ষের মতো ছিল।··· কিন্তু হঠাৎ দ্বার ভগ্ন করে বাহিরের দুর্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষাশালার মধ্যে প্রবেশ করলে···পৃথিবীর লোক সেই পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রবেশ করে কী দেখলে। একটি জীর্ণ তপস্বী, বসন নেই, ভূষণ নেই। সে যে কথা বলতে চায়, এখনো তার কোনো প্রতীতিগম্য ভাষা নেই, প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ নেই, আয়ত্তিগম্য পরিমাণ নেই। অতএব হে বৃদ্ধ হে চিরাতুর, হে উদাসীন তুমি ওঠো···।[২]

ইহা কি অচলায়তনেরই ইতিহাস নহে, ভারতবর্ষের 'পুরপ্রাচীর' কি অচলায়তনের প্রাচীর নহে, সেই জীর্ণ তপস্বী কি মহাস্থবির নহে? প্রাচীন অচলায়তন, শোণপাংশু নবাগত জাতি—যাহাদের

১ ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, পৃঃ ৫৪—৫৬

২ নূতন ও পুরাতন, স্বদেশ, পৃঃ ৪৬৯—৪৭১।

সংঘর্ষে বারংবার পুরাতন প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আর গঠনশীল ভারতবর্ষ বারংবার নূতন করিয়া বৃহত্তর করিয়া জীবনগণ্ডী রচনা করিয়া তুলিয়াছে, কারণ ইতিহাসের বিচিত্র উপকরণকে একীভূত, অঙ্গীভূত করিয়া জীবনগণ্ডী রচনা করিয়া সভ্যতা গঠনের শক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক।

৬

শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অচলায়তনকে ত্রুটিহীন বলা চলে না। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই রক্তাল্পতা ব্যাধিগ্রস্ত, ছায়াপ্রায় আইডিয়ার মুখোস মাত্র। কেবল মহাপঞ্চকের চরিত্রে কিছু পরিমাণে মানবসুলভ সজীবতা আছে। শুধু তাই নয়, তাহার চরিত্রে ট্র্যাজেডির উপাদানও আছে। এই মানবসুলভ গুণের ফলেই বিচিত্র লোকটা পাঠকের অন্তরে প্রবেশলাভে সমর্থ; অন্য সব চরিত্র পাঠকের মস্তিষ্কে মাত্র প্রবেশ করে, অন্তরে নয়—মানুষের অন্তরে কেবল মানুষেরই প্রবেশাধিকার আছে।

ইহার চেয়েও বড় ত্রুটি, অচলায়তন নাটকের সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর স্থান নাই। কোন নাটকে নারী থাকিবে বা থাকিবে না তাহার জন্য নাট্যকারের উপর জুলুম চলে না, কিন্তু এখানে সে রকম দাবীর সঙ্গত কারণ আছে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির মিলনে যে নূতন সমাজের ছক কবি রচনা করিলেন, সেখানে নারীর স্থান কোথায়, স্বভাবতই সে প্রশ্ন মনে আসে। অচলায়তন অবশ্য ব্রহ্মচারীদের আয়তন—এখানে নারী না থাকিতে পারে; শোণপাংশুরাও আততায়ী, নারীকে সঙ্গে না আনিতে পারে—কবির পক্ষ হইতে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা চরম উত্তর নয়। ইহা গল্পমাত্র নয়; ইহা সমাজ-ব্যবস্থার নূতন একটা ছক বা Pattern। তাহা যদি হয়, তবে এই ছকের মধ্যে নরনারী সকলেরই যথাযোগ্য স্থান থাকা আবশ্যক। নারীর সে স্থান ইহাতে

কোথায়? নারীর সেই স্থানটি নির্দিষ্ট হয় নাই বলিয়া গুরুর আদেশে নূতন করিয়া গড়া আয়তনও যথেষ্ট উদার নয়, তাহার চেয়েও মানব-প্রকৃতি অনেক ব্যাপক—কাজেই ইহাকেও আবার ভাঙিয়া গড়িতে হইবে। সে আঘাত যদি গুরু না করেন, সে প্রশ্ন যদি কবি না করেন, তবে বাধ্য হইয়া সমালোচককেই সেই দুর্মুখ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে হয়। সমালোচক কেবল প্রশ্নই করিতে পারে, সমাধানের ভার তাহার উপর নয়। কিন্তু এই প্রধান ত্রুটির ফলেই নূতন সমাজতত্ত্বরূপে এই নাটক সঙ্কীর্ণ এবং ইহা সর্বজন সর্বকাল গ্রাহ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।

৭

এতক্ষণ কেবল তত্ত্ববিচারের দৃষ্টিতে নাটকখানির আলোচনা করা হইয়াছে, কতক পরিমাণে মহাপঞ্চকের দৃষ্টি যেন সমালোচককে পাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু এখানে শেষ করিলে নাটকটির প্রতি সুবিচার হইবে না। ইহাতে যে প্রচুর কবিত্ব রস আছে, নাটকখানির তাহা একটি প্রধান সম্পদ। তাহার আলোচনার জন্য পঞ্চকের দৃষ্টির আবশ্যক। নববর্ষা সমাগমের সমারোহ এবং আশা, প্রথম বারিপাতের সিক্ত অভ্যর্থনা এবং উল্লাস, পঞ্চকের কণ্ঠের ভাষায় ও সঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে প্রকৃতিকে নাটকের মূল ভাবের প্রতীক করিয়াই কবি বর্ণনা করিয়াছেন। নাটকের ঘটনার প্রারম্ভ গ্রীষ্মকালে, পৃথিবী যখন রসের অভাবে শুষ্ক, ইহার অবসান প্রথম বর্ষা সমাগমে, পৃথিবী যখন নবধারাপাতে স্নিগ্ধ। অচলায়তনে আচারসর্বস্ব জীবন যেন গ্রীষ্মের প্রতীক, তাহার মানবরূপ যেন মহাপঞ্চক, তাহার চরিত্রে গ্রীষ্মের তাপ ও তপস্যাজাত শক্তি দুই-ই বিদ্যমান। প্রথম বারিসম্পাতে কেবল পৃথিবী স্নিগ্ধ হয় নাই, গুরুর আগমনে অচলায়তনের জীবনেও মাধুর্য ফিরিয়া আসিয়াছে। কবচকিরীচ এবং কিরীটকুণ্ডলধারী যোদ্ধৃবেশী গুরু যেন বজ্রবিদ্যুৎ-

সমুজ্জ্বল বর্ষার স্থায় উদার মেঘাভ্যুদয়। পঞ্চকের তৃষিত চিত্তচাতক এই মেঘাগমের অপেক্ষাতেই ছিল—তাহার কণ্ঠে অনাগতমেঘের বন্দনাকেই আচার্য যেন শুনিতে পাইত, শুনিয়া বুঝিত, মেঘ, মুক্তি ও গুরুর আবির্ভাব আসন্ন। প্রকৃতির প্রতীক রূপটি বুঝিলে তবেই নাটকখানির উপলব্ধি সার্থক হইবে।

এই প্রসঙ্গে অচলায়তন নাটকের পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের জীর্ণতা ও অর্থহীন আচার-পরায়ণতাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এই উপলক্ষে যে কাঠামোটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত হিন্দু-সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থার কোন মিল নাই।

অচলায়তনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকা ওদন্তপুরী, নালন্দা ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিহারকে মনে আনিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল তপোবন। সেখানে অচলায়তনের মতো কেবল পুরুষ বিদ্যার্থীর বাস ছিল না। তপোবনগুলি জনপদ হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও জনপদের কাঠামোকে অনুসরণ করিত। তপোবনে গুরুর আশ্রম সংসারাশ্রমের ছাঁচে ঢালা; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা—সকলেরই সেখানে স্থান ছিল; যেসব বিদ্যার্থী আসিত, তাহারা পুত্রবৎ পালিত ও শিক্ষিত হইত। অচলায়তনে এসব কিছুই নাই। ওখানকার সমাজ-ব্যবস্থার ছাঁচটিই তপোবনের ছাঁচ হইতে স্বতন্ত্র। অচলায়তনের 'পিউরিটান' জীবনযাত্রার সহিত হিন্দুসমাজের যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। অচলায়তনের পরিবেশ যেমন বৌদ্ধ-বিহারের আদর্শে রচিত তেমনি ইহার অদ্ভুত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, মন্ত্র ও মন্ত্রের নামের অধিকাংশই মহাযান মতবাদের সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে গৃহীত।[১] বস্তুতঃ নাটকখানির পরিবেশ হিন্দু সমাজের পরিচিত নহে।

---

১ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'দি স্যানস্‌ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' গ্রন্থে প্রচুর ধারণী মন্ত্রের উল্লেখ আছে। অচলায়তনের ব্যবহৃত

আমার ধারণা অচলায়তনের পরিবেশ অধিকতর পরিচিত ও বাস্তবঘেঁষা হইলে নাটকখানি শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে উচ্চতর স্তরের হইত—আর যে উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত তাহাতেও অধিকতর সাফল্যলাভ করিত। ভূতের ঢিল গায়ে লাগে না। কোন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধতা সত্বেও পাঠকসাধারণ নাটকখানির দ্বারা আহত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। ইহার জন্য নাটকের অদ্ভুত ও অবাস্তব পরিবেশ অনেক পরিমাণে দায়ী!

রাজা

রাজা নাটকে অদৃশ্য 'রাজা'কে বাদ দিলে প্রধান চরিত্র চারটি। সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ। চারজনেই বিভিন্ন পন্থায় রাজার সাক্ষাৎ পাইতে চেষ্টা করিয়াছে। সুরঙ্গমার ও ঠাকুরদার 'রাজা'র উপলব্ধি ঘটিয়াছে, সুদর্শনার ও কাঞ্চীরাজের উপলব্ধির বিচিত্র ইতিহাসই রাজা নাটক। ইহাদের চারজনের উপলব্ধির পন্থা ভিন্ন, অন্যত্র বলিয়াছি। কী সেই পন্থা?

সুরঙ্গমা দাসীভাবে রাজাকে ভজনা করিয়াছে।

ঠাকুরদা তাহাকে ভজনা করিয়াছে বন্ধুভাবে।

সুদর্শনার সাধনপন্থা মধুরভাবে, সে রাজার মহিষী।

আর কাঞ্চীরাজ রাজাকে ভজনা করিয়াছে শত্রুভাবে—সে রাজার শত্রু, সে রাজবিদ্রোহী।

নাটকখানির প্রারম্ভেই দেখিতে পাই যে, সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা সাধনার শেষে উপনীত, তাহারা সিদ্ধকাম। তার কারণ দাসীরূপে ও সখারূপে সাধনার দায়িত্ব গুরুতর নয়, তাই তাহার সিদ্ধিও

মহামায়ূরী, মারীচ, পর্ণশবরী, শৃঙ্গভেরী, ধ্বজাগ্রকেয়ূরী প্রভৃতি ধারণী কবি উক্ত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার সহিত কবি আগে হইতেই পরিচিত ছিলেন। মালিনী, পরিশোধ প্রভৃতি অনেক কাব্য ও কবিতার মূল কাহিনী গ্রন্থখানি হইতে সংগৃহীত।

অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। মধুরভাবের সাধনাই কঠিনতম, তাই তাহার সিদ্ধিতে জীবনের চরমতম সার্থকতা। আবার যে শত্রুরূপে ভজনা করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তোলে, অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে সে ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয়। কেবল যে হতভাগ্য ব্যক্তি দুর্বলতাবশত সাধনপন্থা হইতে দূরে রহিয়া যায়, তাহার গতি হয় না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

রানী সুদর্শনার সহচরী সুরঙ্গমা রাজার দাসী। সে রানীর নিকটে আপন সাধনার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছে, সিদ্ধিলাভ করিতে অল্প দুঃখ সহ্য করিতে তাহাকে হয় নাই। সিদ্ধিলাভ সে করিয়াছে বটে—তবু সে দাসীমাত্র, কারণ দাস্যভাবের সহজতর পন্থাকেই সে অবলম্বন করিয়াছিল।

সুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত—মদ খেত আর জুয়ো খেলত।...

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত করে দিলেন তখন তোর রাগ হয়নি?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোকে বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে। আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল?

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম—সে পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি

খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত।

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর। কী নিষ্ঠুর। কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা।···

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক, ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।

ইহাই সুরঙ্গমার সাধনার ও সিদ্ধিলাভের ইতিহাস। কিন্তু সিদ্ধিলাভ সত্ত্বেও সে রাজার দাসী ছাড়া কিছুই নয়—নিম্নতর স্তরের সাধনার সহজসিদ্ধি!

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তা হলে যে বেঁচে যাই।···

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেইজন্যেই এত সহজ হল।

দাসী হইবার সাধনা সে করিয়াছে, মহিষী হইবার বাসনা সে করে নাই। যে তাঁহাকে যেরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে সেইরূপেই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে।

এই ভাবটি ঠাকুরদার একটি উক্তিতে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। একজন নাগরিক বলিয়া বেড়াইতেছে যে দেশের রাজা কুৎসিত, তাই তিনি দেখা দেন না। ঠাকুরদা বলিতেছেন—"ওর রাজা কুৎসিত বই কি, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন?··· ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।"

ঠাকুরদার ভাষায় "তাঁর আহ্বান যিনি যে-ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই, সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত।"

ঠাকুরদা রাজাকে সখারূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাই সিদ্ধিলাভ করিবার পরে কেবল রাজার সঙ্গে মাত্র নয়, রাজার সমস্ত প্রজার সঙ্গেই তাহার বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। বয়সনির্বিশেষে সে সকলেরই বয়স্য।

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু। আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কি, কর কি রানী। আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করিনে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

এ অবস্থায় উপনীত হইতে তাহাকে অল্প দুঃখ পাইতে হয় নাই। ঠাকুরদা বলিয়াছে "চিনে নিয়েছি যে, সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি, এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।" একে একে তাহার পাঁচটি ছেলে মারা গিয়াছে—তবু সে রাজাকে দোষী করে নাই, অল্পবুদ্ধি অন্য লোকের মতো বলে নাই যে দেশে ধর্ম নাই বা রাজা 'ধর্মের রাজা' নয়। সবাই যখন শুধায়, এত যে বন্ধুত্ব—তার কী পুরস্কার মিলিল? ঠাকুরদা উত্তর করে "বন্ধুকে কি কেউ কোনোদিন পুরস্কার দেয়?"

পুরস্কার হয়তো রাজা দেন না—কিন্তু সম্মান দেন, গৌরব দেন। গৌরব মানেই সেই বস্তু যাহা বহন করিতে শক্তির আবশ্যক হয়। সাধনার দ্বারা ঠাকুরদা সেই শক্তি অর্জন করিয়াছে। তাই প্রয়োজনের সময় রাজা তাহাকে সেনাপতি সাজাইয়া বিদ্রোহী নৃপতিদের শিবিরে প্রেরণ করেন।

ঠাকুরদাকে দেখিয়া নৃপতিদের একজন শুধায়—"তুমি কে?

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।"

অন্যান্য দুর্বলচিত্ত নৃপতিগণ যখন রাজার আহ্বানে পরাভব স্বীকার করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইবে বলিয়া জানায়, কাঞ্চীরাজ

স্পর্ধার সঙ্গে বলে—"আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি রাজদূত, কিন্তু সভায় নয়—রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।"

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' ঠাকুরদার উক্তি পুরাতনী বাণীরই নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

কাঞ্চীরাজ শত্রুভাবে রাজার ভজনা করিয়াছিল এবং শক্তিমান বলিয়াই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইয়াছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শক্তির যেখানে বিশেষ প্রকাশ সেখানেই রবীন্দ্রবাণীর আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছে। সে শক্তি কবির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইলেও কবির প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অচলায়তন নাটকে মহাপঞ্চক এবং রক্তকরবীর রাজা দৃষ্টান্তস্থল। বিজ্ঞানে শক্তির বিশেষ প্রকাশ বলিয়াই বিজ্ঞানের আপাত অপকারিতার বহু দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাহাকে অবহেলার যোগ্য মনে করেন না। কাঞ্চীরাজ সম্বন্ধেও ইহা সর্বথা প্রযোজ্য।

কাঞ্চীরাজ ষড়যন্ত্রকারী এবং বিদ্রোহী, সুদর্শনাকে বলে কাড়িয়া লইতে সে প্রস্তুত; তারপরে সুদর্শনার রাজা যখন দ্বন্দ্বে তাহাকে আহ্বান করিলেন, তখন সে অপর সকলের মতো পিছাইয়া না পড়িয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সে পরাজিত হইল বটে—কিন্তু তেমনি রাজার প্রসাদও লাভ করিল। তাহার শক্তি আত্মমুখিতার খাত পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎমুখিতার পথে প্রবাহিত হইল, কাঞ্চীরাজের শত্রুভাবের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিল।

১৮ সংখ্যক দৃশ্যে দেখিতে পাই কাঞ্চীরাজ রাজার সন্ধানে পথে বহির্গত। ঠাকুরদা শুধাইতেছে—একি কাঞ্চীরাজ তুমি পথে যে!

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন ক'রে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজাপতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হোক সে যত বড়ো রাজাই হোক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে।...

১৯ সংখ্যক দৃশ্যে দেখিতে পাই রাজ-সম্মানের পথে সুদর্শনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিল। যাহাকে সে উপভোগের বস্তু বলিয়া কামনা করিয়াছিল, বুঝিতে পারি, 'রাজা'র প্রসাদে তাহার সহিত যথার্থ সম্বন্ধে সে স্থাপিত হইয়াছে।

সকলের চেয়ে রানীর সাধনা কঠিন, কারণ সে সাধনা মধুর রসের সাধনা। যে ব্যক্তি রাজাকে প্রণয়ীরূপে পাইতে ইচ্ছা করে তাহাকে সুকঠিন দুঃখের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রাধিকার চোখের জলে কালিন্দীধারা চির বন্যাময়ী, সে অশ্রুধারার না আছে অন্ত না আছে পার। কারণ কৃষ্ণকে তাহার প্রণয়ীরূপে পাইবার বাসনা। সুদর্শনা ও রাধিকা একই লক্ষ্যের যাত্রী। কিন্তু রাজা অমনি তাহাকে গ্রহণ করেন নাই, দুঃখের আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহার অভিমান ও ভ্রান্তি, মলিনতা ও অহঙ্কার নিঃশেষ করিয়া দিয়া তবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা তাহাকে প্রথম হইতেই প্রেয়সী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, রানীরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সুদর্শনা তো রাজার স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই, তাহাকে যথার্থ-ভাবে পাইতে চেষ্টা করে নাই। সে বাহিরে তাকাইয়াছিল, অন্তরের মধ্যে সন্ধান করে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে

দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না, নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল।[১]

রানী সুবর্ণকে নিজের রাজা বলিয়া ভুল করিল। এই ভুলের আসল কারণ অন্ধকার গৃহের সাধনা তাহার শেষ হয় নাই, শেষ হইবার আগেই সে বহির্বিশ্বে রাজার সন্ধান করিয়াছিল। নাটকের প্রথম দৃশ্যে রানীকে অন্ধকার গৃহে দেখিতে পাই, এখানেই রাজার সহিত তাহার মিলন হইয়া থাকে। রানীর কাছে ঘরের অন্ধকার অসহ্য, সে রাজাকে বলে, "আমাকে বাহিরে লইয়া চলো, আলোয় তোমার সঙ্গে আমার মিলন হইবে।" রাজা বলেন, "কালে তাহা হইবে, আগে তোমার অন্ধকারের সাধনা সমাপ্ত হোক, নতুবা তুমি ভুল করিয়া বসিবে।" রানী শোনে না, বাহিরে তাকে সন্ধান করিবার অনুমতি রাজা দেন, রানী পরম ভুল করিয়া বসেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, অন্ধকার গৃহ বলিতে কবি কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমার মনে হয়—অন্ধকার গৃহ বলিতে তিনি মানুষের সাধনার পর্বকে বুঝিয়াছেন। আর এ সাধনা যে মধুরভাবের তাহা আগেই বলা হইয়াছে। সব সাধনার জন্যই যদি নৈভৃত্যের আবশ্যক, মধুর রসের সাধনার জন্য তাহার আবশ্যক সমধিক। বস্তুত যেখানে যে-কেহ সাধনা করিয়াছে, তাহাকেই একটা পর্ব অন্ধকার গৃহে

১ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড।

কাটাইতে হইয়াছে। সিদ্ধার্থকে নৈরঞ্জনা নদীতীরে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল ধরিয়া সাধনা করিতে হইয়াছিল, সেটা অন্ধকার গৃহের অনুরূপ। তখন তাহাকে 'মার' কত রূপেই না ছলনা করিতে চাহিয়াছিল। সকল সাধককেই কখনো-না-কখনো সুবর্ণের ছলনায় পড়িতে হয়। কিন্তু যে-সৌভাগ্যবান সিদ্ধার্থ হইয়াছে—তাহাকে 'সুবর্ণ' ভুলাইতে পারে না। সুদর্শনা সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বেই অন্ধকার গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া ঠকিয়া গেল। অমনি তাহার প্রবঞ্চিত চিত্তকে কেন্দ্র করিয়া অগ্নিদাহ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজ্যময় অশান্তি ও অরাজকতা দেখা দিল।

তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইল, তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল,[১] নাটকখানিতে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সুদর্শনা চরম ভুল করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবু তাহার অন্তরের সুগভীর স্থানে রাজার জন্যে একটা আকুলতা বরাবর ছিল, আবার রাজাও তাহাকে পরম ভুলে ও পরীক্ষায় ফেলিলেও কখনো সত্যই তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। কবি যেন বলিতে চান, মানুষ যতই ভুল করুক, যতই দূরে যাক তাহার রাজাকে কখনো আমূল বিস্মৃত হয় না। আবার রাজাও তাহাকে সমূলে পরিত্যাগ করেন না। তিনি মানুষকে দুঃখ দেন বটে কিন্তু সে তো তাঁহার প্রসাদেরই রূপান্তর।

নাটকের শেষ দৃশ্যটিতে আবার অন্ধকার গৃহ। এবারে দেখি

১ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড।

অন্ধকার গৃহ সুদর্শনার পক্ষে আর তেমন অসহ্য নয়। প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার গৃহের রানী রাজাকে সুন্দর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল—তাই তাহার আলোকের জন্য ব্যাকুলতা ছিল। এখন রানী বুঝিতে পারিয়াছে—তাহার রাজা সুন্দর নয়, অনুপম। তাই তাহার পক্ষে অন্ধকার ও আলো দুই-ই তুল্যমূল্য। তাহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো,—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।"

এইখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি। অন্ধকারে যাহার সূচনা, আলোতে তাহার উপসংহার, সাধনায় আরম্ভ হইয়া সিদ্ধিতে তাহা উপনীত। অন্ধকার গৃহে জীবন যাপনের পালা শেষ হইয়াছে বুঝিতে পারিবামাত্র রাজা রানার সম্মুখে বহির্বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।[১]

২

বর্তমান নাটকের রাজা কে? চরাচরের যিনি রাজা সেই ভগবানকেই এই নাটকে রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবানের অনন্ত রূপের মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্যময় রূপটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, তাই রাজারূপে তিনি বর্তমান নাটকের নায়ক। ভগবানের সহিত মানুষের যত রকম সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে তন্মধ্যে আবার মধুর রসের সম্বন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, তাই রানীরূপে সুদর্শনা এই গ্রন্থের নায়িকা। জন্মপূর্ব হইতেই

১ প্রফুল্লর সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভবানী পাঠকও তাহাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। প্রফুল্ল স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নাই। সুদর্শনাও আর করিবে না বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আছে বটে—কিন্তু মানুষকে সাধনার দ্বারা সেই সম্বন্ধটি উপলব্ধি করিতে হয়। এই সাধনার নাম তপস্যা—যে তাপে তপস্যা উজ্জ্বল হইয়া সার্থকতা লাভ করে তাহা দুঃখের তাপ। তাই মহিষী সুদর্শনাকে সুগভীর দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া কবি তাহাকে সিদ্ধির তটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুদর্শনার দুঃখের মূলে তাহার একটি ভুল—সে তাহার রাজাকে চোখে দেখিতে চাহিয়াছিল। এই ভুলটি হইতে তাহার দুঃখের সূত্রপাত, আর সেই দুঃখ হইতে নাটকীয় ঘটনার বিবর্তন। সুদর্শনার রাজা চোখে দেখিবার বস্তু নহেন।

রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ।[১]

সুদর্শনার প্রভু কোন বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, তিনি সকল দেশে সকল কালে। আপন অন্তরের আনন্দরসে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।[২]

রূপক ছাড়িয়া দিলে নির্গলিত প্রশ্নটি দাঁড়ায় এই যে রবীন্দ্রনাথের ভগবান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না ইন্দ্রিয়াতীত, তিনি যদি বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে না থাকেন, তবে তিনি সকল রূপে, সকল স্থানে, সকলদ্রব্যে অবশ্যই আছেন। কিন্তু সকলের মধ্যে কি বিশেষ অন্তর্গত নয়? তাহা হইলে কি দাঁড়ায় না যে তিনি যুগপৎ বিশেষ ও নির্বিশেষ! অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত। বস্তুতঃ তিনি দুই-ই। তিনি 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র', আবার 'অন্তর মাঝে শুধু একা একাকী', বিচিত্রের আলয়রূপে তিনি আকাশ,

১ ও ২ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড।

আর অন্তরবাসীরূপে তাঁহার আলয় নীড়, 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়'। তিনি একাধারে ভাবময় ও রূপময় বলিয়া 'ভাব হতে রূপে' এবং 'রূপ হতে ভাবে' জগৎচক্র আবর্তিত হইতে পারে। রাজার এই স্বতোবিরুদ্ধ স্বভাবের সত্যটি বুঝিবার জন্য আপন অন্তরের আনন্দরসে তাহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। অন্তরের বীক্ষণাগারে আনন্দরসের দ্বারা তাহাকে বুঝিয়া লইয়া জগতে বাহির হইলে আর ভুল করিবার আশঙ্কা থাকে না। সেই বীক্ষণাগার সুদর্শনার অন্ধকার গৃহ। বীক্ষণাগারের কার্য শেষ হইবার আগেই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতেই তাহার দুঃখের সূচনা।

রাজা নাটকের ভাব-উপজীব্য হইতেছে মানব-হৃদয়ের ভগবৎ উপলব্ধির ইতিহাস। এই নীরস তথ্যটি নাটক নয়, নাটকের শুষ্ক কঙ্কাল মাত্র। কঙ্কাল চিরকালই শুষ্ক। আর সমালোচকের দুর্ভাগ্য এই যে অনেক সময়েই তাহাকে কঙ্কালের সন্ধান রাখিতে হয়। যতটা সম্ভব কবির বাক্য উদ্ধার করিয়া কঙ্কালের নীরসতা ঢাকিতে চেষ্টা করিব—কিন্তু একেবারে ঢাকা পড়িবে এমন আশা করিতে কাহাকেও বলি না।

রবীন্দ্রনাথের ভগবান একাধারে বিশেষরূপ ও বিশ্বরূপ। প্রেমের সম্পর্কে তিনি বিশেষরূপ, জ্ঞানের সম্পর্কে তিনি বিশ্বরূপ। অর্জুনের সখারূপে তিনি কৃষ্ণ, অর্জুনের গুরুরূপে তিনি বিশ্বরূপের প্রদর্শক। তিনি সান্ত, তিনি অনন্ত। ঠাকুরদা বলিতেছে—

আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো এই বিচিত্ররূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলঙ্কার।

রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছে—আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না?

সুদর্শনা। এক রকম করে আসে বই কি! নইলে বাঁচব কী করে?

রাজা। কী রকম দেখেছ?

সুদর্শনা। সে তো এক রকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই রকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হাল্‌কা শাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু···

রাজা। এত বিচিত্র রূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখ্‌তে চাচ্ছ?

আবার কেবল সর্ব প্রকৃতিতে নয়, সর্ব মানবেও তিনি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ঠাকুরদার ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারি—

প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে-তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোক মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান থেকেই যায়।

ঠাকুরদার গানেও এই তত্ত্বটি আছে—"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।"

প্রাণের মানুষ অর্থাৎ বিশেষ বলিয়াই তিনি বিশ্বরূপ।

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।

তিনি মানুষের মনের সকল অবস্থাতেই বিরাজমান—

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিস্‌ নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে?

সার্থকতা, ব্যর্থতা সুখদুঃখ সকল অবস্থাতেই তাঁহার প্রকাশ।

এ গেল রাজার বিশ্বরূপ।

প্রেমের সম্পর্কে অর্থাৎ সুদর্শনার অন্ধকার ঘরটিতে তিনি বিশেষরূপ, সেখানে তিনি বিশ্বরাজ নহেন, সুদর্শনার হৃদয়ের নিঃসপত্ন রাজা।

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা, এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

আবার রাজার কথায় জানিতে পারি—

আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন।

ইহাই তাঁহার বিশেষ রূপের পরিচয়। তবে সে বিশেষ রূপ যে সুদর্শনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, সে তাহার দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্যের আসল কারণ রাজার সহিত তাহার প্রেমের সম্পর্কটি সত্য হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। প্রেমের দৃষ্টিতে তিনি সুন্দর, তিনি অনুপম; আর অপ্রেমের দৃষ্টিতে তিনি ভয়ানক। সুদর্শনা নিজেই সে কথা বলিয়াছে—

সত্য বলছি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

সুরঙ্গমাও এক সময়ে অনুরূপ ভীতি অনুভব করিয়াছে—তখন সে রাজাকে 'ভয়ানক' দেখিয়াছিল। তারপরে তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়া দাসী হইবামাত্র তাহার সমস্ত বেদনা সার্থক হইয়া গেল।

ভগবানের অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার সংগতিসাধন প্রেম। তাহার বিপরীত অপ্রেম। এ প্রায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির মর্মার্থের অনুরূপ—

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম।

প্রেমের সম্পর্কে দুই পক্ষ না হইলে চলে না। এ পর্যন্ত গেল মানুষের পক্ষের কথা। ভগবানের পক্ষ হইতেও মানুষের প্রতি টান অল্প নয়। তাঁহার চোখে মানুষ সুন্দর, মানুষ তাঁহার প্রিয়, মানুষ তাঁহার বহুকালের ধ্যানের ধন—নতুবা কি মানুষকে তাঁহার প্রেয়সী বলিয়া কবিরা কল্পনা করিতে পারিত?

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বইকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ।

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না, নিজের মধ্যে তো দেখতে পাইনে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না, ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কতো বড়! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

আত্মকেন্দ্রী মানুষ অকিঞ্চিৎকর, সে রূপ তাহার যথার্থ নয়। নিজেকে যথার্থভাবে জানিবার উদ্দেশ্যেই নিজেকে ভগবদ্দর্শনে প্রতিফলিত করিয়া দেখা আবশ্যক। কবি যেন ইহাই বলিতে চান। ইহার জন্যই মানুষের যত ধ্যানধারণা, ধর্মসাধনা, উপাসনা ও প্রার্থনা। নতুবা এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের আর কোনো সার্থকতা দেখা যায় না। মানুষ দুঃখকষ্টে ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়া ভগবানের সন্ধান করিতেছে। তিনি তাহার চোখ বাঁধিয়া খেলার

আঙিনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন—আর বলিতেছেন, এবারে ধরো তো। চোখ বাঁধা বলিয়াই খেলার রস জমিয়া ওঠে। চোখের বাঁধা মনের সাধনার দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইবে—ইহাই খেলার নিয়ম, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। দুর্ভাগিনী সুদর্শনার আর বিলম্ব সহিল না। সে ভাবিল চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেই মনের সাধনার অভাব পূরণ হইতে পারে।

৩

সুদর্শনা সুবর্ণর গলায় মালা দিল। সে বুঝিতে পারিল না যে সুবর্ণ ছদ্মবেশী রাজা, সে ভণ্ড। সুবর্ণ কে ও কী? যাহা কিছু বা যে-কেহ মানুষের দৃষ্টিকে ভিতরের দিক হইতে বাহিরের দিকে টানে, জীবনের চরিতার্থতার দিক হইতে সাংসারিক সার্থকতার দিকে টানে, ভগবানের দিক হইতে তাঁহার বিকল্পের দিকে টানে—তাহা-ই বা সে-ই সুবর্ণ। সুবর্ণ শব্দটির সুপ্রয়োগ হইয়াছে। সুবর্ণ বলিতে সুন্দর, স্বর্ণ ও মিষ্টবাক্য তিনই বোঝায়। প্রধানত এই তিনটির মোহেই মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়, সুদর্শনারও আত্মবিস্মরণ ঘটিয়াছিল।

সুবর্ণর ধ্বজায় কিংশুক অঙ্কিত। কিংশুক যথার্থই তাহার প্রতীক। দৃষ্টিসুন্দর এই পুষ্পটি গুণহীন বলিয়া কথিত। বাহ্য সৌন্দর্যের অধিক সম্পদ কাহারো নাই—না পুষ্পটির না ব্যক্তিটির। কিন্তু রাজার পতাকায় অঙ্কিত প্রতীক পদ্ম ও বজ্র কত গভীর ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পূর্ণ। পদ্মের সৌগন্ধ সৌন্দর্য ও কোমলতা, বজ্রের অটল কঠোরতার সহিত মিলিত হইয়া সার্থক পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। কিংশুক বা সুবর্ণ তাহা কোথায় পাইবে? ভগবান কি একাধারে পদ্মের মতো কোমল এবং বজ্রের মতো কঠিন নয়? রবীন্দ্রনাথের কল্পিত প্রতীকটি অপর এক কবির কল্পিত রামচরিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি!"

৪

নাটকের স্থান কাল ও পাত্রের মধ্যে এ পর্যন্ত পাত্রের আলোচনা হইল। এখন স্থান ও কালের আলোচনা করা যাইতে পারে। আগে কালের আলোচনা করা যাক। নাটকটির কাল শুধু বসন্ত নয়, একেবারে বসন্তোৎসবের দিন। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলে চলিবে।

রাজা নাটককে বসন্তোৎসব নাম দেওয়া যাইতে পারে। বসন্তের সত্যকার রূপটি কি? শারদোৎসবে দেখিয়াছি কবি বলিয়াছেন—রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। শরতের মধ্যে সন্ন্যাসের ভাব যদি কিছু থাকে তবে ঋতুরাজ বসন্ত একেবারে সন্ন্যাসী—সে রাজসন্ন্যাসী, তাহার যা কিছু ঐশ্বর্য তাহা বাহিরে, অন্তরে সে ত্যাগের মহিমায় অকিঞ্চন। বসন্ত সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধারণা; পরবর্তী নাটকে কাব্যে এই ধারণাই পরিণতি লাভ করিয়াছে, আর পরিবর্তিত হয় নাই।

এই নাটকে দু'জন রাজা আছেন, এক রাজা যাঁহার নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ, দ্বিতীয় রাজা ঋতুরাজ বসন্ত। দু'জনের মধ্যেই কবি ভাবের ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ঋতুরাজ অনন্ত-ঐশ্বর্য, কিন্তু অন্তরে তাহার রিক্তসম্পদ্ সন্ন্যাস। অপর রাজাও বাহিরে অনন্ত রূপ, অসংখ্য মূর্তি, ঐশ্বর্যের তাহার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার ঘরে তিনি একক, রূপহীন—তিনি অরূপরতন।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।

যে এই বসন্তকে সত্যভাবে দেখিতে পাইয়াছে সে একই সঙ্গে বাহিরের উজ্জ্বল সাজ ও অন্তরের বৈরাগীর গেরুয়া দেখিয়া ধন্য

হইয়াছে। যে হতভাগ্য কেবল বসন্তের বাহিরের রূপটাই দেখিল তাহার দুর্ভাগ্যের আর অবধি নাই।

রানী সুদর্শনা এমনি একজন হতভাগিনী। তিনি ঋতুরাজের বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছেন; তিনি রাজার বাহিরের ঐশ্বর্য দেখিবার জন্য লুব্ধ; বাহিরের সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতর কোনো সত্য তিনি স্বীকার করেন না, তাই তিনি ছদ্মবেশী সুপুরুষ সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিলেন। ইহা তাঁহার লোভের দৃষ্টি।

দাসী সুরঙ্গমার গভীরতর দৃষ্টি আছে। রাজা তাহাকে কৃপা করিয়াছেন। সে জানে রাজাকে বাহিরে দেখিবার নয়, দেখিলে ভুল হইবে, সে জানে রাজাকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখিতে হয়। এক সময়ে রাজার প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু এখন সে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে।··· সুরঙ্গমার দৃষ্টিও চূড়ান্ত নয়—ইহা ভক্তের দৃষ্টি, সে রাজার পায়ের তলাকার মাটির দিকেই তাকায়, মুখের দিকে নয়; ইহা প্রেমের দৃষ্টি নয় বলিয়াই সে রাজাকে যথার্থতমভাবে বুঝিতে পারে নাই।

এই নাটকে কেবল ঠাকুরদা গোড়া হইতে সত্যভাবে রাজাকে জানেন, কারণ তাঁহার দৃষ্টি সখার দৃষ্টি, রাজাকে তিনি বন্ধু বলিয়া জানেন। কবি বলিতে চাহেন ভালোবাসার দৃষ্টিতেই কেবল জগতের ও জগৎপতির সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। যে সেই দৃষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার কাছে বাহিরের ঐশ্বর্য ও ভিতরের বৈরাগ্য যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ইহার আগে কবি মানুষের জীবনলীলার অনুকল্প প্রকৃতিতে দেখিতে পাইয়াছেন। এখানে অর্থদ্যোতনা গভীরতর। এখানে আর মানুষের লীলা নয়, স্বয়ং জগৎপতির লীলার অনুকল্প প্রকৃতির মধ্যে কবি দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বরাজের অন্তরে বাহিরে ভাবের যে আপাত-বিরোধ, ঋতুরাজের স্বভাবেও যেন তারই প্রতিধ্বনি; সেইজন্যই বিশেষ করিয়া বিশ্বরাজের লীলামঞ্চের পটভূমিকারূপে

ঋতুরাজকে কবি দাঁড় করাইয়াছেন। পটভূমিকায় ও পুরোভূমিকায় ভাবের সংগতি ঘটিয়া গিয়াছে। অন্তর ও বাহিরের যে বিরোধ, ঐশ্বর্য ও সন্ন্যাসের মধ্যে যে বিরোধ তাহা আপাত-বিরোধ মাত্র। ঋতুরাজ যথার্থ ধনী বলিয়াই সব ত্যাগ করিতে সক্ষম, বিশ্বরাজের লীলাও অনুরূপ। বাহিরে তাঁহার আলোয় আলোময়, আর একটি অন্ধকার ঘরে রানীর সঙ্গে তাঁর মিলন; বাহিরে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য, কিন্তু রানী তাঁহাকে চোখে দেখিতে পান না; বাহিরে তাঁহার অসংখ্য রূপ, অন্ধকার ঘরে রানীর কাছে তিনি অরূপ; কারণ সুদর্শনার প্রভু—'কোনো বিশেষরূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে, আপন অন্তরে আনন্দ-রসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়'।[১]

এতক্ষণ কাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে তাহার তাৎপর্য কী। বুঝিতে পারা যাইবে কবি কেন বিশেষভাবে বসন্তঋতুকেই পটভূমিকারূপে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কীভাবে পটভূমিকায় এবং পুরোভূমিকায়, বিশ্বরাজে ও ঋতুরাজে সংগতি ঘটাইয়া দিয়াছেন।

এবারে নাটকের স্থান সম্বন্ধে একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে একটি অন্ধকার ঘর, আবার ইহার শেষতম দৃশ্যেও দেখিতে পাই সেই অন্ধকার ঘরটিকে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার ঘর হইতে রানী রাজার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বাহির হইয়াছেন—আর শেষের দৃশ্যে রাজা নিজেই দ্বার খুলিয়া রানীকে আলোতে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। শেষ দৃশ্যটিতে এমন যে হইতে পারিল তার কারণ তখন রানীর অন্ধকার ঘরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। ইহারই আনুসঙ্গিকরূপে মনে রাখিতে হইবে যে প্রথম দৃশ্যের সময় সন্ধ্যাবেলা আর শেষ দৃশ্যের

১ ঋতুচক্র, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, প্রথম খণ্ড।

সময় ঊষা। এই ঊষা রানীর নবজীবনের সূচক, এ প্রভাত যেমন বহিরাকাশের, তেমনি রানীর অন্তরাকাশেরও বটে।

আরও একটি বিষয়। নাটকটির দৃশ্যসমূহের অনেকগুলিই অন্ধকার ঘরে ও বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রিতে বিভক্ত। আলো-অন্ধকারের মোটা তুলির টানে নাট্যব্যাপারের অঙ্গে সুখদুঃখের ডোরা কাটিয়া দিয়া কবি ইহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। রানীর ঘর অন্ধকার, বাহিরের রাত্রি পূর্ণিমায় উজ্জ্বল : রানী নিঃসঙ্গ, বাহিরে আনন্দোন্মত্ত জনতা : রানী রাজাকে কাছে পাইয়াও দেখিতে পাইতেছে না, বাহিরের জনতা তাঁহাকে শতরূপে দেখিতে পাইয়াও কাছে পাইতেছে না—এই সমস্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা কবি নাটকের অর্থকে অধিকতর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করিয়া পাঠকের রসোদ্বোধনে সাহায্য করিয়াছেন।

৫

এবারে নাটকটির গঠনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। নাটকটি কুড়িটি দৃশ্যে বিভক্ত, অঙ্ক ভাগ নাই। কিন্তু অনায়াসে ইহাকে দুই অঙ্কে ভাগ করা চলিতে পারিত। প্রথম আটটি দৃশ্য প্রথম অঙ্ক, শেষের বারোটি দৃশ্য দ্বিতীয় অঙ্ক। এমন যে বলিলাম তার কারণ, প্রথম আট দৃশ্যের স্থান ও কাল এক, 'রাজা'র রাজধানী, রাজপুরী ও প্রাসাদের উদ্যান—সমস্তই একটি মাত্র দিনের ঘটনা। নবম দৃশ্য হইতে স্থানান্তর ও কালান্তর ঘটিয়াছে, ঘটনাও দ্রুততর বেগে পরিণামের মুখে ধাবিত। ষষ্ঠ দৃশ্যে রোহিণীর উক্তিতে আছে—"পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম" এবং অষ্টম দৃশ্যে সুদর্শনার উক্তিতে আছে —"কাল থেকে চেষ্টা করছি।" ইহাতে কালান্তর সূচনা করে বটে —কিন্তু 'কাল' ও 'পরশু'-র ব্যবহার অনবধানতার ভুল বলিয়াই মনে হয়। কেননা ঘটনাপ্রবাহের ছেদ লক্ষ্যগোচর হয় না।

১৭ সংখ্যক দৃশ্যটি ১৬ সংখ্যক দৃশ্যের স্থানে বসিলে ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা সহজতর হইত বলিয়া মনে হয়। ১৫ সংখ্যক দৃশ্যের বিষয়

বিদ্রোহী রাজগণের প্রতি রাজসেনাপতিবেশী ঠাকুরদার যুদ্ধের আহ্বান। তারপরেই ১৬ সংখ্যক দৃশ্যে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার সংলাপ হইতে জানিতে পারি যে বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়াছে কিন্তু রাজা তখনো রানীকে লইতে আসেন নাই। ১৭ সংখ্যক দৃশ্যে নাগরিকগণের সংলাপ হইতে যুদ্ধের একটা বিবরণ জানিতে পারা যায়। কিন্তু ১৬ সংখ্যক দৃশ্যেই পাঠক যুদ্ধের পরিণাম জানিতে পারিয়াছে—তারপরে সে বিষয়ে তাহাদের আর তেমন কৌতূহল থাকিবার কথা নয়। ১৭ সংখ্যক দৃশ্যকে আগে আনিলে পাঠক যথাসময়ে যুদ্ধের বিবরণ জানিতে পারিয়া রানীর ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

নাটকটি দুই অঙ্কে ভাগ করিবার কথা বলিয়াছি—কিন্তু সূক্ষ্মতর বিচারে ২০ সংখ্যক দৃশ্যটিকে তৃতীয় অঙ্ক বলিয়া ধরা উচিত। স্থান, কাল ও ঘটনার ছেদ বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই অঙ্কপাত করা হইয়া থাকে। ২০ সংখ্যক দৃশ্যটির স্থান প্রথম দৃশ্যের ন্যায় অন্ধকার ঘর—নাটকের ঘটনাচক্র আবার আবর্তিত হইয়া সূচনা-স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কবি সেরূপ দায়িত্ব স্বীকার করেন নাই, সরাসরি কুড়িটি দৃশ্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্থান, কাল ও ঘটনাবিন্যাস অনুসারে নাটকের দৃশ্যযোজনা ও অঙ্কপাত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বরাবর একপ্রকার শিথিলতা ছিল। কেন এমন হইয়াছে তাহার আলোচনা স্থানান্তরে করা যাইবে।

৬

এতক্ষণ যে আলোচনা হইল প্রধানত তাহা তত্ত্বের আলোচনা। তত্ত্বের আলোচনা রসের আলোচনা নহে। রসের গৌরবেই সাহিত্যের আদর। নাটকটির মূল উপজীব্য—মানবহৃদয়ের সহিত ভগবানের মিলন যেমন দুরূহ, তেমনি জটিল। এ হেন বিষয়কে রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তোলা সহজ নহে। এখন দেখিতে

হইবে এ বিষয়ে কবি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। কারুকার্যময় ভাষা, ঠাকুরদার সহজ প্রজ্ঞা, নাগরিকগণের সরস কথোপকথন, রবীন্দ্রসংগীত বলিতে যে অলৌকিক গীতিকবিতা বুঝায় তাহার প্রচুর প্রয়োগ, ঘটনাবিন্যাসের এক প্রকার দ্রুতি—এইসব উপায়ের দ্বারা কবি যে নাট্যবিষয়টিকে সজীব ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নাটকের মূল গৌরব চরিত্রসৃষ্টি। প্রাণবান নরনারীই নাটকের প্রধান সম্পদ্। সেই সম্পদে নাটকখানি তেমন সমৃদ্ধ নয়। একমাত্র সুদর্শনাচরিত্র ব্যতীত আর কোনো মানব-চরিত্র পাঠককে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না বলা যাইতে পারে। সুদর্শনার বেদনা, আত্মদ্বন্দ্ব, গ্লানির অনুভূতি, অনুশোচনা ও বিনতি পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। নাটকের বিষয়টি সাধারণ জনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অতীত, তাহাকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গোচর করিয়া তোলা সহজ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির নিকট হইতে সুলভ সমাধানের প্রত্যাশাই বা কেন করিব? লৌকিক কবির যে দানে মন তৃপ্ত হয় অলৌকিক কবির সে দানে পাঠকের মনে এক প্রকার অতৃপ্তি রহিয়া যায়। 'রাজা' নাটকের পাঠক এই জাতীয় একটা অতৃপ্তি অনুভব করে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ডাকঘর

ডাকঘর নাটক সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য ইহার রচনা-কাল। ইহা গীতাঞ্জলি-গীতালি পর্বে লিখিত। খেয়া-কাব্য রচনার সময় হইতে বলাকা-ফাল্গুনী রচনার মধ্যবর্তী পর্বটা কবিজীবনের একটা স্বভাববিরুদ্ধ সময়; এমন সময় তাঁহার জীবনে ইহার পূর্বেও আসে নাই, আর পরেও নয়। কবিজীবনের এই স্বভাববিরুদ্ধতা সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' গ্রন্থে আমি উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তৎকালে প্রমাণাভাবে ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি নাই।

সম্প্রতি তাঁহার যে-সব চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই

পর্বের উপরে আলোক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইসব চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, এই পর্বে উৎকট একটা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কবিকে পাইয়া বসিয়াছিল। এমন উৎকট আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক সুস্থ মনে লক্ষণ নয়; রবীন্দ্রনাথের তো নয়ই, কারণ এমন সুস্থ, স্বাভাবিক, বলিষ্ঠ দেহ-মন কদাচিৎ দেখা যায়। তবে এই সাময়িক স্বভাববিরুদ্ধতার কারণ কি? যথাকালে ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব—কিন্তু আরও চিঠিপত্র প্রকাশিত না হইলে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিন্তু তৎপূর্বে কবি-লিখিত চিঠিপত্রের সাক্ষ্য শোনা যাক।

এখানে [শিলাইদহে] আসবামাত্রই আমার সেই অসহ্য ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে। এমন সুগভীর আরাম আমি অনেক দিন পাইনি। এই জিনিসটি খুঁজতেই আমি দেশদেশান্তরে ঘুরতে চাচ্ছিলুম কিন্তু এ যে এমন পরিপূর্ণভাবে আমার হাতের কাছেই আছে সে জীবনের ঝঞ্ঝাটে ভুলেই গিয়েছিলুম। কিছুকাল থেকে মনে হচ্ছিল মৃত্যু আমাকে তার শেষ বাণ মেরেছে এবং সংসার থেকে আমার বিদায়ের সময় এসেছে—কিন্তু যস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যুঃ,—মৃত্যুও যাঁর অমৃতও তাঁরি ছায়া—এতদিনে আবার সেই অমৃতের পরিচয় পাচ্ছি।···১৯১২।[১]

পরবর্তী একটি পত্রখণ্ডে এই উৎকট মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষার অধিকতর পরিচয় আছে।

কিছুদিন থেকে আমার মনের মধ্যে যে উৎপাত দেখা দিয়েছে সেটা একটা শারীরিক ব্যামো। সে কথা ক্রমশই আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে।—তার দুটো কারণ আমার মনে আসছে।

প্রথম, কিছুকাল থেকেই আমার একটা nervous breakdown হয়েছে তার সন্দেহ নাই। যখন আমার কানে এবং মাথার বাঁ দিকে ব্যথা করতে লাগিল তখন বুঝেছিলুম সেটা ভালো লক্ষণ নয়। যে কোন কাজ করতুম অত্যন্ত জোর করে করতে হত। আর

১ চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১।

মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা ও অশান্তি অকারণে লেগেই ছিল।

তার পরে Younan ডাক্তার এর জন্যে যে ওষুধ দিলেন সেটা হচ্ছে Aurum, খুব high dilution। এটা কেন দিলেন আমি বুঝতে পারিনি। কানাইবাবু বলেছিলেন, এতে আমার অনিষ্ট হবে। আমার বিশ্বাস এই ওষুধের ফলে আমার কানের ব্যথা সেরে গেল বটে কিন্তু এই ওষুধের যে mental effect সে আমাকে চেপে ধরেছে—ওর মানসিক লক্ষণ নিচে লিখে দিচ্ছি—

Melancholy, with inquietude and desire to die.—Irresistible impulse to weep. Sees obstacles everywhere. Hopeless, suicidal; desperate. Great anguish. Excessive scruples with conscience. Despair of oneself and others. Grumbling, quarrelsome humour. Alternate peevishness and cheerfulness.

মেটিরিয়া মেডিকাতে যা লিখেছে এর সব লক্ষণই আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ; অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা। তার পরে যখন রামগড়ে ছিলুম তখন থেকে আমার conscience-এ কেবলি ভয়ঙ্কর আঘাত করেছে যে, বিদ্যালয়, জমিদারি, সংসার, দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্তব্য আমি কিছুই করিনি—আমার উচিত ছিল নিঃসংকোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া, এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোককে একেবারে চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যে টেনে আনা; সেইটে যতই হচ্ছিল না ততই নিজের উপর সংসারের উপর আমার গভীর অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল এবং কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার idealকে realise করতে পারলুম না তখন

মরতে হবে, আবার নূতন জীবন নিয়ে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। মনের মধ্যে এই রকম সুগভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বলেই আমি যাদের খুব ভালোবাসি তাদেরই সম্বন্ধে যত রকম মন্দ এবং অকল্যাণ আমার কল্পনায় বারম্বার তোলাপাড়া করেছে, কোনো মতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি।…

এ রকম একান্ত মূঢ়ের মতো মনের ভাব আমার কোনোকালেই ছিল না। আমি বরঞ্চ স্বভাবতই নিরুদ্বিগ্ন স্বভাবের। তোদের কারো জন্যে কখনো মিছিমিছি ভাবিনি। সেইজন্যই শিশুকাল থেকে তোদের এত অজস্র স্বাধীনতা দিতে পেরেছি, কিন্তু এখন এমন অদ্ভুত ভীরুতা মনে এসেছে যে তুই হয়তো বাইসিকেলে করে একটু কোথায় গেলে আমার ভয় হয় তোর বিপদ হবে—দেরি করে এলে মনে হয় কিছু একটা বিপদ হয়েছে। আমি নির্লিপ্ত এবং নিশ্চিন্ত স্বভাবের অথচ আমার এমন দশা হঠাৎ কি করে হতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছিলুম না। আজকাল একেবারে আমার স্বভাবের উলটো চালে চলছি…। সেজন্যে নিজের পরে অশ্রদ্ধাই হচ্ছে।…কাল সন্ধ্যার সময়ে ক্ষণকালের জন্য এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা আলোর আবির্ভাব দেখতে পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এইবার থেকে আমি এই মোহজাল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আবার আমার প্রকৃতি ফিরে পাব। আজ আমি আমার এই ব্যাধিগ্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ স্বভাবকে কতকটা যেন বাইরে থেকে দেখতে পেয়েছি বলেই Materia Medica খুলে সেই Aurum ওষুধের লক্ষণ মিলিয়ে দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়েছি—একেবারে সম্পূর্ণ মিলে গেছে। আমি deliberately suicide করতেই বসেছিলুম—জীবনে আমার লেশমাত্র তৃপ্তি ছিল না। যা কিছু স্পর্শ করছিলুম সমস্তই যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিলুম। এ রকম একেবারে উল্টো মানুষ যে কি রকম করে হতে পারে এ আমার একটা নতুন experience—সমস্তই একেবারে দুঃস্বপ্নের ঘন জাল। তোদের

ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব—এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।… এই অবস্থায় যা কিছু করেছি তার জন্যে আমি দায়ী নই।… আমার জন্যে তোরা আর ভাবিস নে। আমি কিছুদিন সুরুলের ছাতে শান্ত হয়ে বসে আবার আমার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পাব সন্দেহ নেই—মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব কোন সন্দেহ নেই। ১৯১৫।[১]

চিঠিখানা ডাকঘর রচনার পরবর্তী, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ডাকঘর রচনার সঙ্গে সঙ্গেই এই মনোভাব কাটিয়া যায় নাই; যে মনোভাব হইতে ডাকঘরের উদ্ভব, তাহা তখনো চলিতেছিল। ইহার আগের চিঠিখানার তারিখ ১৯১২ সাল। এখন ১৯১১ (ডাকঘর রচনার সময়) হইতে ১৯১৫ পর্বের আরও চিঠিপত্র প্রকাশিত হইলে এই সময়ের রহস্য অধিকতর পরিষ্কৃত হইবে, এমন আশা করা যায়।

যে বছরে ডাকঘর রচিত হয় সেই বছরে লিখিত একখানি চিঠি হইতে কবির পূর্বোক্ত মনোভাবের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি দূর দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল কিছুদিন থেকে আমার মন এই বলছে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর তো সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি নে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে

১ চিঠিপত্র ২, পৃঃ ২ —৩২

সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়—বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্বে এই ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি—এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।...

ইতি ১২শে আশ্বিন, ১৩১৮।[১]

এই সময়কার আর একখানি পত্রে পাই—

বেরো, বেরো, বেরো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়্, ফাঁকায় ছুটে আয়, আর একদণ্ড ঘরে নয় এই কথাটা এমন করে অন্তরে বাহিরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে যে, আজ আমার আর অন্য কোনো কথা চিন্তা করবার জো নেই—এর কাছে অন্য সকল কথাই আমার কাছে তুচ্ছ।... ২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮।[২]

এই কয়েকটি পত্রখণ্ডে ডাকঘরের প্রত্যক্ষতঃ উল্লেখ নাই; ডাকঘরের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে অনুমানলব্ধ মাত্র। মাত্র কিন্তু এবারে যে অংশ উদ্ধার করিতেছি, তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ ডাকঘরের কথা আছে; ডাকঘর যে মনোভাব হইতে উদ্ভূত তাহার উল্লেখ আছে; তাহা জানিবামাত্র পূর্বোক্ত পত্রখণ্ডের সঙ্গে ডাকঘরের যে-সম্বন্ধ অনুমানগম্য ছিল তাহা অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

ডাকঘর নাটকটি তাঁর নিজের মৃত্যুকল্পনা অবলম্বনেই লেখা। ১৩২২ সালে পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের সকলের কাছে তাঁর নাটকের বিষয়ে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন; ৪ঠা পৌষের বক্তৃতার বিষয় ছিল ডাকঘর। সেই বক্তৃতাগুলি তখন আমার পিতৃদেব কালীমোহন ঘোষ তাঁর দিনলিপি-পুস্তকে

১ দেশ, ১০ই আশ্বিন, ১৩৪৮

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৪

লিখে রেখেছিলেন, এখানে তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু-উৎসবের জন্য লিখিনি।

শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম, প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল, চল, বাইরে চল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে, সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময়ে বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই-যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন, তখন আমার দায় নাই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যে অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই, এ গদ্য লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুত কি? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমণীয়তা আছে। যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক

দিয়েছিল, বহু দূরে সে অজানা রয়েছে, তার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে অজানার ডাক, দূর সেখানে মুগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমণীয়, বহু বিস্মৃত অপরিচিতের মধ্যে যে আনন্দ। সেই যখন অন্তরালে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিল, সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না, থাকব না, যাব, যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে, সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে—আর আমি কিনা বসে রইলুম। এই দুঃখকে, ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে। এই ভাব যদি কারো সম্পূর্ণ অপরিচিত হয় তবে হেঁয়ালি বলতে পারে। এই বেদনা যদি কারো মধ্যে থাকে সে বুঝতে পারবে এর মর্মটা কী।[১]

এই কয়েকখণ্ড রচনা হইতে ডাকঘর-পর্বে কবির মনের অবস্থা জানিতে পারা যায়। মানসিক এই পটভূমি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন খাসমহলে তাহার আসন পাতা হয়। "প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।" "আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।" ইহাই সেই গভীরতর যৌবনের স্বরূপ।

'পউষের পাতাঝরা তপোবনে' বিগত যৌবন বার্তা পাঠাইয়া দেয়—

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে।…
লিখেছে সে
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার।…

১ রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ১৩৭—১৩৮, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।[১]

বলাকার ২৫, ২৬ ও ৪৪ সংখ্যক কবিতায় এই নূতন যৌবনের, প্রৌঢ়ের যৌবনের বার্তা।

আর প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য! তাহার সমাধান ফাল্গুনীতে। যৌবনের দল চিরন্তন বৃদ্ধকে ধরিবার জন্য বিশ্বের রহস্য-গুহার মধ্যে তলাইয়া গেল—সেখান হইতে যাহাকে টানিয়া বাহির করিল, সে চিরন্তন বৃদ্ধ নয়, চিরন্তন যুবক, তাহাদেরই দলপতি জীবন সর্দার। যৌবনের দলকে সে চালাইয়া লইয়া যায়। যৌবনের দলপতি জীবন সর্দার, তাহার কাজ বিপদ হইতে বিপদে চালনা করা। এই প্রতীকটির অর্থ কি আর স্পষ্ট করিবার প্রয়োজন আছে? জীবনের আকর্ষণে যৌবন বিপদের মুখে স্বতঃই অগ্রসর হইয়া চলে। তবে বার্ধক্য কোথায়?

ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

আবার—

বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।

তবে বুড়ো কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গুহা হইতে সদ্যবহির্গত জীবন সর্দার বলিল—'কোথাও তো নেই।' 'তবে সে কি?' 'সে স্বপ্ন।'

শীতের অন্তে বসন্ত; যৌবনের অন্তে প্রৌঢ়দের নূতনতর যৌবন; আর বার্ধক্য—সে স্বপ্নমাত্র। ইহাই ফাল্গুনীর প্রতিপাদ্য ও সমাধান।

অপসরণশীল যৌবন ও প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য কবির মনে যে দ্বন্দ্বের

---

১ বলাকা ১৩

সৃষ্টি করিয়াছিল, বলাকা ও ফাল্গুনীতে এইভাবে তাহার সমাধান তিনি করিলেন। "তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব—এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।"

অন্তরের সাধনায় স্পর্শমণির দ্বারা কবি সমস্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন—অস্বাভাবিকতার বিভীষিকাজাল ছিন্ন হইয়া গেল, কবি আবার স্বীয় প্রতিভার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। বলাকা-ফাল্গুনীর পর্বে কবির মানসিক স্বাভাবিকতার পুনঃ সূত্রপাত। ডাকঘর নাটক এই স্বভাববিরুদ্ধ পর্বের বিশিষ্ট একটি রচনা।

এই সময়ের প্রধান তিনটি যে লক্ষণ, মৃত্যুর উৎকট আকাঙ্ক্ষা, অনির্দিষ্ট সুদূরের জন্য আগ্রহ আর প্রবাসবেদনার কাতরতা—ডাকঘর নাটক এই তিনটি মনোভাবের সম্মিলিত সৃষ্টি। অমল-চরিত্র এই তিনটি উপাদানে গঠিত—এতদধিক চতুর্থ কোনো উপাদান তাহাতে নাই।

এখন, এই নাটকে উল্লিখিত 'চিঠি' ও 'ডাকঘর' কি? বলা বাহুল্য চিঠি ও ডাকঘর প্রতীক। কিসের প্রতীক? প্রতীক হিসাবে চিঠির উল্লেখ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল নহে। তাঁহার মতে চিঠির মধ্যে দুটি ভাব আছে, একটি রহস্য আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, ওই ক্ষুদ্র পত্রপুটকে অবলম্বন করিয়া সুদূরের নিকট আগমন। যে চিঠি প্রতীক নয়, নিতান্ত লৌকিক, তাহার মধ্যেও এ দুটি ভাব নিহিত। অথবা লৌকিক চিঠিতে এ দুটি ভাব আছে বলিয়াই প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

চিঠির এই মোহ-রহস্যের উল্লেখ কবির পত্রে কোনো কোনো স্থানে আছে—

পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা আরো

একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলোকের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে।···আমার বোধ হয় ওই লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে—লেফাকাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ—ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।[১]

আবার—

দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি—দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে।···বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয় একটু স্বতন্ত্র—তার মধ্যে একরকমের নিবিড়তা গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে।···[২]

এ দুটিই লৌকিক চিঠি সম্বন্ধে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পত্র ক্রমে প্রতীক হইয়া উঠিতেছে এবং প্রতীক হইয়া লৌকিকরস হারায় নাই, বরঞ্চ সে রস আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালী-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।[৩]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতীক-চিঠির উল্লেখ বহুত্র আছে—তন্মধ্যে উৎসর্গের ১১শ সংখ্যক কবিতা এবং পূরবীর 'হে ধরণী কেন প্রতিদিন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমলের রাজার চিঠির সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ নাই—একই ডাকহরকরা তাহাদের বহন করিয়া আনিয়াছে; রহস্য ও সুদূরময়তা ইহাদের প্রধান অঙ্গ। যে-সুদূরের

১ ছিন্নপত্র—৮ই মার্চ, ১৮৯৫

২ ছিন্নপত্র, ১

৩ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

জন্য অমলের মন লালায়িত, সেই সুদূরই যেন ওই পত্রপুটের শিশিরকণায় প্রতিবিম্বিত নীলিমা রূপে তাহার হাতে ধরা দিবার জন্য আসিয়াছে। অমলের কাছ হইতে সুদূর, এ যেমন রহস্যের একটা দিক, তেমনি আবার সুদূরের কাছ হইতে অমল, আর-একটা দিক; সেই দিকের বাণীবহ প্রতীক ওই চিঠি।

আর চিঠির প্রতীকটিকে একটি বাস্তব-পারিপার্শ্বিক দিয়া সজীব করিয়া তুলিবার জন্য 'ডাকঘরটি'র অবতারণা। ইহারই আনুষঙ্গিকভাবে ডাকহরকরাকে দেখিতে হইবে। অমলের মতে তাহার প্রধান রহস্য ও সুখ এই যে, সে সুদূর ও নিকটের মধ্যে নিরন্তর দৌত্য করিতেছে; অমল যে-সুখ হইতে বঞ্চিত, তাহা ওই লোকটির নিত্যকার পেশা। অমল যেন নিজের আকাঙ্ক্ষাকে ওই লোকটির মধ্যে ভ্রাম্যমাণ দেখিতে পায়।

এখন আর একটা প্রধান প্রশ্ন এই যে, রাজ-কবিরাজের আগমনে অমলের ধীরে ঘুমাইয়া পড়াটা কি? মৃত্যু? না কোনো রকমের প্রতীক-নিদ্রা? রাজা আসিয়া ডাকিলেই অমল জাগিয়া উঠিবে এই সূত্র ধরিয়া কেহ কেহ ইহাকে খৃষ্টীয় Resurrection জাতীয় কিছু মনে করিয়াছেন।

ইহা যে মৃত্যু নয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। কারণ মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ত অবসান হিসাবে কোনো তত্ত্বনাট্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এরকম মতবাদ তাঁহার তত্ত্বের বিরোধী। বিশেষ অমল তো মরে নাই; স্পষ্টই উল্লিখিত আছে রাজার ডাকের অপেক্ষায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র।

ইহাকে মৃত্যু বলিয়া মনে করার চেয়ে এক রকমের প্রতীক-নিদ্রা মনে করা অধিকতর সঙ্গত। কারণ কবির কাব্যে বহু স্থানে এই নিদ্রা-প্রতীকের ব্যবহার আছে। আকাঙ্ক্ষিতের জন্য যখন রাত্রি জাগিয়া বিরহিণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সেই নিদ্রাকে সার্থক করিয়া আকাঙ্ক্ষিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—এরূপ ভাব রবীন্দ্রকাব্যে অবিরল।

খেয়ার 'মুক্তিপাশ' কবিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বরহিণী বলিতেছে—

ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে।

তাঁহার আসিবার আগে অমলের ঘরটির মতই বিরহিণীর

রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ,

অমলও তাঁহার মতো জাগিয়া উঠিলে বলিতে পারিত, কিম্বা নিশ্চিত থাকিতে পারি যে জাগিয়া উঠিয়া সে বলিবে—

আজ নয়ন মেলিয়া এ কি হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই।···
দেখিনু কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দুয়ার জানালা
সকলি দিয়েছে খুলিয়া—

অমলের মতোই তাহার—

রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার—[১]

সত্যই তো রাজ-কবিরাজ আসিয়া ক্ষুদ্রতর কবিরাজের আদেশে বন্ধ অমলের ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়াছেন—এখন স্বয়ং রাজা আসিয়া ডাকিলে তাহার শেষ বন্ধনও খসিয়া পড়িবে। তিনি অমলকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইবেন।

অমলের নিদ্রা ও এইসব নিদ্রা মূলতঃ এক ; তবে গীতিকবিতায় যাহা একতন্ত্রী, নাটকের ঘটনার দাবিতে তাহাকে বিচিত্রতর, পূর্ণতর করিয়া দেখানো হইয়াছে, প্রভেদ মাত্র ইহাই।

এই নিদ্রা বা মৃত্যু খৃষ্টীয় Resurrection কি না?

১ খেয়া

Resurrection যদি একমাত্র মৃত্যুর পরেই সম্ভব হয়, তবে ইহা নিশ্চয় Resurrection নয়; কিন্তু পুনর্জীবন যদি এ জীবনেই লভ্য হয়, জীবনের হীনতর অংশ ভস্মীভূত হইয়া মহত্তর অংশ উদ্ভূত হয়—তবে ইহাকে Resurrection মনে করিতে আপত্তি নাই, কারণ তখন Resurrection ও পূর্বোক্ত প্রতীক-নিদ্রায় আর কোনো ভেদ থাকে না।

The Post Office-এর ভূমিকায় কবি ইয়েট্‌স্ তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন—

The deliverance sought and won by the dying child is the same deliverance which rose before his imagination, Mr. Tagore has said, when once in the early dawn he heard, amid the noise of a crowd returning from asme festival, this line out of an old village song, "Ferryman, take me to the other shore of the river." It may come at any moment of life, though the child discovers it in death, for it always comes at the moment when the 'I,' seeking no longer for gains that cannot be assimilated with its spirit istable to say, "All my work is khine" (Sadhana pp. 162, 163).

ইয়েট্‌স্ যাহা বুঝিতেছেন তাহা মৃত্যু নয়, জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তি মৃত্যুর মুহূর্তেও লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তখন তাহা তো আর লৌকিক অর্থে মৃত্যু নয়; অমলের মৃত্যু যদি জীবন্মুক্তিই হয় তবে তাহা জীবনেরই অঙ্গ; জীবনের অবসান নয়। মনে রাখিতে হইবে কবি শিল্পসৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন। শিল্পের দাবি মিটাইতে গিয়া তত্ত্বের যৌক্তিক অলঙ্ঘ্য পরিণামকে অনেক সময়ে সংকুচিত করিতে হয়; তত্ত্বকে অনুসরণ করিয়া কবি যে পর্যন্ত যাইতে রাজি ছিলেন,

শিল্প, বিশেষ নাট্যশিল্প, তাহার বিরোধী; সেইজন্য তিনি রাজাকে রঙ্গমঞ্চে আনিতে পারেন নাই, অমলকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন নাই; নাট্যরচনার বেলায় কবি শিল্পের অনুরোধে যেখানে থামিয়াছেন ন্যাট্যসমালোচনার বেলায় সমালোচক সেখানে থামিতে বাধ্য নয়; শিল্পের দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াও সমালোচক তত্ত্বের যৌক্তিক সীমানা নির্দেশ করিতে বাধ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনের এই পর্বটাতে কবি ও অমল একই আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ ও অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন—অথবা কবি নিজেকেই অকলের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেছিলেন। আমরা দেখিয়াছি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও সাধনার বলে কবি এই অস্বাভাবিকতা কাটাইয়া উঠিয়াছেন; তাহার কতক চিহ্ন বলাকাতে, কতক ফাল্গুনীতে। ডাকঘরের বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। অমলের জাগরণ নাটকের অন্তে নাই বটে, কিন্তু তাহা কবির জীবনে ঘটিয়াছে। অমল কবির জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কবিই রাজকবিরাজের দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, স্বয়ং রাজার দ্বারা মহত্তর জীবনে উদ্বুদ্ধ অমল; সে-সুধার ফুলের আকাঙ্ক্ষা লইয়া অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই সুধার ফুল নবোদ্বোধিত কবির করতলগত হইয়াছে; সুধার ফুল আর কিছুই নয়, প্রেম, মানুষের ভালবাসা। "তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব—এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।...মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব।"—এই বেদনা অমলও নিশ্চয় প্রকাশ করিতে পারিত, অন্ততঃ অনুভব যে করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাকঘরের উপসংহার লিখিত হয় নাই বটে, তাহা কবির জীবনে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। "আমি কিছুদিন সুরুলের ছাতে শান্ত হয়ে বসে আবার আমার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পাব সন্দেহ নেই।" অমলেরও এই একই আকাঙ্ক্ষা, রুগ্নতাকে কাটাইয়া চিরন্তন স্বভাবকে ফিরিয়া পাইবার। নাটকের শেষে

তাহার অর্ধসমাপ্ত সাধনা ও অর্ধলব্ধ আকাঙ্ক্ষার উপরে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যবনিকা উঠিয়া গেলে শান্ত সমাহিত কবিকে সুস্থতর অবস্থায় ও মহত্তর জীবনে আবার ফিরিয়া পাওয়া গেল। কবি আপনাকে ও জীবনকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, কারণ ইহার ঔষধ তাঁহার অন্তরেই ছিল।

এই নাটকে অন্যান্য যে-সব পাত্র-পাত্রী আছে তাহাদের বুঝিতে হইতে অমলের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা বুঝিতে হইবে। অমলের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুযায়ী ইহাদের তিন ভাগে ভাগ করা চলে। একদল অমলকে ভালোবাসে না, তাহারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, যেমন কবিরাজ ও মোড়ল; আর একদল তাহাকে ভালোবাসে, কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইতে দিতে নারাজ, যেমন মাধব দত্ত, দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা, বালকগণ, সুধা; তৃতীয় দল তাহাকে ভালোবাসে এবং ঘর হইতে মুক্তি দিতে উৎসুক, যথা ঠাকুর্দা, রাজকবিরাজ।

কবিরাজ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়াছে; দেহের অতিরিক্ত আর কিছু আছে বলিয়া সে জানে না; সে জানে, অমলকে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই সে নিরাময় হইবে।

মোড়ল নিজের উচ্চতাকেই জগতের মাপকাঠি বলিয়া জানে। তাহার চেয়ে বড়ো, চোখে-দেখার চেয়ে বেশী তাহার জগতে কিছু নাই। শিশুর সরলতা তাহার কাছে হয় উপহাসের, নয় উষ্মার। অমলের মতো গরিবঘরের ছেলে রাজার চিঠির আশায় বসিয়া আছে —ইহা তাহার কাছে অসহ্য। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস তাহার পরিহাসের চেয়েও কৌতূহলকর। তাহার বিদ্রূপই শেষে সত্যে পরিণত হইল; অমলকে যাহারা ভালোবাসিত তাহারা রাজার চিঠির সংবাদ দিতে পারিল না; আর মোড়লের বিদ্রূপকে সত্য করিয়া তুলিয়া রাজার চিঠি আসিয়া পৌঁছিল।

কবিরাজ ও মোড়ল দু'জনেই ফিলিস্টাইন।

মাধব দত্ত সংসারী লোক। তাহার জীবনের মধ্যে অমলের মত আকাশ-বিলাসী বিহঙ্গশিশু আসিয়া পড়িয়াছে। সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্জরে কেমন করিয়া সে তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। সে অমলকে ভালোবাসে বটে তবে সে ভালোবাসা অমল-কেন্দ্রী নয়, আত্মকেন্দ্রী; অমলের মৃত্যুতে নিজের ঘর যে শূন্য হইবে, ইহাই যেন তাহাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিতেছে। তাহার সাংসারিকতা এতই প্রবল যে রাজা আসিয়া পৌঁছিলে অমলকে ভালোমত কিছু প্রার্থনা করিতে সে শিখাইয়া দিতেছে। সে অমলকে ভালোবাসে, কিন্তু সে ভালোবাসা জীবনের বেদনা হইতে উদ্ভূত নয়। সমাজের দাবী, সংসারের দাবী যেন সেই ভালোবাসা তাহার উপর চাপাইয়া দিয়াছে; সেইজন্য অমলকে কবি তাহার পুত্র না করিয়া পোষ্যপুত্ররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে ভালোবাসা সাংসারিক রূপের সঙ্গেই মাত্র পরিচিত, তাহার বেশী কিছুতে সে বিশ্বাস করে না; সে অবিশ্বাসী। সেইজন্য শেষ মুহূর্তে ঠাকুর্দা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে—'চুপ করো অবিশ্বাসী।'

দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা, বালকগণ অমলকে ভালোবাসে, কিন্তু কবিরাজের অনুশাসনকেই তাহারা বালকের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করে। অমলের মনোভাবের প্রতি তাহাদের আন্তরিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু বাহ্যশাসনকে লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই।

এমন কি সুধা, যে-সুধা অমলকে ভালোবাসে, অন্য সকলের চেয়ে বেশি করিয়া, সে-ও অমলের আধখানা খোলা দরজা, রুগ্ন অমলের একমাত্র সান্ত্বনা বন্ধ করিয়া দিতে চায়।

ঠাকুর্দা একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ। অমল যাহা হইলে-হইতে-পারিত ঠাকুর্দা তাহা-ই; সেইজন্য তাহার প্রতি বালকের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

ঠাকুর্দার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা নাই, আবার মৃত্যুকে সে ভয়ও করে

না। নিরুদ্দেশ সুদূরকে সে দেখিয়া আসিয়াছে তাই ঘরের কোণটিও তাহার কাছে কম মনোরম নয়। আর প্রবাসের বেদনা! সমস্ত জগৎটাই তাহার গৃহ হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে প্রবাস কোথায়? ঠাকুর্দা এই গৃহকারাগারের একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়। সে যেন অমলের দূরবীক্ষণযন্ত্র। অমল তাহার মধ্য দিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষিত জগৎকে দেখিতে পায়।

রাজকবিরাজের তুলনায় মাধব দত্তর গৃহচিকিৎসকের কত প্রভেদ! রাজকবিরাজ আসিয়া রুদ্ধ দরজা জানালা খুলিয়া দিল; বাতির আলো নিভাইয়া ঘরে তারার আলো প্রবেশের পথ করিয়া দিল। তাপিত বালকের দেহ নিদ্রার অমৃত-প্রলেপে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। রাজকবিরাজ আসন্নপ্রায় মুক্তির আভাস—আভাসে মুক্তি যদি এত মধুর, স্বয়ং মুক্তির না জানি কি স্বাদ!

ডাকঘরের সমস্ত চরিত্রই ক্ষীণতম রেখায় অঙ্কিত; ন্যূনতম অপরিহার্যকে রাখিয়া সমস্ত অবান্তর বিষয়কে বাদ দেওয়া হইতেছে। চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাসংস্থানে 'human habitation ও name'-এর ভার চাপাইয়া দিলে নাটকটির রহস্যলোক পীড়িত হইয়া ভাঙিয়া পড়িত। যে-সুদূরের জন্য অমলের চিত্ত উৎসুক, তাহার দিকে যাত্রার উপযোগী সজ্জা—সর্বভারবর্জিত ক্ষিপ্রগামী ছিপ-নৌকা, অবান্তরপীড়িত, উদ্দিষ্ট লক্ষ্য, মন্থরগামী বজরা নহে।

রবীন্দ্রনাথের অল্প নাটকই আছে যাহাকে লইয়া তিনি ভাঙাগড়া করেন নাই; এই বারম্বার ভাঙাগড়া ও সংযোজনা শিল্পগত অস্বস্তির পরিচয়! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ডাকঘরকে তিনি স্পর্শ করেন নাই। ডাকঘর রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে, কিন্তু রবীন্দ্র-বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ ইহাতে যথেষ্ট আছে—আকৃতির অনতিদীর্ঘতা, অবান্তরবর্জিত অপরিহার্য রেখায় চরিত্রসৃষ্টি, climax-হীন শান্তিময় পরিণাম, অস্ফুট ছায়ালোকের মোহময় রহস্য, পাত্রপাত্রীর নির্দিষ্ট

জাতিহীনতা এবং ইতিহাসও ভূগোল-বিবর্জিত কালে ও দেশে ঘটনার সংস্থান।

দু'একখানা নাটক বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই গান আছে। গানের বহুলতায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের গতির স্বাভাবিক মন্থরতাকে মন্থরতর করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র নাটকের একটিও গান না থাকাতে ইহার ক্ষীণ ঘটনাস্রোত অপ্রতিহত গতিতে শান্তিপারাবারের দিকে প্রবাহিত হইতেছে; স্বভাবতঃই ইহার আবহাওয়া এমন রহস্যময় যে গানের দ্বারা তাহা বাড়াইয়া তুলিবার আবশ্যক হয় নাই।[১]

ফাল্গুনী

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে বলাকার যে স্থান, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে ফাল্গুনী নাটকের সেই স্থান ও সেই গুরুত্ব। দুইখানি গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও জীবন মোড় ঘুরিয়াছে। অনেকে ইহাকে অপ্রত্যাশিত মনে করেন—কিন্তু মূলের গতি ও প্রকৃতি স্মরণ রাখিলে তেমন অপ্রত্যাশিত মনে হইবে না। বলাকাতে ও ফাল্গুনীতে রবীন্দ্র-জীবন পুনরায় স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতা লাভ করিয়াছে। এই সময়ের

১ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ডাকঘর অভিনয়-প্রস্তাব উপলক্ষে নাটকটির স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তবে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, এইরূপ শুনিয়াছি। ঐ সময় ডাকঘর নাটকের জন্য তিনি কয়েকটি গানও লিখিয়াছিলেন। কালিকাতায় অভিনয়কালেও ডাকঘর নাটকে তিনি কয়েকটি গান জুড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডাকঘর কোনো সংস্করণেই তিনি সে গানগুলি গ্রন্থভুক্ত করেন নাই—সুতরাং উল্লিখিত তথ্যদ্বারা আমার বক্তব্য খণ্ডিত হয় নাই।

অমলের 'মৃত্যু' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখণ্ড উদ্ধারযোগ্য—"ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী—রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না, কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।...১০।২।৩৯"

পূর্ববর্তী পর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া কবির জীবনে একটা অস্বাভাবিকতার ভাব চলিতেছিল। ডাকঘর নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি অস্বাভাবিকতার স্বরূপটা কি। এখানে তাহার পুনর্বিবরণ দান অনাবশ্যক—ইঙ্গিত মাত্র দিলেই চলিবে।

ডাকঘর নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে কবির একখানি চিঠির উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই চিঠিখানার বিষয়ে পুনরায় স্মরণ করা যাইতে পারে।[১] এই চিঠিখানা কবির আত্মিক ব্যাধির পূর্ণ বিবরণ বহন করিতেছে। এই সময়ে কবি একপ্রকার আত্মিক ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, বাঁচিয়া থাকিবার আর প্রয়োজন নাই, এখন মৃত্যুই একমাত্র কাম্য—এইরূপ একটা ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই অস্বাভাবিকতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একটা চেষ্টাও তাঁহার মনে ছিল। পরবর্তী চিঠিখানিতে আসন্ন মুক্তির স্বাদ রহিয়াছে।[২] কবির আত্মিক ব্যাধির অভিজ্ঞতা হইতে ডাকঘর নাটকের জন্ম; ডাকঘরের বালক-নায়ক কবিরই ব্যাধিগ্রস্ত স্বরূপ, ডাকঘরের মুক্ত-পুরুষ ঠাকুরদা কবিরই কল্পিত মুক্ত জীবনের প্রতীক।

বলাকা কাব্যে এবং ফাল্গুনী নাটকে দেখা যাইবে যে, ব্যাধিমুক্ত কবি পুনরায় জীবনের স্বাভাবিক উদারক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

এই আত্মিক ব্যাধিটা কি? প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে, বিশেষ যাঁহারা কল্পনাপ্রবণ আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ, তাঁহাদের জীবনে প্রৌঢ় বয়সে এমন একটা অস্বাভাবিকতার সময় আসিয়া থাকে। তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, 'এতকাল নদীকূলে, যাহা লয়ে ছিনু ভুলে'—সমস্তই যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু ঐরূপই তাঁহাদের ধারণা হইয়া থাকে। ইহাকে প্রৌঢ় বয়সের গোধূলি সময়ের অনিশ্চয়তা বলা যায়।

---

১ চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭—৩২, ১৯১৫ সাল।

২ চিঠিপত্র, ২য়, পৃঃ ৫৩, ১৯১৫ সাল, জুলাই।

মনীষী ব্যক্তিরা সাধনবেগে এই সময়টাকে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন স্বস্তি, নূতন শান্তি এবং নবতর ভাবসাম্যের ক্ষেত্রে উপনীত হন। রবীন্দ্রনাথও হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে সেই নূতন ক্ষেত্র বলাকা ও ফাল্গুনী। দু'টি রচনাই সমসাময়িক।

এই ব্যাধির পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার দেহগত যৌবন তো অপনীত হইল—কিন্তু তার পরিবর্তে নূতন কোন স্বাদ, মহত্তর কোন ইঙ্গিত তো জীবনে উপনীত হইল না। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের তাঁহার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখা আবশ্যক। স্ত্রী-বিয়োগ, পুত্র ও কন্যা বিয়োগ, নিজের শারীরিক পীড়াদায়ক ব্যাধি—তাহার সঙ্গে রহিয়াছে আসন্ন বার্ধক্যের প্রসারিত-প্রায় ছায়া। চল্লিশের কোঠা হইতে যেদিন যৌবনকে বিদায় দিয়াছিলেন, সেটা ছিল কল্পনার ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবে সেই মুহূর্ত যখন আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন আর তেমন প্রসন্ন মনে বলিতে পারিলেন না—'যারে সোনার জন্ম নিয়ে, সোনার মৃত্যুপারে।' বরঞ্চ যৌবনকেই আঁকড়াইয়া ধরিবার একটা ইচ্ছা যেন তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তেমন ইচ্ছা তো সফল হইবার নয়। দেহের যৌবনের চলিয়া যাওয়াই তো ধর্ম, তাহাকে রাখিতে গেলেও থাকিবে না। তখন এই অবস্থায় দেহের যৌবনের বিকল্প অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত হইলেন। যতদিন এই বিকল্পের সন্ধান তিনি পান নাই, ততদিন তাঁহার মন সুস্থ হয় নাই, ততদিন তাঁহার জীবনে অশান্তি ও অস্বাভাবিকতা ছিল। ইহাই তাঁহার ব্যাধি। ডাকঘরে এই ব্যাধির পরিচয়। বলাকা ও ফাল্গুনীতে তাঁহার ব্যাধিমুক্তি, কারণ তখন তিনি দৈহিক যৌবনের বিকল্পের সন্ধান পাইয়াছেন, তখন তিনি দৈহিক যৌবনের বিকল্পকে আবিষ্কার করিয়া অলকানন্দার সুদৃঢ় পাষাণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। বলাকা ও ফাল্গুনী বিকল্প যৌবন বা প্রৌঢ়ের যৌবনের কাব্য। "প্রৌঢ়দের যৌবনটিই নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হ'য়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা

দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।"[1] এ দু'খানি বই নিরাসক্ত যৌবনের আনন্দলোকের কাব্য।

দৈহিক যৌবনের বিদায় ও নিরাসক্ত যৌবনের আবির্ভাব ফাল্গুনী নাটকের সূচনায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার বিশদ আলোচনার পূর্বে বলাকা কাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ স্মরণ করা যাইতে পারে।

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস;
বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
লিখেছে সে
আজি আমি অনন্তের দেশে
লিখেছে সে
এসো এসো চলে এসে বয়সের জীর্ণপথ শেষে
মরণের সিংহদ্বার
হ'য়ে এসো পার।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।[2]

কবি বলিতে চান, বয়োধর্মেই দৈহিক যৌবন গত হয় বটে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না, সে যৌবন নবতর মূর্তিতে, দিব্যরূপে

১ সূচনা, ফাল্গুনী, রঃ রচনাবলী, ১২শ খণ্ড।

বলাকা, ১৩শ সংখ্যক কবিতা।

অপেক্ষা করিয়া থাকে, তারপরে মানুষ যখন 'মরণের সিংহদ্বার' অতিক্রম করে, তখন যৌবনের বরমাল্য সে পুনরায় লাভ করে।

এই আশ্বাসে সান্ত্বনা থাকিলেও সে সান্ত্বনা সুদূরপরাহত ; কেন না, 'মরণের সিংহদ্বার' অতিক্রম করিতে না পারা অবধি পুরাতন যৌবনকে নূতনভাবে লাভ করাতো চলিবে না।

আর একটি কবিতায় দেখিতেছি কবি আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন—

যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণ তলে—
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে…[১]

এখানে দেখা যাইতেছে যে, নিরাসক্ত যৌবনকে লাভ করিবার জন্য মরণের সিংহদ্বার পার হইবার আর প্রয়োজন নাই। নিরাসক্ত যৌবন অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া কবির কাছে আসিয়াছে। নিরাসক্ত যৌবনের বিবর্তনের ইতিহাসে কবি এখানে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এই বিবর্তনের ইতিহাসের পূর্ণ পরিণতি ফাল্গুনী নাটক। এই দুই যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বতন্ত্র। দৈহিক যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী উর্বশী, আর নিরাসক্ত যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। ইহাদের স্বরূপ ব্যাখ্যাও বলাকা কাব্যে বর্তমান।[২]

২

কবির ব্যক্তিগত বেদনা কিভাবে ফাল্গুনী নাটকের সূচনার কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবারে তাহা বিচার করা যাইতে পারে। ইক্ষ্বাকুবংশের এক রাজা একদিন সন্ধ্যায় মাথায় একটি পাকা চুল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন যে, মৃত্যুর পত্র

১ বলাকা, ২৫ সংখ্যক কবিতা।

২ বলাকা, ২৩শ সংখ্যক কবিতা।

বহন করিয়া ঐ পাকা চুলটি আসিয়াছে। বার্ধক্যের ঐ পরওয়ানা দেখিয়া জীবন সম্বন্ধে তিনি বিতৃষ্ণা অনুভব করিলেন। জরুরী রাজকার্যে আর তাঁহার মন বসিল না। তিনি শ্রুতিভূষণের সাহচর্যে বৈরাগ্য-সাধন করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সময়ে তাঁহার রাজকবি আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, বৈরাগ্যসাধনে প্রকৃত সহায় তিনিই হইতে পারেন। কবি বলিলেন যে, কবিরাই প্রকৃত বৈরাগী; কারণ সংসারটাকে তাঁহারা পথ বলিয়া মনে করেন, সংসারকে নিত্য মনে করিয়াও, তাহার দাবীদাওয়া পালন করিয়াও তাহাকে বর্জন করিতে শেখাই প্রকৃত বৈরাগ্য। কবি আরও বলিলেন, যে পাকা চুলটি দেখিয়া রাজা ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন, সেই পাকা চুলের ভূমিকার উপরেই নূতন যৌবনের মল্লিকার মালা স্থাপিত হইবে।

কবি বলিলেন—

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হ'ল তো হোক না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন, নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

কবির উক্তিতে রাজা ভাবিলেন যে, তাঁহার বৈরাগ্যসাধনের সংকল্প বুঝি বা বিচলিত হয়, তিনি শ্রুতিভূষণকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া কবি বলিলেন।

তাঁকে কেন মহারাজ?

—বৈরাগ্যসাধন করবো।

—সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

—তুমি?

—হাঁ, মহারাজ, আমরাই তো আছি পৃথিবীতে মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

—বুঝতে পারলুম না।

—এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম, তবু বুঝতে পারলেন না?

আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

—তোমাদের মন্ত্রটা কি ?

—আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলি খালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে, বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

—সংসারের পথটাই বুঝি বৈরাগ্যের পথ হ'ল ?

—তা নয় তো কি মহারাজ ? সংসারে যে কেবলি সরা কেবলি চলা ; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো পথিক, সেই তো কবি বাউলের চেলা।

কবি বুঝাইলেন যে নিরাসক্ত যৌবন কর্মকে নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে শেখায়, আর নিরাসক্তভাবে কর্মকে গ্রহণ করাই তো প্রকৃত বৈরাগ্য।

কবির উপদেশে রাজার জীবন-তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল। যে-দুর্ভিক্ষকাতর প্রজার দল অন্ন প্রার্থনায় রাজসমীপে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি রাজা কর্তব্য পালনে সচেতন হইলেন। পরে রাজার আদেশে কবি রাজসভাতে ফাল্গুনীর গীতিনাটিকা অভিনয়ের আয়োজন করিলেন।

কবির উপদেশে রাজার জীবন-তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল বটে ; কিন্তু সে তৃষ্ণা ঠিক পূর্ববর্তী তৃষ্ণা আর হইল না। পূর্ববর্তী যৌবনের মধ্যে সম্ভোগের ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল, এবারে যে মহত্তর যৌবনের পালা আরম্ভ হইল, তাহার মধ্যে ত্যাগের ইচ্ছাটাই প্রবল। ত্যাগ মানে ছাড়া নয়, 'ছাড়তে ছাড়তে পাওয়া।' ত্যাগের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিলে জীবনের কর্তব্য পালন সহজ হইয়া আসে।

নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখছেন তো ? মাটির পাকা

রাস্তা হ'ল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে সে কেবলি ভারি করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাইতো সে আপনার ভার লাঘব করছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখদুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক।

কবির মতে দৈহিক যৌবন পথ, আর প্রৌঢ়ের নিরাসক্ত যৌবন নদী। একটির ধর্ম সুখ বা সম্ভোগ, আর একটির ধর্ম আনন্দ বা ত্যাগ। এই ধর্মকে যে গ্রহণ করিতে পারে সেই তো বৈরাগী। জীবনধর্ম পালনই যথার্থ বৈরাগ্য সাধন।

নিরাসক্ত বা মহত্তর যৌবনের মধ্যে একটি বৃহৎ কর্মের আহ্বান আছে। এই কর্ম সাধনাতেই মানুষের মুক্তি। বৃহৎ কর্ম সাধনার জন্যে প্রয়োজন বীর্যের—বৈরাগীই প্রকৃত বীর। কবিশেখরের ভাষায়—

যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে, সৃষ্টি করে তারাই, কেন না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ফাল্গুনী নাটকের বাউল বলিয়াছে—যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।...যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তাহ'লে বসন্তের দশা কি হ'ত?

এবারে রবীন্দ্রনাথ কি বলিতেছেন দেখা যাক—ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ উৎসব তো শুধু আমোদ নয়, এ তো অনায়াসে

হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়। তাই যুবকেরা বল্‌লে, আনবো সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী ক'রে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখ্‌তে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হ'য়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার, নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়, তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হ'য়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত।[১]

সমসাময়িক বলাকা কাব্যের উক্ত ভাবদ্যোতক কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[২]

মহত্তর যৌবনের কর্মসাধনায় আপাতদৃষ্টিতে উন্মত্ততা থাকিলেও তাহার পরিণামে একটি শান্তি ও স্নিগ্ধ সাফল্য বিরাজিত, কারণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কাজেই মহত্তর যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী শেষ পর্যন্ত কর্মসাধনার গতিকে

…ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে……

* * * *

---

১ আত্মপরিচয়, ৩, পৃঃ ৭১

২ বলাকা, কবিতা সংখ্যা ৪৪, ৪৫, সবুজের অভিযান, সর্বনেশে, আহ্বান, পাড়ি

ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন মৃত্যুরে
পবিত্র সঙ্গমতীর্থ তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।[১]

এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কবি নিজের জীবনবেদনাকে রাজার জীবনে প্রক্ষেপ করিয়া একটি সমাধানে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে সমাধানটি হইতেছে যে, দৈহিক যৌবন গত হইলেই মানুষের আশা-ভরসা, উৎসাহ-উদ্যম অন্তর্হিত হইবার কারণ নাই। বরঞ্চ নূতন যৌবনলক্ষ্মী প্রদত্ত মহত্তর যৌবনের কৃপায় জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তখন মানুষের জন্মে। জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি বলিতে রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্তভাবে কর্মসাধনা বুঝিয়া থাকেন। ইক্ষাকু-বংশের রাজা কবির উপদেশ বিষাদ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন; অবসাদগ্রস্ত অর্জুনও নিরাসক্তভাবে কর্মসাধনার উপদেশে জড়তা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন; বর্তমান কবি মুক্তি পাইয়াছেন কি? তাঁহার পরবর্তী কাব্যসাধনার ও কর্মসাধনার যে চিহ্ন বর্তমান তাহাতে মনে হয় যে, এই মুক্তির দিকেই তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। অন্ততঃ যে জড়তা ও বিষাদ কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাদের কবল হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন।

৩

কবির উপদেশে রাজার জীবনে বিতৃষ্ণা ঘুচিলে ফাল্গুনের দিনে কোন কিছু একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে রাজা কবিকে অনুরোধ জানাইলেন। কবি রাজসভায় ফাল্গুনী গীতিনাট্যের আয়োজন করিলেন। এই নাটকে যে সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা রাজার জীবনসমস্যার অনুরূপ। কবি রাজাকে বুঝাইলেন যে

১ বলাকা, কবিতা সংখ্যা ২৩

রাজার নিজের বা যে-কোন মানুষের জীবনে যে লীলা চলিতেছে বিশ্বেও সেই লীলাই অভিনীত হইতেছে। নাট্যের বিষয় সেই বিশ্বলীলা। তাহা হইলে দেখা গেল যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে যে-সমস্যা রাজার জীবনেও সেই সমস্যা—আবার সেই সমস্যাই রূপান্তরে বিশ্বজীবনে। এইভাবে রাজার জীবনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বা যে-কোন মানুষের জীবন বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সহিত সংপৃক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এবার দেখা যাক্, বিশ্বজীবনে কোন সমস্যার সমাধান হইতেছে, বা কোন লীলার অভিনয় হইয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্র লিখিতেছেন—

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সঙ্কোচ হয়। জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়, আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, শ্যামলতা অম্লান, অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেটাকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত, তাহলে অনাদিকালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়তো, এর উপরে যেখানেই পা দিতুম ধ্বসে যেতো। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চির নূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির

মধ্যেও সে লীলা চলেছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না। ফাল্গুনীর যুবক দল প্রাণের উদ্দামবেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করিনে—আচ্ছা দেখ, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেতো।[১]

রাজা মাথায় পাকা চুল দেখিয়া খেদ করিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ আসন্ন বার্ধক্যের ছায়ায় বিষণ্ন, ফাল্গুনীর কবিশেখর দুইজনের উদ্দেশ্যেই বলিতেছেন—

এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন, নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

রাজা যেখানে জরা দেখিতেছেন, কবিশেখরের দূরতর প্রসারী দৃষ্টি সেখানে নূতন রাজলক্ষ্মীকে দেখিতে পাইতেছে, রাজার দৃষ্টি যেখানে বিনাশ ও Fact-কে দেখিতেছে কবিশেখরের দৃষ্টি সেখানে নূতনতর জীবনের সূত্রপাত ও Truth-কে দেখিতেছে।

রাজা শুধাইলেন—গানের বিষয়টা কি?

কবি বলিলেন—শীতের বস্ত্রহরণ।

—এতো কোন পুরাণে পড়া যায়নি।

—বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে

১ গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ৬০৭, র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড

বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে দিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি, পুরাতনটাই নূতন।

—এতো গেল গানের কথা, বাকিটা?

—বাকিটা প্রাণের কথা।

—সে কি রকম?

—যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরবে তখন—

—তখন কি দেখ্‌লে?

—কি দেখ্‌লে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

—কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি?

—না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্ব কবির সেই গীতি-কাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।

এবারে নাটকটির সংগঠনরীতি স্মরণ করা আবশ্যক। নাটকটির প্রত্যেক অঙ্কের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা আছে। গীতিভূমিকায় আছে প্রকৃতির লীলা, নাটকে আছে মানবজীবনের লীলা—আর যে রাজসভায় এই অভিনয় চলিতেছে সেখানে আছে রাজার ব্যক্তিগত জীবনের লীলা। তিন লালাকে সুকৌশল একটি শিল্পের ফ্রেমে আঁটিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ তিনকে এক দেখাইয়াছেন, তিনি যেন বলিতে চান যে, তিন লীলার ধর্ম শুধু এক নয় বস্তুত তাহারা এক।

কবি বলিতে চান যে, চরম বিচারে প্রকৃতির মধ্যে জরা মৃত্যু নাই; শীত আসিয়া যখন সব শেষ হইয়া গেল মনে করিতেছি, তখনই দেখিতেছি বসন্তের আবির্ভাব—এইভাবে বিশ্বে বসন্তচক্রের চিরন্তন আবর্তন চলিতেছে।[১] মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য

১ এই প্রসঙ্গে ফাল্গুনী নাটকের ইংরাজী অনুবাদের The Cycle of Spring নামটি স্মরণীয়।

দুই ভাগে বিভাজ্য। সমষ্টিগতভাবে মানব জগতেও জরা মৃত্যুর চরম স্থান নাই, কারণ জরা মৃত্যু সত্ত্বেও মানবসংসার নবীন। কিন্তু ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে তো এমন বলা যায় না। সেখানে দেখি চুলের পাক ধরে, বার্ধক্যের ছায়া যৌবনের জ্যোতিকে ম্লান করিয়া দেয়—ইহার সমাধান কোথায়? কবি বলিতে চান যে, অনায়াসলব্ধ দৈহিক যৌবনের পরিবর্তে মানুষ ইচ্ছা করিলে সাধনলব্ধ যৌবনের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারে। সে যৌবন অদৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্য নামের অভাবে কবি ইহাকে নিরাসক্ত যৌবন বলিয়াছেন। ইহার অপর ব্যাখ্যাগত নাম আসক্তি হইতে মুক্তি বা আত্মার চিরানন্দ অবস্থা। ইহাকে জীবন্মুক্তি নাম দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। ইহা আত্মার যৌবন।

মানবজীবন ত্রিভুজের এক কোণে দৈহিক যৌবন, আর এক কোণে বার্ধক্য—আর এই দুইয়ের ঠেলাঠেলির ফলে তৃতীয় কোণে বিরাজ করিতেছে মহত্তর যৌবন। ইহা সাধনলভ্য এবং দুর্লভ বলিয়াই সকলে এ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। এই অবস্থাকেই রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন।

৪

এবারে নাটকটির পাত্রপাত্রীর পরিচয় লওয়া যাইতে পারে—তাহাতে নাটকের মর্মের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। রাজা শুধাইলেন:

—তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে?

কবি বলিলেন—এক হচ্ছে সর্দার।

—সে কে?

—যে আমাদের কেবল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।

—সে কে ?

—যাকে আমরা ভালবাসি, আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেছে।

—আর কে আছে ?

—দাদা, প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই সে সার মনে করেছে।

—আর কেউ আছে ?

—আর আছে এক অন্ধ বাউল।

—অন্ধ ?

—হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখেনা বলেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

এবারে কবিকৃত ব্যাখ্যা শোনা যাক। এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারো কারো চুল পাকিয়াছে কিন্তু সে খবরটা এখনো তাদের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনও বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্যই সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতই কাঁচা হইয়া উঠিবে; বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে। ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে সর্দার ছাড়া তার অন্য কোন পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।······এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া, পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না, ভিতরে কথা কয়, এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।[১]

ফাল্গুনীর পাত্রগণের তালিকায় কবি তাহাদের যে বিশেষ

১ গ্রন্থ-পরিচয়, পৃঃ ৫১১, র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

পরিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দেখিতেছি সর্দারকে জীবন সর্দার বলা হইয়াছে। এই জীবন সর্দার নামটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হয়।

ফাল্গুনী নাটক পুরাপুরি 'এলিগরি' বা রূপক নাট্য না হইলেও কোন কোন স্থলে 'এলিগরি' বা রূপকের ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে। জীবন সর্দার, চন্দ্রহাস, দাদা ও অন্ধ বাউল চারজনকেই রূপক মনে করা যাইতে পারে।

জীবন সর্দার বলিতে রবীন্দ্রনাথ জীবন বা 'লাইফ প্রিন্সিপল' বুঝিয়াছেন। 'এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া, পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, সেটা তার অভিপ্রায় নয়।' ইহা কি জীবনেরই স্বভাব নয়? অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মতে ইহাই জীবনের ধর্ম, গতিই জীবন, স্থিতিই জীবনহীনতা।[১] জীবন সর্দার বা জীবনই নব যৌবনের দলকে পথে বাহির করিয়া দুস্তরের অভিমুখে চালিত করিয়াছে, চিরকালের বুড়াকে ধরিয়া আনিতে সেই তো নব যৌবনের দলকে উৎসাহিত করিয়াছে, তারপরে মৃত্যুর অন্ধকার গুহা হইতে চিরকালের বুড়ার পরিবর্তে যে বাহির হইয়া আসিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল—সে তো এই জীবন সর্দার বা জীবন ছাড়া অপর কেহ নহে।

গুহা হইতে সর্দারকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত চন্দ্রহাস বলিয়া উঠিয়াছে—

তবে তুমিই চিরকালের?

—হাঁ,

—আর আমরাই চিরকালের?

—হাঁ,

১ বলাকার চঞ্চলা কবিতা স্মরণীয়

—এতো বড় আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!

সংসারে বার্ধক্য নাই, আছে চিরন্তন জীবন, পিছন হইতে ধূলা বালির আড়াল হইতে কখনো কখনো তাহাকে বুড়া বলিয়া মনে হইলেও সম্মুখ হইতে দেখিবামাত্র জীবনের চিরনবীনরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কবি চন্দ্রহাসকে নব যৌবনের দলের প্রিয় সখা বলিয়াছেন। চন্দ্রহাসকে আমরা প্রেম বলিতে পারি। প্রেম আছে বলিয়াই নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও জীবনেও প্রতি আসক্তি আছে। শুধু তাহাই নয়, একমাত্র প্রেমই মৃত্যুর অন্ধকারে তলাইয়া গিয়া জীবনের রহস্যভেদ করিতে সক্ষম। নাটকের শেষ অঙ্কে নব যৌবনের দল অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল, তখন চন্দ্রহাস সাহস করিয়া অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিয়া আশার সংবাদ শুনাইয়া দিল—ধরেছি, তাকে ধরেছি। এই ইঙ্গিত হইতে মনে হয় যে কবির মতে জীবনের কাজ চালাইয়া লওয়া, আর প্রেমের কাজ সেই চলাকে মধুর করিয়া তাহাকে অর্থময় করিয়া তোলা। প্রেমের স্পর্শ না পাইলে জীবনের দুর্বারগতি নিরর্থক ও বিড়ম্বনা হইয়া ওঠে। চন্দ্রহাস সঙ্গে না থাকিলে নব যৌবনের দল অনেক আগেই খেলায় ভঙ্গ দিত, জীবনের তাগিদও তাহাদের চালিত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ!

দাদা নব যৌবনের দলের প্রবীণ যুবক। বয়স তাহার অল্প—তবু তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়, ভিন্নার্থে 'বার্ধক্যং জরসা বিনা।' বয়স অল্প হইলেও যে জরার কবলিত হওয়া যায়, জরা যে মনের ধর্ম, ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি দাদাকে প্রবীণ যুবক করিয়া আঁকিয়াছেন। আমাদের জন্মজরাগ্রস্ত দেশে দাদার অভাব নাই। পাঠশালার বয়স হইতেই তাহারা প্রাজ্ঞের মতো কথা বলিতে শুরু করে। ইহাদের দেহের বয়সে আর মনের বয়সে খাপ খাইতে

চায়না—সেই তরুণ বৃদ্ধদের রূপক করিয়া কবি দাদাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আর আছে এক অন্ধ বাউল। এই লোকটি চোখ দিয়া দেখে না বলিয়াই বুড়ার (আসলে জীবনের) সন্ধান জানে। এই প্রসঙ্গে 'রাজা' নাটকের বিষয় স্মরণীয়। 'রাজা' চোখে দেখিবার নহেন, রানী চোখে দেখিতে চাহিয়া ভুল করিয়াছিল। রানী চোখে দেখার আশা ছাড়িলে তবে 'রাজাকে' উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। অন্ধ বাউল অনেক দিন হইল চোখে দেখার প্রথা ছাড়িয়াছে—তাই সে এখন জীবনের স্বরূপ অবগত। 'রাজা' নাটকের রানী সুদর্শনা অনেক দুঃখ ভোগের পরে নাটকের অন্তে যে-অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, অন্ধ বাউলের আজ সেই অবস্থা, তাহার সাধনার পর্ব শেষ হইয়াছে, সে এখন সিদ্ধকাম। অন্ধ বাউলকে প্রজ্ঞার রূপক বলিতে পারা যায়।

সবশুদ্ধ মিলিয়া ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, জীবন সর্দার বা জীবন নব যৌবনের দলকে চালিত করিতেছে, চন্দ্রহাস বা প্রেম সেই চলাকে মধুর করিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, প্রজ্ঞা ব্যতীত প্রেমও পথ দেখিতে পায় না। অন্ধ বাউল সেই প্রজ্ঞা, যাহার নিকটে সন্ধান পাইয়া চন্দ্রহাস বুড়াকে ধরিবার আশায় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রূপকটিকে পূর্ণতর করিবার জন্য দাদারও প্রয়োজন ছিল। মানুষের বা নব যৌবনের দলের মানসিক জরার বাহ্যরূপ দাদা। নব যৌবনের দল ছুটিয়াছে, আর তাহাদের মনে যে জরা আছে, যে-নিরুৎসাহ আছে, যে-সন্দেহ আছে, যে-অপরিণত অভিজ্ঞতা আছে—সে সমস্ত দাদার মধ্যে মূর্তিমান হইয়া চৌপদী রচনা করিতে করিতে নব যৌবনের দলের পিছনে পিছনে চলিয়াছে।

পূর্ণাঙ্গ 'এলিগরি' বা রূপক নাট্য রবীন্দ্রনাথ কখনো লেখেন নাই, তাহা তাঁহার শিল্প-স্বভাবসঙ্গত নয়, বিশেষ একটা বাঁধানো

রাস্তায় অধিকক্ষণ তিনি চলিতে পারেন না—কিন্তু তত্ত্বনাট্য বলিয়া পরিচিত নাটকগুলির অনেকস্থলে তিনি রূপকের আংশিক ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ফাল্গুনী অন্যতম প্রধান বলিয়া মনে হয়।

৫

ফাল্গুনী নাটকের কাল ফাল্গুন মাস, বসন্তকাল। বসন্তকাল ঋতুচক্র পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আবার নূতন বৎসরে প্রবেশ করে। শীতের জরাতে পৃথিবীর দীনতা প্রকাশিত হয়—কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়, তারপরেই আবির্ভূত হয় বসন্ত, বসন্তের পৃথিবী আবার নূতনভাবে নবীন হইয়া দেখা দেয়। এই সত্যটিকে কবি মানব জীবনের বার্ধক্যজাত জরা ও তদুত্তর নূতন জীবনের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছে। প্রকৃতির জীবনে ও মানব জীবনে একই লীলার ধারা বহমান—ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি বসন্ত ঋতু নাটকের কাল হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু এ বসন্ত মানুষের মহত্তর যৌবনের প্রতীক—ইহার মধ্যে সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও অশ্রু দুই-ই আছে; ইহাতে আনন্দের উল্লাস যেমন আছে, তেমনি কর্মের আহ্বানও আছে—তা না থাকিলে এ বসন্তের বাণী মানুষের মনকে তেমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারিত না।

—এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কি রকম সুর লাগছে। এ যেন ঝরা পাতার সুর।[১]

—এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ছিল।

—ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারবো না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

১ তুলনীয় 'রাজা' নাটকের বসন্তের রূপ।—'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে'

—আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলাতে চেয়েছিল।

আর বসন্তের মধ্যে যে কর্মের আহ্বান নিহিত তাহাও জানিতে পাই।

বাউল। সে [চন্দ্রহাস] বল্লে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।

—তারি ঢেউ ?

বাউল। হাঁ, খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয়নি।

—বসন্তের এই কি খবর ?

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে ইহা বসন্তের আদর্শায়িত রূপ, মানুষের যৌবনের আদর্শায়িত রূপ। এ বসন্ত কেবল পার্থিব নয়, এ যৌবন কেবল দৈহিক নয়। এ বসন্ত কবির চোখে দেখা বসন্ত, এ যৌবন পরিণত মনে অনুভব করা যৌবন। অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবলই তারুণ্যের জয়গান করিয়াছেন। এ উক্তি আংশিক সত্য মাত্র। কেননা, রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি দৈহিক তারুণ্যের উদ্দেশ্যে তেমন নয়, যেমন আদর্শায়িত তারুণ্যের উদ্দেশ্যে। কিংবা বলা উচিত, বলাকা ও ফাল্গুনীতে আসিয়া কবি দৈহিক তারুণ্যের অনুকল্পরূপে প্রৌঢ়ের যৌবনকে নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহার কণ্ঠে প্রতিভার স্বয়ম্বর মাল্য অর্পণ করিয়াছেন।

এখানে সংক্ষেপে নাটকের স্থানের আলোচনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি বলিয়াছেন যে—"এই নাট্য কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই।" ইহার বিস্তৃতরূপ নাট্য দৃশ্যগুলিতে পাওয়া যাইবে। প্রথম দৃশ্যের স্থান পথ, দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ঘাট, তৃতীয় দৃশ্যের স্থান মাঠ, চতুর্থ দৃশ্যের স্থান গুহাদ্বার। অর্থাৎ ঘটনাস্রোত পথে ঘাটে মাঠে চলিতে চলিতে চরম দৃশ্যে গুহাদ্বারের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ নব যৌবনের দল পথের টানে ভাসিতে ভাসিতে গুহাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যথাস্থানে পথ ও গুহাদ্বারের আলোচনা করা যাইবে।

৬

ফাল্গুনী নাটকখানিকে রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও জীবনদর্শনের মোড় ঘুরিবার স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এবারে সে-বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। এখানে তিনি প্রকৃতিকে মানুষের অনুকল্পরূপে নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পরবর্তী কাব্যে ও নাটকে আর এই ভাব হইতে বিচ্যুত হন নাই।

প্রকৃতির জীবনে যে লীলা চলিতেছে মানবজীবনে যে ঠিক তাহারই অনুরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে ফাল্গুনীতে এক অভিনব শিল্পরীতিকে কবি আশ্রয় করিয়াছেন। নাটকটির প্রত্যেক দৃশ্যের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা সংযোজিত। গীতিভূমিকার নায়কনায়িকা প্রকৃতির পাত্রপাত্রী, নাট্যদৃশ্যে নায়ক মানব পাত্রগণ। গীতিভূমিকায় যাহা ভাবাকারে উক্ত, নাট্যদৃশ্যে তাহাই ঘটনাকারে বিবৃত, গীতিভূমিকা যদি হয় সূত্র, নাট্যদৃশ্য তবে তাহার টীকাভাষ্য।

নবীনের আবির্ভাব, যুবকদলের প্রবেশ ॥

প্রবীণের দ্বিধা, সন্ধান ॥

প্রবীণের পরাভব, সন্দেহ ॥

নবীনের জয়, প্রকাশ ॥

গীতিভূমিকা ও নাট্যদৃশ্যের পূর্বোক্তরূপ পরিচয় বিবৃতি কবি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। আর ইহাই স্মরণ করিয়া কবিশেখর রাজাকে বলিয়াছিল—"হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।"

শেষ জীবনের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নাট্যদৃশ্যের ঘটনা-স্থানরূপে একটি আদর্শায়িত পথের কল্পনা করিয়াছেন। ফাল্গুনীর ঘটনাস্রোতও একটি পথকে অনুসরণ করিয়া প্রবাহিত। যৌবনের দল কর্তৃক চিরন্তন বৃদ্ধের অনুসন্ধান নাট্যবিষয়, কাজেই নাট্যবিষয়ের সঙ্গে নাট্যদৃশ্যের সুসঙ্গতি হইয়াছে। নাট্যদৃশ্যে পথের ভাবটা

দর্শকদের চোখে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কবি নাট্য ব্যবস্থাপক-গণকে নির্দেশ দিতেছেন—"রাস্তা দিয়ে পথিক চলাচলের by-play টা তোমরা করে নিতে পারবে? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল এইরকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।"[১]

৭

ফাল্গুনীতে প্রতীক-ভাবসম্পন্ন বস্তুর অভাব নাই। পূর্বোক্ত পথটাই প্রতীক-ভাবসম্পন্ন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রতীক বলিতে শেষ দৃশ্যের গুহাটিকে বুঝি। এই গুহা কিসের প্রতীক?

কবির ভাষায়—(প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই প্রাণকেই নূতন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে, যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেতো।[২]

এই গুহা যে মৃত্যু, গুহার অন্ধকার যে মৃত্যুর রহস্য—তাহার সপক্ষে কবির আরও উক্তি পাওয়া যায়।

জীবনকে সত্য বলে জানতে পেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় পাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে, সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিক থেকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৬০১, র-র, ১২শ খণ্ড

২ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৬০৭, র-র, ১২শ খণ্ড

মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ-তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়।[১]

ইহার পরে গুহাটার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তারপরে যখন মনে পড়ে যে, গুহাকে মৃত্যুর প্রতীকরূপে তিনি আগেও ব্যবহার করিয়াছেন—তখন তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

মুক্তধারা

মুক্তধারা নাটকের সঙ্গে পূর্বতন প্রায়শ্চিত্তের কিছু কিছু মিল আছে। মুক্তধারার গল্পাংশের আভাস প্রায়শ্চিত্তে পাওয়া অসম্ভব নয়; পরবর্তী নাটকের কয়েকটি চরিত্রের একমেটে রূপ পূর্ববর্তী নাটকে আছে; কয়েকটি গানও উভয় নাটকে এক; আর ধনঞ্জয় বৈরাগী সশরীরে প্রায়শ্চিত্ত নাটক হইতে গৃহীত। কিন্তু খুব বেশী ঐক্য এই দুই নাটকে অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক—কারণ জাতিতে ইহারা স্বতন্ত্র।

মুক্তধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, ইহাতে প্রতীক ব্যবহার করা হইয়াছে। এই প্রতীক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তবেই ইহার বিচারে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরব-মন্দির চূড়ার ত্রিশূল।[২]

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৬০৮, র-র, ১২শ খণ্ড

২ মুক্তধারা, রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭

মুক্তধারার নাট্যক্ষেত্রের সর্বত্র হইতে এই যন্ত্র ও ত্রিশূল যেমন দৃশ্যমান, নাটকের সমালোচকের মনের মধ্যেও তেমনি সর্বদা এই দুটি প্রতীককে উপস্থিত রাখা আবশ্যক। তানপুরায় যেমন গানের মূল সুরটিকে ধরিয়া রাখে—এই দুটি প্রতীকেও তেমনি নাটকের মূল তত্ত্বটি ধরিয়া রাখিয়াছে।

ওই যন্ত্রটা মুক্তধারার বাঁধের একাংশ; উত্তরকূটের দেবতা মানুষের জন্য যে ঝরনা দিয়াছেন, উত্তরকূটের যন্ত্ররাজ তাহাকে বাঁধিয়া নিজেদের প্রয়োজনের জন্য সংযত করিয়াছে। উত্তরকূটের একদিকের আকাশে লৌহযন্ত্র, অপর দিকের আকাশে ভৈরব মন্দিরের ত্রিশূলের চূড়া। দুই বিপরীত দিকে দুটি প্রতীককে স্থাপন করিয়া কবি যেন ইহাদের মধ্যে বিরোধটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চাহেন। বিরোধের মূলে উত্তরকূটের দেবলক্ষ্মী স্পর্ধা। ভৈরব যে জল মানুষের জন্য দিয়াছেন, উত্তর-কূটীয়েরা নিজের দেশের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহাকে বাঁধিয়াছে; মানুষমাত্রেরই যাহা সম্পত্তি তাহাকে দেশবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া তাহাদের ধারণা হইয়াছে। এই যে ধারণা, তাহার মূলেও আবার আর একটা বৃহত্তর ভ্রান্তি; ভৈরব যিনি সকলেরই দেবতা, উত্তরকূটের লোকেরা তাঁহাকে কেবল নিজেদের দেবতা বলিয়াই মনে করিয়াছে। দেবতাকে যখন বিশেষ জাতির দেবতা বলিয়া মনে হয়, দেবতার দান যখন বিশেষ জাতির ভোগত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই বিশেষ জাতি তখন দেবতার একমাত্র অনুগৃহীত মনে করিয়া অন্য সব জাতির উপরে দেবতার প্রতিনিধিরূপে স্বার্থপাশ নিক্ষেপ করিয়া দেবতার অভিনয় করিতে থাকে। প্রকৃত দেবতাকে তখন তাহারা আলাদিনের প্রদীপের মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন স্বার্থসাধনের উপকরণমাত্র মনে করে। উত্তর-কূটীয়দের সেই চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে। এখানেই মুক্তধারার অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি।

যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় মুক্তধারাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, সেই সফলতার জন্য সকলে ভৈরব মন্দিরে পূজা দিতে চলিয়াছে—স্বয়ং রাজাও পদব্রজে ভৈরব মন্দিরের যাত্রী। এই ঘটনায় অদৃষ্টের শ্লেষ বড় নিদারুণ। যিনি মানুষের জন্য মুক্তধারার সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঁধ বাঁধিয়া তাঁহারই বিধানকে লঙ্ঘন, আবার সেই লঙ্ঘনের গৌরবে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পূজার সমারোহ।

রণজিৎ। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিনি।

বিশ্বজিৎ। উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না—এই কথা জানাতে এসেছি।

রণজিৎ। তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ। কী নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছে সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ। শত্রু দমনের জন্যে—

বিশ্বজিৎ। মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ। যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ। তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।[১]

দেবতা ভৃত্য হইয়াছেন, পূজা বেতন হইয়া পড়িয়াছে, এই কথা বলিয়া দিবার জন্য বিশ্বজিৎ আছেন, ধনঞ্জয় আছে, যুবরাজ অভিজিৎ আছেন। অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া দেবতাকে দাসত্ব হইতে, অর্ঘ্যকে বৃত্তিত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছেন। মুক্তধারা খুলিয়া

১ তদেব, পৃ: ১৭৪-১৭৫।

দেওয়ায় ঝরনা যে কেবল মুক্তি পাইয়াছে তাহা নয়, দেবতা ভৃত্যত্ব হইতে এবং মানুষ দেবলক্ষ্মী মনিবত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছে। মুক্তধারার বাঁধভাঙা এই দুইটি মুক্তিরই প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের তত্ত্বনাট্যে বক্তব্য বিষয়কে চরিত্র ও ঘটনার দ্বারা যেমন প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তেমনি ভাব প্রকাশের আর একটি উপায়—অনুকূল আব্‌হাওয়া সৃষ্টি। বরঞ্চ, চরিত্র ও ঘটনা-স্রোতের চেয়ে আব্‌হাওয়ার উপরেই তিনি যেন বেশী নির্ভর করিয়াছেন। রবীন্দ্র-তত্ত্বনাট্যের ইহা একটি প্রধান লক্ষণ।

মুক্তধারায় আব্‌হাওয়ার গুরুত্ব খুব বেশি, কবির বক্তব্যের অধিকাংশই আব্‌হাওয়ার দ্বারা প্রকাশিত। বাঁধের লৌহযন্ত্র ও ভৈরব মন্দিরের চূড়া, বৃহত্তর আব্‌হাওয়ার অংশ মাত্র।

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ, আসন্ন অমাবস্যার রাত্রি ; সায়াহ্নের ম্লান আকাশে দিনের আলো নাই, আবার রাত্রির অন্ধকারও ঘনীভূত হয় নাই—উদ্ধত স্পর্ধার মত লৌহযন্ত্রটা মাত্র দৃশ্যমান আর বিপরীত দিকে আসন্ন প্রলয়ের বিদ্যুৎশিখার মত ত্রিশূলের ত্রিধা নিশংক সতর্কবাণী।

অন্ধকারের মধ্যে একটা আম বাগান ; আম বাগানের পাশ দিয়া মন্দিরগামী পথ ; পথ দিয়া মন্দিরযাত্রীরা অবিরাম চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ভৈরব মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিদলের ধূপ দীপ হাতে গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। আবার কখনো বা যন্ত্রমহিমার গান করিয়া উল্লসিত জনতার যন্ত্ররাজকে কাঁধে করিয়া প্রবেশ ও প্রস্থান। পূজা যে কাহার, তাহাতেই যেন সংশয়, ভৈরবের না যন্ত্ররাজ বিভূতির ? পুত্রহারা অম্বার বিলাপ এবং পৌত্রহারা বটুকের সাবধানবাণীও এই আব্‌হাওয়ার অন্তর্গত। আব্‌হাওয়াকে শোকে ও সতর্কতায় ভয়রোমাঞ্চ করিয়া তোলাই তাহাদের প্রধান কাজ। আরও একটা ব্যাপার আছে। এতদিন উত্তরকূটের সর্বত্র হইতে মুক্তধারার কলধ্বনি শোনা যাইত—আজ তাহা আর শোনা যাইতেছে না। সেই

অভ্যস্ত অথচ অশ্রুত কলধ্বনিও এই আবহাওয়ার একটা নঙর্থক অংশ। এই অনভ্যস্তনিস্তব্ধতা দেবতার নীরব রোষের মত উত্তরকূটের মাথার উপরে উদ্যত।

ইহার উপরে আছে যন্ত্র ও ত্রিশূল। দিনের বেলায় যন্ত্রটাকে দেখিয়া লোকের অহঙ্কার হইত, অন্ধকারে সেটাকে দেখিয়া তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

ওই ভাই ওই দেখ্। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হ'য়ে এলো কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের চূড়াটা এখনও জ্বল্ছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হ'য়ে রয়েছে।

আর ভৈরব মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে, যেন ডোব্বার ভয়ে কী রকম দেখাচ্ছে।[১]

অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইবার পরে—

কুন্দন। ওই দেখো চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আস্ছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হ'য়ে উঠ্ছে।

—দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মত দেখাচ্ছে।

কুন্দন। বিভূতি তার কীর্তিটাকে এমন ক'রে গড়্ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যেদিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাক্বার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।[২]

যন্ত্রটা যে উত্তরকূটের স্পর্ধার প্রতীক, কাজেই উত্তরকূটের সর্বত্র ওই যন্ত্রটাকে না দেখিয়া উপায় কি?

এমন কি স্বয়ং রাজাও একবার অসতর্ক মুহূর্তে যন্ত্রটার প্রকৃত রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সত্যকার রূপ বুঝিতে তাঁহাকে অনেক দুঃখ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

১ তদেব, পৃঃ ২২২।

২ তদেব, পৃঃ ২২৭।

রণজিৎ। মন্ত্রী, ওটা কী, আকাশে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটা তো সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ। এমন স্পষ্ট তো কোনদিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী। আজ সকালে ঝড় হ'য়ে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ। দেখেছ, ওর পিছনে থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশী উঁচু ক'রে তোলা ভাল হয়নি।

মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।[১]

রাজা বলিয়াছেন অতটা উঁচু করা ভাল হয় নাই—কিন্তু কতটা উঁচু সত্যই তিনি যদি জানিতেন! যন্ত্রের মাথা যে দেবমন্দিরের চূড়াকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

এতক্ষণ যে প্রতীক, ঘটনা বা লোকগুলির কথা বলিলাম তাহারা নাটকের গল্পের বিবর্তনে কোন সাহায্য করে নাই; নাটকের গল্প যে ক্ষেত্রে বিবর্তিত হইতেছে সেই ক্ষেত্রকে সৃষ্টি করিয়া তাহারা নাটকের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইহারা নাটকের নিষ্ক্রিয় অংশ। এই নিষ্ক্রিয় অংশের পটভূমিকাতেই নাটকের সক্রিয় অংশ ঘটনার বিবর্তন করিতে করিতে পরিণামের মুখে ছুটিয়াছে।

প্রতিভাবান্ প্রয়োজকের হাতে পড়িলে রঙ্গমঞ্চে মুক্তধারা বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধ'রে একটা নাটক লিখছিলুম শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটী। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়, এর নাম "পথ"। এতে কেবল "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী

---

১ তদেব, পৃঃ ১২৮-১২৯।

আছে, আর কেউ নেই, সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।[১]

যদিও এই নাটকের নাম 'পথ' রাখা হয় নাই, তবু নামটার বিশেষ সার্থকতা আছে। নাটকের ঘটনাক্ষেত্র ভৈরব মন্দিরে যাইবার পথ। রাজা পথের মধ্যে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাজা হইতে দীনতম ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলেই ভৈরব মন্দিরের পথযাত্রী। সব ঘটনাই এই পথের উপর ঘটিয়াছে। শিবতরাই ও উত্তরকূটের হাজার হাজার লোক পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

নাটকের নায়ক যুবরাজ অভিজিৎ জন্মযাত্রী। পথের ধারেই তাহার জন্ম, আবার পথের ধারেই তাহার মৃত্যু। মুক্তধারার তীরে সে জন্মিয়াছে, আবার মুক্তধারার বন্ধন ভাঙিতে গিয়া তাহার তীরেই তাহার মৃত্যু। বাঁধন ভাঙা মুক্তধারার স্রোত তাহার দেহ ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। মুক্তধারার মধ্যেও যে গতি, পথের মধ্যেও তো সেই গতিই। পথ কাটাই যুবরাজের কাজ। নন্দিসংকটের রুদ্ধ পথ সে কাটিয়া দিয়াছে; আবার যেসব পথ এখনো কাটা হয় নাই পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের সেই সব অকৃত পথকে সে দেখিতে পায়।

অবিরাম গতিতেই জীবনের সার্থকতা—গতিই জীবনের স্বরূপ। সেই গতি যেখানে কোন কারণে ব্যাহত, জীবনরূপ সেখানে বিকৃত। এই বিকৃতির হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করাই অভিজিতের ব্রত। মুক্তধারার বদ্ধজল বদ্ধজীবন-স্রোতের প্রতীক; নন্দিসংকটের রুদ্ধ পথ রুদ্ধজীবনের প্রতীক; গৌরীশৃঙ্গের অকৃত পথ অনাগত জীবনের

---

১ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পৃঃ ১১৩, ১৩২৮, ৬ঠা মাঘ।

শান্তিনিকেতনে এই নাটক প্রথম পাঠের সময়ে কবি একবার বলিয়াছিলেন—নাটকটার নাম "পথ" দিলে ভাল হয়। কিন্তু তার বেশী অগ্রসর হন নাই। 'মুক্তধারা' নামেই ইহা প্রকাশিত হয়। লেখক সেই পাঠসভায় উপস্থিত ছিল

প্রতীক ; জীবনস্রোতে আর একবার স্বভাবের গতি ফিরাইয়া দিবার জন্য অভিজিৎ জীবনত্যাগ করিয়াছে। এই বদ্ধ জীবনের পারিপার্শ্বিকে তাহার জীবনও যেন রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মুক্তধারার মুক্তস্রোতে সে মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের গতিকে ফিরিয়া পাইল।

নাটকের ভিতরকার এই গতিরূপটি নাটকের গঠন প্রণালীতে চমৎকার ধরা পড়িয়াছে। নাটকের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে যে দ্রুতি ও গতি আছে, জনস্রোতের যে অবিরাম চলা আছে, ঘটনা ও মানুষ সকলেই ভৈরব মন্দিরের দিকে যে দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটিতে বাধ্য হইয়াছে, পথাশ্রয়ী নাটকের ভিতরে এই গতি আশ্চর্যরূপে দৃশ্যমান। আর নাটকের সমাপ্তির চরম মুহূর্তে মুক্তধারার মুক্তিকল্লোলে গতির জয়োল্লাসে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভিতরের ও বাহিরের ঐক্যে নাটকের তত্ত্ব ও টেকনিক একাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

এবারে নাটকের যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী। বস্তুতঃ তাহা নয়। যন্ত্রের মধ্যেও প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশ, তাহাকে কবি কখনো অস্বীকার করেন নাই, কারণ সে শক্তি যে মানুষের শক্তিরই অংশ।

ধনঞ্জয়। যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা [এ ক্ষেত্রে মুক্তধারা] কি কম কথা ? তা সে অন্তরেই হোক আর বাহিরেই হোক।

যন্ত্রের প্রতি ইহাই কবির যথার্থ মনোভাব। যন্ত্রের মধ্যে মানব শক্তিরই প্রক্ষেপ ; যন্ত্র মনুষ্যত্বের সীমাকে অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে ; বিরাট যন্ত্র যেন মানুষেরই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ব্যক্তিত্বকেও তো অবাধ রাশ দেওয়া চলে না ; নিজের সুবিধা ও অপরের স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া ব্যক্তিত্বকে চালনা করিতে হয়। প্রবল শক্তি-সম্পন্ন লোকেরও প্রবল শক্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহার

করিবার নৈতিক অধিকার নাই। নীতির ক্ষেত্রে এ সত্য তো আমরা স্বীকার করি। তাহা যদি হয়, তবে যন্ত্রের ক্ষেত্রেই বা তাহা স্বীকৃত না হইবে কেন? কারণ যন্ত্র তো মানবসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন নয়, সে যে মানুষেরই শক্তির প্রকাশ মাত্র। মানুষের শক্তির সীমা ছাড়াইলে শাসন করি, যন্ত্রের শক্তি সীমা ছাড়াইলে কেন অশাসিত থাকিবে? মানুষের শক্তি ও যন্ত্রের শক্তিকে আজ পর্যন্ত আমরা ভিন্ন জাতের মনে করিতে অভ্যস্ত, তাই বিচারে এত গোলযোগ উপস্থিত হয়। যেদিন এই দুই শক্তিকে একই শক্তির প্রকাশভেদ ও অংশবিশেষ বলিয়া দেখিতে পারিবে, সেদিন অনেক গোলযোগ আপনি পরিষ্কার হইয়া যাইবে। মানুষের শক্তির মত যন্ত্রও নৈতিক শক্তি। যতক্ষণ যন্ত্র প্রাণের সহায় নৈতিকতঃ ততক্ষণ তাহার টিকিবার অধিকার আছে। যতক্ষণ সে প্রাণের অনুকূল, সৌন্দর্যের অনুকূল, কল্যাণের অনুকূল, আনন্দের অনুকূল, ততক্ষণ তাহাকে বর্জন করা মনুষ্যত্বকেই হীনবল করা হয়। কিন্তু যখন সে মানুষের প্রতিকূল হইয়া ওঠে, 'সুপারম্যানের' পরিবর্তে 'সাব্‌ম্যান' গঠনের পথ প্রস্তুত করে, 'ডিভিশন অব লেবারের' স্থলে 'সাবডিভিশন অব লেবারের' ক্ষেত্র রচনা করে, তখন মুক্তধারায় বাঁধ পড়ে; তখন কবির পক্ষে অভিজিতকে আহ্বান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অভিজিৎ প্রাণের দ্বারা যন্ত্রকে ভাঙিয়াছে, ইহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতারই প্রমাণ। যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্রের দ্বারা ভাঙিলে প্রকারান্তরে যন্ত্রের জয় ঘটিল; কিম্বা মানুষের অধিকতর পরাজয় ঘটিল। দুর্বল যন্ত্রেরই দাসত্বের পরিবর্তে সে প্রবলতর যন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করিল। আবার তাহার চেয়েও প্রবলতর যন্ত্র আবিষ্কারে মানুষের রোখ চাপিয়া যায়—এমনিভাবে তাহার স্বাধীনতা অমোঘতর শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িতে থাকে মাত্র। কিন্তু প্রাণকে যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না—প্রাণের প্রবলতা মানুষের পক্ষে শুভ ছাড়া, অশুভ নয়।

তোমার চিঠিতে machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ, সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বল্‌ছে—"আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিত্‌বো, আমি মারকে না-মারা দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে "মার লাগিয়ে জয়ী হ'ব।" পৃথিবীতে যন্ত্রী বল্‌ছে "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজের বন্দী মানুষটি বল্‌ছে "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি দিতে, হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয় আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।[১]

তিন জাতের মানুষের কথা কবি এখানে বলিয়াছেন। যন্ত্রী মানুষ বিভূতি, সে যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে চায়; মন্ত্রী মানুষ ধনঞ্জয়, সে যন্ত্রের আঘাত অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে জয়ী হইতে চায়; আর অভিজিৎ বলে যে মানুষকে প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

বিভূতি ও অভিজিৎ উভয়েই উত্তরকূটের মানুষ। উত্তরকূটেই

১ রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩২, ৫৩৩।

যন্ত্রের উদ্ভব। বিভূতি বলে উত্তরকূট যন্ত্রের রাজত্ব, অভিজিৎ বলে উত্তরকূট যন্ত্রোত্তর রাজত্ব। এখানকার লোকেই যন্ত্রের স্রষ্টা, আবার এখানকার লোকের হাতেই যন্ত্রের নাশ। এ কেমন করিয়া হইল? মানুষের সামাজিক বিবর্তনের পথে যন্ত্রবাদ একটা অবস্থা মাত্র, চরম অবস্থা নয়। যে বিবর্তনের ফলে মানুষ আজ যন্ত্রবাদে পৌঁছিয়াছে, সেই বিবর্তনেরই আরও খানিকটা অগ্রগতির ফলে সে একদিন যন্ত্রোত্তরবাদে পৌঁছিবে। যন্ত্রবাদ যদি আজকার অবস্থা হয়, যন্ত্রোত্তরবাদ আগামী কাল। বিভূতি আজকার মানুষ, অভিজিৎ মানুষ আগামী কালের। অভিজিতের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের পূর্ণতর রূপ। ইউরোপে যন্ত্রবাদের উৎপত্তি, আবার ইউরোপের মধ্যেই ইহার প্রতিবাদ আছে। যন্ত্রোত্তরবাদ ইউরোপেই প্রথম দেখা দিবে—তখন ইউরোপ নিজের যান্ত্রিক কীর্তিকে নিজেই নষ্ট করিবে।

যুবরাজ বলেছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড় গৌরব তাই লাভ করো।

কিন্তু তাহা অনায়াসে ঘটিবার নয়, তাহার জন্য আত্মনাশের ও আত্মবিপ্লবের আবশ্যক। বিভূতি স্বহস্তে যন্ত্রকে নাশ করিতে পারে নাই, সেজন্য অভিজিতকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। যন্ত্ররাজ বিভূতি ও যন্ত্রোত্তররাজ অভিজিৎ—দুজনে মিলিয়াই উত্তরকূটের সম্পূর্ণ রূপ। তাহারা পরস্পর পরিপূরক—ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।

প্রচণ্ড শক্তির আধার বলিয়া যন্ত্রকে কবি স্বীকার করেন, মানুষের ব্যক্তিত্বেরই যেন তাহা প্রক্ষেপ। কিন্তু যন্ত্র যখন প্রাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বিষাক্ত করিয়া তোলে, মানুষের উপকরণ মাত্র না হইয়া মানুষই যন্ত্রের কাছে উপকরণ হইয়া পড়ে, তখন তাহা জীবনের মাধুর্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণকে নাশ করে।

অনায়াসে প্রাণ দেয়, জীবন তাহার কাছে নগণ্য বলিয়া নয়, জীবন এমন অমূল্য, এমন সুন্দর যে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রাণ দান খুব দুর্লভ মূল্য নয়। অভিজিৎ কঠোরের সাধনায় নিরত বলিয়া আদৌ নীরস নয়, জীবনের সৌন্দর্য, কোমলতা, মাধুর্যের প্রতি সে একান্ত সচেতন—এত বেশি সচেতন সে এ-সবের মূল্য হিসাবে সে আপনার জীবন দান করিতে উদ্যত।

সঞ্জয়। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, রাজবাড়ীতে ওই যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে এরও কি কোন ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে?

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্য কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বসো, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হ'য়েছিলে। জানবার আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয়নি সে কে, কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে-কথা কি আজ মনে করার নেই? ভীরু যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারেনি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ। পড়ছে বইকি। সেইজন্যই তো সইতে পারছিনে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ ক'রে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করিনি।

সঞ্জয়। গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হ'য়ে রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁছচ্ছে না?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌঁছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে। চেয়ে দেখো ওই পাখী

দেবদারু গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ওকি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে; কিন্তু ওযে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই ছবিটি। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।[১]

বিভূতি অভিজিতে মিলিয়াই যেমন উত্তরকূটের পূর্ণ পরিচয়, তেমনি কবি-মানস ও বিদ্রোহীব্যবহার মিলিয়াই অভিজিতের সম্পূর্ণ মূর্তি। যে মানুষ আগাগোড়াই কঠোর সে যদি যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—তাহা যেন যন্ত্রের বিরুদ্ধে যন্ত্রেরই বিরোধ; তাহাতে মানবিক ট্র্যাজেডি নাই; অভিজিতের আত্মদান ট্র্যাজিক, কারণ, তাহা যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহ।

ধনঞ্জয় মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলে আমি মারের দ্বারা মারকে জয়ের চেষ্টা করি না, আমি মারকে ছাড়াইয়া উঠিয়া মারকে জয় করি। সে শিবতরাইয়ের নেতা। শিবতরাইয়ের অন্য সবাই কিন্তু ধনঞ্জয়ের শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাহারা মারের দ্বারা মারকে জয় করিতে পারিলেই যেন বাঁচে। বিভূতি ও অভিজিৎ মিলাইয়া যেমন উত্তরকূট, তেমনি ধনঞ্জয় ও শিবতরাইয়ের অপর সকলে মিলিয়া শিবতরাই—অর্থাৎ মারখানেওয়ালার পূর্ণরূপ। তাহার মধ্যে যে অংশটা মানুষ, শিখাস্বরূপ, সে বলে মারকে না-মারের দ্বারা জয় করিতে হইবে; আর যে-অংশ জন্তু, মাংসপিণ্ডমাত্র, সে মার খাইয়া হয় কাঁদে, নয় উল্টা-মার দেয়। উত্তরকূট যেমন অভিজিতের শিক্ষা লাভ করিতে পারে নাই, শিবতরাইও তেমনি ধনঞ্জয়ের শিক্ষা লাভে অসমর্থ। বাংলা চলিত প্রবাদে আছে যে ধনঞ্জয় মার খাইয়া শিক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু এ ধনঞ্জয় এমন যে মার খাইলেও তাহার শিক্ষা হয় না। এই প্রবাদ

১ তদেব, পৃঃ ২০২-২০৩

বাক্যটি স্মরণ করিয়াই কি কবি এই পাত্রটির নাম ধনঞ্জয় রাখিয়াছেন ?

রণজিতের সঙ্গে অভিজিতের প্রেমের সম্পর্ক। সে অভিজিতকে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে। সম্পর্ক প্রেমের বলিয়াই অভিজিতের মৃত্যু তাহার পক্ষে ট্র্যাজিক হইয়াছে।

ডাকঘরেও প্রেম ও আচরণের এই দ্বৈত ভাব লক্ষিত হয়। মাধব দত্ত অমলকে ভালবাসে কিন্তু তাহাকে বোঝে না, ফলে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রেমের যথার্থ পূর্ণতার জন্য হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্মিলন প্রয়োজন। বুদ্ধিসম্পর্কহীন প্রেমানুভূতি মানুষকে মিলিত না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। রণজিৎ, মাধব দত্ত ও অমলের সম্পর্কের মধ্যে হৃদয় ও মস্তিষ্কের দ্বিধা হইতে এই কথাটি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই একাধিক জনতা আছে। কিন্তু মুক্তধারার জনতা অনেক—ইহার প্রায় অর্ধাংশই জনতার কথোপকথন। নাটকটি পথের কাহিনী, স্বভাবতই ইহার যোগ্য পাত্র-পাত্রী পথিক, মুক্তধারার জনতা পথিক জনতা। নাটকের চরম সঙ্কটের মুহূর্তে শিবতরাই ও উত্তরকূটের হাজার হাজার পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই পথিক অধিকাংশই নামপরিচয় ও ব্যক্তিত্বহীন। পথিকের আবার পরিচয় কি ?

জনতার আবার ব্যক্তিত্ব কি? মানুষ যখন এক তখন তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে, কিন্তু যখন সে জনতার মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিয়া দশের এক হইয়া যায় তখন তাহার ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায় ; সমষ্টির পরিচয়েই তখন তাহার একমাত্র পরিচয়। কাজেই মুক্তধারার জনতার ব্যক্তিপরিচয় নাই, কিন্তু চমৎকার সমষ্টি-পরিচয় আছে।

উত্তরকূটের ও শিবতরাইয়ের লোকের জাতীয় পরিচয় তাহাদের কথাবার্তা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ভুল করিবার কোন আশঙ্কা নাই।

উত্তরকূটের লোকের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ অবজ্ঞা ও স্পর্ধা। শিবতরাই ও অন্যান্য দেশের লোককে তাহারা নিজেদের চেয়ে হীন মনে করে, তাহাদের প্রতি অনুকম্পামিশ্রিত হীনতার ভাব পোষণ করে। পৃথিবী যে তাহাদের ভোগত্র, উত্তরভৈরব যে বিশেষ করিয়া তাহাদেরই দেবতা—এ বিষয়ে তাহারা নিঃসন্দেহ। যন্ত্র ও প্রহারের শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তিতে তাহাদের আস্থা নাই।

আবার শিবতরাইয়ের লোক উত্তরকূটের ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে ঈর্ষিত। উত্তরকূটকে মুখে তাহারা যতই উপেক্ষা করুক মনে মনে তাহাকে বড় মনে করে, তাহারা ধনঞ্জয়ের চেলা হইয়াও ধনঞ্জয়ের শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, কারণ ধনঞ্জয়ের ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দুর্বল ও হীনচৈতন্য ব্যক্তির দ্বারা লাভ করিবার নয়। ফলে ধনঞ্জয়ের মন্ত্র তাহাদের জীবনে সফল হয় নাই—মুখে মাত্র আবর্তিত হইতেছে; মনে মনে তাহারা লাঠি চালায়, মুখে কেবল ক্ষমার কথা। হয়তো উত্তরকূটের মারমুখো পাহাড়ীরাই প্রয়োজন কালে ধনঞ্জয়ের শিক্ষাকে যথার্থ ভাবে লাভ করিতে পারিবে।

উত্তরকূটের লোক আপনার দেশকে সন্দেহ করিয়া থাকে, কিন্তু সন্দেহটা এমনি বাতিক যে তাহার সীমানানিশ্চয় সম্ভব নয়। শিবতরাইকে সন্দেহ করিতে করিতে অবশেষে তাহারা বিভূতি, অভিজিৎ, রণজিৎ, মন্ত্রী সকলকেই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সন্দেহের পরিধি যত বাড়িয়াছে আত্মীয়ের পরিধি তত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে—শেষ পর্যন্ত সে পরিধি সঙ্কীর্ণতম হইয়া নিজেতে মাত্র আসিয়া ঠেকিয়াছে—ব্যক্তিত্ববাদের ইহা অনিবার্য ট্র্যাজেডি।

উত্তরকূটের নাগরিকরা মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎকে সন্দেহ করিতে সুরু করিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস তিনি উত্তরকূটের প্রতিকূল, ইহার দণ্ড কি?

২। এর উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে, দাদা—

১। হাঁ, হাঁ, ওদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন। আর জানিস তো ভাই, ওর গোষ্ঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গরু আছে।

১। তার সব কটি গুণে নিয়ে তবে—কী অন্যায়! অসহ্য অন্যায়—

৩। আর ওদের সেই জাফরাণের ক্ষেত, তার থেকে অন্ততঃ পক্ষে বৎসরে—।[১]

এইসব উক্তির ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রেতিহাস হইতে প্রচুর নজির পাওয়া যাইবে।

নাটকের মধ্যে একটি গুরুমশাই আছেন, তাঁহাকে যেমনটি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ঠিক সেই ছাঁচে উত্তরকূটের ভাবী নাগরিক গঠন করিয়া তুলিতেছেন। জনতায় যাহাদের পরিচয় পাইলাম, গুরু মহাশয়ের গোকুলে তাহারা বাড়িয়া উঠিতেছে। Totalitarian রাষ্ট্রের হাতে পড়িলে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি সব কেমন করিয়া রাষ্ট্রনীতির অনুকূল হইয়া গড়িয়া ওঠে, গুরু মহাশয় ও বালকগণ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গুরু মহাশয় চমৎকার একটি type; তাহার দোসর আধুনিক ইউরোপের কোন কোন রাষ্ট্রে সংখ্যায় প্রচুর।

রক্তকরবী

রক্তকরবী নাটকের মর্মার্থ কি? স্পষ্টত ইহা দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি কৃষিনির্ভর সভ্যতার সহিত যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব একটি আধুনিক সমস্যা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নিছক আধুনিক সমস্যা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নহেন। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, "আধুনিক সমস্যা ব'লে কোনো পদার্থ নেই। মানুষের

১ তদেব, পৃঃ ২২৮

সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।” এ চিরকালীন সমস্যা যে কত বেশী পুরাতন তাহারই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কবি রামায়ণের কাল পর্যন্ত গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, রামায়ণে কথিত রাম-রাবণের দ্বন্দ্বে এই চিরকালীন সমস্যার একটি তৎকালীন রূপ পাওয়া যায়। প্রচলিতসংস্করণ রক্তকরবীর প্রস্তাবনাতে তিনি এই সমস্যাটির সম্যক্ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রক্তকরবী নাটকটির সহিত রামায়ণের মূলগত ঐক্যের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার মতে রামায়ণের সমস্যাই রক্তকরবীর সমস্যা। নাটকটির শিল্পসত্তা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আগে তাহার তত্ত্বসত্তা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক—তাই সমস্যাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেখানে যত আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া দিতেছি। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইবে—কিন্তু সেই দীর্ঘতাই প্রমাণ করিবে, সমস্যাটি কত দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে।

প্রথমে রক্তকরবীর প্রস্তাবনা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ-করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বলো প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চচূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি রকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ

করে থাকি। … হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে
কলিযুগ কৃষিপ … জাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া
শোষণজীবী স … দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত
রাক্ষসেরই মা … খর এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের
ঝুলিতে লুকি … ছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা
যায়। নবদূর্ব … র্বর বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর
অধীশ্বর দশ … নিয়েছিল, সেটা সেকালের কথা,
না এ কালে … ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না
আমার মতে … বির কথা? তখনো কি সোনার
খনির মালি … াসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান
দিয়েছিল।

আরও … রাখতে হবে। কৃষি যে দানবীর
লোভের ট … হয়েছে. ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-
ঢাকা দিে … সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে।
আজকের … মৃগের লোভেই তো আজকের দিনের
সীতা তাঁ … চ্ছে; নইলে গ্রামে পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।...রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল। হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা, বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর-

একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।[১]

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারিলাম যে, রামায়ণে ও রক্তকরবীতে তত্ত্বগত ঐক্য আছে; উভয় কাব্যেরই তত্ত্বগত রূপ হইতেছে, দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার দ্বন্দ্ব: রত্নাকরের দস্যুবৃত্তি ত্যাগের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ একটা ইঙ্গিত দেখিয়াছেন; এমনকি রাম ও রাবণ নাম দুটিও তাঁহার নিকটে দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার রসে রঞ্জিত হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

রামায়ণের তত্ত্ববিশ্লেষণের জের রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনাতেও আছে, এবং আরও স্পষ্ট আকারে আছে। 'সীতা' শব্দটিতে তিনি একটি বিশেষ রূপক দেখিতে পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়—রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ সীতার বিবাহ, অহল্যার শাপমুক্তি—সমস্তই একটি বৃহৎ রূপকের অংশ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনুভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হালচালনরেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন।···বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈবরাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনুভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে-ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে-ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন; তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে

১ রক্তকরবী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫৪৫-৫৪৬

ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।[১]

উপরের অংশ হইতে সীতা নামের ব্যাখ্যা জানা গেল। সীতা কি, না মূর্তিমতী কৃষিবিদ্যা। তাহা হইলে নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র কর্তৃক সীতাবিবাহের অর্থ দাঁড়ায়—আর্যসমাজ কর্তৃক কৃষিবিদ্যাকে স্বীকার। আর রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং রাম কর্তৃক রাবণকে পরাজিত করিয়া সীতার উদ্ধারের মর্ম এই যে, আকর্ষণজীবী সভ্যতা কৃষিবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে কর্ষণজীবী সভ্যতায় ও আকর্ষণজীবী সভ্যতায় একটা প্রবল লড়াই বাঁধিয়া ওঠে। সেই যুদ্ধে রাবণই কেবল পরাজিত হইল না, সামগ্রিকভাবে আকর্ষণজীবী সভ্যতার উপরে কর্ষণজীবী সভ্যতার আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটিল। জাভাযাত্রীর পত্রে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও পূর্বোদ্ধৃত অংশের এবং রক্তকরবী-তত্ত্বের পোষক।[২] কিন্তু সে সব উদ্ধারের আর আবশ্যক আছে মনে করি না, যেহেতু এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতেই সমস্যার রূপটি বিশদ হইবার কথা।

রামায়ণের সহিত রক্তকরবীর তত্ত্বগত ঐক্য প্রদর্শন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই, নাটকটিকে যতদূর সম্ভব রামায়ণের প্যাটার্নে বা ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সীতাহরণ এবং তাহার ফলে লঙ্কাধ্বংস রামায়ণের মূল বিষয়; নাটকটিরও মূল বিষয় অনুরূপ, নন্দিনীকে যক্ষপুরীতে আনয়ন এবং যক্ষপুরীধ্বংস। লঙ্কাপুরীর রাবণ ও যক্ষপুরীর রাজার মধ্যেও সাদৃশ্য বর্তমান।

---

১ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮শ খণ্ড, পৃ ৪৩২-৪৩৩। পরিচয় গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮১৬ সাল। প্রবন্ধটির রচনাকাল আরও পূর্ববর্তী। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, রক্তকরবীতে যে তত্ত্ব প্রকাশিত কত দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে তাহা বিরাজ করিতেছিল।

২ জাভাযাত্রীর পত্র, ৭, পৃ ৪৪১-৪৭৫, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯শ খণ্ড

রাক্ষসগণ আকর্ষণজীবী, তাহারা কর্ষণজীবিতার বিরোধী। যক্ষপুরীর খোদাইতন্ত্রও রূপান্তরে কি তাহাই নয়? এসব বিষয়ের বিচারে তুলনাকে বহুদূর পর্যন্ত টানিয়া লওয়া উচিত নয়, আভাস-ইঙ্গিতের চেয়ে অধিক প্রত্যাশা করা উচিত হইবে না। কবিও আভাস-ইঙ্গিতেই কাজ সারিয়াছেন, তবু বুঝিতে পারা যায়, রক্ত-করবীকে ঢালাই করিবার সময়ে রামায়ণের ছাঁচটা তাঁহার মনে ছিল।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতাম, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ-বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটেনি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে, তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ: সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।...

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থানের একটি ডাক-নাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে।[১]

উদ্ধৃত অংশের সাক্ষ্যে যুক্তির বলে রামায়ণের ছাঁচের সহিত রক্তকরবীর ছাঁচের ঐক্য প্রমাণ করা যায় কি-না সন্দেহ—তবে অনুভূতির বলে নিশ্চয় যায়। শিল্পবিচারে অনুভূতির সাক্ষ্যকেই বিশ্বাস করিতে হইবে।

যদিচ অনুভূতিই আমাদের প্রধান সাক্ষী এবং সে বেচারা ইঙ্গিতের বেশী দান করিতে সমর্থ নয়, তবু তাহার ইঙ্গিতময় সাক্ষ্যের অনুকূলে কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি, যাহাতে রক্তকরবী যে রামায়ণকাব্যের ছাঁচে ঢালাই-করা তাহা প্রমাণিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

রামায়ণ-কাব্যে রাম ও রাবণের দ্বন্দ্ব, তাহাদের দ্বন্দ্বের হেতু সীতাহরণ। এই ঘটনাটি রক্তকরবীতে ভাবরূপে দেখা দিয়াছে। রক্তকরবীর দ্বন্দ্ব কর্ষণজীবিতা ও আকর্ষণজীবিতার মধ্যে, মাঝখানে রহিয়াছে নন্দিনী। রবীন্দ্রনাথ সীতাকে মৌলিক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, সীতা অর্থাৎ হলচালনরেখা। সোজা কথায় এই যে, সীতা কৃষিবিদ্যা, আর তাহাকে লইয়াই দ্বন্দ্ব দুই ভিন্ন গোত্রের সভ্যতায়। রক্তকরবীতেও দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছে দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতায়, তাহাদের দ্বন্দ্বের কারণ নন্দিনী। তাহা হইলে এই নন্দিনী কে? নাটকখানি বুঝিবার পক্ষে নন্দিনীর মর্মগত পরিচয় জানা বিশেষ আবশ্যক, এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার আশাতেই এখন ক্ষান্ত হইলাম। আবার রামায়ণ ও রক্তকরবী দুই ক্ষেত্রেই দেখি আসল দ্বন্দ্বটা মানুষের সহিত যন্ত্রের দ্বন্দ্ব। রাক্ষস-সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের মতে যান্ত্রিক সভ্যতা। রামায়ণ ও রক্তকরবীর শিবির সন্নিবেশের একপক্ষে প্রাণের মাধুর্য, অপরপক্ষে আত্মঘাতী ঐশ্বর্য; একপক্ষে আনন্দ, রাম ও রঞ্জন; রাম যে আনন্দ দান করে, রঞ্জন যে মনকে রাঙাইয়া

১ রক্তকরবী, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃ ৪৪৪

তোলে; অপরপক্ষে রাবণ ও যক্ষপুরীর অধীশ্বর। দুইখানি কাব্যেই দেখা যায়, প্রেমের সঙ্গে লুব্ধ প্রচেষ্টার সংঘাত; রাম সীতাকে প্রেমের দ্বারা আপন করিয়াছেন, রাবণের লুব্ধ প্রচেষ্টা তাহাকে হরণ করিয়াছে; রঞ্জন ও নন্দিনীর মধ্যেকার অদৃশ্য প্রেমসূত্রকে লুব্ধ মুগ্ধ ঈর্ষাপরায়ণ যন্ত্ররাজ বারংবার আঘাত করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। এসব তথ্য যেমন আকস্মিক নয়, তেমনি ইঙ্গিতময়ের অধিকও নয়, তবে কাব্যদুইখানি এক ছাঁচে ঢালাই বলিয়া অনুভূতির সাক্ষ্যে বিশ্বাস হইলে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি সেই বিশ্বাসের বনিয়াদ দৃঢ়তর করিয়া দিবে বলিয়া মনে করা অন্যায় হইবে না।

২

নন্দিনী কে, আর রক্তকরবী বলিতে কবি কি বুঝিতেছেন? এ দুটি বিষয় পরিষ্কার হইলেই নাটকখানির মর্মগ্রহণ সহজ হইবে, কারণ নন্দিনী ও রক্তকরবীর গুচ্ছের মধ্যে একটা মর্মগত যোগ আছে। নন্দিনী যাহার মানবরূপ, রক্তকরবীপুষ্প তাহারই প্রতীকরূপ; রূপে ভিন্ন, স্বরূপে এক। কবি মানবকন্যা নন্দিনীর রূপে যে অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহাকেই আরও নৈর্ব্যক্তিক করিয়া, আরও পারিপার্শ্বিকশূন্য বিশুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ প্রতীকে পরিণত করিয়া, রক্তকরবীপুষ্পগুচ্ছরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আগে নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা কবির ভাষাতে শোনা যাক—

রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়ত রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ

ঘটে তাহলে তার [illegible] । নাটকের মধ্যেই কবি আভাষ দিয়েছে যে, মা[illegible] তালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, ম[illegible] ...এ যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।[1]

কবির সতর্কবাণী সত্ত্বেও নন্দিনীর স্বরূপ সন্ধান না করিয়া উপায় নাই এবং রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে না হোক পাপড়ির সহিত মিলাইয়া লইয়াই নন্দিনীর স্বরূপ সন্ধান করিতে হইবে। নন্দিনী যদি অপর্ণা বা ইলা হইত তবে তাহার স্বরূপ সন্ধান করিবার কথা কাহারো মনে উঠিত না, তাহার রূপেই সকলেই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু নন্দিনী যে-যক্ষপুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে সকলেই কিছু-না-কিছু সন্ধান করিয়া মরিতেছে। সেখানকার অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ শব্দের অর্থ খুঁজিতেছে, সেখানকার খোদাইকরের দল মাটির তলায় সোনা খুঁজিয়া মরিতেছে, জালের আড়ালে রাজা নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকে সন্ধান করিতেছে, স্বয়ং নন্দিনী রঞ্জনকে খুঁজিতে আসিয়াছে—এমন আবহাওয়ায় হতভাগ্য সমালোচক যদি নন্দিনীর স্বরূপসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে তাহার ভয়ের কারণ নাই, যেহেতু কবি স্বয়ং অন্যত্র নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পথপ্রদর্শন করিয়াছেন—

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী-নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য

১ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫৪৬

সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিল ... আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী; ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই। প্রেমের মধ্যে পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধন-জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তা বর্ণিত আছে।[১]

স্বভাবতই সংসারের একটা দিক যান্ত্রিক, সামাজিক কাঠামো, অর্থনীতিক কাঠামো, রাষ্ট্রিক কাঠামো, সবই অল্পবিস্তার যান্ত্রিক, তাহাকে বাদ দিলে মানুষের চলে না, যেমন কঙ্কালের নীরস অথচ দৃঢ় কাঠামোটাকে বাদ দিলে মানবদেহের চলে না। কিন্তু কঙ্কালের কাঠোমোটাই সব নয়, তার উপরে রক্তমাংস আছে, এবং সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে দেহের লাবণ্য ও মুখশ্রী। ঐখানেই মানুষের পরিচয়, কঙ্কালে কঙ্কালে ভেদ নাই। কবি বলিতে চান, যন্ত্র এবং প্রাণ, দার্ঢ্য ও প্রেম, কর্তব্য ও আনন্দ মিলাইয়া জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু কোনো কারণে কোনো সমাজে যদি যন্ত্রের দিকটাই প্রবল হইয়া ওঠে, তখন সে সমাজ মরিতে বসে। তখন সেই সমাজের মধ্যে হয় নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে, নয় সেই সমাজ ধ্বংস হয়। যক্ষপুরী সেইরকম একটি সমাজ। যন্ত্র সেখানে সর্বশক্তিমান হইয়া মানুষকে পীড়িত ও মনুষ্যত্বচ্যুত করিতেছে। যক্ষপুরীর সৌভাগ্য যে, মহতী বিনষ্টির আগেই সেখানে নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নন্দিনী কিনা আনন্দদায়িনী।

গীতায় কথিত হইয়াছে যে, অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে ভগবান

১ যাত্রী, পৃ ৩৮৪-৩৮৫, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯শ খণ্ড

অবতীর্ণ হন। তিনি মুক্তিদাতারূপে আসেন। নন্দিনী মুক্তিদাত্রীরূপে আসিয়াছে। যক্ষপুরীর সমাজে প্রাণের অভাব ঘটিয়াছে, ধর্মের অভাবও বলা যাইতে পারে, কেননা, অধর্ম প্রাণহরণ দিয়া শুরু করে, প্রেমহরণ ও সৌন্দর্যদৃষ্টিহরণ করিয়া তাহার কাজের সমাপ্তি ঘটে।

পুরুষ সন্ধানস্বভাবী, সন্ধানের প্রেরণায় সে কেবলি অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। কি বহির্বিশ্বে, কি অন্তর্লোকে, কোথাও তাহার সন্ধানের শেষ নাই। কেহ খুঁজিতেছে মাটির তলাকার সোনা, কেহ খুঁজিতেছে মনের তলাকার গূঢ়সত্তা; তাহার এই অনন্ত সন্ধানদৌড়ের আর শেষ নাই, এমন সময়ে সমাপ্তির অবগুণ্ঠনবতী নারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্তব্যের খাতিরে পুরুষ কেবলি যন্ত্র গড়িয়া চলিয়াছে, যন্ত্রকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছে। এমন সময়ে নারী সেখানে আনে প্রেম। পুরুষ টানিতেছে বাহিরের দিকে, নারী টানিতেছে ভিতরের দিকে—দুই টানাটানিতে সমন্বয় ঘটিলে পূর্ণতার শতদল বিকশিত হইয়া ওঠে, সেই শতদলের উপরেই তো বিষ্ণুসনাথা লক্ষ্মীর আসন। পুরুষী শক্তি ও নারীশক্তির যথার্থ সমন্বয়ে সংসারের পূর্ণতা। কিন্তু বাস্তব সংসারে এমন পূর্ণতা কখনো কদাচিৎ ঘটিয়াছে। যক্ষপুরীতে তো ঘটেই নাই—পুরুষী শক্তি সেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়া দুর্ভেদ্য যন্ত্রে আপনাকে দুর্জয়

বলিয়াছি যে, নন্দিনী ও রক্তকরবী অভিন্ন। দুয়ের স্বরূপ এক, কিংবা বলা চলে যে নন্দিনীর প্রতীক রক্তকরবীর পুষ্পগুচ্ছ।

এবিষয়ে একখানি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করা যাইতেছে—

মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন—দেখুন, প্রাণের জন্য ভয় নাই। উপনিষদ্ বলেন, প্রাণই সত্য, তার মৃত্যু নেই, ভয় ছিল জড়ের জন্য। বিজ্ঞান বলছেন, প্রকৃতির হাতে রচিত যে বস্তু তারও মৃত্যু নেই। মরে যতসব মানুষের রচা কৃত্রিম অসত্য বস্তু। রক্তকরবীতে আমি সে কথা বলেছি। হাজার বাঁধনে বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কে কবে মারতে পেরেছে? আমার ঘরের কাছে একটি লোহালক্কড়-জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবী গাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময়ে দেখতে পাই নি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জালজঞ্জাল ভেদ ক'রে একটি সুকুমার করবীশাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এলো। সে বললে, ভাই মরি নি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল। নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরী' 'নন্দিন' প্রভৃতি বলে আমার তৃপ্ত হয়নি, তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।[১]

পত্রখানির মর্ম অবগত হইবার পরে রক্তকরবীর স্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়; "চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার [নন্দিনীর] আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি।" রক্তকরবীর চারাটিও তো লোহার স্তূপের জালজঞ্জালে চাপা পড়ে

১ বর্তমান লেখকের নিকটে লিখিত পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রীর পত্র

নাই। নাটকে আছে যে, যক্ষপুরীর একান্তে অনাদরে অবহেলায় আবর্জনাস্তূপের নিকটে একটিমাত্র রক্তকরবীর গাছ আছে। যক্ষপুরীর যে ব্যবস্থা তাহাতে করবীর গাছ অধিক থাকিবার কথা নয়। সে ফুলের সন্ধানও আবার রাখে কিশোর নামে একটি বালক। ভালোবাসার দৃষ্টিতে সে নন্দিনীকে দেখিয়াছে, তাই তাহার দৃষ্টিতে বুঝি রক্তকরবীর গাছটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পত্রোল্লিখিত রক্তকরবীর চারাটি একটি ফুল ফুটাইয়া বলিয়া গেল যে, তাহাকে মারিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। নাটকের শেষেও দেখি যক্ষপুরীর কঠিন পাথরের উপরে বুকের রক্তের দাগে একগুচ্ছ রক্তকরবীর ফুল ফুটাইয়া দিয়া রঞ্জন বিদায় লইয়াছে। সে যেন পত্রখণ্ডে লিখিত রক্তকরবীর চারাটির মতোই বলিয়াছে—'মরিনি তো, আমাকে মারতে পারলে কই'। প্রাণের প্রতি, প্রেমের প্রতি, আনন্দের প্রতি অর্থাৎ নন্দিনীর প্রতি রঞ্জন তো অবিশ্বাস পোষণ করে নাই। তবে আর মরিল কই? ঐসবের প্রতি অবিশ্বাসেই তো মৃত্যু। নাটকের চূড়ান্তে নন্দিনী ও রক্তকরবী এক হইয়া গিয়াছে, গিরিশিখরের চূড়ান্তে অস্তমান সূর্য ও জ্বলন্ত মেঘ যেমন করিয়া এক হইয়া যায়।

দুই-ই যদি এক, তবে পৃথক সত্তা বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? নন্দিনী মানবকন্যা, মানবগুণ বা পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়া তাহার মধ্যকার বিশুদ্ধ প্রাণরূপ দেখানো সম্ভব নয়। প্রাণের ও প্রেমের, আনন্দের ও সৌন্দর্যের রূপটিকে বিশুদ্ধভাবে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই রক্তকরবীর অবতারণা করিতে হইয়াছে এবং তাহার উপরে প্রতীকের আরোপ করিতে হইয়াছে। কোনো বস্তুর বিশুদ্ধ রূপটি একমাত্র প্রতীকের দ্বারাই প্রকাশ সম্ভব।

৩

নন্দিনী-চরিত্র নাটকখানির প্রাণ। তাহার প্রাণবেগে নাটকের ঘটনা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যে যক্ষপুরী এতকাল স্তিমিতবেগে আপনার অভ্যস্ত পথে চলিতেছিল নন্দিনীর প্রাণপ্রবাহ আসিয়া পড়িয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া দিয়াছে। যক্ষপুরীর জীবনে নন্দিনী বেমানান, এখানে সে খাপ খায় নাই বলিয়া কেহ-বা তাহাকে আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, আবার কেহ-বা তাহাকে একটা দুর্যোগ মনে করিয়া যক্ষপুরী হইতে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। যক্ষপুরীর জড়-সংস্থাতে নন্দিনীরূপ প্রাণকণা এক বিপর্যয় ঘটাইবার মুখে—এমন অবস্থায় নাটকের সূত্রপাত।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্য জাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক-ভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী-নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিকতে দেয় না বুঝি।[১]

নাটকখানির অন্যান্য পাত্রপাত্রীকে বুঝিতে হইলে নন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়া, নন্দিনীর আবির্ভাবের পটভূমিকায় প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, নন্দিনীর আগমনে বিভিন্ন চরিত্রে যে অভাবিত প্রতিক্রিয়া জন্মিয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই তাহাদের মনের গতিবিধি বুঝিতে পারা যাইবে।

রাজা অধ্যাপক পুরাণবাগীশ কিশোর গোঁসাই ফাগুলাল চন্দ্রা বিশু ও সর্দার প্রভৃতি নাটকখানির প্রধান পাত্রপাত্রী। অবশ্য রঞ্জনও আছে, কিন্তু তাহাকে স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

নন্দিনীর প্রতি রাজার মনে দুটি বিরুদ্ধ ভাব—একটা আকর্ষণের,

১ নাট্যপরিচয়, রক্তকরবী, পৃঃ ৩৪২, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড

একটা বিকর্ষণের ; একটা নন্দিনীর দিকে তাহাকে টানিতেছে, আর একটা নন্দিনীকে তাড়াইয়া দিতে পারিলে সে বাঁচে। রাজা যেখানে যক্ষপুরীর অধীশ্বর, অর্থাৎ যক্ষপুরীর যন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহত্তম যন্ত্র সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহার বিকর্ষণ। রাজা অজ্ঞাতসারে বুঝিয়াছে যে, এই মেয়েটি তাহার যন্ত্রধর্মকে বিকল করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু রাজা যেখানে মানুষ, যক্ষপুরীর জটিল জালের আড়ালে থামিয়া যেখানে তাহার মানব-হৃদয় অপর হৃদয়ের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণ। যন্ত্রস্বভাব ও মানবস্বভারের দ্বৈত উপকরণে যক্ষপুরীর রাজা গঠিত। তাহার দ্বৈত স্বভাবের পরিচয়দান-উপলক্ষে কবি বলিতেছেন—

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালায় রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটেনি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটছে, এমনও এক সূচনা আছে।

আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই।

একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।[১]

উপরের বর্ণনা হইতে মকররাজের যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে জানা গেল যে, রাজা অমিত শক্তি। তাহার সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শক্তি যুক্ত হইয়া তাহাকে প্রবল ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছে। আর জানিলাম যে, ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি, বিভীষণ ও রাবণ, তাহার এক দেহেই বিরাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয় জানিতে পারিলাম, তাহার বিপুল সমৃদ্ধির মাঝখানে একটি মানবকন্যার আবির্ভাব হইয়াছে।

এই মানবকন্যাটির স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় রাজার মধ্যেকার সহজাত মানববুদ্ধি ও চেষ্টায়ত্ত বৈজ্ঞানিক শক্তি, তাহার মধ্যেকার রাবণ ও বিভীষণ আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং অবশেষে বৈজ্ঞানিক শক্তির উপরে মানববুদ্ধির, রাবণের উপরে বিভীষণের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, রামায়ণের মতো ঘটনা-প্রবাহে ঘটে নাই, অর্বাচীন কালের শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়া ভাবনাপ্রবাহে ঘটিয়াছে।

বিজ্ঞান মানুষকে শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ আজ দশানন ও সহস্রাক্ষ। কিন্তু বিপদ এই যে, মানুষ এই শক্তিকে নিজের কল্যাণকর্মে নিয়োগ করিতে জানে না। বালকের হাতে অস্ত্র পড়িলে তাহা দিয়া সে যেমন যথেচ্ছ আঘাত করিয়া একপ্রকার গৌরব অনুভব করে, অবশেষে তাহার ক্লান্ত হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়ে, মানুষের আজ তেমনি দশা। মানুষ আজ ক্লান্ত। এই ক্লান্তির অবসান হইতে পারিত, বৈজ্ঞানিক শক্তির চরিতার্থতা হইতে পারিত—যদি সে আপনার প্রাণধর্মের সহিত যন্ত্রধর্মকে কোনোরকমে মিলাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহা তো আজও হইয়া উঠিল না, বরঞ্চ দেখিতেছি যে, যন্ত্রের চাপে প্রাণ আজ পীড়িত। সেই পীড়া

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৫৪৪ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫শ খণ্ড

মানবসমাজ আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। মকররাজও সেই পীড়ায় পীড়িত, ক্লান্ত। তাই নন্দিনীর প্রতি তাহার এমন আকর্ষণ, তাই তাহার প্রতি একরকম সূক্ষ্ম প্রণয়ের ভাব সে অনুভব করে, তাই রঞ্জনের প্রতি তাহার ঈর্ষার অন্ত নাই। মুক্ত বিশুদ্ধ প্রাণরূপের প্রতি যন্ত্রপীড়িতের যে মনোভাব, নন্দিনীর প্রতি মকররাজ তাহাই অনুভব করিতেছে।

এ যেমন গেল তাহার একই দেহে প্রাণময় ও যন্ত্রময় সত্তার অস্তিত্ব, আবার দেখি সে একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ। পাপের লালনের জন্য সে দায়ী বটে, কিন্তু তাহার প্রতি একটা প্রতিবাদও আছে তাহার মনে। নন্দিনী আসিবার আগেও ছিল, সুপ্ত ছিল; নন্দিনী আসিয়া সেই সুপ্ত প্রতিবাদকে জাগাইয়া দিয়াছে। যক্ষপুরীর জীবনের যে জটিল জালকে সে সৃষ্টি করিয়াছে, অবশেষে নিজের রচা যে জটিল জালখানার আড়ালে সে অন্তরায়িত, একদিন নন্দিনীর প্রেরণায় ও প্ররোচনায় তাহাকেই দীর্ণ করিয়া সে মুক্ত হইয়াছে, আপনার রচিত প্রাণহীন নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

এ মুক্তি মানবের মুক্তি, জড়বাদের যন্ত্রবাদের অতিকায়িক নিষ্পেষ হইতে প্রাণের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান, মানুষ যতই যন্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া, জড়াচ্ছন্ন হইয়া পড়ুক না কেন, তাহার মৌলিক প্রাণধর্ম একেবারে বিনষ্ট হয় না। গুহার ভিতরে জল জমিতে জমিতে এক সময়ে যেমন পাথর ভেদ করিয়া তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, জড়ে ও যন্ত্রে চাপা-পড়া প্রাণও তেমনি মুক্তির মুহূর্ত খুঁজিতেছে—একদিন না একদিন স্বসমুত্থ বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিবেই। কিন্তু তাহার জন্য চাই প্রাণের প্ররোচনা। নন্দিনী সেই প্ররোচনা বহিয়া যক্ষপুরীতে অবতীর্ণ।

উপরের উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথ পাপ ও পাপের মৃত্যুবাণের উল্লেখ করিয়াছেন। পাপ বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন? জড়ের

কাছে আত্মসমর্পণকেই তিনি পাপ বলিতেছেন। নন্দিনীর প্রাণবেগ যক্ষপুরীর জড়ধর্মের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিয়া প্রাণের মুক্তির পন্থা সুগম করিয়া দিয়াছে।

এখানে রঞ্জনের ব্যাখ্যা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। রঞ্জন ও রাজা একই ধাতুতে গড়া—ইহা দ্বারা কবি বুঝাইতে চান যে, উভয়ের মধ্যে ধাতুগত সাদৃশ্য আছে। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালোবাসে, আবার রাজার প্রতিও একটা আকর্ষণ অনুভব করে; যদিও তাহাকে ভালোবাসা বলা চলে না। দু'য়ের প্রভেদের কারণ, রঞ্জন হইতেছে মানুষের বিশুদ্ধ রূপ, জড় ও যন্ত্রের ঊর্ধ্বে সে প্রতিষ্ঠিত। আর রাজা যন্ত্র-চাপা-পড়া মানুষ—তাহার মধ্যে মানুষের বিশুদ্ধ রূপটা দেখিতে পাই না, জালের ফাঁকে ফাঁকে কিয়দংশমাত্র দেখি। তাই তাহার প্রতি নন্দিনীর আকর্ষণটা প্রেমে গিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই, রঞ্জনের মধ্যে যে নির্মুক্ত মানবরূপ প্রত্যক্ষ তাহারই প্রতি নন্দিনীর প্রেমের আকর্ষণ। কবি বলিতে চান, প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষণ, গভীরতম আকর্ষণ মানুষের প্রতি; যন্ত্রের প্রতি তাহার মোহের ভাব থাকিতে পারে, শক্তির প্রতি তাহার বিস্ময়ের ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু ভালোবাসিতে সে মানুষকেই বাসিবে। তাহার হাতের রক্তকরবীর রাখী মানুষের হাতের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়া আছে।

সমাজ ও সংস্থার পক্ষে নিয়মতন্ত্র অপরিহার্য, কিন্তু সেই নিয়মতন্ত্র প্রাণের বিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিলে বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। তখন তাহাকে ভাঙিবার প্রয়োজন হয়। যক্ষপুরীর নিয়মতন্ত্র অদৃশ্য প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা লাভ করিয়া যন্ত্রে পরিণত। তখন তাহাকে ভাঙিবার জন্য প্রাণের দ্বারা আঘাত করিতে হয়। তাহাকে ভাঙিবার অন্য উপায় নাই। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি সাধারণ ধারণা। তাঁহার অন্যান্য নাটকেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই। মুক্তধারা-নাটকে অভিজিৎ

আপনার প্রাণ দিয়া মুক্তধারার বাঁধটাকে আঘাত করিয়াছে। অচলায়তন-নাটকের অন্তর্গত পঞ্চক আপনার দুর্বাধ প্রাণশক্তির প্রয়োগ করিয়াছে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিবার উদ্দেশ্যে। অচলায়তনের আচার্য ও রক্তকরবীর রাজা—দুইয়েরই এক অবস্থা। তাহাদের খানিকটা নিয়মতন্ত্রের দ্বারা গ্রস্ত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ তাহাদের মধ্যে আছে। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদেরই জয়লাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু রক্তকরবী-নাটকের সকল পাত্র-পাত্রী এমন সৌভাগ্যবান্ নয়, তাহাদের অধিকাংশই নিয়মতন্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে গ্রস্ত। সর্দার প্রভৃতির কথাই আগে ধরা যাক। সর্দার, মেজো সর্দার, ছোটো সর্দার প্রভৃতি কেবল নিয়মতন্ত্রের অঙ্গীভূত নয়, তাহারা এই নিয়মতন্ত্রকে অটুট রাখিবার কাজে নিযুক্ত। নিয়মতন্ত্র তাহাদের মনুষ্যত্ব নাশ করিয়াছে, আবার তাহারা নিয়মতন্ত্রকে রক্ষা করিতেছে—এইভাবে একটি বিষচক্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

গোঁসাই ও চিকিৎসকও নিয়মতন্ত্রের ধারক ও বাহক। গোঁসাইয়ের কাজ ধর্মোপদেশ-দান। কিন্তু তাহার এমনি দুর্ভাগ্য যে ধর্মোপদেশকে সে নিয়মতন্ত্রের অনুগত করিয়াই দান করে। উপদেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সে সর্দারকে জানায়—

বাবা, দন্ত্য-ন-পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা বেশ মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটা দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা।

এখানে 'ধর্মেই ধর্মের শেষ' নয়, ধর্ম এখানে সম্পদের হেতু, ধর্ম ও ফৌজ যমজ প্রহরী-যুগলের মতো এখানে নিয়মতন্ত্রের রক্ষক। ধর্ম যখন নিজ লক্ষ্য বিস্মৃত হয় তখন তাহার মতো বালাই আর নাই।

যক্ষপুরীর চিকিৎসক প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মানুষকে চিকিৎসা করে

না। মানুষকে যন্ত্রের পায়ে বলি দিবার উদ্দেশ্যেই সে মানুষকে রক্ষা করে।

অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি। কিন্তু যক্ষপুরীর এমনি আবহাওয়া যে তাহার বুদ্ধিটা নিয়মতন্ত্রের অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সর্দার প্রভৃতির মতো সে সম্পূর্ণ গ্রস্ত হয় নাই। কেননা, নন্দিনীকে দেখিয়া তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ভ্রান্তি জন্মায়। নন্দিনীকে দেখিয়া সে বলিল—

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও ছুটো কথা বলি।

সে বলে—

আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এস আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

যক্ষপুরীর সময় কাজের চাপে ভরাট, কোথাও ফাঁক নাই। নষ্ট করিবার মতো সময় যাহার আছে, বুঝিতে হইবে সর্বতোভাবে নিয়মতন্ত্রের অনুগত হইয়া সে পড়ে নাই।

বস্তুবাগীশ ও অধ্যাপকের তুলনায় পুরাণবাগীশ লোকটা এখানে নবাগন্তুক। সে এখানকার হালচাল ভালো বুঝিতে পারে না। অধ্যাপক তাহাকে বুঝাইয়া বলে—

পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা।

অধ্যাপকের বিশ্বাস এই যে, কিছুকাল এখানে থাকিলেই পুরাণবাগীশ যক্ষপুরীর জনতার মধ্যে বেশ খাপ খাইয়া যাইবে।

ফাগুলাল ও চন্দ্রা স্বামীস্ত্রী। যক্ষপুরের জীবনে অভ্যস্ত হইলেও দেশের টানটা এখনো তাহাদের আছে। নবান্নের সময়ে দেশে ফিরিবার জন্য সর্দারের কাছে তাহারা ছুটি চাহিয়াছে। নন্দিনী যাহাদের মনে উদ্‌ভ্রান্তি জাগাইয়াছে ফাগুলাল তাহাদের অন্যতম। শেষ পর্যন্ত সে নন্দিনীর নেতৃত্বে চালিত বিদ্রোহীদলে যোগদান করিয়াছে। নন্দিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণকে চন্দ্রা ঈর্ষার চক্ষে দেখে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সে এখনো নারীস্বভাবভ্রষ্ট হয় নাই। যক্ষপুরের নরনারী সোনার রসে এমনি মশগুল যে, সামাজিক মানবের সাধারণ দোষটুকু হইতেও তাহারা বঞ্চিত।

কিশোর নবাগন্তুক খোদাইকর। যক্ষপুরী এখনো তাহাকে গ্রাস করে নাই, তাই সে নন্দিনীর প্রতি প্রীতির টান অনুভব করে। সেই প্রীতির টানে দুষ্প্রাপ্য রক্তকরবী ফুল জোগায় সে নন্দিনীকে, গান জোগায় যেমন বিশুপাগল।

বিশু পাগল। এক সময়ে সে নিয়মতন্ত্রের অধীন ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অদৃষ্ট তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। যক্ষপুরীতে এখন সে বেমানান, সেখানকার লোকে বলে পাগল, বাহিরের লোকে বলিবে মুক্তপুরুষ। এইরকম এক-একটা মুক্তপুরুষ বা পাগল বা ঠাকুরদাদা বা বাউল রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই আছে। বিশুকে সেই পর্যায়ের অন্তর্গত করিয়া বিচার করা উচিত। মুক্তধারা-নাটকে অভিজিতের সঙ্গে ধনঞ্জয় বৈরাগীর যে সম্বন্ধ, আলোচ্য নাটকে নন্দিনীর সঙ্গে সেই সম্বন্ধ বিশুপাগলের। দু'জনেই মুক্তপুরুষ, মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া বেড়ানই তাহাদের কাজ। তাহাদের মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া অভিজিৎ ও নন্দিনী ছুটিয়াছে, যন্ত্রকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে।

৪

নাটকখানি যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক তাহা বুঝাইবার জন্য কবি আবহসংগীতরূপে ফসলকাটার গানটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যক্ষপুরীর কানে সে গান প্রবেশ করে না, যাহারা সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে তাহাদের কানে অন্তত প্রবেশ করে না। নাটকটির ঘটনার কাল পৌষ, ফসলকাটার সময়, নবান্নের পর্ব আসন্ন। শীতকাল যেমন ফসলকাটার সময়, তেমনি আবার খোদাইকার্যের পক্ষেও প্রশস্ত—কালের ধর্মের মধ্যেই দ্বন্দ্বের কারণ নিহিত, কবি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

একদিকে যক্ষপুরীর খোদাইকরের দল পৃথিবীর অন্ত্র ভেদ করিয়া সোনার তাল তুলিয়া আনিতেছে আর অন্যদিকে দূরে মাঠের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে—'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে'—কিন্তু পৌষের ডাক যক্ষপুরীর কাহার কানে ঢুকিতেছে ?

রাজার কানে ঢোকে না; নন্দিনী তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে সে শুনিতে পায় বটে, কিন্তু মাঠে গিয়া সে কি করিবে ভাবিয়া পায় না। আর শুনিতে পায় বিশু ফাগুলাল ও চন্দ্রা। কিন্তু ইহারা কেহই তো সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর অন্তর্গত নয়। সর্দার ও খোদাইকরের দল শুনিতে পায় না, কিংবা শুনিতে পাইলেও পৌষের ডাকের একটা আপদ মনে করে, মনে করে যে যক্ষপুরীর ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। (ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, পৌষের আসর হইতে, চাষের ক্ষেত হইতে, কৃষিতন্ত্র হইতে তাহারা দেহে ও মনে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষবয়সের অনেকগুলি নাটকে আবহসংগীতের ইঙ্গিতের দ্বারা ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। ফাল্গুনীর গীতিভূমিকা এবং মুক্তধারার ভৈরবপন্থী গান ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। রক্তকরবী-নাটকের ফসলকাটার গান সেই পর্যায়ভুক্ত।)

৫

রক্তকরবী-নাটকখানিকে বিশেষভাবে যন্ত্রবাদসমস্যার নাটক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। বড়ো জোর যন্ত্রবাদকে একটা উপলক্ষ মনে করা চলিতে পারে। যন্ত্রবাদ বা Industrialism নাটকখানির ঘটনাংশ ইহার ভাবনাংশ কি? যন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে নিয়মতন্ত্রের আতিশয্যে মানুষের হৃদয় কিরূপ অসাড় হইয়া পড়ে, অসাড় হৃদয় কিরূপে শুভাশুভবোধকে লঙ্ঘন করিতে থাকে, শুভাশুভবোধ লোপ পাইলে শক্তিমানের নিকটে দুর্বল কিরূপে প্রয়োজনসাধনের উপকরণে পরিণত হয়—তাহারই চিত্ররূপপ্রদর্শন এই নাটকের মুখ্য লক্ষ্য। যন্ত্রবাদ সমস্যা উপলক্ষমাত্র। আর সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, জড়ধর্মের সঙ্গে প্রাণধর্মের দ্বন্দ্ব প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য। নন্দিনী প্রাণের প্রতীক, যক্ষপুরীর সামগ্রিক জীবন মানবস্বভাব বর্জন করিয়া জড়ের প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। ইহার অনুরূপ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে আরও আছে। জ্ঞান-কৈবল্যের আতিশয্যে মানুষ কিরূপ মূঢ় হইয়া পড়ে অচলায়তন-নাটকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্ষমতাপিপাসায় মানুষের শুভবুদ্ধি কিরূপ বিকল হইয়া পড়ে তাহাই প্রদর্শিত মুক্তধারা-নাটকে; আর যন্ত্রবাদের অতিবাদিতায় মানুষ কিরূপ প্রাণহীন হয়, নির্জীব সোনার তাল তুলিতে তুলিতে মানুষ কিরূপ জড়পিণ্ডে পরিণত হয়, তাহারই প্রকাশ রক্তকরবীতে। তাই যন্ত্রবাদকে লক্ষ্য না মনে করিয়া উপলক্ষ মনে করাই উচিত, মানুষের মনের উপরে যন্ত্রবাদের আতিশয্যজাত প্রতিক্রিয়াটাই নাটকের লক্ষ্য। নাটক তিনটির মধ্যে আরও একপ্রকার যোগ বর্তমান। জ্ঞানকৈবল্যে মানুষের চিত্ত কিরূপ অসাড় হয়। তাহার দৃষ্টান্ত অচলায়তন, ক্ষমতালোভে মানুষের হৃদয় কিরূপ জড়ধর্মী হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত মুক্তধারা, আর যন্ত্রবাদের ফলে মানুষের কর্মশক্তি কিরূপ বিকল হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত রক্তকরবী-নাটকের কর্মপ্রবাহ

বেগবান হওয়া সত্ত্বেও কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রস্বরূপ রাজা স্বয়ং আপন সৃষ্ট জালের অন্তরালে আবদ্ধ। যে যন্ত্র মানুষের কর্মশক্তি বাড়াইয়া দেয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কবি বলিতে চান, সেই যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত মানুষের কর্মশক্তি হরণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলে। জালান্তরিত রাজা তাহারই দৃষ্টান্ত। জাল হইতে বাহির হইবার পরেই সে পুনরায় কর্মশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। অচলায়তনের প্রাচীর, মুক্তধারার বাঁধ, আর রক্তকরবীর জাল—তিনটিই প্রতীক; যথাক্রমে মানুষের বুদ্ধির জড়তার, ভালোবাসার নিরুদ্ধ স্রোতের এবং কর্মশক্তির বিকলতার প্রতীক। শেষ পর্যন্ত অচলায়তনে প্রাচীর ভাঙিয়া বুদ্ধি জড়তামুক্ত হইয়াছে, মুক্তধারাতে বাঁধ ভাঙিয়া অভিজিতের মৃত্যু ঘটায় আবদ্ধ স্রোতস্বিনী এবং রাজার হৃদয়ের ভালোবাসা পুনঃপ্রবাহিত হইয়াছে—আর রাজা আপন জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া তবেই আপন কর্মশক্তিকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

৬

নাটকখানির পাত্রপাত্রী কেহই ব্যক্তিবিশেষ নয়—সকলেই শ্রেণীবিশেষ, কেহই ব্যক্তিরূপ নয়—সকলেই শ্রেণীরূপের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি মানেই একপ্রকার প্রতীক। এমন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, যন্ত্রবাদের ফলে মানুষের বৈশিষ্ট্য ক্রমেই লোপ পাইতেছে। কোনো বড়ো কলকারখানার শহরে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে শহরটা একটা বিশাল দাবার ছক, তাহার বাড়িঘর পথঘাট সমস্তই নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা। মানুষগুলো অবধি ছাঁচে ঢালা। কারখানায় প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা সংখ্যায় পরিণত হয়। মনুষ্যত্বের অর্থ যদি মানুষের বিশিষ্ট স্বভাব বা গুণ হয় তবে বলিতে হইবে যন্ত্রবাদের প্রসারের ফলে মনুষ্যত্বের নিশ্চয়ই লোপ হইতেছে, আর তাহার স্থলে সংখ্যারূপের উদ্ভব হইতেছে। সংখ্যারূপ শ্রেণীরূপের চেয়ে আরও নির্গুণ, আরও ফিকা। এই ভাবটি

প্রকাশের উদ্দেশ্যেই কবি যক্ষপুরীর পাড়াগুলিকে দন্ত্য-ন পাড়া মূর্ধন্য-পাড়া প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মানুষের ব্যক্তিগত নামের বদলে সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। যাহাদের ক্ষেত্রে সংখ্যা ব্যবহৃত হয় নাই তাহারও নামের দ্বারা পরিচিত নয়, ব্যবসায়ের দ্বারা পরিচিত, যেমন অধ্যাপক, গোঁসাই, চিকিৎসক ইত্যাদি। বিশু যখন খোদাইকর ছিল তখন ছিল ৬৯-ঙ, তার পরে ব্যবসা পরিত্যাগ করিলে সে আপন নামের দ্বারা পরিচিত, তবু সে ব্যক্তিবিশেষ নয়; সে বিশুপাগল অর্থাৎ যে-কোনো পাগল। ফাগুলাল চন্দ্রা কিশোর স্বনামের দ্বারা পরিচিত—তাহারা এখনো সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর অন্তর্গত হয় নাই, হইলে বিগতনাম হইয়া সংখ্যায় পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই; আনন্দমঠে যেমন সবাই সন্ন্যাসী এবং সবাই একই ছাঁচের সন্ন্যাসী—অর্থাৎ কাহারো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাই, যক্ষপুরীতেও অনেকটা সেইরকম আর কি। Regimented হইলে পর মানুষের বুদ্ধি ব্যক্তিত্ব কর্মধারা সব একই ছাঁচে ঢালাই হইয়া যায়। প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আতিশয্য সত্ত্বেও স্বয়ং মকররাজ নিজেই ছাঁচে-ঢালাই। কেবল নন্দিনীতে বিশিষ্ট গুণ বা ব্যক্তিত্বের কিছু লক্ষণ আছে। কবি তাহাকে একেবারে সংখ্যায় পরিণত না করিলেও বিশিষ্ট গুণ ও ব্যক্তিত্ব যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ সে প্রাণের প্রতীক। কিন্তু মানুষ করিয়া গড়িতে গেলে কিছুপরিমাণ ব্যক্তিত্ব না দিয়া উপায় থাকে না, তাই নন্দিনীর গুণকে আরও নির্যাসিত করিয়া লইয়া রক্তকরবী প্রতীকের অবতারণা করিয়াছেন। প্রাণময় মানুষের নির্যাস নন্দিনী, নন্দিনীর নির্যাস রক্তকরবী; রক্তকরবী বিশুদ্ধ প্রতীক। এই নাটকের অপর প্রতীক লোহার জাল। লোহার জাল ও রক্তকরবীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিয়া শেষ পর্যন্ত লোহার জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারে পূর্বে-উদ্ধৃত পত্রখানি স্মরণ করা যাক। লোহালক্কড়ের জঞ্জালের স্তূপে চাপা-পড়া রক্তকরবীর চারাটি মরে নাই, সুযোগ পাইবামাত্র ছোট্ট একটি লাল

ফুল ফুটাইয়া সে বলিয়াছিল, জড় লোহার স্তূপ চাপা দিয়াও আমাকে মারিতে পারিলে কই; বলিয়াছিল, লোহার চাপে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ঝরিতেছে বটে, তবু মরি নাই। আর যে কথাটি সে সঙ্কোচে বলিতে পারে নাই তাহা হইতেছে, প্রাণের কাছে ঐ জড় লোহার স্তূপেরই পরাজয় ঘটিল। সে অশ্রুত কণ্ঠে নন্দিনীর জয় ধ্বনিত করিয়াছিল। রক্তকরবী-নাটকখানিতেও শেষ মুহূর্তে নন্দিনীর জয় ধ্বনিত হইয়াছে।

রথের রশি

রথের রশি অনতিদীর্ঘ একটি তত্ত্বনাট্য। নাটকীয় লক্ষণ ইহাতে সামান্যই আছে; পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপের চেষ্টা হয় নাই কিম্বা নাটকীয় পরিণামকেও স্পষ্ট করিয়া তোলা হয় নাই। সূক্ষ্ম একটি কাহিনীর সূত্রকে অবলম্বন করিয়া নাটকের মূলগত ভাবটিকে কবিগুরু বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। সেই মূলগত ভাবের গুরুত্বেই নাটকটির গৌরব। সেই ভাবটির ব্যাখ্যা করিবার আগে কাহিনীটির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

রাজ্যে সেদিন রথযাত্রার উৎসব। সকাল হইতে লোক জমিতে শুরু করিয়াছে, দূর-দূরান্তর হইতে তাহারা সমাগত, রথযাত্রা দেখিয়া জীবন ধন্য করিবে। কিন্তু রথ নড়িতেছে না। রথের দড়ি-টানা যাহাদের কাজ, তাহারা অনেক টানাটানি করিয়াও রথ নড়াইতে পারে নাই। দেশের অমঙ্গল আশঙ্কায় সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

পুরোহিত যথাভ্যস্ত মন্ত্র পড়িয়াছে, রথ নড়ে নাই। ক্ষত্রিয়েরা আসিয়া রশি টানিয়াছে, রথ নড়ে নাই। অবশেষে ধনিকদের ডাক পড়িল, তাহাদেরও চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু রথ তেমনি অচল রহিল। রাজ্যে আশঙ্কার চাপা আর্তনাদ উঠিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গেল, মহা দুঃখময় আসন্ন।

এমন সময়ে শ্রমিকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল, রথ টানিবার আদেশ নাকি তাহারা পাইয়াছে। পুরোহিত, সৈনিক ও ধনিগণের নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা রথের রশি ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, আর সকলকে বিস্মিত করিয়া রথ নড়িয়া উঠিল। কিন্তু আর এক বিপদ্ উপস্থিত। রথ অভ্যস্ত রাজপথে না চলিয়া জনপদের দিকে ছুটিল। পুরোহিত ভাবিল, তাহাদের মন্দিরের দিকে চলিয়াছে, সৈনিক ভাবিল, তাহাদের অস্ত্রাগারের দিকে ছুটিয়াছে, ধনিক ভাবিল, তাহাদের ধনভাণ্ডারের দিকে ছুটিয়াছে, সকলেই ভাবিল, তাহাদের সব চাপা পড়িল। তাহারা নিজ নিজ আবাসের মুখে ছুটিল। মেলার বিস্মিত নরনারী শুধাইল, একি রকম? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কবি আসিয়া উপস্থিত হইল।

২য় সৈনিক

একি উল্টো-পাল্টা ব্যাপার, কবি। পুরুতের হাতে চললো না রথ, রাজার হাতে না, মানে বুঝলে কিছু?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহাকালের রথের দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি, নীচের দিকে নামলো না চোখ, রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।

পুরোহিত

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান, ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয়তো। একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই। দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে, জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের। তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ একবার অচল হয়, বোধ করি, তোমার মত কবির ডাক পড়বে, তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।

উদ্বিগ্ন মেয়েরা কবিকে জানাইল তাহারা যে এত পূজা-অর্চনা করিল, নৈবেদ্য উপহার দিল, তাহার কি ফল এই? ভক্তিতে রথ চলিল না—চলিল ম্লেচ্ছদের টানে!

কবি

পূজো পড়েছে ধূলোয়, ভক্তি করেছে মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা,
দেহে-দেহে প্রাণে-প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল!

কবি বলিতে চান যে, শিথিল-গ্রন্থি রশিতে যে টান পড়িয়াছে, সে টান রথ পর্যন্ত পৌছায় নাই কাজেই রথ ছিল অচল।

সংক্ষেপে ইহাই নাটকের কাহিনী।

এই নাটকটি সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় আছে। ইহার পূর্বতন রূপের নাম ছিল রথযাত্রা, পরিবর্তিত রূপের নাম রথের রশি।[১]

১ "১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃঃ ২১৬—২২৫) রথযাত্রা নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। রথের রশি তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ।" গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫০১, র-র, ২২শ খণ্ড।

নাটকটির পূর্বতন রূপ 'রথযাত্রা'য় কবির দৃষ্টি ছিল রথের উপরে, বর্তমান রূপে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রথের রশিটার উপরে। রথের রশি বলিতে কবি কি বুঝিতেছেন? নাটকের কবি রথের রশির ব্যাখ্যা করিয়াছে, সে বলিয়াছে।

মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, তাকে ওরা মানে নি। রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে, দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে,

আবার—

রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা,
দেহে-দেহে, প্রাণে-প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল!

মানুষে মানুষে, মানুষের সমাজে সমাজে যে স্বাভাবিক ও সামগ্রিক সম্বন্ধ, তাহাই রথের রশি। সেই রশিতে টান পড়িলে ইতিহাসের রথ নড়িয়া ওঠে, যে-রথের রথী হইতেছেন মানব-ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু কোনও কারণে যদি রথের রশির গ্রন্থি শিথিল হয়, বাঁধন আল্‌গা হইয়া আসে, তখন দড়িতে টান পড়িলেও সে-টান রথ পর্যন্ত পৌঁছায় না, রথ অচল হইয়া থাকে। নাটকে রথ না চলিবার ইহাই কারণ।

নাটকে কবিগুরু দেখাইয়াছেন যে, রথের রশি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ পরস্পরের প্রতি অবহেলার দ্বারা ইতিহাসের রথাযাত্রার দড়িকে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সৈনিক অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, আর ধনিক অর্থাৎ বৈশ্য, তিন শ্রেণীরই সমান অবজ্ঞা শ্রমিক অর্থাৎ শূদ্রদের প্রতি। শুধু তাহাই নয়, ঐ তিনের মধ্যেও আছে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব। আর মেলায় যেসব নরনারী সমবেত, নিজেদের অজ্ঞাতসারে রশিটার প্রতি অর্থাৎ মানবিক সম্বন্ধের প্রতি তাহারা ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেছে।

দড়িটার প্রতি তাহাদের ভক্তির অন্ত নাই, কিন্তু দড়িটা যাহার প্রতীক, সেই মানবিক সম্বন্ধের প্রতি তাহাদের অপরিসীম অবজ্ঞা। যাহাদের টানে রথ চলিল, মেয়েদের ভাষায় তাহারা 'মেলেচ্ছ'।

কবিগুরু বলিতে চান যে, অবজ্ঞা, বিদ্বেষ ও হিংসা ঢুকিয়া পড়িয়া মানবিক সম্বন্ধকে আজ শিথিলগ্রন্থি করিয়া দিয়াছে, আর সেইজন্যই দড়িতে টান পড়িলেও সে-টানে রথ চলিতেছে না।

ইতিহাসের রথ একদিন ব্রাহ্মণের টানে চলিয়াছে, তারপরে ক্ষত্রিয়ের টানে ও বৈশ্যের টানে চলিয়াছে, এবারে শূদ্রের টানের প্রয়োজন। কারণ, তাহারাই সবচেয়ে অবজ্ঞাত। হইলও তাই, শূদ্রের টানে রথ চলিল। কবি বলিতেছেন—

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন,
নইলে ছন্দ মেলে না।
একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান,
বড়োটাকে দিলেন কাৎ ক'রে।
সমান ক'রে নিলেন তাঁর আসন।

আজ শূদ্রের টানে, ক্ষুদ্রের টানে, অবজ্ঞাতের টানে, ইতিহাসের রথ নড়িয়া উঠিয়াছে, মানব-ভাগ্যবিধাতা ছোট-বড়র মধ্যে হেরফের ঘুচাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন, ইতিহাসের আজ এক সন্ধিক্ষণ।

২

এইখানে কবির সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। ছোটরা একদিন নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ ভাবিতে শুরু করিবে, তাহারাই এক গোষ্ঠী রচনা করিয়া অপর সকলকে ছোট ভাবিবে, অন্ত্যজ ভাবিতে আরম্ভ করিবে, ভাবিতে আরম্ভ করিবে তাহারা রথের বাহন মাত্র নয়, তাহারাই রথী, তাহারাই সর্বময় কর্তা, তখন আবার রথের রশির

বাঁধন আল্‌গা হইয়া পড়িবে, রথ পুনরায় অচল হইবে। সেদিন ডাক পড়িবে কবির। কবি রথ চালাইবে গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।

কবি

আমরা মানি ছন্দ, জানি এক ঝোঁক হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চালচলন যার একপাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিৎ,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে,
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তাল-মানের উপর নয়।

আবার—

আমি তাল রেখে গান গাবো।

সৈনিক

কী হবে তার ফল ?

কবি

যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা,
তখন ক্ষুদে ক্ষুদে খাল খন্দগুলো
মারমূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

ছন্দভ্রষ্ট মানব-সমাজের মধ্যে ছন্দের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে কবির ডাক পড়ে। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, সমাজে সমাজে অবহেলা, দেশে দেশে হিংসা—সেই তো ছন্দপতন। সমগ্রকে না

হইলে ছন্দ রক্ষা হয় না। কিন্তু আজ সমগ্রের যথাযথ সমাবেশ কোথায়? কে কাহার আগে যাইবে, কে কাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহারই তো প্রতিযোগিতা। ইহা আর কিছুই নয়, মানব-সমাজের ছন্দভ্রংশের লক্ষণ। তাই কবির ডাক পড়িয়াছে ছন্দরক্ষার উদ্দেশ্যে।

কবি বলিয়াছেন যে, আমরা মানি সুন্দরকে। সুন্দর মানেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সমাবেশ। ছন্দও তাই, শব্দের যথাযথ সমাবেশ। কিন্তু সেই যথাযথ সমাবেশ আজ কোথায়? সুন্দরের আদর্শ মনে সজাগ থাকিলেই কর্মপ্রবাহে ছন্দ দেখা দেয়। কিন্তু যেখানে সমাজে সমাজে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও অবহেলা, যেখানে যথাযথ সমাবেশের অভাব, সেখানে ছন্দ কোথায়? এক তালে রশিতে টান না পড়িলে রথ চলিবে কেন? মানব-সম্বন্ধের তাল কাটিয়া গিয়াছে, রথ তাই চলিতেছে না। আজ শূদ্রের টানে রথ চলিল বটে, কিন্তু তারপরে একদিন—

আসবে উল্টোরথের পালা।

তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।

কারণ কালক্রমে অমিতবীর্য শূদ্রদেরও মনে এই ধারণা জন্মিবে যে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ, জগতে একমাত্র তাহারাই আছে। সর্বভোগ্য বসুন্ধরার পরিবর্তে শূদ্রভোগ্য বসুন্ধরা এই ধারণাই তাহাদের চালিত করিতে থাকিবে। তখন আসিবে উল্টোরথের পালা।

মানুষের সমাজকে বারে বারে তাল কাটিবার দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—

এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন,
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে
ধূলায় ফেলো না।

মানব-সম্বন্ধ মানবের যদি অন্তরের বস্তু হইয়া ওঠে, তবেই মানব-সমাজ ছন্দভ্রষ্টতার অপরাধ হইতে মুক্তি পাইবে। এখানে সেই মানব-সম্বন্ধেরই প্রতীক রথের রশি। ইতিহাসের রথখানার চেয়ে

যে-রশির টানে রথ চলে, সেই রশির উপরে কবি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—আর সেইজন্যই পূর্বতন 'রথযাত্রা' নাটক পরতনরূপে 'রথের রশি' নাটকে পরিণত হইয়াছে।

তাসের দেশ

তাসের দেশ কিম্ভূত রসাশ্রিত তত্ত্বনাট্য। এই নাটকের মানুষ পাত্র-পাত্রীগণ ছাড়া আর সকলেই তাস-জাতীয় জীব। মানবসংসার হইতে বহু দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপে তাহাদের বাস, সে-দ্বীপ তাসের দেশ। তাস-জাতীয় জীবগণের চেহারা, আচার ব্যবহার ও মনোবৃত্তি মানুষের সঙ্গে মেলে না, তাহাদের দেখিয়া কিম্ভূত মনে হয়, তাহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া নাটকের মানব পাত্রদের মনে কিম্ভূত রসের উদয় হইয়াছে, তাই নাটকটিকে কিম্ভূত রসাশ্রিত বলা হইল।

প্রথম দৃশ্যে দেখিতে পাই যে, রাজপুত্র রাজপুরীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছে, পূর্ণ জীবনের সন্ধানে সে নিরুদ্দেশের মুখে বাহির হইয়া পড়িতে চায়। সদাগরের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সে নৌকা ভাসাইয়া দিল এবং ভরাডুবি হইয়া তাসের দেশের তীরে আসিয়া উঠিল।

এতদিন তাস ও তাসীগণ তাহাদের অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে বাঁধা নিয়মে তালে তালে পা ফেলিয়া বেশ আরামেই ছিল। মানুষের জীবনের স্পর্শে এই প্রথম তাহাদের অভ্যাসের তাল কাটিয়া গেল, তাহারা দেখিল, তাহাদের জীবনযাত্রা ছাড়াও অন্যরূপ জীবনযাত্রা সম্ভব; শুধু তাই নয়, এতদিন পরে তাহাদের নিজের চোখে তাহাদের জীবনকে নিতান্ত কিম্ভূত বলিয়া ঠেকিল। স্বাভাবিক জীবনের ধাক্কায় তাহাদের জীবনচক্রে অরাজকতা দেখা দিল, অভ্যস্ত বুলির বদলে তাহাদের মুখে গান ধ্বনিত হইল, বাঁধা ছকে সংক্রমণের পরিবর্তে তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের অভ্যুদয় ঘটিল। সজীব নিশ্বাসের

বেগে তাসের দেশের তাসের কেল্লা ধ্বসিয়া পড়িল—ইহাই নাটক-খানির কাহিনী ও ভাবগত উপজীব্য।

যে-যৌবনের চঞ্চলতায় রাজপুত্র ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সেই চঞ্চলতাই জীবন্মৃতের মনে জীবনের সাড়া আনিয়া দিয়াছে, যাহারা ছিল জীবন্মৃত, তাহারা জীবিত হইয়া উঠিল, যাহারা ছিল তাস, তাহারা হইয়া উঠিল মানুষ। তাসের চেয়ে তাসীগণই আগে জীবনের ডাকে সাড়া দিয়াছে, পুরুষ পিছাইয়া ছিল, মেয়েদের দৃষ্টান্ত তাহাদের সঙ্কোচের গ্রন্থি শিথিল করিয়া দিয়াছে।

নাটকের উপসংহারের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

রাজা

জানো, চাঞ্চল্য তাসের দেশে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ।

রাণী

জানি, আর এও জানি, অপরাধটিই সবচেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিস।……বলো তোমরা, ইচ্ছের জয়।

সকলে

জয় ইচ্ছের জয়!

রাজা

রাণীবিবি তোমার বনবাস।

রাণী

বাঁচি তাহলে।

রাজা

নির্বাসন। ওকী চললে যে। কোথায় চললে?

রাণী

নির্বাসনে!

রাজা

আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

রাণী

ফেলে রেখে যাবো কেন?

রাজা

তবে?

রাণী

সঙ্গে নিয়ে যাবো।

রাজা

কোথায়?

রাণী

নির্বাসনে।

সকলে

কোথায় গেল সেই মানুষরা।

রাজপুত্র

এই যে আছি আমরা।

রাণী

মানুষ হতে পারবো আমরা?

রাজপুত্র

পারবে, নিশ্চয় পারবে।

রাজা

ওগো বিদেশী, আমিও কি পারবো?

রাজপুত্র

সন্দেহ করি। কিন্তু রাণী আছেন তোমার সহায়। জয় রাণীর।

এই নাটকের তত্ত্ব রবীন্দ্র-সাহিত্যে নূতন নয়, নানা রচনায়, নানা ভাবে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, যৌবনের স্পর্শে জীবন্মৃতের চঞ্চলতা, জীবনের স্পর্শে জড়ের সংস্কারমুক্তির বার্তা ফাল্গুনী নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত আলোচনা বাহুল্য

নাটকটিতে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়, কিম্ভুত রসের অবতারণা এবং রূপকথার কাঠামো। এই দুইটি লক্ষণই ইহার বৈশিষ্ট্য।

কবির দীক্ষা

কবির দীক্ষা নাট্যাকারে রচিত। এই রচনাটিকে নাটক বলা যায় কি না সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহাতে নাটকীয় কোন লক্ষণ দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। ইহা দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন মাত্র, আর কোন নাটকীয় লক্ষণ নাই। ব্যক্তি দুইজনকেও বিশিষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। পাত্র দুইজনের মধ্যে একজন কবি অপরজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি।

এই ব্যক্তিটি একসময়ে কবির দলে ভর্তি হইয়া কবির কাছে দীক্ষা লইয়াছিল, কিন্তু পরে বিজ্ঞজনের তাড়ায় কবিকে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা লইয়াছে। তত্ত্বানন্দ স্বামী 'শিবমন্ত্র দেন তিনি প্রলয় সাধনায়।'

কবি বলিলেন যে—'শিবমন্ত্র দিই আমিও'।

এবারে কবি ও জিজ্ঞাসুর মধ্যে এ বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছে তাহার কিয়দংশ শোনা যাইতে পারে। জিজ্ঞাসু বলিতেছে—

অবাক করলে,
তুমি তো জানি কবি,
কবে হলে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব
সেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বলো বেঠিক কথা।

তোমরা তো মেতে আছ নাচে গানে
জগৎ-জোড়া নাচ গানেরই পালা।
আমাদের প্রভুর।
কী বলেন তত্ত্বানন্দ স্বামী।
ত্যাগের দীক্ষা নিয়েছি তাঁর কাছে।
যদি পরামর্শ দেন সবই ফুঁকে দিতে
তবে কী করবে ত্যাগ ?
উপুর করবে শূন্য ঘড়াটাকে ?

তুমি কাকে বলো ত্যাগ, কবি ?
ত্যাগের রূপ দেখো ঐ ঝরণায়,
নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান।
নিজকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হ'ল ত্যাগী,
তবে সব আগে শিব ত্যাগ করুন
অন্নপূর্ণাকে।

উদ্ধৃত অংশ হইতে কবির ও তত্ত্বানন্দ স্বামীর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝিতে পারা যাইবে। তত্ত্বানন্দ স্বামী সরাসরি ত্যাগের মন্ত্র দেন; জীবনকে গ্রহণের মন্ত্র তাঁহার কাছে পাওয়া যায় না। কবি দেন জীবনকে গ্রহণের মন্ত্র। কিন্তু কবি বলিবেন যে, ভোগের জন্য মাত্র গ্রহণ নয়; ত্যাগের আনন্দলাভের জন্যই গ্রহণ। সঞ্চয়ের জন্যই নয়, ত্যাগের আনন্দলাভের জন্যই সঞ্চয়। কবির কাছে বস্তুকে আত্মসাৎ ভোগ নয়, ত্যাগের আনন্দলাভটাই যথার্থ ভোগ। সেই ভোগ যদি করতে হয় তবে আগে সঞ্চয় করিতে অর্থাৎ জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শিবের দুইটি মূর্তি আছে, একটি ত্যাগী, আর একটি অন্নপূর্ণেশ্বর-রূপে প্রার্থী। অন্নপূর্ণার নিকটে শিব প্রার্থনা করিতেছেন। সে অন্নপূর্ণা প্রত্যেক মানুষ; মানুষের কাছে শিব প্রার্থী। মানুষ রিক্ত

হইলে দান করিবে কি? শিবের ভিক্ষাদানের জন্য মানুষকে প্রস্তুত হইতে হইবে।[১]

কবি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন যে, আমরা অর্থাৎ ভারতীয়রা শিবের শ্মশানেশ্বর মূর্তিতেই মুগ্ধ হইয়া জীবনকে গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি। সেইজন্য যখন তিনি প্রার্থনার হস্ত বাড়াইয়া দেন, তাঁহাকে দান করিতে পারি না, তাই আমাদের অভাব আর ঘুচিতে চায় না। আর যে সঞ্চয় করিয়াছে সে ত্যাগ করিতে শেখে নাই বলিয়া তাহার ঐশ্বর্য ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়া তাহাকে অতলে তলাইয়া দেয়। সে ব্যক্তি ত্যাগ করিতে জানে না বলিয়া ভোগ করিতেও অসমর্থ হয়।

জিজ্ঞাসু শুধায়—'তবে কি য়ুরোপখণ্ডকে বলবো শিবের চেলা।'

কবি বলেন যে, সে কথা মিথ্যা নয়। য়ুরোপ মহাভিক্ষুর দাবী মানিয়াছে বলিয়াই 'ধনে-প্রাণে জ্ঞানে-মানে' এমন সম্পদ্‌শালী। কিন্তু ঐ সঙ্গে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিয়াছেন। য়ুরোপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে কিন্তু সঞ্চয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা যদি বিস্মৃত হয়, যদি ত্যাগ করিতে ভোলে, তবে তাহারাও মরিবে, আর তাহারই পূর্বাভাসস্বরূপ য়ুরোপখণ্ডে আজ এত অশান্তি।

কবির মতে ভারতবর্ষ শিবের রিক্ত মূর্তিটার মাত্র উপাসক; সে জীবনকে গ্রহণ করিতে শেখে নাই, কাজেই ত্যাগ করিবে কি? শিবের অভাব ঘুচাইতে অসমর্থ বলিয়াই তাহার নিজের অভাব ঘুচিতেছে না। আর য়ুরোপখণ্ড শিবের অন্নপূর্ণেশ্বর মূর্তিটার মাত্র উপাসক, জীবনকে সে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু যেহেতু শিবের ভিক্ষুকমূর্তি দেখে নাই, সঞ্চয়ের আসল উদ্দেশ্য সে বিস্মৃত

১ কবির দীক্ষার পূর্ব পাঠ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকায় (পৃঃ ২-৪) শিবের ভিক্ষা নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থ-পরিচয়, পৃঃ ৫০৯, র-র, ২২শ খণ্ড।

হইয়াছে। য়ুরোপের ধন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাহার ভারস্বরূপ, তাহার অশান্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের হেরফের ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে কবি ত্যাগের দ্বারা ভোগের দীক্ষা দান করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাই রচনাটির মূল ভাব।

এই মূল ভাবটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় আদৌ নূতন নয়। তাঁহার পিতৃদেব উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' মন্ত্রকে সাধনার বীজরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির দীক্ষা রচনাটি সেই মন্ত্রেরই বিস্তার। কবির পূর্বতন অনেক রচনাতেই এই মন্ত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনে ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল। প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।...এইজন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করিবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করিবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ শিবের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।[১]

কবির দীক্ষা রচনা হিসাবে সামান্য হইলেও রবীন্দ্রনাথের একটি মূল ভাবের আধাররূপে অসামান্য। ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে যথার্থ সামঞ্জস্যবিধানে বাণী রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন প্রচার করিয়াছেন য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এ বিষয়ে কোথায় প্রভেদ তাহাও দেখাইয়াছেন, আবার য়ুরোপ ও ভারতবর্ষ কিভাবে তাহাদের ত্রুটি

---

১ তপোবন, শান্তিনিকেতন, ২-র পৃঃ ৫৬৬, ১৩শ খণ্ড।

সংশোধন করিয়া পরস্পরকে স্বীকারের দ্বারা পূর্ণতররূপে প্রকাশ হইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত তিনি বহু রচনায় দিয়াছেন। কবির দীক্ষা সেইরূপ একটি ইঙ্গিত।

প্রহসন

১

চিরকুমার সভা সংলাপবহুল উপন্যাসাকারে লিখিত প্রজাপতির নির্বন্ধের নাট্যরূপ। সংলাপবহুল উপন্যাস বলিয়া বর্ণনার অংশ বাদ দিয়া অভিনয়যোগ্য করিয়া লওয়া কঠিন নয়। এরূপভাবে পূর্বে অভিনীত হইলেও পুস্তক-রচনার বহুকাল পরে কবি কর্তৃক ইহার স্থায়ী নাট্যরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমানে মূল উপন্যাসরূপের চেয়ে নাট্যরূপই অধিকতর জনপ্রিয়।

কিন্তু শিল্পের বিচারে নাট্যরূপ ও উপন্যাসরূপের মধ্যে উপন্যাসরূপকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। মূলে গল্পাকারে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই নাট্যরূপের মধ্যেও গল্প-শিল্পের প্রকৃতি রহিয়া গিয়াছে; ইহাকে অভিনয়যোগ্যতা দিতে গিয়াও কবি সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হন নাই। উপন্যাসের ঘটনার মৌলিক মন্থরতা, ঔপন্যাসিক সংলাপের দীর্ঘায়ত আতিশয্য নাটকের অনিবার্য গতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। আবার উপন্যাসে যে-সব বর্ণনা কবির ব্যক্তিগত অভিমত আকারে পাঠককে আনন্দ দান করে—সেগুলি নাটকের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে মুদ্রিত থাকিলেও পাত্র-পাত্রীর মুখে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা হয় নাই—ফলে নাটকের শ্রোতার পক্ষে তাহা অবান্তর ও অলব্ধ সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু নহে।

প্রহসন বা কমেডি জাতীয় নাটকে ঘটনার দ্রুতগতিই প্রধান সম্পদ। গতির দ্রুতি বজায় রাখিবার জন্য অনেক অনাবশ্যক ঘটনা ফেলিয়া দিতে হয়, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখা চলে। উপন্যাসে সে প্রয়োজন কম। চতুর সংলাপ যতই উপভোগ্য হোক নিতান্ত নাটকীয় প্রয়োজন ছাড়া নাটকের মধ্যে তাহা রাখিবার উপায় নাই। স্বনির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট একাগ্র দর্শকের জন্যই নাটক লিখিত, উপন্যাসের পাঠক বসিয়া শুইয়া এবং নিজের অবকাশমতো পড়িতে

পারে—একাগ্রতা তাহার পক্ষে অপরিহার্য নহে। উপন্যাস আগে-পিছে উল্টাইয়া পড়া চলে, নাটকের একাগ্রী প্রকৃতিতে সে অবসর নাই, নাট্যকারের পক্ষে এই মৌলিক সত্য ভুলিবার উপায় কোথায়? প্রজাপতির নির্বন্ধকে নাট্যরূপ দান করিতে গিয়া কবি এই সত্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকেন নাই।

চিরকুমার সভা পড়িতে বসিলে (দেখিতে বসিলে তো বটেই) অনাবশ্যকের ভারে পাঠকের মন ক্ষণে ক্ষণে ভারাক্রান্ত হইতে থাকে। সে দ্রুত অগ্রসর হইতে চাহে কিন্তু কবি অনাবশ্যক ও অনতি-আবশ্যককে একেবারেই বাদ দিতে অসম্মত, ফলে তাহার মনোযোগ অনেক সময়েই একই অঙ্কে, একই দৃশ্যে বা একই ঘটনার চক্রে আবর্তিত হইয়া যেন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তারপরে আবার যখন ঘটনার দ্রুতি আসিয়া পড়ে—পাঠক বা দর্শক তেমন উৎসাহে আর গা-ভাসাইয়া দিতে পারে না।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য ঘটনার দ্রুত অগ্রগতির পক্ষে একটি প্রকাণ্ড বাধা। ইহার সংলাপ চতুর, ইহাতে শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ এবং চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রের কিছু বিস্তৃত পরিচয় আছে সত্য, কিন্তু ঘটনার ক্রমবিকাশের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ঘটনা যেখানে ছিল—তৃতীয় দৃশ্যে প্রায় সেখানে হইতে সুরু হইয়াছে—মাঝখানে একটা সম্পূর্ণ অবান্তর দৃশ্যে বাধা। সমগ্র তৃতীয় অঙ্ক সম্বন্ধেও প্রায় একই আপত্তি করা চলে। ইহাতে পাত্র-পাত্রীর যে চরিত্র-পরিচয় ও চরিত্র-বিশ্লেষণ আছে তাহা উপন্যাস-রীতি-সঙ্গত, নাট্য-রীতিতে অসঙ্গত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তা'ছাড়া, পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের যে পরিচয় দান করা হইয়াছে, সেটুকু বুঝিয়া লইবার ভার অনায়াসে দর্শকের উপরে ছাড়িয়া দেওয়া যাইত। তাহাতে যেটুকু লোকসানের আশঙ্কা ছিল ঘটনার তীব্র গতিতে তাহা পোষাইয়া যাইত। এমন যে হইয়াছে তাহার একটা কারণ দর্শকের বুদ্ধি ও রসবোধ সম্বন্ধে কবির অনাস্থা। নাট্যকারের পক্ষে এই

মনোভাব অমার্জনীয়। ঔপন্যাসিক পাঠকের চেয়ে উচ্চতর আসনে বসিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু নাট্যকারকে দর্শকের সঙ্গে একাসনে সমাসীন হইতে হইবে, এই একাত্মতাই নাট্যকারের সহিত দর্শককে সংযুক্ত করিয়া রাখে।

উপন্যাসের অতিরিক্ত রস বর্ণনাকারে নাটকের মধ্যে বন্ধনী অংশে প্রদত্ত হইয়াছে—কিন্তু দর্শক তাহা কেমনে পাইবে? পাত্র-পাত্রীর সংলাপে সে-সব প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় অঙ্কে চতুর্থ দৃশ্যে ইহার দৃষ্টান্ত অবিরল। "ঘর হইতে হঠাৎ তিন ভগিনীর পলায়নে" বা "আজ চন্দ্রবাবুর বাসায় হঠাৎ নির্মলা আবির্ভূত হইয়া"—যে সমস্যার উত্থাপন করিয়াছে—উপন্যাসের পাঠকের তাহা আয়ত্ত হইলেও নাটকের দর্শকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অলভ্য। কিংবা "আত্মসেবায় অনিপুণ চন্দ্রবাবুর প্রতি শৈলের একটু বিশেষ স্নেহোদ্রেক হইল।" এই স্নেহের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটনায় দেখানো হয় নাই, সংলাপেও নয়। ইহা একান্তভাবে ঔপন্যাসিক রীতি, নাটকীয় নহে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহাতে চরিত্রের বিকাশ আছে বটে কিন্তু চরিত্রের বিকাশ আর ঘটনার ক্রমবিকাশ পরস্পরে তাল রাখিয়া চলে নাই। ঘটনা পিছাইয়া পড়ে—চরিত্র অগ্রসর হইয়া যায়; চরিত্রকে আবার থমকিয়া থামিয়া ঘটনাকে সঙ্গী করিয়া লইতে হয়—চরিত্রের হালে এবং ঘটনার দাঁড়ে সব সময়ে মিল হয় না—তখন কবিকে বর্ণনার 'গুণ' লইয়া নামিয়া টানিয়া নৌকাখানাকে অগ্রসর করিয়া দিতে হয়। এমন যে শুধু এই নাটকেই ঘটিয়াছে তাহা নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেরই ইহা লক্ষণ, তাঁহার নাট্যশক্তির ইহা একটি প্রধান ত্রুটি।

চতুর সংলাপে ও নাটকীয় সংলাপে প্রভেদ আছে। নাটকীয় সংলাপ একই সঙ্গে চরিত্র ও ঘটনাকে বহন করিয়া অগ্রসর হয়। এই নাটকের বহুত্র তাহার ব্যতিক্রম আছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে

শ্রীশ বিপিনের চরিত্র এইরূপ দ্বিভারবাহী নহে। চন্দ্রবাবুর সংলাপের অনেক স্থলেই চরিত্র ও ঘটনার সমন্যাস ঘটে নাই।

এই গ্রন্থের নাট্যরূপ ও উপন্যাসরূপ পড়িলে ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, নাট্যরূপ যতই হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন শিল্পরীতির বিচারে উপন্যাসরূপই শ্রেষ্ঠ। নাট্যরূপে কবির প্রতিভা যতটা ধরা পড়িয়াছে উপন্যাসরূপে তাহার অনেক বেশি—কাজেই উপন্যাসরূপ তো সম্পূর্ণতর বটেই। নাট্যরূপে অনেক বাস্তব-বাধার সঙ্গে বনিবনাও করিয়া চলিতে হয়—উপন্যাসে সে দাবি না থাকাতে কবি সেখানে স্বাধীনতর। এই স্বাধীনতাই সম্পূর্ণতার প্রকৃত কারণ।

২

চিরকুমার সভার অন্তর্নিহিত সত্য কি? 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের তত্ত্বই চিরকুমার সভার তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রতিশোধে কবির যে কলম মানব-হৃদয়ের উপরে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, সেই কলমই বর্তমান নাটকে লঘুভাবে মানব-চরিত্রের উপরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছে। দৃষ্টির গভীরতার ফলে একস্থানে যাহা ট্র্যাজেডিরূপে দেখা দিয়াছে, দর্শন-রীতির ভেদে অন্যত্র তাহাই প্রহসন হইয়া উঠিয়াছে। কবি-প্রতিভার অনুভূতির শাখায় যাহা ট্র্যাজেডি, চিন্তার শাখায় তাহাই প্রহসন। চিন্তা ও অনুভূতির তারতম্যেই কমেডি ট্র্যাজেডি হইয়া ওঠে।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী এক মনগড়া অবাস্তব জগৎ রচনা করিয়া শান্তিলাভের আশা করিয়াছিল। এমন সময়ে একটি অনাথ বালিকা আসিয়া তাহার ধ্যান হরণ করিয়া লইল। সেই ধ্যানহারিণী যখন চলিয়া গেল সন্ন্যাসীর অবাস্তব জগৎবুদ্বুদ শূন্যে মিলাইল; সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর শান্তিও অন্তর্হিত হইল। এই তত্ত্বই লঘু আকারে কি চিরকুমার-সভার তত্ত্ব নয়?

চন্দ্রমাধববাবু সংসারের উপকার আশায় মানব-প্রকৃতিকে

উপেক্ষা করিয়া চিরকুমার সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। একাধিক সভ্যও জুটিয়াছিল। তাহারা যখন মানব-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ না করিয়া সংসারের উপকার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছিল—তখন মানব-প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ তুলিবার আশায় এই সভাটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। মানব-প্রকৃতির প্রথম আঘাতেই চন্দ্রমাধববাবু ও তাঁহার শিষ্যত্রয়ের মন-গড়া অবাস্তব জগৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল, ইহাই কি প্রকৃতির প্রতিশোধের তত্ত্ব নয়? প্রভেদের মধ্যে এই যে পূর্বতন নাটকের তীব্রতা এখানে নাই বলিয়াই ইহা প্রহসন হইতে পারিয়াছে নতুবা বস্তুত দুই-ই এক। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিশোধের তত্ত্বকেই তাঁহার কবি-জীবনের একমন্ত্রে তত্ত্ব বলিয়াছেন—সে দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই প্রহসনখানি তাঁহার প্রতিভার মূল ধারার অন্তর্গত। এই কারণেই চিরকুমার সভার এমন একটা গুরুত্ব আছে যাহা তাঁহার অন্য প্রহসনে নাই।

৩

চিরকুমার সভার গঠনরীতি আলোচনা করিতে হইলে ইহার চরিত্র-বিন্যাস হইতে আরম্ভ করা উচিত। নাটক, উপন্যাস বা কথা-কাব্যের গঠনরীতির মূলে থাকে চরিত্র-বিন্যাস বা ঘটনা-বিন্যাসের বিশেষ একটি পন্থা। সেখান হইতে সুরু না করিলে সুফল লাভের আশা অল্প। রবীন্দ্রনাথের নাটক উপন্যাস ইত্যাদিতে সাধারণত চরিত্র-বিন্যাস পন্থাই অনুসৃত হইয়া থাকে, ঘটনা-বিন্যাসের উপরে কখনো তিনি ঝোঁক দেন না—বরঞ্চ বলা উচিত যে ঘটনা-বিন্যাসে তাঁহার স্বাভাবিক দুর্বলতা দৃষ্ট হয়। বর্তমান নাটক এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। চরিত্র-বিন্যাসকে অনুসরণ করিয়াই নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে; ঘটনা-বিন্যাসে লেখকের স্বাভাবিক দুর্বলতা সর্বত্র স্পষ্ট।

চরিত্রগুলিকে যথাযথভাবে সাজাইতে পারিলে নাটকখানির কাঠামোর এবং গঠনরীতির একটা আভাস পাওয়া যাইবে। আবার এই চরিত্র-বিন্যাস-রীতির মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসতত্ত্বের বিশেষ নীতি। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা অন্য স্থানের জন্য স্থগিত রাখিয়া দিয়া এখানে সামান্য একটু ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতে পারে। প্রকৃতিস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ, স্বাভাবিক এবং বাতিকগ্রস্ত চরিত্র পাশাপাশি সাজাইয়া তিনি ঘটনার বা চরিত্রের হাস্যকর ভাব সৃষ্টি করতে অভ্যস্ত। চরিত্র বা ঘটনার হাস্যকরতা তখনই স্পষ্ট হইয়া ওঠে—যখন তাহার পার্শ্বে Norm স্থাপিত হয়। এই রীতিকে প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে একটি তত্ত্ব হইতে চিত্রে গমন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।'

এই নাটকের মধ্যে কতকগুলি পাত্র-পাত্রী স্বাভাবিক বা normal, আর কতকগুলি নানারকমের বাতিকগ্রস্ত ; বাতিক আর norm-এর দণ্ডের মন্থনে ইহার হাস্যরস উচ্ছ্বসিত। Normal চরিত্রগুলি ইহার কেন্দ্র, বাতিকগ্রস্ত চরিত্রগুলি ইহাতে পার্শ্বিক—দুইয়ের সংঘর্ষে ইহার ঘটনাবলী অগ্রসর হইতেছে। কেন্দ্রীয় স্বাভাবিক চরিত্র তিনটি—অক্ষয়, রসিক ও শৈল। বাতিকগ্রস্ত চরিত্রগুলি আবার দুইভাগে বিভক্ত—একদিকে চিরকুমার সভার সংশ্লিষ্ট দল—অর্থাৎ চন্দ্রমাধববাবু, বিপিন, শ্রীশ, পূর্ণ ও নির্মলা ; আর একদিকে অক্ষয়ের শ্বশুরালয়ের পাত্র-পাত্রী—অর্থাৎ জগত্তারিণী, পুরবালা, নৃপবালা ও নীরবালা। টেব্‌ল আকারে সাজাইলে দাঁড়ায়—

চিরকুমার সভা	অক্ষয়, রসিক, শৈল	অক্ষয়ের শ্বশুরালয়
চন্দ্রমাধববাবু, বিপিন, শ্রীশ, পূর্ণ, নির্মলা		জগত্তারিণী, পুরবালা, নৃপবালা, নীরবালা

বাতিকগ্রস্তের দল আবার দুই ভাগে বিভক্ত—অর্থাৎ তাহাদের বাতিক দুইটি কারণে জাত। বিপিন, শ্রীশ, পূর্ণ ও নির্মলার বাতিক

স্বভাবজ নয়। বিশেষ কারণে ও বিশেষ অবস্থার গতিকেই তাহারা বাতিকগ্রস্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে। একদিকে চিরকৌমার্যের প্রতিজ্ঞা অপর দিকে বিবাহের স্বাভাবিক ইচ্ছা তাহাদের চরিত্রের ভারকেন্দ্রকে বিচলিত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সময়বিশেষের জন্য বাতিকগ্রস্তের আচরণ দিয়াছে। আবার নৃপবালা, নীরবালা একদিকে অবাঞ্ছিত বরের হাত হইতে বাঁচিতে চায়, আর একদিকে বিপিন ও শ্রীশকে বররূপে পাইতে চায়—এই দ্বন্দ্বে তাহাদের ভারকেন্দ্র বিচলিত। পুরবালা ভগ্নীদের ত্বরিত বিবাহের জন্য এমন ব্যস্ত—যে এই অশোভন ব্যস্ততাই তাহার হাস্যকরতার কারণ। কেবল চন্দ্রমাধববাবু ও জগত্তারিণীর বাতিক সাময়িক নহে, তাহা উভয়ের স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহারা যে ঘটনাচক্রেই পড়ুন না কেন, কিয়ৎপরিমাণে বাতিকগ্রস্তের ন্যায় আচরণই করিবেন।

অক্ষয়, রসিক ও শৈলের প্রকৃতিস্থতা স্বভাবজ—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহারা মাথা ঠিক রাখিয়াছে—শুধু তাই নহে—তাহাদের সক্রিয়তার ফলেই নাটকখানি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের প্রকৃতিস্থ সক্রিয়তা ও অপর সকলের বাতিকগ্রস্ত নিষ্ক্রিয়তার দ্বন্দ্ব নাটকের আসল দ্বন্দ্ব। ইহাদের প্রকৃতিস্থতার পটভূমিতেই অন্যদের বাতিকগ্রস্ত আচরণ স্ফুরিত এবং প্রকট। এই দুইদলের সংঘর্ষেই নাটকের হাস্যরস ধ্বনিত।

দুই শ্রেণীর চরিত্রে ভাবগত সংঘর্ষ যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি আর একপ্রকার ভাব-দ্বন্দ্বও এই নাটকে আছে। কতকগুলি চরিত্র আছে যাহারা পরস্পরের পরিপূরকভাবে কল্পিত, অর্থাৎ একটি যদি শাদা রঙের হয় অপরটি যেন কালো রঙের। স্বতঃবিরুদ্ধকে পাশাপাশি স্থাপন করা—ইহাও হাস্যরসসৃষ্টির এক বিশেষ উপায়, ইহা বিশেষভাবে প্রহসনেরই রীতি, ট্র্যাজেডিতে ইহা অচল। ট্র্যাজেডির চরিত্র সূক্ষ্ম তুলিতে অঙ্কিত, সেখানে এমন মোটা তুলিতে শাদাকালোর সমাবেশে চরিত্রাঙ্কন চলে না। এই শ্রেণীর চরিত্র

তিন জোড়া আছে ;—মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বর, শ্রীশ ও বিপিন আর নৃপবালা ও নীরবালা।

মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বরের বর্ণনা পড়িলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

"একটি বিসদৃশ লম্বা বুটজুতা পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালি-পড়া ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা ;··· আর একটি বেঁটে খাটো, অত্যন্ত দাড়িগোঁফ সঙ্কুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালো কালো গোলগাল।"

দৈহিক বর্ণনায় এই বৈষম্য তাহাদের চরিত্রেও পরিদৃষ্ট।

বিপিন ও শ্রীশের বর্ণনাতেও অনুরূপ বৈষম্য আছে।

"বিপিন ফুটবল খেলে, তাহার শরীরে অসামান্য বল, পড়াশুনা কখন করে কেহ বুঝিতে পারে না, অথচ চটপট এগজামিন পাস করে। শ্রীশ বড়ো মানুষের ছেলে, স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়, তাই বাপ-মা পড়াশুনার দিকে তত বেশি উত্তেজনা করেন না—শ্রীশ নিজের খেয়ালে থাকে।"

নীরবালা ও নৃপবালাও পরস্পরের বিপরীত রূপে কল্পিত। নৃপবালা গম্ভীর ও স্বল্পবাক্। নীরবালা চপল ও কৌতুকময়ী।

এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে—অর্থাৎ বাতিকগ্রস্তদের সহিত প্রকৃতিস্থদের দ্বন্দ্ব এবং পূর্বোক্ত তিন-জুড়ির শাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, দুই জাতীয় দ্বন্দ্বে চিরকুমার সভার হাস্যরস ও বৈচিত্র্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই নাটকের পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগুলিকে শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। কতকগুলি চরিত্র পূর্ণ—আর কতকগুলি চরিত্র অপুষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রের সংখ্যাই অধিক। এই চরিত্রগুলি শাদা-কালোর তুলির ন্যূনতম রেখায় অঙ্কিত—পূর্ণায়তভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে স্পষ্ট দেখাইবার চেষ্টাই যেন করা হয় নাই।

বিপিন, শ্রীশ ও পূর্ণর ব্যক্তিত্ব অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর

করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইহাদের মতামতে কিছু ভেদ আছে কিন্তু প্রায় একই ধাতুতে তিনজনে গঠিত; পূর্ণ অপর দুইজনের চেয়ে একটু বেশি লাজুক এইমাত্র তফাত।

নৃপবালা ও নীরবালা প্রায় পরস্পরের বিপরীত গুণে রচিত অপুষ্ট চরিত্র; বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাহাদের মধ্যে দিবার চেষ্টাই যেন হয় নাই। জগত্তারিণী ও পুরবালা মা ও মেয়েই বটে—একটি পাথরের টুকরায় দু'জনে রচিত। কোনরূপ জটিলতা তাহাদের মধ্যে আশা করিবার ইচ্ছাও পাঠকের জাগে না।

নাটকটিতে চন্দ্রমাধববাবু, অক্ষয়, রসিক, নির্মলা ও শৈল পূর্ণাঙ্গ চরিত্র। এই পাঁচজনকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা আছে।

এখন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের চরিত্র-সৃষ্টি রীতির সঙ্গে প্রভেদ এই যে, অন্যশ্রেণীর নাটকে ভাবলোক হইতে চরিত্রগুলিকে বাস্তবলোকে নামাইয়া আনা হয় আর প্রহসনের অধিকাংশ প্রধান চরিত্র বাস্তবলোক হইতে উত্থিত হইয়া ভাবলোকে গিয়া পৌঁছায়। একটি আর একটির বিপরীত পন্থা। প্রহসনের অনেক চরিত্রের মূলেই আছে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই না কোন বিশিষ্টকে নির্বিশেষে শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত করা হইয়াছে।

"চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে। তন্মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ—এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে।... চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছ সারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে, কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোরই নাই।" ১

"মেজদাদা" ও "সরলা"র চরিত্রের অনেক গুণ যে চন্দ্রমাধববাবু ও

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা

নির্মলায় শুধু আছে মাত্র তাহাই নয়, উভয়ের মামা-ভাগ্নী সম্পর্কটিতেও মূল পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক অবিকৃত রাখা হইয়াছে।

অক্ষয় চরিত্রের মূল নির্ণয়ের চেষ্টা কবি না করিলেও তাঁহার জীবনস্মৃতির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা করিতে পারি। অক্ষয়ের চরিত্র-সৃষ্টির মূলে অক্ষয় চৌধুরীর আভাস খানিকটা আছে। অক্ষয় চৌধুরী সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইঁহার সম্বন্ধে কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিতেছেন—"সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন তাহাতে অজস্র টপাটপ শব্দ ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন।...গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলে লেখা ছড়াছড়ি যাইত সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল।" ইহার সহিত চিরকুমার সভার অক্ষয়ের বর্ণনা মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে। অক্ষয়কুমার ঝোঁকের মাথায় দুটো-চারটে লাইন গান মুখে মুখে সাজাইয়া গাহিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কখনোই গান রীতিমত সম্পূর্ণ করিতেন না। বন্ধুরা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "তোমার এমন অসামান্য ক্ষমতা, কিন্তু গানগুলো শেষ কর না কেন?" অবশ্য অন্যান্য চরিত্রের মতো অক্ষয়কুমারের চরিত্রেও কবিকল্পনার মিশল আছে।

রসিক চরিত্রের বাস্তব মূল কী না জানা গেলেও ইহার বাস্তব মূল কল্পনা করা অসম্ভব নহে। কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই শ্রেণীর রসিকবৃদ্ধ পুরুষের চিহ্ন হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌ-ঠাকুরাণীর হাটের বসন্ত রায় ও রসিক একই সৃষ্টি-কল্পনার প্রকারভেদ মাত্র।

নাটকখানির প্রধান গৌরব চন্দ্রমাধববাবু, অক্ষয়, রসিক প্রভৃতি চরিত্রসম্পদ্। ইহার দ্বিতীয় গৌরব অসাধারণ সুচতুর সংলাপ।

আর নাটকখানির প্রধান দোষ—পাত্র-পাত্রীগণের বিশেষভাবে চিরকুমার সভা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিষ্ঠার অভাব, কাহাকেও স্বনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেকেই যেন অভিনয় করিতে আসিয়াছে —অথচ অভিনয়ে যেটুকু স্বনিষ্ঠতা থাকে, তাহারও যেন অভাব। চিরকৌমার্যের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে কাহারো কি নিষ্ঠা আছে? বিপিন ও শ্রীশ তাহাদের ব্রত সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলিয়াছে—কিন্তু সে সব এমনি সুন্দর যে শুনিবামাত্র মনে হয় এগুলি বলিবার জন্যই লিখিত, পালিত হইবার জন্য নয়! পূর্ণ তো চিরকুমার সভার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অভিলাষ লইয়াই প্রবেশ করিয়াছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে স্বয়ং চন্দ্রবাবুও চিরকৌমার্য ব্রত সম্বন্ধে স্বনিষ্ঠ নহেন; তাঁহার বহু মতামতের মধ্যে এই ব্রত অন্যতম। যখন চিরকুমার ব্রত উঠাইয়া দিবার কথা হইল তিনি কিছুমাত্র বিচলিত বা বিস্মিত হইলেন না। চিরকুমার ব্রত যে সভ্যদের একটি সৌখিন মতবিলাস মাত্র ইহা প্রথম হইতেই দর্শকে বুঝিতে পারে—এবং সেই পরিমাণে ইহার রস লঘু হইয়া যায়। ট্র্যাজেডি ও প্রহসনের রচনার ছাঁদ ও গুরুত্ব স্বতন্ত্র। প্রহসনের ওজন ট্র্যাজেডির চেয়ে কম। কিন্তু সেই অপরিহার্য ওজনে কমতি পড়িলে রসোদ্বোধনে একপ্রকার রসাভাস ঘটে। আমার বিশ্বাস চিরকৌমার্য ব্রতের প্রতি সভ্যদের নিষ্ঠায় আর একটু গুরুত্ব আরোপ করিলে ঘটনাচক্রে তাহার ভঙ্গজনিত প্রহসন আরও অনেক বেশি জমিয়া উঠিত। হাস্যরসের ভিত্তি সত্যের কঠিন প্রস্তর দিয়া নির্মাণ করিতে হয়। চিরকুমার সভার পাথরগুলি যেমন কঠিন নয় তেমনি তাহাদের বিন্যাসেও যথেষ্ট পরিমাণে ধৈর্য ও বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতে শিল্পীমন কৃপণতা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

শেষরক্ষা

শেষরক্ষার পূর্বতন নাম 'গোড়ায় গলদ'। 'গোড়ায় গলদ' নাট্যাকারে রচনা—ইহাকে অধিকতর ভাবে অভিনয়োচিত করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমান রূপদান করা হইয়াছে।

শেষরক্ষা একখানি 'ভ্রান্তিবিলাস' নাটক। ভ্রান্ত পরিচয়ের উপরেই ইহার ঘটনাকেন্দ্রের নির্ভর। গদাই ও ইন্দুমতী পরস্পরকে ললিত চাটুজ্যে ও কাদম্বিনী নামে জানিয়া ফেলিল। এই দুই ভুল নামের মারফতে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিল এবং আসল নাম দুটিকে তাহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া চলিল। অবশেষে ঘটনার সন্ধিক্ষণে তাহাদের ভ্রান্তি পরিজ্ঞাত হইলে ছদ্ম নামের ঘটকালি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা আসল নামের সহিত পরস্পরের স্বরূপকে গ্রহণ করিল। এ যেমন ভ্রান্তিবিলাসের একদিক—তেমনি আরও একপ্রকার ভ্রান্তিবিলাস ইহাতে আছে। সদ্য বিবাহিত বিনোদ তাহার পত্নী কমলকে স্বীয় দারিদ্র্যের অজুহাতে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়। পরে রাণীবেশিনী কমলের সহিত তাহার সম্বন্ধ নূতন মাধুর্যে স্থাপিত হয়। এখানে এই নূতন ভ্রান্তিই তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধকে পুনঃসংস্থাপিত করিয়া দিল। দুই দম্পতির ভ্রান্তিতেই প্রেমের উদ্ভব—একটিতে উজ্জ্বল হাস্য অপরটিতে করুণার মাধুর্য মিশ্রিত।

কিন্তু এই দুই প্রকার ভ্রান্তি ছাড়া আর এক জাতীয় ভ্রান্তি নাটকখানির ঘটনাস্রোতকে চালিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাহাকে ঘটনার ভ্রান্তি না বলিয়া ভাবনার ভ্রান্তি বলা যাইতে পারে। কবি বিনোদ নিজের হৃদয়কে ভুল বুঝিয়া প্রথম আবেগের ধাক্কাতেই অদৃষ্টপূর্বা কমলকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। ইহা তাহার একপ্রকার ভ্রান্তি। বিনোদের কবিস্বভাব প্রেমের প্রকৃতিকে একভাবে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই প্রেম যখন বিবাহিত জীবনের সোপান বাহিয়া সংসারের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল তখন তাহার আর এক রকম

মূর্তি দেখা দিল। প্রেমের প্রকৃতি ও সংসারের প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিল। প্রহসন নাটকে এই দ্বন্দ্বের নিরসন প্রহসনের নিয়মে লঘুভাবেই ঘটিয়াছে, তৎসত্ত্বেও ইহার অন্তর্নিহিত বিষাদ যাইবে কোথায়? সূর্যালোক মিলাইবার পূর্বে বিষাদের কুয়াসা হাসির তৃণাস্তরণের উপরে দু'চার ফোঁটা অশ্রু ফেলিয়া গিয়াছে। ঘটনার ভ্রান্তি ও ভাবনার ভ্রান্তি জড়িত হওয়াতে নাটকের গুরুত্ব কিছু বাড়িয়াছে, নতুবা ইহা কেবল ঘটনার ভ্রান্তিবিলাস মাত্র হইলে প্রহসনের বিচারেও লঘু হইয়া পড়িত।

চিরকুমার সভার সহিত ইহার সংগঠন-রীতির ঐক্য থাকিলেও সংভাবনরীতির ঐক্য নাই; চিরকুমার সভার মূলে কবি-জীবনের একটি মূলতত্ত্ব নিহিত—অবশ্য প্রহসনের প্রকৃতি অনুসারে তাহার ওজন হাল্কা। শেষরক্ষার ভিত্তিতে সে রকম কোন কবি-জীবনের সত্য নাই। কিন্তু দুই নাটকের সমগোত্র সংগঠন-রীতি প্রমাণ করিয়া দেয় যে—একই শিল্পীর কল্পনা হইতে ইহারা নির্গত।

চিরকুমার সভার মতোই এ নাটকখানিও বাতিকগ্রস্ততাকে পরিহাসের নাটক। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই নানা প্রকারের বাতিকগ্রস্ত। প্রকৃতিস্থ চন্দ্রকান্ত ও তাহার পত্নী ক্ষান্তমণিকে কেন্দ্র করিয়া ইহা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ইহার চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি পরবর্তী পরিণততর নাটকখানির অক্ষয় ও তাহার পত্নী পুরবালার সগোত্র। চন্দ্রকান্তের প্রকৃতিস্থতার পটভূমিতে ও দ্বন্দ্বে আর সকলের বাতিকগ্রস্ততা স্ফুটতর ও উপভোগ্যতর হইয়া উঠিয়াছে।

বিনোদের কবিস্বভাবজাত ভাবালুতা তাহার বাতিকের কারণ। এই ভাবালুতার আচম্বিত ধাক্কায় সে কমলকে বিবাহ করিয়া ফেলিল—তাহার বিশ্বাস কমলকে সে ভালবাসে কিংবা ভালবাসা সম্বন্ধে তাহার খেয়ালই যথেষ্ট। কিন্তু বিবাহিত জীবনের 'প্রথম ভাগে' অবতীর্ণ হইয়াই সে বুঝিতে পারিল নিছক ভালবাসা শূন্যচারী হইলেও বিবাহিত জীবনের পক্ষে অর্থের প্রয়োজন আছে। পূর্বতন

মোহভঙ্গের তখন সূত্রপাত হইল। সংসারের চাপে তাহার কাবত্ব-বাতিকের ফানুস শূন্যে মিলাইয়া গেল।

গদাই-এর বাতিক আর এক শ্রেণীর। তাহার বিশ্বাস—সে বিনোদের মতো ভাবালুতার বাষ্পচালিত জীব নয়—হৃদয়াবেগের অধীনে সে নয়। হৃদয়াবেগ হইতে সে সর্বতোভাবে মুক্ত—ইহাই যেন তাহার বাতিক। কিন্তু ইন্দুমতীর সাক্ষাৎ মাত্রেই সে বুঝিতে পারিল—পরীক্ষা ক্ষেত্রে কাণ্ডজ্ঞান তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বুঝিতে পারিল সে বিনোদের মতোই হৃদয়াবেগের অধীন। কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি অত্যধিক ভরসাই যেন তাহার বাতিক। বিনোদের কাণ্ডজ্ঞানকে অবহেলা ও গদাই-এর কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি একান্ত আশ্রয়—দুই বৃত্তিকেই নাট্যকার যেন পরিহাস করিয়াছেন।

নিবারণ ও শিবচরণ দুইজনেই বাতিকের উপদানে গঠিত। তাহাদের কথাবার্তা, হাবভাব ও চালচলনে বেশ বুঝিতে পারা যায় তাহারা প্রকৃতিস্থ জীব নয়। চিরকুমার সভার চন্দ্রমাধববাবু ও ইহারা দুইজন একই উপাদানে গঠিত—কেবল চন্দ্রবাবুতে যাহা পরিণতি ও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে—ইহাদের মধ্যে তাহা অপরিণত নির্বিশেষ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

কমল ও ইন্দুমতী চরিত্রদ্বয় বিপরীত উপাদানের সৃষ্টি। কমল গম্ভীর, স্বল্পবাক্ ও আত্মস্থ; ইন্দুমতী চপল, মুখর ও সামাজিক। ইন্দুমতী চিরকুমার সভার শৈলবালাতে পরিণতি লাভ করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

Norm বা প্রকৃতিস্থতাকে অবলম্বন করিয়া এবং তাহার চতুর্দিকে বাতিকগ্রস্ত চরিত্র সাজাইয়া প্রহসন রচনার রবীন্দ্ররীতি এই নাটকে আছে—কিন্তু এমন অপরিণত এবং অস্পষ্টভাবে আছে যে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে কবি তাঁহার প্রহসনতত্ত্ব সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া ওঠেন নাই, অনেক পরিমাণে অন্ধভাবেই যেন চালিত হইয়াছেন। পরিণত নাটকে পাত্রপাত্রীর বাতিক বিচিত্র কার্যকলাপের

দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, বর্তমান ক্ষেত্রে বাতিক স্বতঃস্ফূট—কার্য-কলাপের মাধ্যমে তাহা পরিস্ফুট নয়। একটা লোককে শুধু শুধু বাতিকগ্রস্ত বলিলে লেখকের উপর বিশ্বাস করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়—কিন্তু কার্যকলাপের দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলে চরিত্রটিকেই বিশ্বাস করা যায়—লেখকের ভাষ্যকে তলব করিবার প্রয়োজন হয় না। চিরকুমার সভার পাত্রপাত্রীর পরিচয়ই যথেষ্ট—বর্তমান নাটকের পাত্রপাত্রীকে বুঝিবার জন্য অনেক সময়েই লেখকের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহা লেখকের গৌরবের নহে।

নাটকখানির অন্যান্য চরিত্রগুলি কলমের হ্রস্বতম রেখায় অঙ্কিত। তাহাদিগকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদানের প্রতি কবির যেন মনোযোগের অভাব— ফলে তাহারা নাটকের কাজ চালাইবার মতো ব্যক্তিমাত্র হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু এমন ব্যক্তিত্ব পায় নাই যাহাতে নাটকের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সংসারের মধ্যে স্বকীয় গৌরবে চলাফেরা করিতে পারে।

শোধবোধ

কর্মফল গল্পের রূপান্তর শোধবোধ নাটক। পূর্ববর্তী কোন রচনাকে ভাঙিয়া নাট্যরূপ দিতে গেলে যে-সব শিল্পগত ত্রুটি পরবর্তী রচনায় থাকিয়া যায়, বর্তমান নাটকে তাহার অনেকগুলিই আছে। গল্প ও নাটক ভিন্ন শ্রেণীর শিল্প, কাজেই একটির বস্তুকে অপরটিতে পরিবর্তন সহজ নয়—কিন্তু সে কাজ আরও কঠিন হইয়া ওঠে যদি পূর্ববর্তী রচনা সার্থক শিল্প হয়। সার্থক শিল্প এমন এক বস্তু যাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া অপর রচনা গড়িলে দুয়েরই প্রকৃতি বিকৃত হয়—প্রথমটি স্বধর্ম ছাড়িতে চাহে না বলিয়াই দ্বিতীয়টি স্বধর্ম পায় না। ইটের পাঁজা ভাঙিয়া অট্টালিকা গড়া যায়, কিন্তু অট্টালিকা ভাঙিয়া সেই ভগ্নাবশেষের দ্বারা অপর অট্টালিকা গড়িয়া তোলা একান্ত দুঃসাধ্য।

কর্মফল গল্পে একস্থানে একটি বৃহৎ ছেদ আছে। সুকুমারীর পুত্র হরেনের জন্ম হইয়াছে এবং সে এখন বানান করিয়া পড়িতে পারে—ইহাতে অন্তত বৎসর ছয় সময় অতিক্রম করিয়াছে। গল্প বা উপন্যাসের শিল্পজালে ছয় বৎসরের ফাঁক সব সময়ে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু দৃশ্যকাব্যে, বিশেষ স্বল্পায়ত দৃশ্যকাব্যে, অনেক সময়েই ইহা অলঙ্ঘনীয় ত্রুটি। ট্রাজেডি-শ্রেণীর নাটকে, যেখানে দর্শকের মন ভাবের উচ্চগ্রাম স্পর্শ করিয়াছে—সেখানে এই ত্রুটি চোখে না পড়িতে পারে। কিন্তু প্রহসনে ইহা অত্যন্ত উৎকটভাবে চোখে পড়িবেই। তার উপর হরেনের জন্ম এই নাটকের মোড় ঘুরিবার স্থান হইয়া ওঠাতে দর্শকের সমস্ত মনোযোগ এই দীর্ঘ অবকাশটার উপরে আসিয়া পড়ে। নাটকখানিকে একাঙ্করূপে গড়া হইয়াছে—তাহা না করিয়া হরেনের জন্মকাল হইতে দ্বিতীয় অঙ্কের অবতারণা করিলে হয়তো এই ত্রুটি কিয়ৎপরিমাণে লঘু হইতে পারিত।

দীর্ঘ সময়ক্ষেপের ত্রুটি নানাভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ধনী লাহিড়ীর কন্যা নলিনীর বিবাহের কানাঘুষা সতীশের সঙ্গে চলিতেছে বটে—কিন্তু এরকম অনিশ্চয়ের উপরে ভরসা করিয়া লাহিড়ী দম্পতি যে দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন—ইহাও একপ্রকার অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অন্তত ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার পক্ষে কারণ দেখানো হয় নাই। খুব সম্ভবত রূপান্তরিত রচনার এইসব ত্রুটি অপরিহার্য, চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা—এবং বর্তমান নাটক দেখিলে এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু শোধবোধ নাটকের সাদৃশ্য চিরকুমার সভা বা শেষরক্ষার সঙ্গে আর অধিক দূর টানিয়া লওয়া চলিবে না। যদিচ তিনখানিই প্রহসন—তবু তাহাদের জাত ভিন্ন। চিরকুমার সভা বা শেষরক্ষার পাঠক দু'চার পাতা পড়িয়াই বুঝিতে পারিবে যে এই প্রহসনের বঙ্কিম পথে অভাবিত ও অপ্রত্যাশিত বাধা যতই আসুক না কেন—

ইহার লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থান পূর্বনির্দিষ্ট—হাসির তরঙ্গ সহসা এমন প্রবল হইবে না যাহাতে নৌকা বানচাল হইয়া যাইতে পারে—কাজেই পাঠক নিশ্চিন্ত মনে নাটকগুলি পাঠ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু শোধবোধের পাঠকের তেমন নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। শোধবোধের ঘটনাশ্রেণীকে অভ্রভেদী গিরিশীর্ষ অতিক্রম করিতে হইয়াছে—পদমাত্র স্খলিত হইলে হাসির তুঙ্গতা হইতে ট্রাজেডির অতলস্পর্শ খাদে পড়িতে হইত। সমস্ত নাটকখানির পথটাই একান্ত বক্রতাপ্রবণ; হাসি-কান্না গায়ে গায়ে জড়িত—শেষ পর্যন্ত লেখক ইহাকে প্রহসনের মিলনান্ত-ঘাটে ভিড়াইয়া দিয়াছেন বটে—কিন্তু ইহা হইলে-হইতে-পারিত ট্রাজেডি। ইহাতে ঘটনার যে বেগ, ভাবনার যে তীব্রতা, ভাবের যে উচ্চগ্রাম-স্পর্শ আছে তাহা ট্রাজেডির স্বাভাবিক উপাদান। কোন কোন প্রহসনে ইহা চলিতে পারে—কিন্তু সে প্রহসন ট্রাজেডির যমজ সহোদর। তাহার জাতই সাধারণ প্রহসন হইতে স্বতন্ত্র। এদিক দিয়া বিচার করিলে শোধবোধ ও বৈকুণ্ঠের খাতা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রহসন হইতে ভিন্নশ্রেণীর।

চিরকুমার সভা ও শেষরক্ষা হইতে এই নাটকখানির আরও একটি প্রভেদ এই যে, পূর্বোক্ত নাটকদ্বয়ের পাত্রপাত্রী যেন দেশ কাল ও ঘটনার মধ্যে জলবিহারী হাঁসের ন্যায় বিরাজমান। যতক্ষণ জলের মধ্যে ততক্ষণ কেবল জল তাদের গায়ে স্পর্শ করিয়াছে—জল হইতে তুলিলে তাহার আর কোন চিহ্ন থাকে না। পাত্র-পাত্রীগণ ঘটনার দ্বারা স্থায়িভাবে বিচলিত বা পরিবর্তিত হয় নাই—নাটকের সূত্রপাতেও তাহারা যেমন ছিল, নাটকের অন্তেও তেমনি রহিয়াছে। শোধবোধের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র পরিবর্তনধর্মী এবং পরিবর্তনশীল। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহারা বদলাইতে সুরু করিয়াছে এবং নাটকের অন্তে পৌঁছিয়া দেখা যায় যে, পূর্বের সেই ব্যক্তি আর নাই—তাহাদের স্থলে যেন অন্য লোকের আবির্ভাব

ঘটিয়াছে। সুকুমারী, সতীশ এবং কিয়ৎপরিমাণে নলিনী সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে সত্য। এই পরিবর্তনশীলতা ট্রাজেডির ধর্ম। ভাবের উচ্চগ্রাম-স্পর্শন ও পরিবর্তনশীলতার জন্যই শোধবোধকে আমরা হইলে-হইতে-পারিত ট্রাজেডি বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রহসনের সঙ্গে এই নাটকখানির (বৈকুণ্ঠের খাতারও) আর একটি প্রভেদ এই যে, ইহার সমস্ত পাত্রপাত্রীগুলির চরিত্রেই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া তাহাদিগকে বিশিষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। চিরকুমার সভা বা শেষরক্ষার দু' চারটি চরিত্র সম্বন্ধে ছাড়া এমন কথা বলা যায় না। আদর্শবাদী মন্মথ, কর্তব্যপরায়ণ শশধর, পুত্রস্নেহঅন্ধ বিধুমুখী, পুত্রহীনা সুকুমারীর পুত্রলাভের পরে পরিবর্তন, ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজভুক্ত লাহিড়ী ও লাহিড়ী-জায়া, লেফাফা-দোরস্ত নন্দী ও তাহার টেনিসের ও পরবর্তী কালের জীবনের পার্টনার চারু সমস্ত চরিত্রই জীবন্ত। কিন্তু সবচেয়ে সজীব শোধবোধের নায়ক ও নায়িকা—সতীশ ও নলিনী। মা ও মাসীর আদরে নষ্টপ্রায় সতীশ; একদিকে তাহার ভয় পিতাকে; অপর দিকে নলিনীকে—কিন্তু তাহার মনুষ্যত্ব বা আত্মসম্মানবোধ নাই এমন নহে, তাহা এতদিন চাপা পড়িয়াছিল মাত্র, শেষের দিকে দুঃখের অভিঘাতে তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া তাহার দিকে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজভুক্ত নলিনীর সেই কৃত্রিম সমাজের প্রতি শ্লেষময় ধিক্কার; হাস্যোচ্ছল কিশোরীর অন্তরে প্রেমের গভীরতা ও করুণা; এই রমণীর অন্তরে কী প্রচণ্ড মনুষ্যত্ব ছিল জীবনের চরম পরীক্ষার সময়ে যাহা তাহাকে সসম্মানে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। নলিনী রবীন্দ্রনাথসৃষ্ট ললিতা ও বাঁশরী সরকারের সমগোত্র।

আর একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ না করিলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। শেষের দিকে সতীশের পিস্তল লইয়া বাড়াবাড়ি নিতান্তই 'মেলো-ড্রামাটিক';—না ইহা নাটকখানির যোগ্য,

না রবীন্দ্রনাথের কলমের উপযুক্ত। পিস্তল লইয়া এই আতিশয্য নিতান্তই পাগলামি বলিয়া মনে হয়—শিল্পসম্মত বিশ্বাস-গুণ ইহার মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না।

বৈকুণ্ঠের খাতা

রবীন্দ্রনাথের সবগুলি প্রহসনের মধ্যে এই স্বল্পায়ত, স্ত্রী-চরিত্রবর্জিত, শ্লেষমণ্ডিত প্রহসনখানি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থকতম। তাঁহার অন্যান্য প্রহসনের প্রায় সবগুলিরই একাধিক বার ভাঙা-গড়া হইয়াছে, অনেকগুলি তো পূর্বতন কাহিনীকে ভাঙিয়া-গড়া, কাজেই তাহাদের মধ্যে নাট্যশিল্পের পক্ষে অনেক অবান্তর বস্তু ঢুকিয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। বৈকুণ্ঠের খাতায় সে রকমটি ঘটিতে পারে নাই। ইহার শিল্পের পূর্ণতা বুঝিতে পাইয়াই কবি যেন ইহাকে আর স্পর্শ করেন নাই। এ দিকের বিচারে বৈকুণ্ঠের খাতা ও ডাকঘরকে সৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে।

কিন্তু শিল্পসৃষ্টির সার্থক দৃষ্টান্ত হওয়া সত্ত্বেও ইহা চিরকুমার সভা বা শেষরক্ষার লোকপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই বা পারিবে না। কারণ, এই নাটকের ক্ষুদ্র রস-পরিসরে অধিক লোকের বসিবার স্থানাভাব; তারপরে স্ত্রী-চরিত্রবর্জিত হওয়াতে ইহার রস-সংবেদ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বৈকুণ্ঠের লিখিবার অভ্যাস, নাটকের মূল রসবস্তু, হৃৎ-রসের সমস্যা নয়, চিৎ-রসের সমস্যা। এখন, এমন বুদ্ধিগত বিষয়বস্তু কখনোই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে না। এইসব কারণে বৈকুণ্ঠের খাতার আবেদন চিরদিন স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। এ সমস্তই স্বীকার করিয়া লইয়া দৃষ্টিমান্ সমালোচককে স্বীকার করিতে হইবে যে—এই নাটকখানিই রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের মধ্যে সার্থকতম।

রচনা বিষয়ে বাতিকগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া নাটকখানি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বাতিকগ্রস্ত জ্যেষ্ঠের আনুষঙ্গিক রূপে

আছে গাছপালার বাতিকগ্রস্ত অবিনাশ। অধিক বয়সে বিবাহ করিবার ফলে অবিনাশের বাতিকের কেন্দ্র পরিবর্তিত হইয়াছে, এখন গাছপালা আর তাহার বাতিক নয়, পত্নীই তাহার শেষতম বাতিক। এই দুই বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি এই নাটকের মূলাধার। বৈকুণ্ঠের চরিত্রের ট্রাজেডি এই যে, সে জানে যে, লোকে তাহার রচনা পছন্দ করে না, আড়ালে তাহার বাতিক লইয়া বিদ্রূপ করে, তৎসত্ত্বেও সে বাতিকের যবনিকাখানি খসিয়া পড়িতে দেয় নাই। এই সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালে নিজের আহত হৃদয়কে সে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু নাটকের ঘটনা যখন ঘনীভূত হইয়া ট্রাজেডির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন নিজেই সে যবনিকাখানি খুলিয়া ফেলিয়া দিল—"আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস। সবাই হাসে আমি কি তা জানি নে ঈশেন। ওসব রইলো পড়ে। সংসারে লেখায় কারো কোন দরকার নেই।"

এ যেমন গেল ট্রাজেডির এক দিক, অপর দিকে ভ্রাতৃস্নেহের ট্রাজেডিও তাহাকে বিষম পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়াছে। কেদারের চক্রান্তে পৈতৃক গৃহ ত্যাগের উপক্রমের পূর্বে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে অবিনাশ আছে কিনা, তাহার এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশান বলিল, অবশ্যই সে আছে, এবং বৈকুণ্ঠ ও তাহার কন্যা চলিয়া গেলে অবিনাশের যে দুঃখ হইবে না, তাহাও সে জানাইয়া দিল। ইহা শুনিয়া বৈকুণ্ঠ বলিতেছে—"দেখ্ ঈশেন, তোর কথাগুলো বড় অসহ্য। তুই একটা মিষ্টি কথা বানিয়েও বলতে পারিস্ নে? এতটুকু বেলা থেকে তাকে আমি মানুষ করলাম, একদিনের জন্যেও চোখের আড়াল করি নি, আমি চলে গেলে তার কষ্ট হবে না—এমন কথা তুই মুখে আনিস হারামজাদা বেটা। সে জেনেশুনে আমার নিরুকে কষ্ট দিয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়।"

বৈকুণ্ঠের চরিত্রের দুইটি অবলম্বন, তাহার রচনা ও ভ্রাতৃস্নেহ।

ঘটনাচক্র একসঙ্গে দুইটিকে আঘাত করিয়াছে। এই আঘাতের ফলে নাটকখানি লঘু প্রহসনের স্তর হইতে উন্নীত হইয়া গুরু প্রহসনে (High comedy) পরিণত হইয়াছে। এদিক দিয়া বৈকুণ্ঠের খাতা শোধবোধের সমগোত্র। এই দুইটির হাস্যরস অশ্রুজলমিশ্র ; চিরকুমার সভা ও শেষরক্ষার হাস্যরসের মতো অমিশ্র নয়।

এই নাটকের চরিত্রগুলি সবই বাস্তব-ঘেঁষা। এরূপ বাস্তব ঘেঁষা, সজীব, সংসারের ধূলিবালি-চিহ্নিত চরিত্র-সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ নহে, কিন্তু প্রয়োজন হইলেই যে তিনি সেরূপ চরিত্র-সৃষ্টি করিতে পারেন বৈকুণ্ঠের খাতা তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। বৈকুণ্ঠের চরিত্রের আদর্শ যে সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসাবহুল রচনায় বাতিকগ্রস্ত লেখকের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ অনেকে মনে করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেন যে, চরিত্র-পরিকল্পনার সময়ে কোনো বাস্তব আদর্শকে তিনি সম্মুখে রাখিতেন না—এ কথা আংশিক সত্য বলিয়া মাত্র মনে হয়। কারণ বৈকুণ্ঠের খাতায় সব চরিত্রগুলিরই আষ্টে-পৃষ্ঠে এমন বাস্তবের চিহ্ন অঙ্কিত যে, তাহাদিগকে জীবনের প্রাত্যহিক আসর হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। অবিনাশ, কেদার, তিনকড়ি, ঈশান প্রভৃতি চরিত্র বাস্তব সমুদ্রের তরঙ্গ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শুক্তিমালা, তাহাদের সর্বাঙ্গে বাস্তব সমুদ্রের ছায়ালোকের বিচিত্র রেখা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে একটি নিয়ম নির্ধারণ করা যাইতে পারে। তাঁহার ট্রাজেডি ও তত্ত্বনাট্যসমূহের অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তবমূলবর্জিত। সে-সব প্রধানত কল্পনার ধন। আর তাঁহার প্রহসন-জাতীয় রচনার অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তবোদ্ভূত, তাহাদের পরিচ্ছদ কল্পনার সূতায় বোনা বটে, কিন্তু রক্তমাংস ও জীবন বাস্তবের হাত হইতে তাহারা পাইয়াছে। চিরকুমার সভার চন্দ্রমাধববাবু, রসিক, অক্ষয়, শেষরক্ষার চন্দ্র, শিবচরণ এবং শোধবোধের মন্মথ, নন্দী, নলিনী ও তাহার পিতামাতা

প্রত্যেকেই বাস্তবযোনির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বৈকুণ্ঠের খাতা সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তাহার কোনো চরিত্রই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কেদারের মতো কূটবুদ্ধি হৃদয়হীন পাষণ্ডকে জীবনের ডাস্টবিন ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাইবে, আবার জীবনের 'ডাস্টবিনে' মাঝে মাঝে হঠাৎ এক আধটি স্থানভ্রষ্ট রত্নকণা পাওয়া যায়। তিনকড়ি সেইরূপ একটি অমূল্য রত্ন, তাহার গায়ে ধূলাবালি লাগিয়াছে সত্য, তবু তাহার মূল্য এতটুকুও কমে নাই।

এখানে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতে পারে। অনেকে বলেন যে, জীবনের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কেমন যেন একপ্রকার অসহিষ্ণুতার ভাব আছে, তাই তিনি বাস্তব চিত্র বড় আঁকিতে চান না, কিংবা আঁকিলেও সে চিত্র হয় বাস্তব-ধর্ম-বর্জিত, নয় তেমন সত্য হইয়া ওঠে না। হয়তো এই অভিযোগের মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে বাস্তবের নিখুঁত ছবি যে আঁকিতে পারেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বৈকুণ্ঠের খাতা প্রহসন। এই প্রহসনখানি ট্রাজেডি কমেডির সংকীর্ণ যোজকের পথ ধরিয়া চলিয়াছে, একদিক হইতে আসিয়াছে হাসির শুষ্ক হাওয়া, আর একদিক হইতে আসিয়াছে অশ্রুর লবণাম্বুশীকর, আর দু'য়ে মিলিয়া সংকীর্ণ ভূখণ্ডটিকে এক অপরূপ জীবন-লাবণ্য দিয়াছে, যাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত বিরল। স্বল্পকায় ডাকঘর নাটকটি যেমন রবীন্দ্রপ্রতিভার একদিকের বিশিষ্ট প্রকাশ, তেমনি আর একদিকের বিশিষ্ট প্রকাশ এই প্রহসনখানি বৈকুণ্ঠের খাতা।

হাস্যকৌতুক

হাস্যকৌতুক পনেরোটি ছোট ছোট হাস্যরসাত্মক নাটিকার সঙ্কলন-গ্রন্থ। ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন—"য়ুরোপে শারাড (Charade) নামক একপ্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছে। কতকটা তাহারি অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।...এই হেঁয়ালী-নাট্যের

কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকে আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।"

পনেরোটি নাটিকার মধ্যে ছাত্রের পরীক্ষা, পেটে ও পিঠে, অভ্যর্থনা, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি কয়েকটি নিছক আমোদ দিবার জন্যই লিখিত। কিন্তু অপরগুলিতে আমোদ দান ছাড়াও মানুষের নানাপ্রকার গোঁড়ামির প্রতি কৌতুক, বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গুরুবাদ, পাণ্ডিত্যাভিমান, আর্যামিকে প্রধান স্থান দেওয়া যাইতে পারে। আমরা অন্যত্র দেখিতে পাইব যে, গুরুবাদ ও বুদ্ধির মূঢ়তা রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের একটি প্রধান লক্ষ্য; সুবিধা পাইলেই কবি ইহাদের আক্রমণ করিয়াছেন।

অন্ত্যেষ্টিসৎকার ও খ্যাতির বিড়ম্বনার মধ্যে বিশুদ্ধ নাট্যরস কিয়ৎ-পরিমাণে আছে; কিন্তু আয়তনের হ্রস্বতার ফলেই এ দুটি অকিঞ্চিৎকরতার স্তর হইতে উন্নীত হইতে পারে নাই।

ব্যঙ্গকৌতুক

হাস্যকৌতুকের তুলনায় ব্যঙ্গকৌতুক অনেক পরিমাণে পরিণত শক্তির রচনা। এই গ্রন্থে নাট্যজাতীয় রচনা ছয়টি। তন্মধ্যে 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' অনেক পরবর্তী কালের রচনা (১৩৪৫)। তাহা ছাড়া ইহা সংলাপ মাত্র; কোনক্রমেই ইহাকে নাট্যশ্রেণীর অন্তর্গত করা চলে না।

বাকিগুলির মধ্যে বিনি-পয়সার ভোজ, নূতন অবতার ও অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি—একচরিত্র নাটক। স্বর্গীয় প্রহসন ও বশীকরণ প্রচলিত ধরনের নাটক।

বশীকরণ নাটকের আক্রমণের লক্ষ্য গুরুবাদ। স্বর্গীয় প্রহসনে শীতলা, মনসা, ঘেঁটু প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবীকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তির আক্রমণের বিষয়—রসজ্ঞানের অভাব। নূতন অবতারে নিজেকে দেবতা সাজাইবার বিপদ বর্ণিত

হইয়াছে। বিনি-পয়সার ভোজ নিছক আনন্দ দানের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের বিচারে ব্যঙ্গকৌতুকের ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কবির নিজের মমত্ব যেন বশীকরণের প্রতি কিছু সমধিক। ফাল্গুনী-অভিনয়ের কালেও (১৯১৬) ইহাকে মুখপত্ররূপে অভিনয়ের পরামর্শ তিনি দিয়াছিলেন। ইহার প্রতি কবির আকর্ষণের হেতু আমাদের বুদ্ধির অগম্য। না আছে ইহার দর্শকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিবার শক্তি, না আছে চরিত্র-সৃষ্টির নিপুণতা, সংলাপেও অসাধারণ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। খুব সম্ভবত গুরুবাদের মূঢ়তার নিন্দা ইহার বিষয়বস্তু বলিয়াই কবির ইহা এত প্রিয়।

মুক্তির উপায়

মুক্তির উপায় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত উক্ত নামের একটি গল্প-ভাঙা প্রহসন। আয়তনে নাটকটি চিরকুমার সভা ও শেষরক্ষার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রণের গৌরবলাভ করার চেয়ে বশীকরণের অনুগামী রূপে ব্যঙ্গকৌতুক গ্রন্থে সংগৃহীত হইলে যথার্থ হইত। বস্তুত বশীকরণের সঙ্গে মুক্তির উপায়ের বিষয়বস্তুরও ঐক্য আছে। ইহা গুরুবাদের প্রহসন।

গুরুবাদ প্রহসনের বিষয় হইতে বাধা নাই। কিন্তু গুরুবাদকে বিদ্রূপ করিতে গেলে গুরুবাদ বা গুরুকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া অঙ্কিত করা উচিত। যে লক্ষ্যের অভিমুখে বিদ্রূপবাণ নিক্ষিপ্ত হইবে তাহাকে লক্ষ্যগোচর করিয়া স্থাপিত করিতে হয়। এই নাটকের যে গুরু, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে ইহার কেন্দ্র বলা চলে, সে লোকটা শিল্প-জগতে বিশ্বাসকরতা লাভ করে নাই। অবশ্যই সে ভণ্ড, কিন্তু ভণ্ডকেও বিশ্বাসযোগ্য করিয়া আঁকিতে হয়। কিন্তু এই গুরুটি না-ভণ্ড, না-সত্য; সে কিম্ভূত। দু'চার ছত্র অগ্রসর হইলেই তাহার বায়ব-অস্তিত্ব পাঠককে সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে—আর সেই সন্দেহের

সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রহসনের প্রাণান্ত ঘটিয়া যায়। গুরুর শিষ্য মাখন ও ফটিকও কিম্ভুত। অতিশয়োক্তি প্রহসনের প্রাণ। কিন্তু অতিশয়োক্তিরও একটা নিয়ম আছে। নাটকটির অধিকাংশ চরিত্রে অতিশয়োক্তির আতিশয্য ঘটিয়াছে—ফলে কেহই প্রহসন জগতের নাগরিকত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

কেবল পুষ্পমালার ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সংস্কৃতে এম. এ.-পাশ-করা এই বিদুষী তরুণী গুরুবায়ুগ্রস্ত সংসারের লোক নয়। সে ইন্দুমতী, শৈলবালার সখী হইবার যোগ্য, তাহাকে শোধবোধের নলিনীর সহিত টেনিসের দ্বৈত প্রতিযোগিতায় দেখিলে বিস্মিত হইব না। পুষ্পমালাই এই নাটকের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র। আর ইহারই প্রতি কবির যেন সমস্ত মনোযোগ অর্পিত—ফলে অন্যান্য চরিত্র কবির উপেক্ষিত—এবং তাহাদের অবিশ্বাসকরতা এই উপেক্ষা-সঞ্জাত বলিয়াই বোধ হয়। মোটের উপর মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, এই নাটক রচনার মূলে প্রহসনের প্রেরণার অপেক্ষা প্রয়োজনের তাগিদই প্রবলতর।

রূপান্তর ও নামান্তর

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক নাটকের মূল কাহিনী গ্রন্থান্তর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক বা ঐ-জাতীয় প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহার মূল গল্প সংগৃহীত। কাব্যনাট্য বলিতে আমরা যে-শ্রেণীর রচনা বুঝি তন্মধ্যে কেবল 'সতী'র গল্পাংশ একটি মারাঠি ব্যালাড হইতে এবং 'মালিনী'র গল্পাংশ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'দি স্যানস্ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র গল্পাংশ কবির স্বকল্পিত। অবশিষ্ট সমস্তগুলির মূল কাহিনী মহাভারতের অন্তর্গত।

সাহিত্যিকগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের রচনার মূল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে লইয়া থাকেন এবং নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নূতন অর্থারোপ করিয়া থাকেন। এইসব প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরাতন কাহিনী তাঁহার স্বকীয় হইয়া ওঠে এবং এই স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় থাকিয়া যায়। মূল কাহিনীটা অনেক পরিমাণে বাঁশের কঞ্চিখানার মতো, তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে বল্লরী বিতানিত হয়, সেটাই সমালোচকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহাভারত হইতে কালিদাস শকুন্তলার কাহিনী লইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও মহাভারতকারের শকুন্তলা স্বরূপত ভিন্ন। মূল কাহিনীকে পরবর্তী কবি যে কেবল নাট্যরূপ দিয়াছিলেন তাহাই নয়, ওই নাট্যরূপের মধ্যে কবির স্বরূপও রহিয়া গিয়াছে। শকুন্তলা নাটকে প্রেমের যে বিচিত্র পরিণাম গ্রথিত, প্রেমকে যে সন্তানমুখী লক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া সার্থকতা দেওয়া হইয়াছে তাহা একান্তভাবে কালিদাসীয়। ওখানেই কালিদাসের নিজস্ব পরিচয়।

প্রাচীন কবিগণের সহিত অর্বাচীন কালের কবিগণের প্রধান প্রভেদ এইখানেই। বেদব্যাস বা বাল্মীকির চেয়ে কালিদাস যে

প্রতিভায় উচ্চতর স্তরের ছিলেন এমন নয়। রামায়ণ ও মহাভারতে মহাকবিগণের ব্যক্তিত্বের সন্ধান করিলে হতাশ হইতে হইবে, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের কালিদাসের কাব্যে কালিদাসের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়। আবার আরও অর্বাচীন কালের রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাটক কালিদাসের শকুন্তলার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরের রচনা এমন দাবি নিশ্চয় কেহ করিবেন না। কিন্তু চিত্রাঙ্গদায় যে রস আছে, শকুন্তলায় তাহার স্ফুরণ হয় নাই, শকুন্তলার মূল কাহিনীতে তাহার একেবারেই অসম্ভাব। শকুন্তলা ও চিত্রাঙ্গদা ঘটনাবিন্যাসে এক না হইয়াও জীবনতত্ত্ব-বিচারে অভিন্ন নয়। দুই-ই প্রেমের বিকাশের, প্রেমের পরিণামের এবং সন্তানজন্ম দ্বারা প্রেমের সার্থকতার কাব্য। কিন্তু তবু কত প্রভেদ! চিত্রাঙ্গদা মনের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদনাকে অনুভব করিয়াছে শকুন্তলায় তাহা অজ্ঞাতপ্রায় ছিল, মূল কাহিনীতে কি শকুন্তলার, কি চিত্রাঙ্গদার কোথাও তাহা নাই।

প্রাচীন ও অর্বাচীন কাব্যে মূল প্রভেদটা এইখানে, একটিতে কবির পরিচয় আছে, অপরটিতে নাই বা থাকিলেও নিতান্ত প্রচ্ছন্ন। এমন কি, প্রাচীন ও অর্বাচীন গীতি-কবিতা সম্বন্ধেও ইহা সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য নহে। তবে এখানে আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয় কাব্য ও নাটক। হোমারের কাব্যে আর সকলকেই পাই কেবল হোমারকেই পাই না। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তেকে সর্বাগ্রে পাই—বস্তুত তাঁহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই সমগ্রটি দুলিয়া রহিয়াছে। মিল্টন যতই নিরপেক্ষতার ভান করুন 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যে তাঁহার পিউরিটান রুচি ও সৌন্দর্যবিলাসী কবিপ্রকৃতি দুই-ই বিদ্যমান। সত্য কথা এই যে, 'প্যারাডাইস লস্টে'র যে দ্বন্দ্ব তাহা দেবদানবে নয়, মিল্টনের দ্বিধাগ্রস্ত প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার পিউরিটান স্বভাব ও কবিপ্রকৃতির মধ্যে। প্রাচীন কাব্য প্রধানত জগন্ময় (Objective), অর্বাচীন কাব্য প্রধানত মন্ময় (Subjec-

tive)—পৃথিবীর কাব্যপ্রবাহ জগন্ময়তা হইতে মন্ময়তার অভিমুখে চলিয়াছে।

এখন এই মন্ময়তার প্রভাবে এবং ফলে অর্বাচীন কাব্যে অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে, প্রাচীন কাব্যে যাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিলেও হয়, হয়তো বীজাকারে মাত্র ছিল।

প্রাচীন কবিগণ জগৎ ও জীবনের রাজপথগুলির যাত্রী ছিলেন; গলি, উপগলি ও অন্ধিসন্ধির সন্ধান বড় রাখিতেন না। কাব্যের চরিত্রগুলিকেও তাঁহারা মোটা তুলিতে আঁকিতেন, ছায়াতপের দ্বারা সূক্ষ্ম বর্ণবিলাস ফুটাইবার দিকে তাঁহাদের ঝোঁক ছিল না। অর্বাচীন কালের কবিরা সংসারের রাজপথ ছাড়িয়া গলিঘুঁজি বাহিয়া মানবচিত্তের সূক্ষ্ম রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রাচীনদের এ-সব সূক্ষ্ম কাজের দিকে মন ছিল না। খুব সম্ভব তখনকার সমাজও এজন্য প্রস্তুত ছিল না। নূতন জায়গায় আসিয়া পড়িলে প্রথমে রাজপথ ও প্রকাণ্ড দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিতেই সময় যায়। গলিঘুঁজির জ্ঞান বিশেষ পরিচয়ের পরে আসে। প্রাচীন কবিগণ এ-সংসারে নূতন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হোমার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন হাজার বৎসর আগেকার লোক, ব্যাস-বাল্মীকি আরও আগেকার, কত হাজার বৎসর কে জানে। তাঁহারা যে-জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে-জগৎ কবির দৃষ্টিতে নূতন ছিল। জীবনের রাজপথগুলি এখন সুপরিচিত; তাই কবি ও শিল্পীরা ক্রমেই অধিকতর সংকীর্ণ পথে, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত পথে, অচলিত পথে যাত্রা করিয়াছেন।

রাজপথ সরল ও প্রশস্ত; গলিপথ কেবল সংকীর্ণ নয়, সে পথে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে হইলে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়, গলিপথের গতি সূক্ষ্ম ও জটিল। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্— মহাভারতের অন্তর্গত গান্ধারীর আবেদনের মূল কাহিনীতে গান্ধারী দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আবেদন করিতেছেন—সে আবেদন কত প্রত্যক্ষ, কত স্পষ্ট, কত সংক্ষিপ্ত ও সরল!

"এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাংশুল দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ! আপনি পুত্রবৎসলতাবশত তৎকালে বিদুরবাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে আপনার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিকৃত ভাবেই থাকে; অসমীক্ষ্যকারিতা আপনার নিতান্ত দোষাবহ। ক্রূরহস্তে নিপতিতা হইলে রাজলক্ষ্মী ক্ষণধ্বংসিনী হয়; কিন্তু সরলের রাজশ্রী পুরুষপরম্পরাক্রমে পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে।"

এই সরল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর সুদীর্ঘ সূক্ষ্মবেদনাময় বহু অনুভূতির শাখাপ্রশাখা-জালরচিত উক্তির তুলনা করিলেই প্রভেদটা কোথায় বুঝিতে পারা যাইবে।

মূল কাহিনীর ধৃতরাষ্ট্রের উত্তর অনুরূপ স্থূলার্থবোধক। "প্রিয়ে! যদি বংশনাশ হয়, তাহা নিবারণ করিতে পারিব না; কিন্তু পুত্রেরা যে-রূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা না হউক; পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহাদিগকে দ্যূতারম্ভ করিতে হইবে।

এ-ধৃতরাষ্ট্র পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার ব্যক্তি। প্রাচীন যুগের মানুষেরা পাথর ছুঁড়িয়া মারিত। ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি প্রস্তরযুগের যোদ্ধাদের অস্ত্রের মতোই স্থূল, কারুকার্যহীন, গুরুভার এবং প্রত্যক্ষফলদায়ী। এমন মোটাতুলির ছবি একালের পাঠক সহ্য করিবে না। একালের পাঠক অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া সহজরসের নাস্তিকে পরিণত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ ঘুচিতেই চায় না, কাজেই অনেক কলাকৌশল, অনেক ছল-ছলনা অবলম্বন করিয়া কবিকে সন্তর্পণে পথ চলিতে হয়। অর্বাচীন কবিদের কাজ বড় কঠিন।

এ তো কালের ধর্ম। অর্বাচীন কালের কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালের ধর্ম বা বিশেষ স্বভাবের পরিচয় তো থাকিবেই। কিন্তু কেবল ওইটুকু থাকাই যথেষ্ট নয়, কারণ ইহা তো কালের

সামান্য লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিলক্ষণও থাকা আবশ্যক—এবং অবশ্যই আছে।

চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপ অল্পদিন ব্যবধানে রচিত। এ দুইটি কাব্যনাট্যে কবি নরনারীর প্রেমের বিকাশ, পরিণাম ও সম্ভাবিত দ্বন্দ্বের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই এ-দুটির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্জনাদি ব্যাপারে তাঁহাকে যে পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছে—পরবর্তী কালের কাব্যনাট্যে তাহা সম্ভব হয় নাই।

পরবর্তী কালের গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস, সতী ও কর্ণকুন্তীসংবাদে ধর্মাধর্মের বৈচিত্র্য-পরীক্ষাই কবির লক্ষ্য। ধর্মের স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এইসব কাব্যে মূলের পরিবর্তন, পরিবর্জনাদি করিতে হইয়াছে। মালিনী কাব্যনাট্যে এই দুটি সূত্র, প্রেম ও ধর্ম গ্রন্থিযুক্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার ব্যবস্থা আবার বিচিত্রতর, পূর্বোক্ত দুটি হইতেই ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় কল্পনা মানবহৃদয়ের মর্ম-প্রবেশিনী দৃষ্টি, তুরীয় রুচি, সূক্ষ্ম সমবেদনা এবং ঘনপিনদ্ধ ভাষা—এ সমস্তই তাঁহার একান্ত নিজস্ব, "মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।" এখন রবীন্দ্রনাথের কালের ধর্মের সহিত তাঁহার নিজস্ব কবিধর্ম যুক্ত করিলেই তাঁহার কাব্যের, এ-ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্যনাট্যের স্বরূপ জানিতে পারা যাইবে।

বিদায়-অভিশাপ

কচ ও দেবযানীর উপাখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ বিদায়-অভিশাপ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতীয় মূল কাহিনীকেও কিঞ্চিৎ ভিন্নার্থে বিদায়-অভিশাপ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কচের প্রণয়লাভে হতাশ দেবযানী বিদায়কালে তাহাকে শাপ দিয়াছে যে,

যে বিদ্যার তরে,
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার

সম্পূর্ণ হবে না বশ, তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

ক্ষুব্ধ নারীচিত্তের আশাভঙ্গকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া কচ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছে যে—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে,
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমাপ্ত। এইখানেই দেবযানীর বিদায়-ব্যথার রক্তিম দিগন্তে চিরকালের মতো কচ অস্তমিত হইল। কিন্তু মূল কাহিনীর সমাধান পৃথক্‌রূপ। দেবযানী তাহাকে শাপ দিল যে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার অপরাধে তাহার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না। এই শাপের প্রতিবাদে কচ দেবযানীকে অভিশাপ দিয়া বলিল যে—"তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোনো ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবে না।" এইরূপে শাপ-প্রতিশাপে সমাপ্ত মূল কাহিনী দ্বিগুণ অর্থে বিদায়-অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেবযানীর শাপের প্রত্যুত্তরে কচের বরদান।

রবীন্দ্রনাথ কচকে যে মহত্ত্ব দিয়াছেন মূলে তাহা নাই, সেখানে দেবযানী ও কচ দুইজনেই প্রগল্‌ভ। অবস্থা বিচার করিলে দেবযানীকে ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্যালাভান্তে স্বদেশে প্রস্থানোন্মুখ কচের কলহপরায়ণতা আদৌ পুরুষোচিত নয়। এই পৌরুষ রবীন্দ্রনাথের দান। বিশেষ, মূল কাহিনীর কচ দেবযানীর অশেষ উপকারের জন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ, তাহার প্রতি প্রেমপরায়ণ নয়, কাজেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাতে কচের দিক হইতে কোনোরূপ ত্যাগের মহিমা প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রকাব্যের কচ গোপনে দেবযানীর প্রতি প্রণয়াসক্ত, কিন্তু কর্তব্যপাশ এমন করিয়াই তাহাকে বাঁধিয়াছে, প্রণয়িনীর আশা পরিত্যাগ করা ছাড়া

তাহার গত্যন্তর নাই। অথচ মূল কাহিনীতে কচ দেবযানীকে গুরুপুত্রী ও সহোদরা জ্ঞান করিয়াছে, তাহাদের বিবাহের বাধা সামাজিক, নৈতিক নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উভয়ের বিবাহের প্রধান বাধা নৈতিক, কর্তব্যবুদ্ধি কচকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের কোনো বাধা তাহার নাই বলিলেও চলে। বাহ্যবাধানিরপেক্ষ প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে পরিত্যাগ করাতে কচের চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশিত। এ-সব কথা স্মরণে রাখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের কচ মূল কচ হইতে অধিকতর মহিমান্বিত।

দেবযানীচরিত্র অঙ্কনে খুব বেশি কৃতিত্বের দাবি রবীন্দ্রনাথের নাই। মূলের দেবযানী হইতে বিদায়-অভিশাপের দেবযানী অধিকতর ছলাকলাময়ী, মনের বেদনাকে সূক্ষ্মসঙ্কেতময় ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তিও তাহার অধিক, মনোভাবের প্রতিবিম্বরূপে তপোবনপ্রকৃতিকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার ক্ষমতা তাহার নূতন—এ সমস্তই আধুনিক কালোচিত লক্ষণ। কোনো প্রাচীনকালিনীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এ-সমস্ত দেবযানী-চরিত্রের অনুষঙ্গ মাত্র, তাহার চরিত্রের ভিত্তি দুর্জয় নারীপ্রকৃতি, দুর্দাম প্রণয়পিপাসা, সে প্রগল্‌ভা এবং আশাভঙ্গহেতু নিষ্ঠুরা। প্রাচীন কাব্যে অঙ্কিত সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির দলভুক্তা সে নয়। এই কারণেই সে বিশিষ্ট, নিঃসঙ্গপ্রায় বলিয়াই সে একান্তভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্রৌপদী অবস্থান্তরে পড়িলে এরূপ হইতে পারিত। গ্রীক নাটকের মীডিয়া ও ক্লাইটেমনেস্ট্রা তাহার উপমাস্থল। মূলে বর্ণিত দেবযানীর অভিমান ও দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠাকে দাসীত্বে নিয়োগ, সপত্নীরূপে তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য এবং যযাতিকে নিজের পাণিগ্রহণ করিতে অভিনব যুক্তিপ্রয়োগ, এ-সব গুণ 'আদর্শ' নারী-চরিত্রের যোগ্য নয়, এ সমস্তই অর্বাচীন কালোচিত, দেবযানী প্রাচীনতম 'মডার্ণ উওম্যান'। বেচারা যযাতির অপরাধ কি? কূপমধ্যে নিপতিত দেবযানীর হাত ধরিয়া সে উঠিয়াছিল। অমনি

দেবযানী বলিয়া বসিল—তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, এখন গ্রহণ না করিলে চলিবে কেন ?

দেবযানীর প্রাণধর্মের প্রাচুর্য মূলেই আছে। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বর্জন করেন নাই, কেবল কিঞ্চিৎ নরম করিয়াছেন মাত্র। সুকুমার কাব্যকলার স্বর্ণপিঞ্জরে ঢুকিয়া বনের দুরন্ত বিহঙ্গী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ সংযত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিদায়কালীন দায়িত্বহীন অভিশাপবাণীতে প্রাণধর্মের প্রবলতা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

চিত্রাঙ্গদা

মহাভারতের আদিপর্বে 'অর্জুনের চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ' নামে অধ্যায়টি ক্ষুদ্র। ইহা হইতে কেবল এইটুকু জানিতে পারা যায় যে, তীর্থপর্যটন উপলক্ষ্যে অর্জুন মণিপুরে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে বনমধ্যে দেখিতে পাইলেন। পরে তাহার পরিচয় পাইয়া মণিপুররাজের নিকট গিয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। রাজা বলিলেন, তাঁহার পুত্র হইবার কথা ছিল, তৎস্থলে কন্যা জন্মিয়াছে; যদি তাহার গর্ভজাত পুত্র মণিপুর রাজ্যের বংশধর হইবার প্রতিশ্রুতি লাভ করে, তবে অর্জুন বিবাহের অনুমতি পাইতে পারে। রাজা এইরূপ জানাইলে, অর্জুন বাঞ্ছিত অঙ্গীকার করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিলেন।

এই সামান্য কাহিনীটুকুর উপরে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কাব্য স্থাপিত। মূলের ঘটনা একটি কাহিনীর কঙ্কাল, রবীন্দ্রনাথ কঙ্কালে প্রাণদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে রূপান্তর দিয়াছেন। দেবযানীর মতো চিত্রাঙ্গদাও 'মডার্ণ উওম্যান', তবে প্রভেদ এই যে, মূলের দেবযানী বেগশালী ব্যক্তিত্বময়ী, মূল চিত্রাঙ্গদায় ব্যক্তিত্বের চিহ্নমাত্রও নাই। মূলের নামরূপটিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি জটিল, বিচিত্রভাববহুল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

বস্তুত, এই কাব্যখানির পক্ষে মূল কাহিনী প্রায় অবান্তর, কারণ রামজন্মের পূর্বে রামায়ণের মতো কাহিনীটি মনে পড়িবার আগেই কবির মনে কাব্যের ভাবটি উদিত হইয়াছিল। ভাবটিকে ঝুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে যখন তিনি একটি অবলম্বন সন্ধান করিতেছিলেন তখন কাহিনীটি তাহার মনে পড়িয়া গেল। কবি বলিতেছেন—

'এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গে মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।' ১

এইবারে ভাবটি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

'কেন জানি না হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে, সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্ব-রূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্‌কার দিতে পারে। এ-যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।' ২

এই সূচনা-অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের প্রকৃত মূল কোথায়। এই কাব্যের মদন ও বসন্ত চরিত্রদ্বয় আসিল

১ সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, র-র, তৃতীয় খণ্ড।

২ সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, র-র, তৃতীয় খণ্ড।

কোথা হইতে, চিত্রাঙ্গদার বর্ষকালস্থায়ী রূপলাভের বরপ্রাপ্তি ঘটিল কোন্ প্রয়োজনের সূত্রে, আবার সেই দেবদত্ত সৌন্দর্যের ছদ্মবেশ ছিন্ন করিয়া চিত্রাঙ্গদাই বা কোন্ সাহসে মুক্তিলাভ করিল—সমস্তই সংক্ষেপে এই সূচনাটিতে বিবৃত আছে। বস্তুত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের প্রকৃত মূল মহাভারতীয় উপাখ্যানে নয়, কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যে —একথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের কচ ও অর্জুন দুইজনেই কর্তব্যপরায়ণ বীরপুরুষ। অর্জুনের কর্তব্যবুদ্ধি, ক্ষাত্রধর্ম সুখাবেশে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেও মণিপুর-প্রজাগণের প্রয়োজনের মুহূর্তে জাগিয়া উঠিয়াছে।

দেবযানীর মতো রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাও প্রগল্ভা ও দুর্দম ইচ্ছাশক্তিশালিনী নারী। কিন্তু অভীষ্টলাভ হওয়াতে দেবযানীর মতো ইচ্ছাশক্তির চরমে যাইবার আবশ্যক তাহার ঘটে নাই, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে যে দেবযানীর সঙ্গে তাল রাখিয়া সঙ্কল্পের শেষসীমা পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত—তাহার প্রমাণ তাহার চরিত্রেই আছে। শকুন্তলা কাব্যে ও চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে সাদৃশ্য থাকিলেও শকুন্তলা-চরিত্র ও চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র ভিন্ন কালধর্মের সৃষ্টি। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে শকুন্তলা বলিয়াছিল—বৎস, তোমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করো। অনুরূপ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা অনুরূপ উত্তর দিত কিনা সন্দেহ। দেবযানী তো নিশ্চয়ই দিত না। তাহারা অর্বাচীন, তাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগের মানুষ, আর শকুন্তলা সেই প্রাচীন কালের মানুষ, যখন সপত্নীজনের সেবা করিয়া নারীকে পতিগৃহের আদর্শ হইয়া উঠিতে হইত।

গান্ধারীর আবেদন

গান্ধারীর আবেদন সম্বন্ধে বক্তব্য আগেই প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, মূলে ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় আসল প্রভেদটা কোথায়। মূলে যাহা স্থূল, সংক্ষিপ্ত এবং

প্রাচীনকাব্যধর্মী—রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও অর্বাচীন কাব্যধর্ম আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি মূলের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। গান্ধারীর চরিত্র উভয়ত্রই সমরূপ। ধর্মভীরুতা গান্ধারীচরিত্রের স্বরূপ। পুত্রেরা যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে জননীকে প্রণাম করিলে তিনি কখনো বলেন নাই যে তোমার জয় হোক, সর্বদাই বলিতেন ধর্মের জয় হোক। এইরূপ ধর্মনিষ্ঠা জননীর পক্ষেই অধর্মাচারী পুত্রের নির্বাসনপ্রার্থনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের রচনাতে মূলের এই স্বরূপটি সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ

মহাভারত মহাকাব্যে কর্ণের ন্যায় ট্র্যাজিক চরিত্র আর আছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে অধিরথসূতপুত্র নামে খ্যাত। অর্জুনের যশে সে ঈর্ষিত, অথচ রাজকুলে জন্ম নহে বলিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। দুর্যোধনের অনুগ্রহে সে রাজপদ পাইয়াছে, অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার বহুপ্রতীক্ষিত সময় আসন্ন। কিন্তু যে দৈব জন্মমুহূর্তে তাহার অদৃষ্টে ট্র্যাজেডির বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নূতন সুযোগ পাইয়া কুন্তীর মুখে তাহাকে জানাইয়া দিল যে, অর্জুন তাহার ভ্রাতা। নিষ্ঠুর নিয়তি তাহাকে ও অর্জুনকে মুখোমুখি করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইল না—উভয়ের ভ্রাতৃসম্পর্ক জ্ঞাপন করিয়া দিল—এমন না হইলে যে ট্র্যাজেডির চরম হয় না।

মহাভারতকার কর্ণ-চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে স্থূল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ঘটনাবিন্যাসের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপায় অবলম্বন করেন নাই। প্রাচীন কবিদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক শিল্পরীতি। রবীন্দ্রনাথ কেবল ঘটনাবিন্যাসই করেন নাই, তাহার চিত্তের ভাবনাবিন্যাসকেও দেখাইয়া দিয়াছেন। এইরূপে ঘটনা ও ভাবনার

টানাপোড়েনে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ মূলের চেয়ে জটিল, অধিকতর ভাবগ্রাহী—অর্থাৎ আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে।

মূলে দেখিতেছি যে, কর্ণ কৃতঘ্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে ভাবিয়াই কুন্তীর অনুরোধে কৌরবপক্ষ ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। কর্ণ বলিতেছে—

'যাহারা স্বামীর নিকট কৃতকার্য হইয়া তাঁহার কার্যকাল উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে, সেই সকল ভর্তৃপিণ্ডাপহারী পাতকিগণের ইহলোক বা পরলোকে সম্পত্তিলাভ হয় না। অতএব হে আর্যে। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হিতার্থ স্বীয় সাধ্যানুসারে তোমার পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া সৎপুরুষোচিত অনৃশংস কার্যানুষ্ঠান করিব, আপনার বচনানুরূপ কার্য অর্থকর হইলেও তদনুষ্ঠানে কদাপি সম্মত হইব না।'

পরিষ্কার উত্তর, কিন্তু এ-রকম উত্তর কেবল প্রাচীন কাব্যেই সম্ভবপর ছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্নঋণ, প্রভুর প্রতি কর্তব্যের বন্ধন, ক্ষাত্রধর্ম প্রভৃতির উপরেই কর্ণ-চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত যে ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনার আরোপ করিয়াছেন, তাহা একান্তই আধুনিক। আর, ওইটুকু আছে বলিয়াই কর্ণকে কেবল বীর বলিয়া সম্ভ্রম করি না, দুরদৃষ্ট বলিয়াই আপন মনে করি। জন্মমুহূর্ত হইতেই সে দুরদৃষ্টের স্রোতে ভাসমান।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বলিতেছে—

আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়

শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

এ-উক্তি নিতান্তই আধুনিক কালোচিত, ইহা একপ্রকার ‘অহৈতুক বিষাদ’, ইহা হ্যামলেটের বিষাদ বা হ্যামলেটিয়ানা।

মহাভারতের কুন্তী কর্ণকে পরিচয় দিতে আসিয়াছেন কি উদ্দেশ্যে? যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র-নাশের আশঙ্কাতেই তিনি কর্ণকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে আসিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অর্জুনের হাতে কর্ণেরও যে জীবননাশের আশঙ্কা আছে তাহাতে তিনি বড় উদ্বেলিত নহেন। কর্ণ যেমন অভয় প্রদান করিলেন যে, অর্জুন ভিন্ন কুন্তীর অপর চার পুত্রের প্রাণনাশ করিবেন না—অমনি কুন্তী আশ্বস্ত চিত্তে ফিরিয়া চলিলেন। বোধ করি, অর্জুন সম্বন্ধে তাঁহার মনে তেমন উদ্বেগ ছিল না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুন্তী কেবল স্বার্থবোধেই কর্ণকে ফিরাইয়া লইতে আসেন নাই। তাহার প্রতি যে অন্যায় হইয়া গিয়াছে, সেই অন্যায়ের প্রতিকার করাও তাঁহার একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই কানীন পুত্রটির বিচ্ছেদে তাঁহার মাতৃহৃদয়ে দুঃখের অন্ত ছিল না। মূল কুন্তীচরিত্রে সে-ভাব আছে মনে হয় না।

তারপরে মূলের কুন্তী যেমন অবাধে আত্মপরিচয় এবং কর্ণের জন্মরহস্য বলিতে পারিয়াছে তাহা এ-যুগে আর সম্ভবপর নয়। কুন্তী বলিয়াছে—তুমি আমার কানীন পুত্র, আমি কন্যাবস্থায় সর্বাগ্রে কুন্তীরাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি। ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন।

অত্যন্ত প্রাঞ্জল, এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্ব্যর্থ নাই। এ-সব বিষয় এমন করিয়া প্রকাশ কোনো আধুনিকের পক্ষে সম্ভব নয়—প্রাচীনেরা পারিতেন, তখনকার সমাজকে এতপ্রকার সুকুমার সংস্কারে আচ্ছন্ন করে নাই, সবই খোলাখুলি ছিল। এখনকার সমাজে গাত্রাবরণ, বাক্যাবরণ ও মনের আবরণ সবই তখনকার চেয়ে অনেক অধিক।

মহাভারতকার যে-কথাটা এত সহজে এবং এত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিতে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সংযম; করিতে আভাস-ইঙ্গিত প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিষয়টাকে অকথিত রাখিয়া পাঠকের অনুমানের উপরে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এই রুচিবোধের সৌকুমার্যের কতক আধুনিকযুগীয়, কতক রবীন্দ্রনাথীয়। এ-বিষয়ে তিনি কেবল আধুনিক নন, আধুনিক যুগের চরম দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ ও কুন্তী দুই জনেই মূলানুগ থাকিয়াও অর্বাচীন কালের মহাকবির স্পর্শে আধুনিক যুগোচিত সৌকুমার্য, সূক্ষ্মতা ও ভাববিন্যাসের জটিলতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণের হ্যামলেটী মনোবৃত্তি-সুলভ 'অহৈতুক বিষাদ' বিশেষ ভাবে আধুনিক যুগের ধর্ম।

নরকবাস

মহাভারতের বনপর্বে সোমক নৃপতির বৃত্তান্ত আছে। এই বৃত্তান্তে আছে যে, সোমক রাজার জন্তু নামে একমাত্র পুত্র ছিল। একদিন সোমক পুত্রের ক্রন্দন শুনিয়া ঋত্বিকসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, একটি পিঁপড়া তাহাকে কামড়াইয়াছে। তখন সোমক ঋত্বিককে বলিলেন—একমাত্র পুত্র হইবার কি জ্বালা! কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। ঋত্বিক বলিলেন যে, যজ্ঞাগ্নিতে জন্তুর বসার দ্বারা আহুতি প্রদান করিলে শতপুত্রলাভ হইবে। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। যথাশাস্ত্র যজ্ঞাগ্নিতে জন্তুর মেদের আহুতি প্রদত্ত হইলে সোমকের শতপত্নী শতপুত্র লাভ করিলেন। জন্তুও প্রধান মহিষীর গর্ভে পুনরায় জন্মিল।

তারপরে যথাকালে প্রথমে ঋত্বিকের ও পরে সোমকের মৃত্যু হইল। সোমক স্বর্গে গমন করিবার সময়ে নরকে ঋত্বিককে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নরকবাসের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া অবগত হইলেন যে, সেই যজ্ঞ করাইবার পাপে তাহার এই দশা ঘটিয়াছে।

তখন সোমক ধর্মরাজকে বলিলেন—হে ধর্মরাজ! আমার যাজককে এই নরক হইতে বিমুক্ত করুন, আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব; ইনি আমার গুরু, আমারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন। যম কহিলেন—হে রাজন! একজনের কর্মফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। ঐ দেখ, তোমার সমুদয় সৎকর্মের ফল বিদ্যমান রহিয়াছে। সোমক কহিলেন—এ-ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি-ব্যতিরেকে আমি পবিত্রলোক ভোগ করিতে বাসনা করি না; স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইঁহার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি। ইঁহার ও আমার কর্মসকল সমান, অতএব আমাদের দুইজনের পুণ্যাপুণ্যফল সমান হউক। যম কহিলেন—যদি তোমার এইরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত সমকাল নরক ভোগ কর, পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদগতি লাভ করিবে।

ইহাই মূল কাহিনী। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্তভাবে মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন। সোমকের স্বর্গবাস-ইচ্ছা পরিত্যাগ ও স্বেচ্ছায় নরকবাস-ব্রত গ্রহণ মূলানুগ। নূতনের মধ্যে নরকচারী প্রেতগণের সৃষ্টি।

মূলগল্প কাহিনী আকারে কথিত। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে নাট্যরূপ ও নাটকীয়তা দান করিয়াছেন। সোমকের মৃত্যুর পরে স্বর্গগমন-কালে নরকের প্রেতগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—এখানেই নাটকের ঘটনার স্থান। রবীন্দ্রনাথের নরকের বর্ণনাটি নূতন এবং মনস্তত্ত্বসঙ্গত, প্রেতগণ বলিতেছে,

স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হ'তে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রীগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জরিত

আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি, সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান, কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

একদিকে স্বর্গ, আর একদিকে মর্ত্য, মাঝখানে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে যাতায়াতের পথের পার্শ্বে বিষাদলোক নরকপুরী, ঈর্ষাই এখানকার ধর্ম।

এই নরকলোকে সোমক ও ঋত্বিক প্রেতগণের কৌতূহল মিটাইবার আশায় তাহাদের মর্ত্যলীলা এবং ঋত্বিকের নরকে আসিবার কারণ বিবৃত করিয়াছে। তাহাদের প্রদত্ত বিবরণে নাটকীয় লক্ষণ অবিরল। মূল কাহিনীর কাঠামো রবীন্দ্রনাথের রচনায় অবিকৃত আছে সত্য, সোমকের স্বেচ্ছায় স্বর্গলাভ-ত্যাগের সঙ্কল্পও মৌলিক—তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বও অল্প নহে। সে কৃতিত্ব কল্পনার ঐশ্বর্যে ও ভাষার গাঢ়বন্ধ সংহতিতে।

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া

কালমৃগয়া ও বাল্মীকি-প্রতিভার মূল কাহিনী রামায়ণের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ মূল হইতেই তাঁহার নাটক দু'খানির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ এতই শিথিলভাবে যুক্ত, অবান্তর বিষয় এত প্রবেশলাভ করিয়াছে যে, এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, নাটক দুটি কিংবদন্তীর উপরে নির্ভর করিয়া লিখিত বলিলেও চলে।

মালিনী

রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকের মূল কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'দি স্যানসক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' গ্রন্থের 'মহাবস্তবদান' অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই কাহিনীর পূর্বোল্লিখিত

কাহিনীগুলির মতো সুপরিজ্ঞাত নহে বলিয়া সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

এক প্রত্যেক-বুদ্ধ বারাণসীতে ভিক্ষার্থ গিয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষা না পাইয়া যখন সে ফিরিয়া আসিতেছে তখন একটি বালিকা তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া আসিয়া সেবার দ্বারা খুশী করিল। প্রত্যেক-বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহার সমাধির উপরে একটি স্তূপ রচনা করিয়া দিয়া বালিকাটি মাল্য ও সুগন্ধের দ্বারা তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিত। বালিকাটি প্রার্থনা করিত, প্রত্যেক পরবর্তী জন্মে সে যেন পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার প্রার্থনা সফল হইল। পরবর্তী জন্মে সে বারাণসীর রাজা কৃকির কন্যারূপে মাল্যচিহ্ন ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল মালিনী। মালিনী কাশ্যপ ও তাহার শিষ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ্য দ্বারা তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিল। রাজসভাতে ব্রাহ্মণগণের অসীম ক্ষমতা। তাহারা মালিনীর আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে তাহার প্রতি নির্বাসনদণ্ড-দানের আদেশ দিতে বাধ্য করিল। মালিনী এক সপ্তাহের অবকাশ চাহিয়া লইল। এই সময়ের মধ্যে তাহার পাঁচশত ভ্রাতা, রাজ-অমাত্যগণ, সেনাপতিগণ ও নাগরিকগণ সকলেই আর্যধর্মে দীক্ষা লইল। তাহারা মালিনীকে নিজেদের আধ্যাত্মিক ত্রাতারূপে স্বীকার করিল। তাহারা রুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিল—ভীত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া রাজার আশ্রয় লইল। তাহাদের অনুরোধে মালিনীর নির্বাসনাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল বটে, কিন্তু তাহারা সকল দুর্গতির মূলস্বরূপ কাশ্যপকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দশজন সৈন্যকে পাঠাইয়া দিল। ইহারা কাশ্যপ কর্তৃক দীক্ষিত হইল। পরে আরও অধিকসংখ্যক লোক কাশ্যপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে তাহারাও আর্যধর্মে দীক্ষিত হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা বুঝিল আর লোক পাঠান বৃথা—কারণ তাহারা বিপক্ষের দলবৃদ্ধিমাত্র করিতেছে। তাহারা নিজেরাই উদ্দেশ্য-

সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহারা কাশ্যপের আশ্রমের দিকে যাত্রা করিল। কাশ্যপ পৃথ্বী দেবীকে আবাহন করিয়া ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল। পৃথ্বী একটি তাল গাছ উন্মুলিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের দিকে নিক্ষেপ করিল—তাহার ফলে সকলে পিষ্ট হইয়া প্রাণে মরিল।

ইহাই মালিনী নাটকের মূল কাহিনী। এই কাহিনী পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকের সহিত ইহার সংযোগ নিতান্তই আংশিক। মালিনী কাশীরাজের কন্যা। সে নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। কাশ্যপ তাহার গুরু। রাজকন্যার নবধর্মগ্রহণে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকটে আবেদন করিয়া তাহার নির্বাসনদণ্ডের আদেশ আদায় করিয়া লইয়াছে এবং এই আদেশের ফলে রাজ্যের একদল মালিনীর প্রতি সমবেদনাশীল হইয়া উঠিয়াছে। মূল কাহিনীর সহিত নাটকের এইটুকু মাত্র মিল। বাকি অংশে যাহার ফলে ঘটনা নাটক হইয়া উঠিয়াছে—সমস্তই কবি কর্তৃক উদ্ভাবিত।

সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্কর চরিত্র কবির মৌলিক পরিকল্পনা। ইহারাই তো বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণের নেতা। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যার আনুগত্য স্বীকার করিলে অসহায় ক্ষেমঙ্কর পররাজ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহের আশায় প্রস্থান করিল—রাখিয়া গেল সুপ্রিয়কে। ইহার পরে যাহা ঘটিল পাঠকগণ জানেন। মালিনীকে বাদ দিলে সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করই নাটকের প্রধান দুইটি চরিত্র—আর নাটকের প্রথম অংশের ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহের ঘটনাকে ছাড়িয়া দিলে নাটকের উপসংহারে ক্ষেমঙ্কর কর্তৃক সুপ্রিয়কে হত্যা নাটকের প্রধান ও চূড়ান্ত ঘটনা।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

'এমন সময়ে স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে

এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হ'ল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।...অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেকদিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হ'ল।' ১

কবির উল্লিখিত স্বপ্নাপ্ত ঘটনা হইতে শেষতম দৃশ্যটিকে পাইলাম —মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক বন্ধু কর্তৃক অপর বন্ধুকে হত্যা। এখন এই দুই বন্ধুর নামকরণ করিয়া—স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুসারে ঘটনাস্রোতের উজানে গেলেই সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করের কাহিনীকে পাওয়া যাইবে। মূল কাহিনীর সহিত স্বপ্নলব্ধ ঘটনার যোগ করিলেই নাটকটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল বাকি থাকে নাটকের অন্তর্লোকের সংবেদন। সে-সংবেদন মালিনী নাটক গ্রথিত হইবার অনেক আগে হইতেই বাষ্পরূপে কবির মনে একটা আশ্রয় খুঁজিতেছিল। মালিনীর মূল কাহিনী কবির দৃষ্টিতে পড়িবামাত্র এই ভাব রূপপরিগ্রহ করিল। অনেক শিল্পী রূপ হইতে ভাবে যান, আবার অনেকে ভাব হইতে রূপে গিয়া পৌঁছেন। এই রকমে শিল্পলোকে 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা' চলিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ভাব হইতে যাত্রা করিয়া রূপে গিয়া উপনীত হইয়া থাকেন। যে-ভাব হইতে মালিনী নাটকের রূপে গিয়া কবি পৌঁছিয়াছেন তাহার স্বরূপ-ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকারতত্ত্ব নয় সে,

১ র-র, ৪র্থ খণ্ড, মালিনী, সূচনা।

মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাব, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।… এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস।'[১]

কাজেই দেখা যাইতেছে, মূল কাহিনী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী এবং এই ভাব-সংবেদন—এই তিনটিকে একত্র গ্রথিত করিলে মালিনী নাটকের সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, মূল কাহিনীর অতি-প্রাকৃত অংশ, স্থূলত্ব এবং কাশ্যপ কর্তৃক শত্রুগণের হত্যার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বর্জিত হইয়া নাটকখানি স্ফটিকশিলার নির্মলতা ও দীপ্তি লাভ করিয়াছে।

নৃত্যনাট্য শ্যামা

নৃত্যনাট্য শ্যামার কবিপ্রদত্ত পূর্বতন রূপ 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত 'পরিশোধ' কবিতা। দুইটিরই মূল কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের মহাবস্তুবদান অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

তক্ষশিলাবাসী বজ্রসেন নামে এক বণিক বারাণসীর এক মেলাতে অশ্ব-বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। পথে তাহার সর্বস্ব খোওয়া যায় ও সে নিজে আহত হয়। যখন সে ভাঙা এক মন্দিরে ঘুমাইতেছিল নগরপাল কর্তৃক সে চোর বলিয়া ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার মতো হয়। এমন সময়ে নগরের বারাঙ্গনা-প্রধানা শ্যামার চোখে সে পড়ে। বজ্রসেনের পুরুষোচিত সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট হয়। শ্যামা তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল।

১ র-র, ৪র্থ খণ্ড, মালিনী, সূচনা।

বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্যামার রূপে মুগ্ধ ছিল। শ্যামার ইচ্ছায় ও তাহার পরিচারিকার কৌশলে উক্ত শ্রেষ্ঠীপুত্র নিজের অজ্ঞাতসারে বজ্রসেনের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলে বজ্রসেন মুক্তি পায়।

শ্যামা বজ্রসেনকে ভালোবাসিত, বজ্রসেনও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু উক্ত শ্রেষ্ঠীপুত্রের মৃত্যুর কারণ জানিতে পারায় তাহার মনে শান্তি ছিল না, সে শ্যামাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। একদিন উভয়ে যখন ভ্রমণে বাহির হইয়াছে তখন সে শ্যামাকে মদ্যপানে অচেতন করিয়া গলা টিপিয়া জলে ডুবাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসে। তাহার ধারণা হইয়াছিল শ্যামা মরিয়াছে। উক্ত স্থানের নিকটেই শ্যামার মা উপস্থিত ছিল। তাহার চেষ্টায় শ্যামা প্রাণে বাঁচিয়া উঠিল। বাঁচিয়া উঠিয়া তক্ষশিলানিবাসিনী এক ভিক্ষুণীর সাহায্যে বজ্রসেনকে সে প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইল।

ইহাই মূল কাহিনী। পরিশোধ কবিতায় ও নৃত্যনাট্যে মূল ঘটনার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত না হইলেও নরনারীর ভাবনায় বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রথমত শ্রেষ্ঠীপুত্র উত্তীয় জানিয়া শুনিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। নিষ্ফল প্রেমের পরিণামস্বরূপ সফল মৃত্যুকে সে আনন্দে গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বজ্রসেনের দ্বিধা নূতনভাবে কবি কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছে। শ্যামাকে সে ভালোবাসে —কিন্তু সেই ভালোবাসার অন্তরায় উত্তীয়ের মৃত্যু। শ্যামাকে আঘাত ও বর্জনের পরে সে যে অনুশোচনা অনুভব করিয়াছে তাহাতে তাহার চরিত্র একরূপ ট্র্যাজিক মহত্ত্ব পাইয়াছে। প্রণয়পীড়িত শ্যামা যখন তাহাকে শেষবারের জন্য প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল— তখন নিজের ক্ষমাহীনতায় ধিক্কৃত হইয়া বজ্রসেন গাহিয়াছে—

প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে-অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজন-শরণ প্রভু॥

প্রেম ও পাপ, বিচার ও ক্ষমার মধ্যে দোদুল্যমান বজ্রসেনের চরিত্র অশ্বত্থপত্রশীর্ষে কম্পমান শিশিরবিন্দুর মতো অসহায় এবং করুণার পাত্র। ইহা সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, মূলে ইহার কিছুই নাই।

শ্যামার ধর্মাধর্মবিবর্জিত প্রেমের সর্বস্বভাবও রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত। যাহার জন্য শ্যামা নীতিধর্ম এমন অনায়াসে লঙ্ঘন করিল তাহাকে হারাইতে বাধ্য হইয়া শ্যামার পাপের প্রতি নয়, শ্যামার মুগ্ধ নারীহৃদয়ের প্রতি সুকৌশলে কবি পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আগেই বলিয়াছি যে, ঘটনার পরিবর্তনে নয়, পাত্রপাত্রীর ভাবনার পরিবর্তনেই মূলের সহিত কবিকৃত কবিতাটি ও নৃত্যনাট্যের প্রধান পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক নাটককে পরবর্তী কালে রূপান্তর ও নামান্তর দিয়াছেন, তাহা ছাড়া নূতন সংস্করণের সময়েও অনেক নাটককে প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত করিয়াছেন। কোন কোন নাটকের রূপান্তর এত অধিক হইয়াছে যে, দু'খানিকে স্বতন্ত্র নাটক বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, যেমন রাজা ও রাণী এবং তপতী। কিন্তু এরূপ আমূল পরিবর্তনের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও রূপান্তর ও নামান্তরভেদে অনেকগুলি নাটকের দুটি করিয়া রূপ প্রচলিত আছে। বর্তমানে আমরা তত্ত্বনাট্য পর্যায়ের রূপান্তর ও নামান্তরেরই আলোচনা করিব। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই সব

রূপান্তর ও নামান্তরের উদ্দেশ্য কি এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কি পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে নাটক সবচেয়ে বেশি বাস্তব-ঘেঁষা। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারাইলে তাহার এক মুহূর্তও চলে না। নাটক শ্রব্য কাব্য। দর্শক ও অভিনেতা, প্রযোজক ও লেখক—এতগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিলে তবে নাটকের রসোদ্বোধন ঘটে। নাট্যকারকে এই সব বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিতে হয়। তারপরে যে উপলক্ষ্যে অভিনয় তাহার দাবীও আছে। সময়ের পরিবর্তনে রচনার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তাছাড়া যোগ্যতর অভিনেতা দেখা দিলে তাহার শক্তির দাবীও মানিয়া লইতে হয়। এদিক দিয়া বিচার করিলে নাটককে যৌথ শিল্প বলা উচিত, যূথের যথাযথ সমাবেশেই নাটকের রসোৎকর্ষ।

এবারে বুঝিতে পারা যাইবে যে নাটক লিখিয়া সমাপ্ত করিবার পরেও লেখক কেন তাহার পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। এমন পরিবর্তন সব সময়ের সব দেশের নাটকেই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্র-নাট্যের বহুল রূপান্তর ও নামান্তরের ইহা একটি প্রধান কারণ। কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

নাটকীয় প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শক্তি নহে। তাঁহার প্রতিভার অক্ষয় তূণীরে বহু অস্ত্র আছে, নাটকীয় প্রতিভা তাহাদের অন্যতম, কিন্তু যে অস্ত্র মুখ্যস্থানীয় নয়। বহু নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন, সংখ্যার বিচারে তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে কাব্যের পরেই নাটকের স্থান, এসবই সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাট্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশ নয়। যে রচনায় প্রতিভার মুখ্য প্রকাশ, তাহাই নিখুঁত হইবার সম্ভাবনা; আর যে রচনায় প্রতিভার গৌণ শক্তির প্রকাশ, তাহাতে খুঁত থাকিয়া যাইবার আশঙ্কা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। আর সেই অসম্পূর্ণতার বোধই কবি-গুরুর মনে

এক প্রকার অস্বস্তি জাগাইয়া রাখিয়াছে। আর এই অস্বস্তিবোধের ফলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি নাটকগুলিকে ঢালিয়া সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মনে করিলে অন্যায় হইবে না। আমাদের এই সিদ্ধান্তের একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। এক শ্রেণীর নাটককে আমরা কাব্যনাট্য বলিয়াছি, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর রচনায় নাটকের চেয়ে কাব্যের দাবী বেশি; ইহাদের অঙ্গে নাটকের লক্ষণের চেয়ে কাব্যের লক্ষণ অধিকতর প্রকট। আর যেহেতু রবীন্দ্র-প্রতিভার মুখ্য বিকাশ কাব্যে, গৌণ বিকাশ নাটকে, অধিকতর কাব্যলক্ষণাক্রান্ত এই সব নাটক সম্পূর্ণতর আকার লাভ করিয়াছে, ইহাদের অঙ্গে খুঁত নাই বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে অধিকাংশ নাটকের উপরে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যনাট্যগুলিকে আর স্পর্শ করেন নাই। অসম্পূর্ণতাজাত যে অস্বস্তিবোধ অন্য নাটকগুলি সম্বন্ধে ছিল, কাব্য-নাট্যগুলি সম্বন্ধে তাহা অনুভব করিবার কারণ তাঁহার মনে ছিল না।

অসম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের শিল্পীর মনে যে অস্বস্তি অনুভূত হইয়া থাকে—তাহাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার অধিকাংশ নাট্যরচনার উপরে বারংবার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এ বিষয়ে তুলনাস্থানীয় রবীন্দ্রনাথের দোসর গ্যয়টে। নাটকীয় প্রতিভা গ্যয়টের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, অথচ বহুতর নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতোই একই কারণে তিনি বারংবার তাহাদের সংস্কারসাধন করিয়াছেন। এই সব সংস্কারের ফলে রূপান্তর ও নামান্তরগুলি সম্পূর্ণতর আকার লাভ করিয়াছে কিনা, সেটা বিচারের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করে নাই, রূপান্তর ও নামান্তরগুলি মৌলিক রচনার চেয়ে মোটের উপরে উন্নততর, সম্পূর্ণতর রচনা নয়। কিন্তু এই সব অসম্পূর্ণতার মধ্যেও কবির

মনের ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেই পরিচয় দানই আলোচনার উদ্দেশ্য।

শারদোৎসব নাটকের নামান্তর ঋণশোধ। ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য ঋণশোধের ভূমিকা ও শেখর চরিত্রের সন্নিবেশ।[১] ইহা ১৯২১ সালের কথা।

১৯২২ সালে কলিকাতায় ঋণশোধের অভিনয়ের সময়ে পূর্বোক্ত ভূমিকা পরিত্যক্ত এবং একটি নূতন ভূমিকা সংযোজিত হয়।[২]

এ-দুটি পরিবর্তন ছাড়া আরও পরিবর্তনের চিহ্ন ঋণশোধে বর্তমান।

১৯২১ সালে ঋণশোধ নাটক অভিনয় উপলক্ষ্যে কতকটা অংশ সংযোজিত হয়।[৩]

১৯২১ সালের ভূমিকায় শারদোৎসবের সন্ন্যাসীকে সম্রাট বিজয়াদিত্যরূপে দেখানো হইয়াছে। তিনি শারদোৎসবে বাহির হইয়া পিঞ্জরীর বীণকার সুরসেনের বীণা শুনিতে যাইবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯২২ সালের ভূমিকায় নায়ক রাজা, মন্ত্রী, তাঁহাদের কোন বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই। উভয়ের কথোপকথনে শারদোৎসবের অন্তর্নিহিত মর্ম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কোন ঘটনার উল্লেখ নাই।

ঋণশোধ নাটককে শারদোৎসবের উচ্চতর সংস্করণ বলিয়া মনে হয় না। ভূমিকাগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নাটকের মর্মব্যাখ্যা। 'শারদোৎসব' নামে যাহা সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছিল, 'ঋণশোধ'

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৮—৪১

২ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭—৫১

৩ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৮—৪১। ঐ পরিবর্তন মুদ্রিত ঋণশোধ নাটকে নাই। অভিনয়ের স্টেজকপিতে বর্তমান। ঐ স্টেজকপি নাটকের প্রতিকার বর্তমান লেখকের নিকটে রক্ষিত।

নামে তাহা স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রূপান্তর ও নামান্তরগুলির একটি প্রধান উদ্দেশ্য কবির আত্মব্যাখ্যার ইচ্ছা। ব্যাখ্যার আতিশয্যের দ্বারা শিল্পবস্তু কদাচিৎ উন্নততর রূপ লাভ করিয়া থাকে। এসব ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মনে হয় না।

অরূপরতন

'রাজা' নাটকের নামান্তর অরূপরতন। কিন্তু 'রাজা' নাটকের রূপান্তরও বর্তমান। 'রাজা' নাটকের প্রথম সংস্করণ ও রচনাবলী-সংস্করণে কিছু ভেদ আছে। প্রথম সংস্করণের চেয়ে রচনাবলী-সংস্করণ আকারে কিছু বড়। রচনাবলী সংস্করণের প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার কক্ষ, সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা কথোপকথনে নিযুক্ত। প্রথম সংস্করণের প্রথম দৃশ্যে পাই পথ এবং বিদেশী নাগরিকগণকে। অন্ধকার কক্ষকে দ্বিতীয় দৃশ্যরূপে দেখানো হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম সংস্করণকে উন্নততর বলা চলে। বিদেশী নাগরিকগণের আলোচনায় যে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, নাটকের গতির পক্ষে তাহা বিশেষ সাহায্য করে, সেই গতির বেগে অন্ধকার কক্ষের রহস্য গভীরতর হইয়া ওঠে। ইহা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দুই সংস্করণে নাই, রসেরও তারতম্য ঘটিয়াছে মনে হয় না।[১]

অরূপরতনের দুইটি সংস্করণ বর্তমান, একটি ১৩২৬ সালের, অপরটি ১৩৪২ সালের, দুটিই মূল নাটকের চেয়ে আকারে অনেক ছোট।

১৩২৬ সালের সংস্করণে অদৃশ্য রাজার উত্তর-প্রত্যুত্তর বর্জিত হইয়াছে। ১৩৪২ সালের সংস্করণে পুনরায় অদৃশ্য রাজার কথোপকথন প্রবিষ্ট হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে ১৩২৬ সালের সংস্করণকে উচ্চতর শিল্পসৃষ্টি মনে করা উচিত। কেননা,

---

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪৮—৪৯

রাজা যদি দৃষ্টিগোচর না হন, তবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হওয়াও উচিত নয়। চক্ষু যেমন ইন্দ্রিয়, কর্ণও তেমনি আর একটি ইন্দ্রিয়। যিনি অতীন্দ্রিয় তিনি সব ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই সমান অগোচর। ১৩২৬ সালের সংস্করণে রাজাকে ইন্দ্রিয়গোচর না করিয়াও তাঁহার প্রভাবকে সর্বব্যাপী করিয়া তোলা হইয়াছে। সেই প্রভাবের ফলেই নাট্য-ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া দেখানো হইয়াছে। এই বিষয়ে উক্ত সংস্করণ 'রাজা' ও 'অরূপরতনে'র সমস্ত রূপান্তর ও নামান্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শুধু ঐটুকু দিয়া নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই সংস্করণে মূল পাত্র-পাত্রীকে গৌণ স্থান দিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর জনতার কৌতুককর দৃশ্যগুলিকে মুখ্য করিয়া তোলা হইয়াছে এবং তার ফলে নাটকখানি লঘু হইয়া পড়িয়া রসহানি ঘটিয়াছে।

১৩৪২ সালের সংস্করণে অদৃশ্য রাজার কথোপকথন পুনরায় শ্রুত হইয়াছে। অন্য বিষয়ে ইহা প্রায় ১৩২৬ সালের সংস্করণের অনুরূপ।

সমগ্র রূপের বিচার করিলে বর্তমান লেখকের মতে রচনাবলী সংস্করণই শ্রেষ্ঠ, যদিচ অদৃশ্য রাজার কথাবার্তা একটি খুঁত বলিয়াই মনে হয়। ওটাকে একটা 'কনভেনশন' বা সংস্কাররূপে ধরিয়া লইতে আপত্তি আছে, যেহেতু ১৩২৬ সালের সংস্করণ প্রমাণ করিয়াছে যে, রাজাকে সর্বতোভাবে বাদ দিয়াও তাঁহার প্রভাবকে নাটকের মধ্যে সক্রিয় করিয়া তোলা সম্ভব।

গুরু

"সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি 'গুরু' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশিত করা হইল।"

মূল নাটকের চেয়ে 'গুরু' আকৃতিতে ছোট এবং প্রকৃতিতে লঘুতর হইয়াছে। মূল নাটকে পাত্রগণের মধ্যে যে সব তত্ত্বালাপ

ছিল, নামান্তরে তাহাদের অনেক অংশ বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু যে নাটকের প্রাণই হইতেছে তত্ত্ব, তত্ত্ব বাদ পড়িলে তাহা সব সময়ে সহজ-গ্রাহ্য হয় না, সহজে অভিনয় যোগ্য হইতে পারে। এই কারণেই নামান্তর মূল নাটকের চেয়ে দীনতার হইয়া পড়িয়াছে।

মূল নাটকের 'শোণপাংশু' নামান্তরে 'যূণক'। এ-পরিবর্তন অনুমোদনযোগ্য। কারণ 'শোণপাংশু'র প্রকৃত অর্থ না জানিয়াও অনুমান করা চলে যে, শোণিত যাহাদের পাণ্ডু বা ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শোণপাংশুদের প্রকৃতির দ্বারা এ অর্থ সমর্থিত হয় না। 'যূণক' বলিতে যৌবনেরভাব এবং যবন বা বিদেশীর ভাব সূচিত হয়। যূণকের মধ্যে দুটি ভাবই আছে, তারা বিদেশীও বটে আবার যৌবনের দীক্ষাপ্রাপ্তও বটে!

এই নামের পরিবর্তন বাদ দিলে অপর কোন বিষয়ে গুরু নাটকে কোন নূতন বা উন্নততর গুণের সমাবেশ হইয়াছে মনে হয় না।[১]

রথযাত্রা

রথের রশির পূর্বতন রূপ রথযাত্রা ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রথের রশি তাহারই পরিবর্তিত ও পুনর্লিখিত রূপ।[২]

রথযাত্রা ও রথের রশির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দুটি। প্রথম নামটি, দ্বিতীয় রথযাত্রা লিখিত গদ্যে, আর রথের রশি লিখিত গদ্যছন্দে।

রথযাত্রায় কবির দৃষ্টি রথখানার উপরে, আর রথের রশিতে তাঁহার দৃষ্টি যে-টানের জোরে রথখানা চলে, তাহার উপরে। দুইয়ে

---

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৫৩৭

২ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ২২শ খণ্ড পৃঃ ৫০৯-৫১০

অনেক প্রভেদ। এবিষয়ে রথের রশি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

শিবের ভিক্ষা

কবির দীক্ষার পূর্বপাঠ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় শিবের ভিক্ষা নামে প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১]

এখানেও পরিবর্তন নামের। নামের পরিবর্তন ভাবের পরিবর্তন সূচনা করে। পূর্বতন পাঠে শিবকে বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, পরবর্তী আকারে শিবভক্ত কবিই প্রধান। 'কালিদাসের মত আমাদের কবিও শৈব।'

আর একটি পরিবর্তন গদ্য হইতে গদ্যছন্দে, পূর্বতন পাঠ গদ্যে লিখিত, পরবর্তী পাঠ লিখিত গদ্যছন্দে।

তাসের দেশ

তাসের দেশ নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়া বাহির হয় ১৩৪৫ সালে। রচনাবলীতে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

"প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে 'প্রথম দৃশ্যে' পরিণত হইয়াছে। পত্রলেখা চরিত্র নূতন সংযোজিত হইয়াছে।"[২]

সংস্করণভেদে তাসের দেশে রসের ও ভাবের তারতম্য ঘটে নাই।

রূপান্তর ও নামান্তরের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে কোথাও কোথাও সামান্য পাঠান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু সে-সব তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

---

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ৫০৯-৫১০

২ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩-৫৪৪

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নাটকগুলির রূপান্তর ও নামান্তরের নানা কারণ বিদ্যমান, তন্মধ্যে বাস্তবের দাবী একটি হইলেও তাহা মুখ্য কারণ নয়। আসল কারণ অসম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত করিবার প্রয়াস। কিন্তু ইহাতে কবি সিদ্ধকাম হইয়াছেন মনে হয় না, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপান্তর ও নামান্তর মূল রচনার চেয়ে দীনতর মূর্তিতে দেখা দিয়াছে।[১] সেই সঙ্গে আছে অতি ব্যাখ্যা ও আত্মব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা হইতেই অনেক স্থলে একই নাটকে একাধিক ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। নাটকের রূপান্তর ও নামান্তরে নূতন নামকরণ করিবার সময়ে কবি দুইটি নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন মনে হয়।

পূর্বনাম নির্বিশেষ হইলে নূতন নামে তাহাকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প। তাই শারদোৎসব হইয়াছে ঋণশোধ; রাজা হইয়াছে অরূপরতন; শিবের ভিক্ষা হইয়াছে কবির দীক্ষা; রথযাত্রা হইয়াছে রথের রশি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্বনাম নির্বিশেষে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নামান্তর তুলনায় বিশিষ্ট। শারদোৎসব বলিতে উৎসবের বিশেষ প্রকৃতিকে বুঝায় না, ঋণশোধ-নামকরণের দ্বারা উৎসবের বিশেষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজা নিতান্ত সাধারণ সংজ্ঞা, তুলনায় অরূপরতন বিশিষ্ট, রাজার প্রকৃতি ইহাতে নির্দিষ্ট।

আর একটি নিয়ম হইতেছে, পূর্বনামে যাহা ঋণাত্মক (Negative), নূতন নামে তাহাকে ধনাত্মক (Positive) করিয়া তোলা হইয়াছে।

---

১ রাজা ও রাণীর নামান্তররূপে তপতীকে গ্রহণ করিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। নাটকরূপে না হইলেও শিল্পবস্তুরূপে তপতী রাজা ও রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু তপতীকে নামান্তর না বলিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নাটক বলিয়াই ধরা উচিত। অবশ্য তপতী তত্ত্বনাট্যশ্রেণীর অন্তর্গত নয়, যথাস্থানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

তাই অচলায়তন হইয়াছে গুরু; যক্ষপুরী হইয়াছে রক্তকরবী। অচলায়তন ও যক্ষপুরী দুটা নামই ঋণাত্মক, নাম দুটিতে স্থান দুটির অন্ধকার অবস্থার সূচনা করিতেছে; তুলনায় গুরু ও রক্তকরবী ধনাত্মক, নূতন নামে স্থান দুটির আশা ও মুক্তির সূচনা।

নাটকগুলির রূপান্তর ও নামান্তর হইতে কবিমনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল, আবার নূতন নামগুলি হইতেও কবিমনের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া গেল।

রাজা নাটকের মূল কাহিনীর অনুবাদ প্রদত্ত হইল।[১]

বারাণসীরাজ সুবন্ধুর প্রধানা মহিষী আয়ুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শূরসেনের অন্তর্গত কান্যকুব্জ রাজার কন্যা সুদর্শনাকে বিবাহ করিল। সুদর্শনা পতিকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখিয়া পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। কুশ কান্যকুব্জে গিয়া বিবিধ কলায় তাহার কৃতিত্ব দেখাইয়া সুদর্শনার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্বশুরের পরামর্শে কুশ যতীশ্বর নামে একটি রত্ন নিজ মস্তকে ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ অপরূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্যে বিভূষিত হইলে, তখন পত্নী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল।[২]

এই স্বল্পাক্ষর, শিল্পসৌন্দর্যহীন ও সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতবর্জিত কাহিনীটির মধ্যে রাজা নাটকের বীজের সন্ধানলাভ পাঠকের পক্ষে সহজ নয়: স্পষ্টভাবে না বলিয়া দিলে নিতান্তই কঠিন। কাজেই নাট্যকারের পক্ষে এই বীজ হইতে উক্ত মহীরুহ সৃষ্টি করা যে কত শক্ত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আবার এক হিসাবে এই কঠিন কাজটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন

১ কুশ জাতক, No B 32. The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, Rajendralal Mitra.

২ এই কাহিনীটিকে ভিত্তি করিয়া আরও পরবর্তী কালে শাপমোচন নামে নৃত্যনাট্য লিখিত হইয়াছে।

কঠিন হয় নাই; কারণ রাজা নাটকের মূল ভাবটি অনেকদিন হইতেই বাষ্পাকারে তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিতেছিল, এখন একটি কাহিনীর আশ্রয় পাইয়া দানা বাঁধিয়া সুসংহত, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে আত্মপ্রকাশ করিল মাত্র।[১]

মূল কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে দুই দিক হইতে কাজ করিতে হইয়াছে, একদিকে কাহিনীটিকে যেমন শিল্পসৌন্দর্যে ভূষিত করিতে হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি আবার ইহাতে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত সঞ্চার করিয়া দিতে হইয়াছে। বরঞ্চ শাপমোচন নৃত্যনাট্যের সঙ্গে কাহিনীটির যোগ ঘনিষ্ঠতর। শ্বশুরালয়ে গিয়া পত্নীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কুশের কলাবিলাসকে নৃত্যনাট্যে ফলাও করিয়া দেখানো হইয়াছে; যতীশ্বর রত্নাধারণের মতো স্থূল বিষয় অবশ্যই দেখানো হয় নাই, যে-জ্যোতিতে বিগতরূপ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তালভঙ্গরূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণতার জ্যোতি।

কিন্তু রাজা নাটকে ঘটনাস্রোত অন্যপথগামী।

---

১ ১৯০৬ সালে প্রকাশিত খেয়া কাব্যে শুভক্ষণ, ত্যাগ, আগমন, দুঃখমূর্তি, মুক্তিপাশ, প্রভাতে, দান, বালিকাবধূ প্রভৃতি একগুচ্ছ কবিতা আছে। রাজা নাটকের 'রাজা' ও সুদর্শনার মধ্যে যে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে এই কবিতাগুলির তাহাও একটা বৈশিষ্ট্য। আর তিনি কেবল পতিমাত্র নন, জগৎপতি বা রাজাও বটেন। আগমন কবিতাটিতে রাজাকে "আঁধার ঘরের রাজা" বলা হইয়াছে। রাজা নাটকের মহিষী সুদর্শনা নিজে স্বামী সম্বন্ধে ঠিক ঐ অভিধাই ব্যবহার করিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই, নাটকে যাহা ডালপালা মেলিয়া পূর্ণাঙ্গে বিকশিত হইয়াছে, খেয়ায় লিরিক কবিতাগুলিতে তাহা আভাসে কথিত মাত্র। শুধু খেয়া কাব্যে নয়, আরও উজানে অগ্রসর হইলে নাটকে বর্ণিত ভাবটিকে ইতস্ততঃ আভাসে ইঙ্গিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে খেয়া কাব্যে ভাবটি দানা বাঁধিয়া উঠিবার মুখে আঁধার ঘরের রাজা'র উক্তিতে তাহা প্রমাণ হয়।

কাহিনীর রাণী সুদর্শনা পতিকে কুৎসিত দেখিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল; নাটকের রাণী সুদর্শনা দেখিয়াছে যে, তাহার পতি কেবল কুৎসিত নয়, ভীষণ। তাহার ধারণা হইল, এই জন্যই রাজা অন্ধকার ঘরের বাহিরে তাহার সঙ্গে দেখা করেন না। রাণী ক্রোধে ও আত্মধিক্কারে পতিগৃহ ত্যাগ করিল।

তারপর নানা অবস্থাবিপর্যয়ের পরে, আধ্যাত্মিক দুঃখভোগের অন্তে অন্ধকার ঘরের বাহিরে বিশ্বের আলোকের মধ্যে রাজা যখন দেখা দিলেন তখন রাণী বলিয়া উঠিল, 'তুমি সুন্দর নও প্রভু; তুমি অনুপম।'

মূল কাহিনীতে কেবল সুদর্শনা ও কুশকে (রাজাকে) পাই, নাটকের অন্যান্য সমস্ত পাত্রপাত্রীই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, তাহাদের উল্লেখ মাত্রও মূলে নাই। তাহা ছাড়া মূলের কুশ (রাজা) ও সুদর্শনার চরিত্রে আধ্যাত্মিক বিবর্তন ঘটাইয়া তাহাদিগকে অনেক উচ্চতর শ্রেণীতে তোলা হইয়াছে; মাধুর্যের খাতিরে সুদর্শনা নামটিকে কবি রক্ষা করিয়াছেন মাত্র।[১]

---

১ অন্যান্য নাটকের মূল সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—

অচলায়তন নাটকে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী, মারীচি, মহামারীচি, পর্ণশবরী, উষ্ণীষ-বিজয়, শৃংভেরিঙ্গ প্রভৃতি যেসব মন্ত্রের ও ব্রতের উল্লেখ আছে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের কল্পিত নয়; 'দি স্যান্সক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' নামে পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে এইসব ধারণী মন্ত্রের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। অমঙ্গল নিবারণের আশায় বা অভীষ্ট ফললাভের ইচ্ছায় এইসব মন্ত্র আবৃত্তি করা হইত বা লিখিয়া কবচে ভরিয়া ধারণ করা হইত।

মুক্তধারা নাটকের মূল প্রায়শ্চিত্ত নাটকে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে—যদিচ কেবল প্রত্যক্ষভাবে ধনঞ্জয় বৈরাগীকেই পূর্বনাটক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

রথের রশি নাটকের ঘটনা, অর্থাৎ রথের দিনে রথ না চলা এবং অন্ত্যজদের টানে রথের চলা বর্তমান লেখক কর্তৃক বিবৃত একটি বাস্তব ঘটনা হইতে গৃহীত।

তাসের দেশ নাটকের মূল 'একটা আষাঢ়ে গল্প' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প।—গল্পগুচ্ছ, র-র, ১১শ খণ্ড।

ঋতুচক্র

রবীন্দ্রনাথের নাটকের তিনটি ধাপ আছে।

প্রথম ধাপে কতকগুলি নাটক যাহাতে রঙ্গমঞ্চের সবটা জায়গা জুড়িয়া মানব পাত্রপাত্রী; প্রকৃতি তাহাতে অল্পই স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় ধাপে কতকগুলি নাটক, প্রত্যক্ষত যাহার পাত্রপাত্রী প্রকৃতি—মানুষের কথা তাহাতে কেবল ব্যঞ্জনাতেই ধ্বনিত। মাঝখানে একটা ধাপ আছে, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহাকে মানব ও প্রকৃতির সীমান্তপ্রদেশ বলা চলিতে পারে; প্রথম ধাপের মানবীয় গুরুত্ব কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনো তৃতীয় ধাপের প্রাকৃতিক প্রাধান্য শুরু হয় নাই। প্রকৃতি এখনো পটভূমিতে পড়িয়া আছে। কিন্তু সে পটভূমি নির্জীব ও অর্থহীন নহে। এই নাটকগুলি পড়িলে মনে হয়, কবির নাট্যজগতে একটি প্রধান চরিত্রে প্রবেশের মুখে, এখনো তাহার সবটা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই; এখনো সে নেপথ্যের আড়ালে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার দূরাগত পায়ের শব্দ, ওড়নীর আভাস, চুলের সুগন্ধ, সুরের মূর্ছনা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। এইসব নাটকে প্রকৃতি পটভূমিতে আছে বটে, কিন্তু সে নিজে পটভূমি নয়—কবির ইঙ্গিত পাইলেই মানবচরিত্রকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া নিজে রঙ্গমঞ্চের সবটা জায়গা জুড়িয়া বসিবে। তৃতীয় ধাপের নাটকে প্রকৃতির তরুলতা, নদী, বায়ু, চন্দ্র, মেঘ এবং ঋতুপর্যায় যেমন মূর্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, এখনো তেমন ঘটে নাই; এখনো প্রকৃতি মানব-পরিবেশের বাহিরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই আছে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে তাহার ভাববিনিময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, মানুষের সুখদুঃখের ছায়া তাহার দর্পণে বিম্বিত, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সে সচেতন; কেবল মানুষের জীবনের মধ্যে যে-সব বস্তু নিরর্থক বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতির সহিত পরিপূরকভাবে

দেখিলে তাহা অর্থদ্যোতক হইয়া ওঠে; মানুষ যে স্বয়ংপূর্ণ নয়—এমন কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়িয়া যায়, এবং বিদ্যুৎবিকাশের ক্ষণিকতায় দেখিতে পাওয়া যায় মানুষ ও প্রকৃতি মিলিয়াই জগৎটা সম্পূর্ণ।

একমাত্র মানব-পরিবেশের ধ্যানেই মানব-জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে, এমন কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দম্ভ আছে; মানব-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আতিশয্যজাত সংকীর্ণতা হইতে ইহার উৎপত্তি। সৌভাগ্যবশত ভারতীয় কবিদের চিত্তকে এই উগ্র সূক্ষ্মতা বিদ্ধ করিতে পারে নাই। প্রাচীনদের মধ্যে কালিদাস ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শকুন্তলার তপোবন কেবল প্রাকৃতিক পটভূমি মাত্র নয়—তাহার প্রাকৃতিকত্ব রক্ষা করিয়াও কবি তাহাকে সজীব সহৃদয় করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

'আমি মনে করি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই, তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ংবদা ছিল না।' [১]

কিন্তু একথা মনে করাও অসংগত নয় যে, তপোবনবিচ্যুত শকুন্তলাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই দুষ্মন্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন কবি হয়তো ইহাই বলিতে চান যে, প্রকৃতির সহিত মিলিয়াই মানুষ সম্পূর্ণ, প্রকৃতি হইতে খণ্ডিত মানুষ নিরর্থক—এত নিরর্থক যে তাহাকে চিনিতেই পারা যায় না।

শকুন্তলাতে প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে তাহা সজীব সহৃদয়, কিন্তু তাহা প্রকৃতিই রহিয়া গিয়াছে—তাহাকে মানবরূপ দিয়া রূপক নাটকের পাত্রপাত্রী সাজানো হয় নাই।

'...তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতর যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া

১ কাব্যের উপেক্ষিতা, 'প্রাচীন সাহিত্য'।

তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া, এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই।'[১]

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ধাপের নাটকে প্রকৃতি প্রকৃতি থাকিয়াই সজীব, সহৃদয়, এবং মানবজীবনের মধ্যে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাঁহার তৃতীয় ধাপের অধিকাংশ নাটক রূপক নাটকের ঠাটে রচিত, তাহাতে প্রকৃতির মুখে কথা ও গান বসানো হইয়াছে।

দ্বিতীয় ধাপে নয়খানি নাটক আছে—অচলায়তন, বিসর্জন, শারদোৎসব, ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, ফাল্গুনী, এবং রাজা ও রাণী, তপতী। তপতীকে স্বতন্ত্র নাটক বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই কয়খানি নাটক মনোযোগ দিয়া পড়িলে দেখা যাইবে—ইহাদের ভিতর দিয়া বৎসরের ঋতুচক্র ঘুরিয়া আসিয়াছে—এবং আবর্তন গতানুগতিক মাত্র নয়—প্রত্যেক নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে এক-একটি ঋতুর ভাবসংযোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ নাটকের মানব-পাত্রপাত্রীর জীবনে যে লীলা চলিতেছে প্রকৃতির পরিবেশে সেই একই ভাবের লীলা—প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক, ভারতীয় কবির প্রকৃতির নখদন্ত হইতে জীবরক্তের ধারা ঝরিয়া পড়ে না।

অচলায়তন নাটকের ঘটনাকাল গ্রীষ্ম, ইহার অন্ত্যভাগে নববর্ষার সমাগম।

বিসর্জন বর্ষাকালের নাটক; ইহার নাটকীয় চরম মুহূর্ত শ্রাবণের শেষ দুইদিনে সংঘটিত; শেষতম দৃশ্যটির সময় শরতের প্রথম প্রভাত।

---

১ শকুন্তলা, 'প্রাচীন সাহিত্য'।

শারদোৎসব, বলা বাহুল্য, শরৎকালের নাটক—কিন্তু সে-শরৎ আগমনীর শরৎ, অর্থাৎ ঋতুর প্রথম অংশ। ডাকঘরও শরৎকালের নাটক বটে। কিন্তু সে-শরতে বিজয়ার বিষাদের সুর লাগিয়াছে, কখন শরৎ অজ্ঞাতসারে হেমন্তের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

রক্তকরবীর সময় হেমন্তের শেষ এবং শীতের প্রারম্ভ; ইহাকে পৌষমাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বসন্তকালের নাটক রাজা ও রাণী, রাজা এবং ফাল্গুনী।

এমনি করিয়া এই কয়খানি নাটকের ভিতর দিয়া ঋতুচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আসিয়াছে।

এইবারে দেখা যাক, নাটকগুলিতে মানবলীলা ও ঋতুলীলার ভাবের কি রাখী-বিনিময় হইয়াছে।

গ্রীষ্ম-বর্ষা : অচলায়তন

অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম ও বৃথা আচারের আবর্তনে অচলায়তনের অধিবাসীদের মন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বাহিরে গ্রীষ্মের কঠোরতায় যে লীলা চলিতেছে অচলায়তনিকদের মনেও সেই একই লীলা। গ্রীষ্ম যতই দুঃসহ হোক তার পরে বর্ষার স্নিগ্ধতা আছে একথা সত্য বটে, কিন্তু গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দুঃসহতার মধ্যে মনে হয় বুঝি ইহার আর শেষ নাই, বুঝি ইহাই প্রকৃতির একমাত্র বিধান, বুঝি ইহাই আদি ও অন্ত।

মহাপঞ্চকের ঠিক ইহাই মনের কথা। সে অচলায়তনের ক্রিয়াকর্ম আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে বড়ো আর কিছু জানে না—এই গণ্ডীর বাহিরে যে একটা বৃহৎ জগৎ আছে তাহাও বোধ করি ভালো করিয়া মানে না। সে আচারের তাপে শুষ্ক হইয়া একটি সজীব রুদ্রাক্ষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই শুষ্ক রুদ্রতারও একটি শক্তি আছে; মহাপঞ্চকের সংকীর্ণ নিষ্ঠা তাহাকে সেই শক্তি দান করিয়াছে; এই শক্তির বলেই গুরু যখন অপ্রত্যাশিত পথে অচলায়তনের প্রাচীর

ভাঙিয়া আসিলেন—তখন একমাত্র মহাপঞ্চকই গুরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে সাহস করিয়াছে।

মহাপঞ্চক গুরুকে বলিতেছে :

'মহাপঞ্চক। আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনি ওই ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সে-ই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সে-ই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।...

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বাররোধ করে এই বসলুম, যদি প্রয়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তরোয়ালের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়! তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা! এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না ?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে ! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।'

মহাপঞ্চক মূর্তিমান গ্রীষ্ম ; গ্রীষ্মের শুষ্কতা ও শক্তি দুই-ই তাহাতে আছে ; আচারের অনুবর্তন তাহাকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে বটে কিন্তু তাহার ফলেই সে সংহত হইয়া শক্ত হইয়াছে। এই শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই গুরু তাহাকে পছন্দ না করিলেও শ্রদ্ধা করিয়াছেন ; কিন্তু উপাধ্যায় প্রভৃতি আর যে-সব অভাজন এখানে আছে, যাহারা আচারপালনে কেবল ক্ষুদ্রই হইয়াছে, শক্তিমান হয় নাই—গুরু তাহাদের সঙ্গে বাক্যবিনিময় পর্যন্ত করেন নাই।

এই গেল গ্রীষ্মের একটা রূপ। তার পরে অচলায়তনের আচার্য। বাহিরের গ্রীষ্মের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সামঞ্জস্য আছে—তাঁহার হৃদয়ও শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আছে ; তিনি জানেন, জীবনে আচার আছে ; বর্ষা আপন নিয়মে আসে—আনন্দ কেমন করিয়া আসে আচার্য জানেন না। অচলায়তনের ক্রিয়াকর্ম যে সমস্তই ব্যর্থ তাহা তিনি জানেন—এ সমস্ত ছাড়িয়া আনন্দের সন্ধান করা উচিত বুদ্ধির বলে তাহাও বুঝিতে পারেন—কিন্তু অভ্যাসের গণ্ডী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আচার ও আনন্দ, অভ্যাস ও সহজ স্ফূর্তি, গ্রীষ্মের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ও নববর্ষার উদার স্নিগ্ধতার মধ্যে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত। তাঁহার চরিত্রে ট্র্যাজেডির উপকরণ কিছু কিছু আছে। একদিকে তিনি মহাপঞ্চকের নিঃসংশয় সংকীর্ণতাকে ঈর্ষা করেন, আর একদিকে পঞ্চকের অকুতোভয় উদ্দামতাকে কামনা করেন।

আচার্য জানেন গ্রীষ্মের পরে বর্ষা অবশ্যই আসিবে—কিন্তু কেমন করিয়া আসিবে, কবে আসিবে জানেন না—শুষ্ক অচলায়তন ও শুষ্কতর হৃদয়ের উপরে নববর্ষাসমাগমের আশায় তিনি অধীর উন্মুখ হইয়া আছেন।

আচার্য ব্রহ্মচারীদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :

'জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।'

এই কাতরোক্তিতে আছে বর্ষার আহ্বান, নূতন প্রাণের সরস বর্ষার আহ্বান। গুরু যখন আসিলেন তিনি একাধারে বাহিরের বর্ষা ও মনের বর্ষণ সঙ্গে করিয়াই আসিলেন। তাঁহার আগমনে অচলায়তন স্নিগ্ধ হইল—মন সরস হইল; বাহিরের বর্ষা ও রসের বর্ষণ পরস্পরের পরিপূরক হইয়া নূতন অর্থ লাভ করিল।

অচলায়তনের শুষ্কতার মধ্যে যুবক পঞ্চক নববর্ষার দূত। আয়তনের হৃদয়হীন মূঢ়তা তাহাকে নীরস করিয়া ফেলে নাই—আচারের অত্যাচার হইতে সে যে শুধু নিজেকে রক্ষা করিয়াছে তাহা নয়, অপর সকলকেও ইহার বিরুদ্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। রসের অভাবে আচার্যের হৃদয় যখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে পঞ্চক তখন নববর্ষার আহ্বান ধ্বনিত করিয়া ফিরিতেছে :

'তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা —আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে, আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্।'

অচলায়তনিকদের মধ্যে একমাত্র পঞ্চকই জানে যে বর্ষাতেই মুক্তি, রসের বর্ষণেই অচলায়তনের শুষ্কতা দূর হইবে—এবং সে বর্ষা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

দাদাঠাকুরের সঙ্গে আলাপ উপলক্ষ্যে পঞ্চক বলিতেছে :

'ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই,

এইবার তো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘননীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।'

এই যে শুষ্কতা তাহা কেবল গ্রীষ্মের নয়, রসাভাবক্লিষ্ট অচলায়তন সিদ্ধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; এই যে বর্ষা তাহা কেবল ঋতুবিশেষের নয়, তাহা মনের, যে লক্ষ্যের দিকে অভিচালিত করিবার জন্য গুরুর আগমন আসন্ন; পঞ্চক সহজাত বুদ্ধির বলেই জানে যে সরসতাতেই মুক্তি, আনন্দই লক্ষ্য।

গ্রীষ্মের তাপ যখন চরমে ওঠে তখন বর্ষণ নামে। অচলায়তনের শুষ্কতা যখন এতদূর হইয়াছে যে বিনা দোষে বালক সুভদ্রকে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের আসনে বসাইতে উদ্যত; চণ্ডক নামে শোণপাংশু যুবককে তপস্যা করিবার অপরাধে অচলায়তনের রাজা নিহত করিলেন, তখনই বর্ষণ নামিল। গুরু অচলায়তনে আসিলেন—সঙ্গে বর্ষণ আসিল, বাহিরে বর্ষাঋতু, মনে রসের বর্ষণ; মনে মুক্তির উদার গম্ভীর মেঘগর্জন।

আচার্য ও পঞ্চক দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত। এ দিকে অচলায়তনে গুরু প্রবেশ করিয়াছেন। গুরুর আগমন ও বর্ষার অবতরণ—পঞ্চক ও আচার্যের মনে একার্থক।

'পঞ্চক। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল। শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পরে বজ্র। আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে।

আচার্য। ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।

পঞ্চক। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।'

গুরু আচার্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য দর্ভকপল্লীতে আসিয়াছেন। আচার্য তাঁহাকে বলিলেন:

'আচার্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাইনে—আমাকে একটু রস দাও।

দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য, ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা? এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক—আজ দুর্যোগ একে বলে কে। আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।'

বর্ষায় তো মুক্তি আসিল—কিন্তু অচলায়তনের কি ব্যবস্থা করিলেন? তিনি মহাপঞ্চককে বিদায় দিলেন না—কেবল পঞ্চককে আয়তনের আচার্য করিয়া দিলেন। মহাপঞ্চক জীবনের কঠোরতার প্রতীক—পঞ্চক প্রতীক রসের; জীবনের পক্ষে দুটিরই প্রয়োজন সমান। আবার মহাপঞ্চক ও পঞ্চক সহোদর ভ্রাতা। এই সম্বন্ধের দ্বারা কবি বলিতে চান যে কঠোরতা ও সরসতার মধ্যে সত্যকার বিরুদ্ধতা নাই। বরঞ্চ প্রচ্ছন্ন প্রেমের সম্বন্ধই আছে, নাড়ীর যোগ আছে; কেবল দৃষ্টিদোষের জন্যই তাহাদের পরস্পরবিরোধী মনে হয়, এবং দৃষ্টির অস্বাভাবিকতা ঘুচিয়া গেলে তাহাদের সহোদরত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। অচলায়তনিকরা রসের দিকটা একেবারে উপেক্ষা করিয়া কঠোরতার সাধনায় হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে—সাধনার এই হেরফের ঘুচাইবার জন্যই গুরুর আবির্ভাব। গ্রীষ্মকালের খরতাপে এই নাটকের আরম্ভ, নববর্ষার স্নিগ্ধতায় ইহার অবসান; গ্রীষ্ম ও বর্ষা, কঠোরতা ও সরসতা,

মহাপঞ্চক ও পঞ্চক মিলিয়া মানবজীবনের সাধনার পরিপূর্ণ রূপ।

বর্ষা-শরৎ : বিসর্জন

বিসর্জন বর্ষাকালের নাটক—কেবল তাহার নাটকীয়তার চূড়ান্ত শ্রাবণের শেষরাত্রে, বর্ষাকালের শেষরাত্রে ঘটিয়াছে; পরের দিন অর্থাৎ শরতের প্রথমে ইহার অবসান।

বিসর্জনের মতো মানবহৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ নাটকে বর্ষার লীলা-প্রকাশের অবসর অত্যন্ত অল্প—যেটুকু বা আছে তাহাও যেন কবি তেমনভাবে গ্রহণ করেন নাই। জয়সিংহের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বর্ষার মেঘাড়ম্বরে, অবিশ্রাম বর্ষণে, বিদ্যুৎ-চমকে, বজ্রাঘাতে ও গর্জনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ ছিল। জয়সিংহের হৃদয়ের সরসতা ও আবেগ বর্ষার স্নিগ্ধতা ও শ্যামশ্রীর দোসর। বিসর্জন নাটকে কবি এই সুযোগ গ্রহণ না করিলেও রাজর্ষি উপন্যাসে করিয়াছেন :

'তাঁহার [জয়সিংহের] আরো সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার চারিদিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যাম বল্লরীর পল্লব-স্তবকে যৌবনগর্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এসকল প্রাণের কথা, ভালোবাসার কথা বড়ো কেহ একটা জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব

পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কলকল করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে—জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘনপল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দ—কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।'[১]

বিসর্জন নাটকে এসব কিছুই নাই—বোধকরি নাটকে ইহার স্থানও নাই; রাজর্ষির জয়সিংহের প্রকৃতি-প্রীতি বিসর্জনে অপর্ণার প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে; রাজর্ষির প্রকৃতি বিসর্জনের অপর্ণা।

ধ্রুবকে হত্যা-চেষ্টার অপরাধে রঘুপতির নির্বাসনদণ্ড হইয়াছে—তখন রঘুপতি রাজাকে বলিলেন:

আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে
নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুইদিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে, চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

বিসর্জন নাটকে শ্রাবণের এই শেষ দুইদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রাবণের শেষরাত্রে, বর্ষার অন্তিম প্রহরের অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টি হইতেছে, মন্দিরে রঘুপতি জয়সিংহের জন্য উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতেছেন—জয়সিংহ রাজরক্ত আনিতে গিয়াছে। এখানে রঘুপতির অন্তরে যে ঝড় বহিতেছে বাহিরের ঝড় তাহার অনুরূপ, আবার বর্ষার অন্তিম প্রহর যেমন ঝড়ে জলে আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া

১ রাজর্ষি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিতে কৃতসংকল্প, তেমনি জয়সিংহের এতদিনের দ্বন্দ্বেরও আজ অবসান হইয়াছে—সে রাজরক্ত উপলক্ষ্যে নিজের রক্তপাত করিতে কৃতসংকল্প।

রাত্রির বিষম দুর্যোগে রঘুপতি জাগ্রতা দেবীর তাণ্ডব দেখিতেছেন—নিজের বলি সংগ্রহ করিবার জন্য যেন তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন।

এতদিনে, আজ বুঝি জাগিয়াছে দেবী।
ওই রোষ-হুহুংকার। অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছে
তিমিররূপিণী। ওরা ওই বুঝি তোর
প্রলয়-সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্ব-মহাতরু

জয়সিংহ আত্মরক্তদান করিলেন। জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির চৈতন্য হইল; রক্তপানপুষ্ট মূঢ় দেবীপ্রতিমাকে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করিল।

পরদিন শরতের প্রথম দিবসটি নাটকের শেষ দিন। গুণবতী দেবী বলি লইয়া প্রবেশ করিলেন, তিনি দেবীকে পাইলেন না, কিন্তু স্বামীকে নূতন করিয়া লাভ করিলেন, গোবিন্দমাণিক্যও সেই সময়ে পূজার্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঘুপতির জয়সিংহকে আর পাইবার উপায় নাই বটে, তিনি অপর্ণার মধ্যে নূতন করিয়া জয়সিংহকে পাইলেন। যে-শরতের প্রথম প্রত্যূষে রঘুপতির অভিশপ্ত দগ্ধরাজ্য ছাড়িয়া যাইবার কথা ছিল, সেই প্রত্যূষে রক্তপিপাসু দেবীই এই রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। শরৎকাল দেবীর, যিনি সকলের মাতা, আগমনের সময়, কবি শরতের প্রথম প্রত্যূষটির উপরে জোর দিয়া, এই দিনটিকেই নাটকের চূড়ান্ত করিয়া, ইহাই যেন বলিতে চান যে, এতদিন পরে জীবজননীর আগমন হইল, এবং তাঁহার আগমনের পূর্বেই শ্রাবণের শেষ দুর্যোগের মধ্যে জীবরক্তপায়ী

যে পাষাণকে লোকে মাতা বলিয়া মনে করিত, সে ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করিল।

শরৎপ্রারম্ভ : শারদোৎসব, ঋণশোধ

শারদোৎসব ও তাহার রূপান্তর ঋণশোধ শরৎকালের নাটক। সে শরৎও আবার শরতের প্রারম্ভ, শেষ নয়। শরৎ একসঙ্গে আগমনী ও বিজয়ার কাল, আনন্দের ও বিষাদের। এই দুইখানি নাটকে শরৎপ্রারম্ভের আগমনীর আনন্দের সুর—শরৎশেষের বিজয়ার বিষাদের সুর আছে ডাকঘর নাটকে, যদিচ ইহাও শরৎকালেরই নাটক।

শারদোৎসব-ঋণশোধে কবির প্রধান বক্তব্য এই যে, জগতের কাছে আমরা সর্বদা প্রেমের ঋণ বহন করিতেছি, শরৎকালে সেই ঋণশোধের পালা; শরতের প্রকৃতির মধ্যে কবি ঋণশোধের সেই ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। অন্তরে এই ঋণশোধের ভাবটি জাগ্রত করিতে হইলে আগে বাহিরে শরতের সঙ্গে রঙে ও ভাবে এক হইতে হইবে—তবেই ভিতরে বাহিরে সত্য একাত্মকতা স্থাপিত হইবে।

'বিজয়াদিত্য। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে, বলো। আমি তো একমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মতো ঝলমল

করে উঠল, তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহবেদনায় উপচে পড়ছে।' [১]

সম্রাট বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজত্বের পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য রাজ্যের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন, এই ঋণশোধ-ব্যাপারে কেবল তিনিই পিছাইয়া ছিলেন—প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিমুহূর্তে প্রেমের ঋণশোধ করিতে কতই না কষ্ট সহ্য করিতেছে।

'সন্ন্যাসী। ওকে [উপনন্দকে] সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে, সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে।' [২]

উপনন্দও প্রেমের ঋণশোধ করিতেছে। তাহার গুরু বীণকার সুরসেন লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণ রাখিয়া মারা গিয়াছেন—উপনন্দ স্বেচ্ছায়, সানন্দে, ছুটির আনন্দে-ভরা শরৎকালে প্রেমের ঋণের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়া পুঁথি নকল করিয়া ঋণশোধ করিতে উদ্যত।

'ঠাকুরদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়। আর এমন দিনেও ঋণশোধ।...

সন্ন্যাসী। বল কি, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে?

---

১ ঋণশোধের ভূমিকা।

২ ঋণশোধ।

ওই ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো। লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না।' ১

উপনন্দ সুন্দর, কেননা সে প্রেমের দুঃখ বহন করিতেছে; শরৎকালও যেমন ঋণশোধ করিতেছে, উপনন্দও তেমনি ঋণশোধে ব্যস্ত, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে একই ভাবের অনুবর্তন চলিতেছে।

শরতের ঋণশোধের ভাবটি জীবনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে মিলনটা বাহির হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

'সন্ন্যাসী। বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো—নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কি করে? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।' ২

এ তো গেল কেবল বাহিরের মিল। ভিতরের মিল কি করিয়া হইবে? কবির দৃষ্টিতে শরতের মধ্যে একটা আসক্তিহীন উদার অকিঞ্চনতার ভাব আছে—এই ভাবটি মনের মধ্যে লাভ করিলে শরতের সঙ্গে অন্তরের একাত্মতা ঘটিবে।

'মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

---

১ শারদোৎসব।

২ শারদোৎসব।

রাজা। একথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝড়ে পড়ে।

রাজা। একথা মানতে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। একথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচা ধানের যে খেত দেখি, কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি থাকে সেকথা সে একেবারে লুকিয়েছে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ঐ রকমই হাল্কা, সে ঐ রকমই নিরর্থক। সে-পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা। বাঃ এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না। ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে। আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল? তাদের নিয়ে কী হবে?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ঐ ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচা ধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ছুটির ভিতরেই ফসলের আয়োজন করছে।' [1]

১ শারদোৎসবের ভূমিকা।

উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে, শরতের অন্তর্গত ভাবটি কি, এবং কেন সম্রাট্ বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। 'রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।' বিজয়াদিত্য রাজাকে যথার্থভাবে লাভ করিবার জন্যই সন্ন্যাসী হইয়াছেন। শুধু মানুষ রাজা নয়, ঋতুরাজ বসন্তও রবীন্দ্রনাথের মতে সন্ন্যাসী, সে বৈরাগী। সত্য কথা কি, রাজসন্ন্যাসীই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজা।

শারদোৎসবে ছেলের দলের তাৎপর্য কি তাহাও এই অংশে আছে; এবং এত সম্রাট্ ও রাজা থাকিতে উপনন্দের মতো একটি বালক মাত্র ইহার নায়ক কেন তাহাও বোধ করি আর অস্পষ্ট নাই।

শরতের মধ্যে যে 'ছুটির খুশি'র কথা কবি বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে সত্যকার কাজের কোনো বিরোধ নাই—কারণ, প্রেমের ঋণশোধ করিবার জন্য উপনন্দ যেমন পংক্তির পর পংক্তি লিখিতেছে অমনি ছুটির পর ছুটি পাইতেছে।

এই ছুটির খুশিতেই বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়াছেন; কবিশেখর কিসের যেন সন্ধানে বহির্গত; ছেলের দল ঠাকুরদাকে লইয়া বেতসিনীর তীরে বাহির হইয়াছে; উপনন্দ গুরুর ঋণশোধে বাহির হইয়াছে; রাজা সোমপালের দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা যায়; লক্ষেশ্বর-পুত্র ধনপতির নামতা ছাড়িয়া বেতসিনীর ধারে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করে; এমন কি লক্ষেশ্বরেরও এক-একবার বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়িতে মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

শরৎশেষ : ডাকঘর

ডাকঘর নাটকের ঘটনার সময় শরৎকাল, ইহাকে শরৎশেষ বা হেমন্তের প্রারম্ভ বলিয়াছি। ইহার ঘটনার সময় যে শরৎ তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাটকের মধ্যেই আছে—কিন্তু শরতের শেষভাগ এমন উল্লেখ নাই, আমার অনুমান মাত্র।

ডাকঘর নাটক বারংবার পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, শারদোৎসবের শরতের সঙ্গে কেমন যেন ইহার শরতের প্রভেদ আছে। শারদোৎসব শরৎপ্রারম্ভের, ডাকঘর শরৎশেষের। যদি ইহা শরৎপ্রারম্ভের হইত, তবে ইহাতে পূজার উল্লেখ থাকিত—সে উল্লেখের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ইহার স্বল্প কথোপকথনে, ঘটনার বিরলতায়, রোগীর পাণ্ডুমুখচ্ছবিতে; বর্ণনীয় বস্তুর স্বচ্ছতায় পাঠককে, আমাকে অন্তত, হেমন্তের আবহাওয়াকে মনে করাইয়া দেয়—

'দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে সকলেরই যখন খাওয়া হয়ে যায়, পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনের ঐ কোণের ছায়ায় ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে—তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং ঢং!'

আবার :

'দুপুরবেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—'

আবার :

'আকাশে খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল।'

পুনরায় :

'আমাদের জানালার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায়, আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।'

এই কথাগুলিতে এবং সমস্ত বইখানিতে অস্পষ্ট একটা হেমন্তের আভাস আছে। বিশেষ, ডাকঘরের বিষাদের সঙ্গে বিজয়ার বিষাদের একটা সাদৃশ্য অনুভূত হয়, আর আগমনীর আনন্দ যদি

শরৎপ্রারম্ভের হয়, বাকি সমস্ত ঋতুটা বিজয়ার বিষাদের অশ্রুচ্ছায়ায় পরিম্লান।

'শরতের মধ্যে একটা ব্যাকুলতার ভাব আছে; মনটাকে অভ্যস্ত ঘরের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া অনির্দিষ্ট দূরত্বের দিকে অভিক্ষেপ করিয়া দেয়। 'আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।' কী চায় নিজেই সে জানে না। অমল জানে না সে কী চায়—কেবল একটা পরম ব্যাকুলতার ভাব তাহাকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে। দইওয়ালার ডাক শুনিলে তাহার মন উদাস হইয়া যায়, পাহারাওয়ালার হাঁক শুনিলে তাহার মন উদাস হইয়া যায়, পথে পথিক দেখিলে তাহার নিরুদ্দেশের মুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে; এত কাজ থাকিতে ডাকঘরের কাজটি তাহার পছন্দ—যাহার কাজই হইতেছে কেবল পথে পথে চলিয়া বেড়ানো; নীল আকাশ দেখিয়া তাহার মনে হয়, সে হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিতেছে; ঠাকুরদার সঙ্গে সে ক্রৌঞ্চদ্বীপে, হাল্কা জিনিসের দ্বীপে, না জানি কোন্ সমুদ্রের তীরে চলিয়া যাইতে চায়। বিশিষ্ট কোনো স্থান তার লক্ষ্য নয়—সেটা উপলক্ষ্যমাত্র; চলিয়া যাওয়াটাই তাহার লক্ষ্য। মনের এই ব্যাকুলতার ভাব, মানবচিত্তের এই চিরন্তনী ব্যাকুলতা শরতের মধ্যে আছে।

প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাহাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপর ঝিকিমিকি করিতে থাকে,...তাই শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবলি চলি-চলি করে।'...[১]

অমল মানুষের মনের সেই চলি-চলি ভাব; ঋতুর ব্যক্তিত্ব ও মানুষের ব্যক্তিত্ব এক হইয়া গিয়াছে।

একটি লক্ষ্য করিবার ব্যাপার আছে। রবীন্দ্রনাথের দুইখানি শরৎ-সম্বন্ধীয় নাটকেই নায়ক দুটি বালক, উপনন্দ ও অমল।

---

১ 'শরৎ', 'পরিচয়'

কেন এমন হইল? শরতের সঙ্গে শৈশবের কি কোনো মিল আছে?

'আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি গায়ের গন্ধের মতো।...

শরতের রংটি প্রাণের রং।...এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে।...বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব।...ছেলেদের হাসি-কান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে, তাতে মাল বোঝাই নাই...।'[1]

কবির মনে শরৎ ও শিশুর ভাব জড়িত হইয়া গিয়াছে; কবির কাছে শরৎ শিশু, আবার শিশু শরৎ। কাজেই শরৎকালের নাটক লিখিবার সময়ে স্বভাবতই কবি দুটি বালককে নায়ক করিয়াছেন—যাহাদের শৈশব এখনো ভালো করিয়া কাটে নাই।

শরতের চলি-চলি ভাবটা বয়স্ক মানুষের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা পড়ে না, কারণ শিক্ষা, সংস্কার ও সংসারের দায়িত্বে তাহার মনের উপর একটা স্থূল আবরণ পড়িয়া গিয়াছে—বালকের স্থূলহস্তাবলেপহীন মনে সেইজন্যই এই 'চলি-চলি'র বিশুদ্ধ রূপটি চোখে পড়ে।

শীতকাল : রক্তকরবী

রক্তকরবী শীতকালের নাটক। ইহার পুরোভূমিকায় যক্ষপুরী, পটভূমিকায় ফসল-কাটার মাঠ; যক্ষপুরীর বীভৎস গর্জনকে ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ফসল কাটার গান কানে আসে—আর এই দুই ভূমিকার মধ্যে সেতুবন্ধের ব্যর্থ প্রচেষ্টা নন্দিনীর।

১ 'শরৎ', 'পরিচয়'।

আগের কয়খানি নাটকে ঋতুর ভাবে ও মানুষের ভাবে যেমন মিল রক্তকরবীতে তেমনি অমিলটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; এখানে ঋতুর ভাবে ও মানুষের ভাবে দ্বন্দ্বটাই দেখানো হইয়াছে; এই দুই বিপরীত শক্তিকে, মাঠ ও খনি, ফসল কাটা ও খনি খোদাই, গর্জন ও সঙ্গীত, রঞ্জন ও রাজা, প্রেমের লীলা ও প্রাণের প্রচণ্ডতাকে দুই হাতে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে গিয়া নন্দিনী পিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যক্ষপুরীর খনিখোদাই শব্দে একটু ছেদ পড়িলেই দূর হইতে শোনা যায়:

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
আয়, আয়, আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায়, হায়, হায়।

এই গানটিই, এই ভাবটিই রক্তকরবী নাটকের পটভূমি-সংগীত, কখনো তাহা শোনা যায়, কখনো যায় না, কিন্তু নাটকের পটভূমিতে নিরন্তর ইহা নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে।

ঋতুর ও মানুষের দ্বন্দ্বটাই নাটকের লক্ষ্য করিবার মতো, শীতকাল ফসল কাটার সময়—আবার তাহা খোদাই কাজের পক্ষেও প্রশস্ত; একদিকে নবান্নের পরিপূর্ণ আহ্বান, আর একদিকে ধ্বজাপূজার মদিরাপিচ্ছিল বীভৎসতা; একদিকে মাটির তলাকার মৃত সোনা, আর একদিকে সোনার রঙের ফসল; একদিকে যক্ষপুরীর জালে বিধৃত প্রাণের প্রচণ্ডতা, অন্যদিকে নির্বোধ প্রান্তরের অনায়াস উদারতার মধ্যে প্রেমের লীলা; রাজা ও রঞ্জন; —অথচ রহস্য এই যে, রাজা ও রঞ্জন উভয়েই এক ধাতুতে গড়া, আর উভয়ে এক ধাতুতে গড়া বলিয়াই দুজনেরই প্রতি নন্দিনীর আকর্ষণ।

নাটকটির মূলে একটা দ্বন্দ্ব আছে এবং সেই দ্বন্দ্বের আলোড়নে

নন্দিনীর মন্থরকাতর প্রেম ব্যথায় রক্তিম হইয়া রক্তকরবী রূপে ফুটিয়া উঠিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে।

বসন্ত : রাজা ও রানী, রাজা, ফাল্গুনী, তপতী

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজার মতো ঋতুরাজ বসন্ত সন্ন্যাসী; বাহিরে তাহার ঐশ্বর্য, অন্তরে তাহার বৈরাগ্য; 'অন্তরে তাহার বৈরাগী গায়'; যে কেবল বাহিরের সম্পদে মুগ্ধ হইল সে কিছুই দেখিল না; যে ভিতরের উদাসীকে দেখিল, সে-ই দেখিল। কিন্তু বসন্তের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের মনে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যে-বয়সে তিনি রাজা ও রানী লিখিতেছিলেন তখন বসন্তের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্ব তাঁহার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয় নাই, অর্ধগোচরভাবে অবশ্যই ছিল।

বিক্রমদেব ও সুমিত্রার সম্বন্ধের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই সুমিত্রাকে পাইবার পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার কারণ, বিক্রমদেব বসন্তের বাহিরটাকে কেবল দেখিয়াছেন, সেখানে ঐশ্বর্য এবং ভোগরতি, অন্তরে যেখানে বৈরাগ্য ও আসক্তিহীনতা সেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই; তিনি প্রেমের বিলাসকেই দেখিয়াছেন, প্রেমের আত্মবিসর্জনপরতাকে দেখেন নাই; কাজেই তিনি প্রেমে তৃপ্তি পান নাই সুমিত্রাকে পাইয়াও পান নাই; বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই ঢেউ তুলিয়া আকাঙ্ক্ষিত পদ্মটিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই নাটকে বসন্তের ভাবটি কবির কাছে অর্ধ-গোচর; সচেতন ভাবে প্রত্যক্ষ নয়।

রাজা ও রানীর রূপান্তর তপতী সুপরিণত বয়সে লেখা, তখন কবির মনে ঋতুর ভাবের ক্রমবিকাশ স্পষ্টরূপ ধরিয়াছে, কাজেই রাজা ও রানীর চেয়ে তপতীতে বসন্তের আইডিয়াটি পরিণততর; সত্য কথা বলিতে কি, তপতীর কাহিনী আইডিয়াটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কবি লিখিয়াছেন :

'সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।

'রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।' ১

রচনার দোষে ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই ইহা সত্য নয়, ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়াই রচনার দোষ হইয়াছে। মানব-জীবন ও বসন্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে যে ঐক্য আছে তাহা স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিলে নাটকের ঘটনাস্রোত স্বাভাবিক পরিণামের দিকেই যাইত—অযথা কুমার ও ইলার প্রেম-কাহিনীর অসংগতির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত না। তপতীতে এই দোষ কবি শুধরাইয়া লইয়াছেন; ভাবটি পরিস্ফুট হওয়াতে রচনা অন্তত এই দোষ-পরিমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা এবং ফাল্গুনীতে বসন্তের আইডিয়াটি পূর্ণ পরিণতি লাভ লাভ করিয়াছে, এবং কবিজীবনের শেষ পর্যন্ত সেই আইডিয়ার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই।

---

১ তপতী, ভূমিকা।

রাজা

রাজা নাটককে বসন্তোৎসব নাম দেওয়া চলিতে পারে। বসন্তের সত্যকার রূপটি কি? শারদোৎসবে দেখিয়াছি কবি বলিয়াছেন, 'রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।' শরতের মধ্যে সন্ন্যাসের ভাব যদি থাকে তবে ঋতুরাজ বসন্ত একেবারে সন্ন্যাসী—সে রাজসন্ন্যাসী; তাহার যা-কিছু ঐশ্বর্য তাহা বাহিরে, অন্তরে সে ত্যাগের মহিমায় অকিঞ্চন। বসন্ত সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধারণা; পরবর্তী নাটকে কাব্যে সংগীতে এই ধারণাই পরিণতি লাভ করিয়াছে, আর পরিবর্তিত হয় নাই।

এই নাটকে দুটি রাজা আছেন, এক রাজা যাঁহার নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ, দ্বিতীয় ঋতুর রাজা বসন্ত। দুজনের মধ্যেই কবি ভাবের ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ঋতুরাজের অনন্ত ঐশ্বর্য, কিন্তু অন্তরে তাহার রিক্তসম্পদ্ সন্ন্যাস। অপর রাজারও বাহিরে অনন্ত রূপ, অসংখ্য মূর্তি, ঐশ্বর্যের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার ঘরের মধ্যে তিনি একক, রূপহীন, তিনি অরূপরতন।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

যে এই বসন্তকে সত্যভাবে দেখিতে পাইয়াছে সে একই সঙ্গে বাহিরের উজ্জ্বল সাজ ও অন্তরের বৈরাগীর গেরুয়া দেখিয়া ধন্য হইয়াছে। যে হতভাগ্য কেবল বসন্তের বাহিরের রূপটাই দেখিল তাহার দুর্ভাগ্যের আর অবধি নাই।

রানী সুদর্শনা এমনি একজন হতভাগিনী। তিনি ঋতুরাজের বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছেন; তিনি রাজার বাহিরের ঐশ্বর্য দেখিবার জন্য লুব্ধ; বাহিরের সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতর কোনো সত্য তিনি স্বীকার করেন না; তাই তিনি ছদ্মবেশী সুপুরুষ সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিলেন। ইহা তাঁহার লোভের দৃষ্টি।

দাসী সুরঙ্গমার গভীরতর দৃষ্টি আছে। রাজা তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। সে জানে রাজাকে বাহিরে দেখিবার নয়—দেখিলে ভুল হইবে, সে জানে রাজাকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখিতে হয়। একসময়ে রাজার প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল—কিন্তু এখন সে একপ্রকার ভক্তি করিতে শিখিয়াছে। তাহার চোখে রাজা কেমন? রানীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিতেছে:

'হাঁ, তাই বলব—সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য! যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হ'ল যে কটাক্ষেও তার দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলায় মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয়, এই আমার চের, আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।'

সুরঙ্গমার দৃষ্টিও চূড়ান্ত দৃষ্টি নয়—ইহা ভক্তির দৃষ্টি, সে রাজার পায়ের তলাকার মাটির দিকেই তাকায়, মুখের দিকে নয়; ইহা প্রেমের দৃষ্টি নয় এবং প্রেমের দৃষ্টি নয় বলিয়াই সে রাজাকে যথার্থতম ভাবে বুঝিতে পারে নাই।

এই নাটকে কেবল ঠাকুরদা গোড়া হইতে রাজাকে সত্যভাবে জানেন—কারণ, তাঁহার দৃষ্টি ভালোবাসার দৃষ্টি—তিনি নিজেকে রাজার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই যখন তিনি গান করেন—

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ

ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়

তাইরে নাইরে নাইরে না।—

তখন তাহা একাধারে ঋতুরাজ ও তাঁহার রাজার যথার্থ পরিচয় বহন করে। তাই ঠাকুরদা বলেন, 'আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।' অর্থাৎ তাঁহার রাজার বাহিরে পদ্মের কোমলতা ও সৌন্দর্য, আর ভিতরে বজ্রের বিবিক্ত কঠোরতা।

কবি বলিতে চাহেন, ভালোবাসার দৃষ্টিতেই কেবল জগতের ও জগৎপতির সত্য পরিচয় পাইবার উপায়; যে সেই দৃষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার কাছে বাহিরের ঐশ্বর্য ও ভিতরের বৈরাগ্য যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তবে অভিজ্ঞতাটি অনেক দুঃখে লাভ করিতে হয়; রাণী সুদর্শনার এই দুঃখের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিলাভের ইতিহাসই 'রাজা' নাটকের প্রাণবস্তু।

ইহার আগে দেখিয়াছি, মানুষের জীবনলীলার অনুরূপ কবি প্রকৃতির লীলাতে দেখিয়াছেন। এখানে কিন্তু অর্থদ্যোতনা গভীরতর। এখানে আর মানুষের লীলা নয়—স্বয়ং জগৎপতির লীলার অনুরূপ প্রকৃতির মধ্যে কবি দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বরাজের অন্তরে বাহিরে ভাবের যে আপাতবিরোধ, ঋতুরাজের প্রকৃতির মধ্যেও যেন তারই প্রতিধ্বনি; সেইজন্যই বিশেষ করিয়া বিশ্বরাজের রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকারূপে ঋতুরাজকে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পটভূমিকায় ও পুরোভূমিকায় ভাবের ঐক্য ঘটিয়া গিয়াছে।

অন্তর ও বাহিরের যে বিরোধ, ঐশ্বর্য ও সন্ন্যাসের যে বিরোধ তাহা আপাতবিরোধ মাত্র। ঋতুরাজ যথার্থ ধনী বলিয়াই বসন্তের ক্ষণিক উৎসবশেষে ঐশ্বর্যের প্রচুরতাকে নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়া কখন একদিন অকস্মাৎ বৈশাখের বীতরাগ গীতহীন শুষ্কতৃণ মাঠের মধ্য দিয়া দগ্ধতাম্র দিগন্তের দিকে এমন অনায়াসে যাত্রা করিতে পারে।

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে

ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে

দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

বিশ্বরাজের লীলাও অনুরূপ। বাহিরে তাঁহার আলোয় আলোময়—তাহার মধ্যে একটি অন্ধকার ঘরে রানীর সঙ্গে তাঁহার মিলন; বাহিরে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য, কিন্তু রানী তাঁহাকে চোখে দেখিতে পান না; বাহিরে তাঁহার অসংখ্য রূপ, অন্ধকার ঘরে রানীর কাছে তিনি অরূপ; তাঁহার ধ্বজার পদ্মের মধ্যে বজ্র আঁকা, তিনি বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি; সে তাঁহার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া লড়াই করিতে অগ্রসর হয়, তাহাকেই তিনি সম্মান দেন; তিনি নিজের রাজতক্ত বিদ্রোহী রাজাদের ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ লোকদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সঞ্চরণ করেন, তিনি নিজের প্রিয়তমা রানীকে অন্ধকার ঘরের নির্বিঘ্নতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ধূলার উপরে বিশ্বজনের সম্মুখে নিরবগুণ্ঠন নগ্নতার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। কারণ, সুদর্শনার প্রভু।

'কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।'[১]

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী ফাল্গুন মাসের নাটক। ইহার পটভূমিকা ও পুরোভূমিকায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক হিসাবে পূর্বোক্ত সবগুলি নাটকের চেয়ে ইহার গুরুত্ব বেশি। পূর্বোক্ত নাটকগুলিতে কবি মানুষের লীলা ও প্রকৃতির লীলাতে ঐক্য দেখিয়াছেন; রাজা নাটকে বিশ্বরাজ এ ঋতুরাজের লীলাতে ঐক্য ধরা পড়িয়াছে; ফাল্গুনীতে আর কেবল ঐক্য মাত্র নয়, প্রকৃতির লীলাই যেন মানুষের লীলাকে বুঝিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানবজীবনের সমস্যাকে জাগাইয়া

১ অরূপরতনের ভূমিকা।

তুলিবার সোনার কাঠি যেন প্রকৃতির শিয়রের তলে রহিয়াছে। এ কথাটির উপরে একটু জোর দিতে চাই। কারণ, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মানুষকে বুঝিবার সাধনা করিলেও প্রত্যক্ষত চরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; পরোক্ষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন মাত্র; তিনি প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্প, দোসর করিয়া দাঁড় এবং প্রকৃতির লীলার মধ্যেই মানুষের লীলার ছবি যেন দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার শেষের জীবনের কাব্যসাধনা প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্পরূপে দাঁড় করাইতে নিযুক্ত: প্রকৃতির শান্তিসরোবরে সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড মানবজীবন স্নিগ্ধ হইয়া অখণ্ড পূর্ণতায় প্রতিফলিত হইয়াছে, কবি তাহাই নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; প্রত্যক্ষত মানবজীবনের দিকে তাকাইবার আকাঙ্ক্ষা এইভাবে পূরণ করিয়া লইয়াছেন। মানুষের বিকল্প প্রকৃতি হইয়া উঠিবার ইতিহাসে ফাল্গুনী একটি পতাকাস্থান, বা মোড় ঘুরিবার মুখ। বলাকা ও ফাল্গুনী সমসাময়িক; ইহার পর হইতে কাব্যে নাট্যে সঙ্গীতে মানবমুখী কবি প্রকৃতিমুখী হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতমুখিতাও মানবমুখিতা; কারণ, প্রকৃতি মানুষেরই বিকল্প বা symbol।

'ফাল্গুনী নাটকের গঠনপ্রণালী দেখিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইবে। ইহাতে চারটি অঙ্ক, আর প্রত্যেক অঙ্কের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা। প্রত্যেক অঙ্কের নাটকীয় পাত্রদের মনোভাবকে গীতিভূমিকার প্রকৃতির সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার এত গুরুত্ব বেশি যে এক-একবার মনে হয়, ফাল্গুনীতে প্রকৃতি আর পটভূমি মাত্র নয়, ইহাই যেন পুরোভূমি, মানুষের লীলাটাই যেন পটভূমিতে গিয়া পড়িয়াছে। ইহা ফাল্গুনীর পক্ষে সর্বতোভাবে সত্য না হইলেও পরবর্তী অধিকাংশ গীতিনাট্য ও কাব্য সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে প্রযোজ্য।

'রাজা। এ নাটকে গান আছে নাকি?

কবি। হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।'[১]

গীতিভূমিকার ও নাটকের অঙ্কের একটা তালিকা দেওয়া গেল :

নবীনের আবির্ভাব। যুবকদলের প্রবেশ॥ প্রবীণের দ্বিধা। সন্ধান॥ প্রবীণের পরাভব। সন্দেহ॥ প্রত্যাগত যৌবনের গান। প্রকাশ॥

এবার দেখা যাক গীতিভূমিকায় ও নাটকে কি করিয়া মিলিয়া গিয়াছে।

'রাজা। গানের বিষয়টা কি?

কবি। শীতের বস্ত্রহরণ।

রাজা। এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায়নি।

কবি। বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

রাজা। এ তো গেল গানের কথা, বাকিটা?

কবি। বাকিটা প্রাণের কথা।

রাজা। সে কি রকম?

কবি। যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরল তখন—

রাজা। তখন কি দেখলে?

কবি। কি দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

রাজা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয় কি আলাদা নাকি?

কবি। না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে

---

১ ফাল্গুনীর ভূমিকা।

আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।' ১

এইভাবে গীতিভূমিকায় ও নাটকে, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে, গানের বিষয়ে আর প্রাণের বিষয়ে ঐক্য সংঘটিত হইয়াছে।

ফাল্গুনীর যুবকের দল চিরন্তন বুড়াকে ধরিবে বলিয়া পণ করিয়াছিল—জীবনের রহস্যগুহার ভিতর হইতে সে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন দেখা গেল সে চিরন্তন নবীন; সে আর কেহ নয়, যুবকদলের নবীন সর্দার—শীতের হিমল গুহাটার ভিতর হইতে ঠিক এমনি ভাবেই বসন্ত বাহির হইয়া আসে।

এই যে বসন্ত, এই যে যৌবন, দুটিই এক; ইহা বাস্তব নয়, বসন্ত ও যৌবনের আদর্শায়িত রূপ। বয়সের যৌবন একবার মাত্র আসিয়া চলিয়া যায়—আর এ যৌবন ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসে, দুঃখের মধ্য দিয়া যখন সে আসে তখন আর যায় না।

ফাল্গুনীর ভূমিকায় যে রাজা আছেন তাঁহার একটি চুল পাকিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বৈরাগ্যসাধনের আয়োজন করিতে-ছিলেন। এমন সময় কবি আসিয়া পাকা চুলটাকে লক্ষ্য করিয়া শুধাইলেন:

'কবি। ওটাকে আপনি ভাবছেন কি?

রাজা। যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে শাদা করার চেষ্টা।

কবি। কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগবে।

রাজা। কই রঙের আভাস তো দেখিনে।

কবি। সেটা গোপনে আছে। শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

রাজা। চুপ, চুপ, চুপ কর, কবি, চুপ কর।

কবি। মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আর

১ ফাল্গুনীর ভূমিকা।

এক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।' ১

পৃথিবীর যৌবন যেমন শীতের অভিজ্ঞতায় জর্জরিত হইয়া তবেই বসন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে, মানুষের যৌবন তেমনি জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া, শাদা চুলের তুষারপাত পার হইয়া নূতন আকারে দেখা দেয়—কবি যাহাকে বলেন চিরযৌবন, যাহা কখনো পুরাতন হয় না—কিংবা যাহা একমাত্র সত্য যৌবন।

কবি সেই যৌবনকে বলিতেছেন আসক্তিহীন যৌবন। সেই যৌবনই সত্যভাবে জীবনকে এবং শিল্পকে ভোগ করিতে জানে, কারণ সে ত্যাগ করিতেও শিখিয়াছে। কবি রাজাকে বলিতেছেন, এই নাটক দেখিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিবেন, যাহাদের চুলে পাক ধরিয়াছে।

রাজা। সে কি কথা কবি ?

কবি। হাঁ, মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফল্‌তে চায়।' ২

নাটকের প্রারম্ভে যুবকদলের যে যৌবন তাহা আদৌ আসক্তিহীন নয়, কারণ তখনো তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা বাকি আছে। চতুর্থ দৃশ্যে যখন তাহাদের ভালোবাসার পাত্র চন্দ্রহাস গুহার মধ্যে চলিয়া গেল, সন্দেহ ও রাত্রির দ্বিগুণিত অন্ধকারে ভালোবাসার পাত্রকে হারাইয়া যৌবনের আর এক রূপ মাত্র তখনই তাহাদের চোখে পড়িল। এই অভিজ্ঞতারই তাহাদের প্রয়োজন ছিল।

'চলার মধ্যে যদি কেবল তেজ থাকত তাহলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে, তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

১ ফাল্গুনীর ভূমিকা।

২ ফাল্গুনীর ভূমিকা।

এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি জগৎটা কেবল 'পাবো', 'পাবো' বলছে না, সঙ্গে সঙ্গেই বলছে 'ছাড়বো', 'ছাড়বো'।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাবো'র সঙ্গে 'ছাড়বো'র বিয়ে হয়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।'

যেমন যৌবন সম্বন্ধে তেমনি বসন্ত সম্বন্ধেও :

'এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম সুর লাগছে?

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।'

এখানে আসিয়া রাজা নাটকের বসন্তে ও ফাল্গুনীর বসন্তে মিলিয়া গিয়াছে :

'ঠাকুরদা। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব—সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে'।

এ যে ফাল্গুনীর ঝরাপাতার সুর।

'বাউল। সে [চন্দ্রহাস] বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।'

এ কি রকম বসন্ত? একই সঙ্গে ঝরাপাতার সুর, কান্নার সুর, আবার লড়াইয়ের সংবাদ। বিস্ময়ের কিছু নাই। এ বসন্ত যাঁহার প্রতীক তাঁহার ধ্বজায় যে পদ্মের মাঝখানে বজ্র অঙ্কিত।

ফাল্গুনীর যৌবনের দল দুঃখের অভিজ্ঞতার পরে যখন চন্দ্রহাসকে পাইল, ভালোবাসার পাত্রকে পাইল, তখনি যথার্থ পাওয়া; তাহারা চুল না পাকাইয়াও নিরাসক্ত যৌবনের তটভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল।

এই নাটকে এক অন্ধ বাউল আছে, একসময়ে সে চোখে দেখিতে পাইত, এখন সে অন্ধ। চন্দ্রহাস তাহার কাছেই বুড়ার সন্ধান পাইয়াছে। সেই বুড়া যখন প্রকাশ পাইল, দেখা গেল সে চিরযৌবন। এই নিরাসক্ত যৌবনের সন্ধান কেবল সে-ই দিতে পারে চোখে দেখার উপরে যাহার ভরসা নাই। রাজা নাটকের রাজাও চোখে দেখিবার নহেন, বরঞ্চ চোখে দেখিতে গেলেই ভুল হইয়া বসে।

এখানেও ভাবের দিকে উভয়ত্র ঐক্য। ফাল্গুনীর নিরাসক্ত যৌবন, যাহা বসন্ত বই আর কিছু নয়, তাহা চোখে দেখিবার নয়। রাজা নাটকের রাজা, যাঁহার প্রতীক বসন্ত, তাঁহাকেও চোখে দেখিবার নয়। দুই নাটকেই দেখি, ঋতুরাজ ও বিশ্বরাজ, মানুষের যৌবন ও পৃথিবীর যৌবন নানা দিক দিয়া ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে, কাজেই নানা ভাবে তাহাদের মধ্যে লক্ষণের একত্ব দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি, মানব ও ভগবান আর সমান্তরাল না থাকিয়া একটা আর-একটার উপরে আসিয়া পড়িতেছে, অলক্ষ্যে কখনন্ মিশিয়া গিয়া এক বলিয়া মনে হইতেছে, পরস্পরের সান্নিধ্যে নূতনতর অর্থ লাভ করিতেছে—এ এক বিচিত্র লীলা!

কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতির গুরুত্বই কবির কাছে বেশি—অন্তত সেই গুরুত্বের দিকেই কবির সাধনা ও শিল্প অগ্রসরশীল।

তন্ত্রনাট্যের প্রতীক

জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মানুষ সর্বদাই প্রতীক ব্যবহার করিতেছে—এবং সে ব্যবহার তাহার বাস্তবজীবন ও আদর্শজীবন সমস্ত ক্ষেত্রকেই ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত। আমরা দশটি টাকার বদলে একখানি দশটাকার নোট গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ নোটখানি দশটি টাকার প্রতীক বা সিম্বল। আবার শব্দ ব্যবহারক্ষেত্রেও সদাসর্বদা অজ্ঞাতসারে প্রতীক ব্যবহার করিয়া চলিয়াছি। একটি 'গাছকে' বুঝাইতে ডালপালা-সমন্বিত 'গাছ' আর অঙ্কিত করি না। দুটি মাত্র বর্ণযোগে একটি শব্দ রচনা করি। ঐ শব্দটি 'গাছ'-বস্তুটির একটি প্রতীক। কিন্তু এক সময়ে মানুষ যখন বর্ণ ব্যবহারের রহস্য শেখে নাই, তখন 'গাছ' বস্তুটি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই সে একটি 'গাছ' অঙ্কিত করিত। মিশরের চিত্রলিপি তাহার প্রমাণ। কালক্রমে চিত্রাক্ষর বর্ণাক্ষরে পরিণত হইয়াছে। মানুষ বস্তু হইতে প্রতীকে উপনীত হইয়াছে, বস্তুতঃ শব্দমাত্রই একপ্রকার প্রতীক। আবার ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও প্রতীকের ব্যবহার অবিরল। এক সময়ে অগ্নি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ নিশ্চয়ই অগ্নির শিখা আঁকিত, এখন একটি বর্ণ প্রয়োগ করিয়া থাকে—এখানে প্রতীকের ব্যবহার হইল। পরে বহ্নিকে সমস্ত দেবতার প্রতীকরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছে, স্থির করিয়াছে যে, বহ্নিতে হবিপ্রদান করিলে দেবতাদের নিকটে সে বহন করিয়া লইয়া যায়। মানুষ যখন দেবমূর্তির পরিকল্পনা করিল তাহারও মূলে প্রতীকী মনোভাব বর্তমান। দুর্গাপ্রতিমা একটি জটিল মনোভাবের জটিল প্রতীক। বহুশক্তিসমন্বিত বিচিত্র অবস্থা দুর্গাপ্রতিমার অনেকগুলি মূর্তির মধ্যে রূপ পাইয়া একটি প্রতীকরূপে দেখা দিয়াছে। আবার কালীমূর্তিও জীবনের একটি করাল ভাবের প্রতীক। শালগ্রাম শিলা আবার প্রতীক হিসাবে পূর্ণতর, কারণ সেখানে দেবভাবের নির্গলিত মর্মকে একটি শিলাখণ্ডে প্রকাশ করা

হইয়াছে। তারপর দেখিতে পাইব যে, মন্ত্র আরও পূর্ণতর প্রতীক, কারণ সেখানে ভাব বস্তুসংস্পর্শ বর্জন করিয়া শব্দকে মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ওঙ্কারকে পূর্ণ প্রতীক বলিতে পারি, কেননা, এখানে আর বস্তুও নয়, শব্দও নয়, কেবল ধ্বনি মাত্র সহায়, প্রতীকবাদে খুব সম্ভব ইহার বেশি আর অগ্রসর হওয়া যায় না, তাই ইহাকে পূর্ণ প্রতীক বলিলাম।

মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও আদর্শ জীবনের যে-সব প্রতীকের উল্লেখ করিলাম তাহাদের মধ্যে একটি ক্রম বা বিবর্তন রহিয়াছে, আর সেই ক্রম বা বিবর্তন মানুষের মানসিক ক্রমোন্নতির সহিত জড়িত। আগে বস্তুর চিত্র, পরে বস্তুর প্রতীকস্বরূপ শব্দ। আগে দেবমূর্তি, পরে দেবতার প্রতীকস্বরূপ শালগ্রাম ও ওঙ্কার।

এইসব উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আগে বস্তুর ব্যবহার, পরে বস্তুর স্থলে প্রতীকের ব্যবহার। সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতীকের ব্যবহার এই সর্বজনীন ক্রমানুযায়ী। প্রাচীন সাহিত্যে প্রতীক অবর্তমান বা বিরল। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতীক অর্বাচীন সাহিত্যের লক্ষণ। বাল্মীকির রামচন্দ্র দোষে-গুণে প্রকাণ্ড একটা মানুষ। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার রামচন্দ্র পরিপূর্ণ মানবজীবনের প্রতীক। এমন কি তুলসীদাসের রাম বাল্মীকির রামের তুলনায় অনেকটা প্রতীকী ধর্মযুক্ত। হোমারের 'ইউলিসিস' দোষে-গুণে একটি প্রকাণ্ড মানুষ, কিন্তু টেনিসনের 'ইউলিসিস' মানুষের অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসার প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। খুব সম্ভব শেক্সপীয়র রাজকুমার হ্যামলেটকে গড়িবার সময় কেবল রক্তমাংস-সহযোগেই গড়িয়াছিলেন। আমরা সেই হ্যামলেটের মধ্যে মানুষের দুর্ভেদ্য সংশয়পিপাসার আরোপ করিয়া তাহাকে প্রতীকভাবে দেখিয়া থাকি। এইসব দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, প্রাচীন সাহিত্যে প্রতীক বিরল, আরও প্রমাণ করে যে, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও অর্বাচীন মন প্রতীকের সন্ধান করিয়া থাকে, যেখানে ভিতরে প্রতীকভাব

নাই, সেখানে বাহির হইতে সেই ভাব আরোপ করিয়া বসে। প্রতীকীভাব, প্রতীকের সন্ধান বা প্রতীকের আরোপ অর্বাচীন মনের একটি বিশেষ লক্ষণ। সেই অর্বাচীন মন যেখানে সাহিত্য-রচনায় নিযুক্ত, সাহিত্যে প্রতীক সেখানে স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

কেন এমন হইল এই প্রশ্নের উত্তরদান সহজ নয়। জটিল অবস্থার উত্তর স্বভাবতই জটিল হইবে। প্রাচীনকালে জীবন যখন সরল ছিল, তখন জীবনসত্য জটিলতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই, সহজেই চোখে পড়িত, কাজেই জীবনকে প্রকাশ করিলেই জীবনের সত্য বা জীবনস্বরূপ আপনি প্রকাশিত হইত। কিন্তু কালক্রমে জীবনের জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনস্বরূপ দর্শন আর সহজ নাই, বহুর আড়ালে এক, জটিলতার আড়ালে সরলতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচিত্র বস্তু-যবনিকার আড়ালে ইন্দ্রিয়াতীত সত্য অনেক পরিমাণে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্বাচীন মন এই দুর্ভেদ্যকে ভেদ করিতে, প্রচ্ছন্নকে প্রকট করিতে এবং জটিলতাকে সরল করিতে চায়। এই ইচ্ছা হইতেই প্রতীকব্যবহারের উদ্যম। ইহা গেল প্রতীক-ব্যবহারের সামগ্রিক বা সামাজিক কারণ। আবার একটি বিশেষ কারণও আছে। কোন কোন মন একান্ত বস্তু-অসহিষ্ণু। বস্তুকে বিদীর্ণ করিয়া স্বরূপ ধরিতে তাহার আকাঙ্ক্ষা। এইসব বস্তু-অসহিষ্ণু মন বস্তুরূপকে নির্গলিত করিয়া তাহার স্বরূপে পরিণত করে—সেই স্বরূপটি রূপের প্রতীক। সেই শ্রেণীর মনও অর্বাচীন কালধর্মে সৃষ্ট, কাজেই বিশেষ কারণটিও সাধারণ কারণের অন্তর্গত। প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের সাহিত্যে যেমন তুলনা করিয়াছি, তেমনি এই দুই শ্রেণীর মনেরও তুলনা করা যাইতে পারে। কালিদাসের মনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের, শেক্সপীয়রের মনের সঙ্গে মেটারলিঙ্কের মনের বা কীট্‌সের মনের তুলনা চলিতে পারে। প্রতিভার তারতম্য এখানে বিচার্য নয়, মনের শ্রেণীবিভাগটাই লক্ষ্য করিবার মতো।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিচিত্র জীবনরূপের দুটি চিত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত কাব্যবিচারে বসিয়া পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের মধ্যে জীবনস্বরূপের দুটি ভিন্ন প্রতীককে দেখিতে পাইয়াছেন। দুই মহাকবির মধ্যে এখানে প্রথম প্রভেদ কালধর্মের, দ্বিতীয় প্রভেদ বিশেষ মনোধর্মের। শেক্সপীয়রের দৃষ্টি রূপ ও স্বরূপে ভেদ করে নাই, রূপের মধ্যে স্বরূপ, বস্তুর মধ্যেই সত্যকে দেখিতে পাইয়াছে। মেটারলিঙ্ক জীবন-স্বরূপকে একটি 'নীলপাখীতে' পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শেক্সপীয়রের পক্ষে জীবনের আনন্দ জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে, ভালো মন্দ ছোট বড় নরনারীর মধ্যে বিকীর্ণ। মেটারলিঙ্ক সেই আনন্দকে একটি নীলপাখীর মধ্যে সংহত করিয়া তবে তাহার ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কালধর্মের প্রভাবে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্য-ক্ষেত্রেও প্রতীকের ব্যবহার অনিবার্যভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই; প্রতীকী সাহিত্যকে অর্বাচীন সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়াও মনে করিতে হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতেই প্রমাণ হয় না যে, সাহিত্যের সত্যই উন্নতি হইয়াছে। বিবর্তন মানেই উন্নতি নয়, বড় জোর পরিবর্তন, কিন্তু সব পরিবর্তনই যে উর্ধ্বগামী এমন মনে করিবার হেতু নাই। বস্তুকে বাদ দিয়া বস্তুস্বরূপ ধরিবার বিঘ্ন অনেক। প্রথমতঃ সেই রূপকথার গল্পের কুমীরের মতো শিয়ালের পা ধরিতে বটের শিকড় ধরিতে হয়। যাহা আমি বস্তুস্বরূপ মনে করিতেছি বা আজ বস্তুস্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা বস্তুস্বরূপ না হইতেও পারে। তেমন ক্ষেত্রে কালের বদলে প্রতীকের গুরুত্বহানির আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে, আর যেখানে সমস্ত রচনাটিরই ভিত্তি প্রতীক বিশেষ, সেখানে রচনাটিরও মর্যাদা-হানির আশঙ্কা থাকিয়া গেল। তাছাড়া রূপ ও স্বরূপ যে ভিন্ন, বস্তু-আশ্রয়ী নয়, তাহার অন্তরালে সত্য কোথাও আছে—ইহা সামাজিক

বা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সাহিত্যে 'escapism' কথাটা আজকাল ঘন ঘন শোনা যায়। আমি তো বুঝি বস্তুকে বাদ দিয়া সত্যের যে সন্ধান ইহাই একমাত্র escapism বা পলায়নপ্রবৃত্তি। তাহার কারণ আর কিছুই নয়—এইরূপ প্রবৃত্তির ফলে মানুষের দৃষ্টি, মনোযোগ, অনুসন্ধিৎসা সমস্তই মুখ্যকে ছাড়িয়া গৌণের প্রতি ধাবিত হইবার আশঙ্কা। মানুষের কাছে মানুষই মুখ্য, মানুষ বলিতে তাহার অন্তর্নিহিত কোন নির্গুণ সত্তা বা সত্যকে বুঝিবার প্রয়োজন নাই, সুখ-দুঃখ আশা-আশঙ্কা বিরহ-মিলন ও জীবন-মৃত্যুর নানারঙের আলখাল্লা-পরিহিত যে-মানুষ তোমার আমার সম্মুখে বর্তমান তাহাকেই বুঝিতেছি। মানুষের যথার্থ প্রতীক মানুষই, রক্তকরবী বা রথের রশি নয়, কারণ মানুষ এমন বিচিত্র, এমন স্বতোবিরুদ্ধতা-পূর্ণ জীব যে, তাহার নির্গলিত মর্ম কোন একটি বস্তু দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ সম্ভব নয়। যে-কোন প্রতীকই গ্রহণ করি না কেন, তাহা আংশিক প্রকাশ না হইয়া উপায় নাই। কালান্তরে অন্য অংশ যখন প্রবল হইয়া ওঠে, তখন প্রতীকের ও তৎসঙ্গে রচনার মূল্য কমিয়া আসে। মেটারলিঙ্কের রচনার সে মহিমা আর নাই, নীলপাখীকে আর তেমন নীল লাগে না, রক্তকরবীর রঙও ক্রমে ফিকা হইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে নাট্যশিল্প হিসাবে রাজা ও রানীর ত্রুটিবিচ্যুতি গুরুতর হইলেও তাহার মানবিক মূল্য কখনো হ্রাস পাইবে মনে হয় না। এমন কি রাজা ও রানীর সংস্কৃতরূপ যে তপতীকে কবিগুরু উচ্চতর মাপের রচনা বলিয়া মনে করিতেন, মানব-মর্যাদার বিচারে রাজা ও রানীর সহিত তাহা সমানাসন পাইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে সাহিত্যে সর্বদাই সর্বপ্রকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং নিঃসংশয়িত ভবিষ্যদ্বাণীর স্থান নাই। যদি কখনো প্রতীকী সাহিত্যে শেক্সপীয়রের উদ্ভব হয়, তবে এ সমস্ত মতামত অবশ্যই পরিবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। প্রতীকী সাহিত্যের মূলেই দুর্বলতা নিহিত। যে-সাহিত্য রূপকে বাদ দিয়া স্বরূপকে, মনাবকে

বাদ দিয়া তাহার জীবনরহস্যকে ধরিতে চায়, তাহা কখনই সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। জলাশয়কে বাদ দিয়া মাছের কল্পনা সম্ভব নয়। এমন কি যে-মাছ শূন্যে অবস্থিত তাহাকেও শরাসনে সন্ধান করিতে হইলে জলপাত্রে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা অনিবার্য। ফলকথা, রূপক-সাহিত্য ও প্রতীকী সাহিত্য দুয়েরই স্থান সাহিত্যের সাধারণ শ্রেণীতে নয়, নীচেই নির্দেশ করিতে হইবে। ব্যাঙ্কে নোট জমানো চলিতে পারে। কিন্তু প্রিয়কণ্ঠে গাঁথিয়া দিবার সময়ে মোহরেরই আবশ্যক।

২

সাহিত্যে প্রতীকের তিন ভাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে; প্রতীকাভাস, খণ্ডপ্রতীক ও পূর্ণ প্রতীক; এই তিনের মধ্যে প্রতীকাভাসকে প্রতীক পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা সন্দেহ, না ফেলাই উচিত, কারণ প্রতীকপর্যায়ী রচনা ছাড়াও প্রতীকাভাস থাকিতে পারে, প্রায়ই থাকে। কিন্তু তজ্জন্য রচনাটি প্রতীকধর্ম গ্রহণ করে না। কোন রচনায় আবেগের তীব্রতা যখন বৃদ্ধি পায়, তাহার ধমনীতে রক্তপ্রবাহ যখন চঞ্চলতর হইয়া ওঠে, তখন রচনাটি আপন নির্দিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার মধ্যে একটি গভীরতর ও ব্যাপকতর সুরের মূর্ছনা বাজিয়া ওঠে—এই আকস্মিক গভীরায়মানতাকে প্রতীকাভাস বলা যাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র' নাটকের জনহীন গুল্মতৃণাবৃত প্রান্তরে ঝঞ্ঝাবিভ্রান্ত লিয়রের দৃশ্যটির কথাই ভাবিতেছি। এই প্রান্তর ও ঝঞ্ঝা বাস্তব সন্দেহ নাই, কিন্তু লিয়রের ব্যক্তিবেদনা যে-তীব্রতায় পৌঁছিয়াছে, তাহাতে ঐ প্রান্তর ও ঝঞ্ঝা আপন বাস্তব সীমানাকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই কি? কন্যাপরিজন-পরিত্যক্ত বৃদ্ধের জীবন আর ঐ জনহীন প্রান্তর কি সমার্থক হইয়া দাঁড়ায় নাই? লিয়রের প্রচণ্ড ক্ষোভ কি ঐ ঝঞ্ঝার মধ্যে আর্তনাদ করিতেছে না? আরও বেশি। লিয়রের দুঃসহ অভিজ্ঞতার সূত্রে ক্ষণকালের জন্য ঐ নির্জন

প্রান্তর ও প্রলয়ঝঞ্ঝা যেন সমগ্র মানবজীবনেরই নিরর্থকতার প্রতীক হইয়া পড়িয়াছে। অথচ 'কিং লিয়র' নাটকখানিকে কেহই প্রতীকী নাটক বলিবেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতার দাহ এ দৃশ্যটিতে এমন একটি তীব্রতায় পৌঁছিয়াছে, যাহাতে দৃশ্যটি আপন নির্দিষ্ট অর্থের সীমানাকে স্বতঃই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—তাহাতে গভীরতর সুরমূর্ছনায় অকল্পিত অর্থের আভাস লাগিয়াছে। ইহাই প্রতীকাভাস। এই প্রতীকাভাস নাট্য, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি যে-কোন শ্রেণীর রচনায় ক্ষণকালের জন্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া রচনাটি প্রতীকধর্মী হইয়া ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথের সব শ্রেণীর রচনাতেই প্রতীকাভাসের দৃষ্টান্ত অবিরল, এখানে তাহাদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র হইবে।

খণ্ড প্রতীক ও পূর্ণ প্রতীককেই প্রকৃত প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। যে-প্রতীক রচনার অংশবিশেষের সঙ্গে মাত্র জড়িত অথবা যে-প্রতীক রচনার মধ্যে এক আধ বার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, রচনার ভিত্তির সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ কার্যকারণগত নয়, তাহাকে খণ্ড প্রতীক বলা যাইতে পারে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের সন্ন্যাসীর গুহা অবশ্যই একটি প্রতীক। কিন্তু ঐ গুহাটির সঙ্গে নাটকের কার্যকারণগত সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ গুহার উল্লেখ বাদ দিলেও নাটকটি প্রায় বর্তমান রূপেই বিরাজ করিতে পারিত, এখন এই দুটি লক্ষণকে স্মরণ রাখিলে গুহাটিকে খণ্ড প্রতীক বলা ছাড়া উপায় থাকে না। আরও একটি দৃষ্টান্ত। 'রাজা' নাটকের অদৃশ্য রাজার পতাকার যে বর্ণনা ঠাকুর্দা দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ পতাকা কেবল একটি বস্তু বিশেষ মাত্র নয়—উহা অদৃশ্য রাজারই প্রতীক। কিন্তু ইহাও খণ্ড প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়, যেহেতু ঐ বর্ণনার সঙ্গে নাটকটির ভিত্তিগত যোগ নাই, বর্ণনাটুকু বাদ দিলেও নাটকটির বর্তমান আকারের কোন ক্ষতি হয় না। আবার একটি দৃষ্টান্ত। 'ফাল্গুনী'

নাটকে উল্লিখিত গুহাটিও খণ্ড প্রতীক, কিন্তু এটি আগের দুটির চেয়ে পূর্ণতর। এই গুহাটিকে নাট্যঘটনা হইতে বাদ দিয়া নাটকটিকে বর্তমান অবস্থায় রাখা যায় না, কারণ নাট্যঘটনা ঐ গুহাভিমুখেই পরিচালিত। ইহাই তাহার পূর্ণতার কারণ। কিন্তু ইহা পূর্ণ প্রতীক নয়, যেহেতু নাট্যঘটনার সঙ্গে যে-অঙ্গাঙ্গী বা যে-দেহাত্মী যোগ থাকিলে প্রতীক ও নাটক একার্থক হইয়া দাঁড়ায়, সে কার্যকারণগত যোগের এখানে অভাব।

অচলায়তন নাটক পূর্বতর খণ্ড প্রতীকের আর একটি দৃষ্টান্ত, কেন না, ঐ প্রাচীর ভাঙা ও গড়ার উপরে নাটকটা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

সেই প্রতীককেই পূর্ণ প্রতীক বা প্রকৃত প্রতীক বলিব, যাহাকে বাদ দিয়া রচনার অস্তিত্ব চিন্তা করাই যায় না, যাহার উপরে রচনাটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাকে রচনার শিরদাঁড়ার ন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। এহেন প্রতীককেই প্রকৃত বা পূর্ণ প্রতীক বলা উচিত।

ডাকঘর নাটকের ডাকঘর, মুক্তধারা নাটকের মুক্তধারার বাঁধ, রক্তকরবী নাটকের রক্তকরবী ও লোহার জাল এবং রথের রশি নাটিকার রথের রশি—পূর্ণ প্রতীক। ইহাদের কোনটিকেই বাদ দিয়া নাটক পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। এখানে দেখি প্রতীকে ও নাটকে একেবারে দেহাত্মীযোগ, সে যেন এমন ঘনিষ্ঠ যে, নাটকটিই প্রতীক এবং প্রতীকটিই নাটকে পরিণত হইয়াছে। ডাকঘরকে বাদ দিয়া ডাকঘর নাটক কল্পনা করা কি সম্ভব? একথা এই মাত্র উল্লিখিত সবগুলি নাটক সম্বন্ধেই সত্য। এগুলিকে পূর্ণ প্রতীক এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-ব্যবহারের পূর্ণ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা উচিত।

এই গ্রন্থের অন্যত্র আমি মুক্তধারাকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বনাট্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। ঐ উক্তিকে পূর্ণতর করিবার উদ্দেশ্যে

আরও বলা উচিত যে, মুক্তধারা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রতীকনাটক। এখন এই উক্তির ব্যাখ্যা করিতে বসিলেই প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়া যাইবে।

এই মাত্র বলিয়াছি যে, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রথের রশি পূর্ণ প্রতীকের দৃষ্টান্ত। কেন?

ডাকঘর অবশ্যই পূর্ণ প্রতীক কিন্তু ইহার ত্রুটি এই যে, এক অমল ছাড়া নাট্যোল্লিখিত আর কাহারো মনের উপরে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া নাই। ডাকঘরের প্রকৃত ব্যবহার তাহারা সকলেই জানে, কাজেই অমলের নিকটে রাজার চিঠি আসিবার উপলক্ষেই যে উহা স্থাপিত, ইহা কেহই বিশ্বাস করে না, বা করাও সম্ভব নয়। একমাত্র অমলের মনের উপরেই ডাকঘরের যা-কিছু প্রতিক্রিয়া। আরও একটি কথা। নাট্যঘটনাকে ডাকঘরটিও কোনরূপে প্রভাবান্বিত করে নাই, অমলকে করিয়াছে বটে, কিন্তু অমলই বা কিভাবে ঘটনাকে প্রভাবিত করিয়াছে? বরঞ্চ সে-ই ঘটনাস্রোতের দ্বারা প্রভাবিত। সে এতই দুর্বল, এতই অসহায় ও অক্ষম যে, তাহার দ্বারা ঘটনাস্রোতকে এতটুকু বিচলিত করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই ডাকঘরের প্রভাবের দ্বারা অমলের মনের মাধ্যমে নাটককে প্রভাবিত করিবার যে সম্ভাবনা ছিল, তাহা আদৌ কার্যকরী হইতে পারে নাই। এই কররণেই পূর্ণ প্রতীকের দৃষ্টান্ত হওয়া সত্ত্বেও ডাকঘরকে প্রতীকধর্মের চরম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাক মুক্তধারার বাঁধের উদ্ধত যন্ত্রটার। নাট্যোল্লিখিত সকল পাত্রই বাঁধটাকে বিশ্বাস করে, ইহা এমন দুঃসহ সত্য যে, বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। আবার এই বাঁধটার প্রতিক্রিয়া সকলের মনের উপরেই বর্তমান। কেহ ইহাকে ক্ষতিকর, কেহ বা উপকারী মনে করে। তার উপরে নাটকের গল্পটাই বাঁধ-বাঁধার আর বাঁধ-ভাঙার, কাজেই রূপান্তরে গল্প, নাটক আর প্রতীক একাত্মক ও এক। ইহা কেবল পূর্ণ প্রতীক নয়, পূর্ণ প্রতীকেরও

চূড়ান্ত রূপ। এমনটি রবীন্দ্রনাথের আর কোন প্রতীকী নাটকে দেখা যায় না, এমনটি রবীন্দ্রনাথের আর কোন তত্ত্বনাট্যে দেখা যায় না, সেইজন্যই মুক্তধারাকে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

রক্তকরবী নাটকের রক্তকরবীগুচ্ছও পূর্ণ প্রতীক, কিন্তু পূর্ণ প্রতীকের চরমরূপ কিনা সন্দেহ। মুক্তধারা নাটকের ঘটনার উপরে মুক্তধারার বাঁধের যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, রক্তকরবীতে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই। বস্তুতঃ রক্তকরবীর যে মহিমায় নন্দিনী ও অন্য কেহ কেহ বিশ্বাসী, সে বিশ্বাস নাটকের অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীর মনেই নাই। আর নাটকের মূল ঘটনাস্রোত রক্তকরবীর গুচ্ছ-নিরপেক্ষ, অন্য নাটকটায় ঘটনাস্রোত আর মুক্তধারার স্রোত মিলিয়া মিশিয়া একটি শিল্পস্রোতে পরিণত হইয়াছে। মুক্তধারার বাঁধটাকে বিশ্বাস করিবার জন্য নাটকের কোন পাত্রপাত্রীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা অপরিহার্য নয়। রক্তকরবী সম্বন্ধে ইহার বিপরীত। নন্দিনীর মনের বিশেষ ভাবের উপরে আস্থা থাকিলে তবেই রক্তকরবীর সৌন্দর্য ও মহিমা সম্বন্ধে আস্থাবান হওয়া সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে রক্তকরবীর মূল্যহ্রাস হইবার আশঙ্কা।

তারপরে আর একটি কথা। উক্ত নাটকে আরও একটি প্রতীক আছে, রাজার লোহার-জাল-দেওয়া জানালা। ইহাতে প্রতীকের দ্বিত্ব ঘটিয়াছে; রক্তকরবীর গুচ্ছ ও জালায়ন নাট্যব্যাপারে দুটিরই সমান মূল্য, দুটিই সমান মুখ্য; ইহাও একটা প্রধান ত্রুটি। কারণ কোনও নাটকে মূল প্রতীকের দ্বিত্ব ঘটা বাঞ্ছনীয় নহে, ঐরূপ ঘটিলে ঐ দুয়ের ফাঁক দিয়া অনেকখানি রস নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা। এই প্রসঙ্গেও আবার মুক্তধারার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। মুক্তধারা নাটকের প্রারম্ভেও দুটি প্রতীক দেখিতে পাই, একটি বাঁধের যন্ত্র, অপরটি ভৈরব মন্দিরের চূড়া। কিন্তু দুটিকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপন করা হইয়াছে, এমন কৌশলে ব্যবহার করা

হইয়াছে, ভৈরবপন্থী ও যন্ত্রবাদীদের chorus এমন সুপিনদ্ধভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে—দুটি প্রতীক আর ভিন্ন নাই, মিলিয়া মিশিয়া একটিতে পরিণত হইয়াছে। রক্তকরবী নাটকে এমন দুয়ের একীকরণ নাই, রক্তকরবীগুচ্ছ ও মকররাজের জালায়ন স্বতন্ত্র প্রতীকরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া নাট্যব্যাপারের মধ্যে দ্বিধা ঘটাইয়া দিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এবারে বাকি রহিল রথের রশি। উক্ত নাটকের রথের রশি পূর্ণ প্রতীক সন্দেহ নাই। কারণ তাহাকে বাদ দিলে নাট্য-ব্যাপারটাই লোপ পায়। কিন্তু যেখানে মূলে নাটকটাই অকিঞ্চিৎকর, সেখানে তাহার প্রতীকটাকে লইয়া দীর্ঘ আলোচনা শূন্যগর্ভ হইতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যের সহিত ঐ শ্রেণীর বৈদেশিক নাট্যের কিছু কিছু তুলনামূলক আলোচনা হইয়াছে, আরও হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটি কথা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, এ দু'য়ে মিল অনেক স্থানেই আকস্মিক, বড় জোর শিল্পগত; মূলগত মিল খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যের মূল রবীন্দ্রকাব্যেই বর্তমান। তবে কবিতায় যাহা বীজাকারে আছে, নাটকে তাহা বনস্পতিমূর্তি লাভ করিয়া শাখা-পল্লবে জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে—প্রভেদের মধ্যে ইহাই

তত্ত্বনাট্যে দোষ

এবারে রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যের দোষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

কোন মহাকবির রচনার দোষপ্রদর্শন অতি গুরুতর সমস্যা, অতি সন্তর্পণে সে বিষয়ে উদ্যত হওয়া আবশ্যক। কেন না, সমালোচকের চোখে দোষ বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইতেছে বস্তুতঃ তাহা দোষ না হইতেও পারে। মহাকবির প্রতিভায় যাহা সিদ্ধ, সাধারণ সমালোচকের দৃষ্টিতে তাহা দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইলেই যে তাহা দোষ এমন বলা যায় না। মহাকবিগণ বৃহৎকালে সঞ্চরণ করেন, সমালোচক ক্ষুদ্রকালের মধ্যেই আবদ্ধ, ক্ষুদ্রকালে যাহা দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন, বৃহৎকাল তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়। কিন্তু সমালোচক আর কী-ই বা করিতে পারে? নিজের আলোক ম্লানদীপ্তি হইলেও একমাত্র তাহাই তাহার নির্ভর, সেই আলোকের সাহায্যে বিচার করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। তাহার সিদ্ধান্ত পরবর্তী কাল গ্রহণ না করিতে পারে, ইহা জানা সত্ত্বেও তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়—ভয়ে সে কর্তব্যপরাঙ্মুখ হইতে পারে না। সেই কর্তব্যবোধেই আমি এই আলোচনায় উদ্যত হইয়াছি।

তত্ত্বনাট্য (রূপক, সাঙ্কেতিক প্রভৃতি নাটক, বা যে কোন জাতীয় তত্ত্বরচনা, যাহা নিছক তত্ত্ব মাত্র নয়, তত্ত্বমূলক শিল্প) একাধারে জীবনতত্ত্ব ও জীবনচিত্র হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এইসব রচনায় তত্ত্ব ও শিল্প স্বতন্ত্র থাকিলে চলিবে না—দুই অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিশিয়া গিয়া এক ও অচ্ছেদ্য হইয়া যাওয়া আবশ্যক। তত্ত্বের ও চিত্রের মিশ্রণের উৎকর্ষের উপরেই শিল্পের চরম উৎকর্ষ নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ তত্ত্বের ও চিত্রের অর্ধনারীশ্বরত্ব-সাধনই শিল্পীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এমন কি তত্ত্বের উদাহরণস্বরূপ চিত্র প্রদর্শিত হওয়াও যথেষ্ট নহে। চিত্রের মাধ্যমে তত্ত্ববিন্যাস বা তত্ত্ব উপলক্ষে চিত্রাঙ্কনও সমীচীন পন্থা

নহে। বস্ত্রের যেমন এপিঠ ওপিঠ, তত্ত্ব ও চিত্রও তেমনি হইবে। পাঠক যদি কোনটিকে স্বতন্ত্রভাবে ধারণা করিতে সমর্থ হয়—তবে বুঝিতে হইবে যে, শিল্পের মর্যাদা সেখানে সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই।

একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। গ্যেটের ফাউস্ট। ফাউস্ট বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, আধুনিক জীবনের একমাত্র মহাকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই কাব্যখানিতে একটি মহৎ তত্ত্ববীজ নিহিত। কিন্তু সেই তত্ত্ববীজ কাহিনীরূপে, বিচিত্র নরনারীর জীবনরূপে বনস্পতি হইয়া দেখা দিয়াছে; গাছ দেখিলে তাহার বীজের কথা আর মনে পড়ে না, ফাউস্ট বনস্পতি দেখিলেও আর তাহার বীজের কথা মনে পড়ে না—মূলে যাহা তত্ত্ব ছিল—শিল্পে তাহা চিত্ররূপ গ্রহণ করিয়াছে; ইহাই তত্ত্ব ও চিত্রের একাঙ্গীভবন। ঘরের কাছের আরও দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। এগুলি স্পষ্টতঃ তত্ত্বোপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য রচনা হইতে স্বতন্ত্র জাতের। এ তিনখানিতে গীতোক্ত মূলতত্ত্বকে শিল্পরূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন সেইজন্যই শিল্প হিসাবে এগুলি তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কিন্তু বিচার অন্যদিক হইতে করিতে হইবে—তত্ত্ববীজ বহন করা সত্ত্বেও এগুলি যে বর্তমান রূপ ও শিল্পমর্যাদা লাভ করিয়াছে—তাহাই কি বিস্ময়কর নহে? যে-পরিমাণে ইহারা তত্ত্ব ও চিত্রকে এক ও অচ্ছেদ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে—সেই পরিমাণেই ইহাদের শিল্পের উৎকর্ষ। একবার ইহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কথা ভুলিয়া যাই না কেন, ইহাদের কাহিনীর আকর্ষণ, ইহাদের নরনারীর সজীব ও বিচিত্র জীবনলীলার কথা ভাবি না কেন! তখন বুঝিতে পারিব তত্ত্ব হিসাবে ইহাদের যে মূল্যই হোক না কেন, চিত্র হিসাবে ইহাদের উৎকর্ষ অল্প নয়। আনন্দমঠ প্রথমে লিখিত, তারপরে দেবী চৌধুরাণী এবং তারও পরে সীতারাম লিখিত। উৎকর্ষের মানেও ইহাদের কি

সেই ভাবে সাজানো চলে না? আনন্দমঠ সব নীচে, সীতারাম সব উপরে। তাহা হইলে ইহাই কি প্রমাণ হয় না যে, তত্ত্ব ও চিত্রের একাঙ্গীকরণে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছেন, এই দুরূহ পরীক্ষায় ক্রমেই তিনি অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে তত্ত্ব ও চিত্রের সূক্ষ্ম ফাটল চোখে পড়িলেও সীতারামেও সে ফাটল সত্যই কি চোখে পড়ে? সেখানে তত্ত্ব ও চিত্রটি একেবারেই অচ্ছেদ্য ও এক হইয়া যায় নাই কি? ফাউস্টের অসামান্যতা এ গ্রন্থে নাই বটে—কিন্তু দুই-ই কি এক জাতের নয়? আরও একটি কথা—বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই অসামান্য।

এখন বিচার্য এই যে, রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যগুলির শিল্পোৎকর্ষ কিরূপ? এ সব নাটকে তত্ত্ব ও চিত্র, জীবনতত্ত্ব ও জীবনচিত্র কি এক ও অচ্ছেদ্যরূপে দেখা দিয়াছে—না দুয়ের মধ্যে অল্পবিস্তর সূক্ষ্ম ও স্থূল ফাটল চোখে পড়ে?

আমার সিদ্ধান্তটি পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখি, ক্রমে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারিবে। রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে তত্ত্বও আছে চিত্রও আছে, কিন্তু কদাচিৎ দুটি এক ও অচ্ছেদ্যরূপে দেখা দিয়াছে। এইসব রচনায় তত্ত্ব ও চিত্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইবার ফলে কখনো তত্ত্ব চোখে পড়ে, কখনো চিত্র চোখে পড়ে, কিন্তু কদাচিৎ তত্ত্ব ও চিত্র অচ্ছেদ্য শিল্পরূপে একত্র চোখে পড়ে। সমস্ত নাটকেই তত্ত্বের ভার এমন গুরুতর যে, জীবনচিত্রের উপরে তাহাদের যেন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে—চিত্র তত্ত্বকে বহন করিতে পারে নাই, পীড়িত হইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছে—কাজেই দুই-ই স্বতন্ত্রভাবে আমাদের চোখে পড়ে।

তত্ত্ব ও চিত্রের একীকরণ দুই ভাবে হইতে পারে। তত্ত্ব চিত্রে রূপান্তরিত হয়, যেমন দেখি ফাউস্ট কাব্যে; আবার চিত্র তত্ত্বকে বহন করিতে পারে, যেমন দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত উপন্যাস-

গুলিতে। শিল্পপন্থা হিসাবে দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি শ্রেষ্ঠতর। রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে ইহার কোন পন্থাই অনুসৃত হয় নাই —ইহাতে তত্ত্ব ও চিত্র দুইকেই কবি স্বয়ং বহন ও চালনা করিয়াছেন—তাহারা পরস্পরনিরপেক্ষ এবং স্থাবর, কবির ব্যক্তিত্বই তাহাদের কবির অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

তত্ত্বনাট্য বা তত্ত্বোপন্যাস যখন শিল্পে পরিণত হয় তখন দেখা যায় যে, কাহিনীর প্রবল বেগে নরনারীর বিচিত্র জীবনরূপে তাহা দেখা দিয়াছে। গঙ্গোত্রীতে যখন বরফ গলে জল আপনি গঙ্গার খাত বহিয়া চলিয়া আসে। আবার গঙ্গোত্রীতে গিয়া এক কমণ্ডলু জল হাতে বহন করিয়াও আনা সম্ভব। দুই-ই গঙ্গার জল। কিন্তু দুয়ে ভেদ আছে। তত্ত্বনাট্য যেখানে সার্থক শিল্প, সেখানে তাহা আপন বেগে বহিয়া আসে, আর যেখানে শিল্প হইয়া ওঠে নাই, বুঝিতে হইবে তাহা কমণ্ডলুতে বাহিত। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য কমণ্ডলুতে বাহিত। তাহার পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতা কম নয়—আবার স্বয়ং কবি কর্তৃক আনীত বলিয়া তাহার মূল্যও বেশি হইতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, তাহা গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহ নহে।

রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে কাহিনীর বেগ অতিশয় মন্দ, অনেক জায়গায় কোন বেগ আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকগুলি নাটকে স্থান কাল ও ঘটনার কৈবল্য (unity of time, space and action) সাধিত হওয়ায় কাহিনীর বেগ দ্রুত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু সে সুযোগ কদাচিৎ গৃহীত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ কালে ঘটনার দ্রুতগতি দেখানো সহজসাধ্য বটে, কিন্তু তজ্জন্য একটা কাহিনী থাকা আবশ্যক। এইসব নাটকে কাহিনীর অংশ অতিশয় ক্ষীণ। কাহিনী ক্ষীণ—তাহার গতিও ক্ষীণ। অনেক স্থলেই তত্ত্বাশ্রয়ী সংলাপ ও সুমধুর সঙ্গীত কাহিনীর অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সংলাপের অভিব্যক্তি কাহিনীর নয়, কাহিনীর

অভিব্যক্তিই সংলাপে। যেখানে কাহিনী ক্ষীণ বা একেবারেই নাই, সেখানে সংলাপও নাটকীয় সংলাপ হয় না, তত্ত্বের উর্ণাতন্তু অবলম্বন করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া থাকে। ইহাই নাটকগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সত্য। ব্যতিক্রম বলিয়া মুক্তধারাকে মনে পড়িতেছে। মুক্তধারার কাহিনী অন্যান্য নাটকের চেয়ে পুষ্টতর, তাহার গতিও প্রবলতর। রক্তকরবীর প্রথমাংশে কোন গতি আছে বলিয়াই মনে হয় না; পাত্রপাত্রীর সংলাপ নাটকীয় পরিবেশের বহির্ভূত কোন দেশ-কালে যেন কথিত হইয়াছে। শেষের বিদ্রোহ ঘটনার প্রচণ্ড সংঘাতের অপ্রত্যক্ষ দৃশ্যে সমস্ত ত্রুটি যেন সারিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। ঘটনার প্রত্যক্ষ বিন্যাস দেখানো হইলে হয়তো তাহা সম্ভব হইতেও পারিত, কিন্তু পরোক্ষ বর্ণনায় ত্রুটিসংশোধন হয় নাই—কেমন যেন পাঠকের রসবোধের বহির্দ্বারে রহিয়া গিয়াছে।

তত্ত্বনাট্যে কাহিনী ও কাহিনীর বেগ সাধারণ নাটকের চেয়ে বেশি হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে সাধারণ নাটকের চেয়েও কাহিনী অপুষ্টতর এবং তাহার বেগ মন্দতর।

উপন্যাস বা নাটকের প্রাণশক্তি নির্ভর করে তাহার নরনারীর প্রাণশক্তির উপরে। রচনার নরনারীর প্রাণ হইতেই রচনা আপন প্রাণ ও আয়ুষ্কালের দৈর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। ফাউস্ট কাব্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ফাউস্ট, মেফিস্টোফিলিস ও গ্রেশেন সম্বন্ধে দ্বিমত নাই—ইহারাই ঐ কাব্যের স্থায়ী ঐশ্বর্য, এবং যতদিন সজীব ও বিচিত্র নরনারীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকিবে, মানুষেরা পুরুষপরম্পরা ফাউস্টের আসরে আসিতে বাধ্য হইবে। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর ঐ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যসমূহ সম্বন্ধে এ কথা কতদূর সত্য?

রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে একটিও পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য, হৃদয়গ্রাহী, সজীব চরিত্র চোখে পড়ে না। অথচ বিচিত্র নরনারী-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অসামান্য। বিক্রমদেব ও রঘুপতি, নয়ন রায় ও

শঙ্কর, সুমিত্রা ও গুণবতী অসামান্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রসাহিত্যের পর্বে পর্বে এমন বিচিত্র নরনারীর সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু তত্ত্বনাট্যগুলিতে তাহাদের দেখা পাই না কেন? প্রকৃতির প্রতিশোধের নরনারী সবই কেমন ছায়াময়, কেহই রক্তমাংসের জীব নহে। শারদোৎসবের লক্ষেশ্বর আংশিক সজীব বটে, কিন্তু তাহার শ্রেণীরূপটাই প্রবল। ঐ চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার অসীম সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কবি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অচলায়তনের মহাপঞ্চক সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। রাজাতে সুদর্শনার মধ্যে মানবচরিত্রের লক্ষণ অতিশয় প্রবল, ফলে সে মূর্তিমতী বেদনা হইয়াছে, কিন্তু রীতিমত মানুষ হয় নাই। ডাকঘর নাটকে সামাজিক মানুষ হিসাবে কে পুরাপুার বিশ্বাসযোগ্য? ফাল্গুনীতে তো শ্রেণীরূপের ছায়াময় শোভা! রক্তকরবীর নন্দিনীর পক্ষে কবির উক্তি সত্ত্বেও তাহাকে মানব বলিয়া মনে হয় না। মুক্তধারার রণজিতের মধ্যে কিছু মানবিক লক্ষণ আছে সত্য, কিন্তু এত পরিমাণে নাই, যাহাতে তাহাকে রঘুপতি বা বিক্রমদেবের মতো বিশ্বাসভাজন করিয়া তোলে। ধনঞ্জয় বৈরাগী কবিরই বিশেষ একটি মতবাদের বাহ্যরূপ, উক্ত নাটকের পরিবেশের বাহিরে আসিলে সে প্রতিষ্ঠা হারাইয়া ফেলে। ফলকথা—এতগুলি তত্ত্বনাট্য, কিন্তু কোথাও একটিও বৃহৎ বা মহৎ চরিত্র-সৃষ্টি নাই।

ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তত্ত্ব ও চিত্রের ভারসম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহা সম্ভব হইত, এখানে তাহা হয় নাই বলিয়াই এমন ঘটিয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষ গল্পের আকর্ষণে আসে, বিচিত্র নরনারীর দেখা পাইবার আশায় আসে, কিন্তু রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে সে-সব আকর্ষণ ক্ষীণ। কাজেই কোন্ আকর্ষণে লোকে এদিকে আকৃষ্ট হইবে? তত্ত্বের আকর্ষণে আসিবে। কিন্তু তত্ত্ব যে পুরাতন হয়! তখন? এইসব রচনার স্থানে স্থানে যে সুপ্রচুর কবিত্বরস আছে

যাহা কখনো পুরাতন হইবে না, তাহার আকর্ষণে আসিবে। মানবজীবন সম্বন্ধে যেসব গভীর, সূক্ষ্ম ও চিত্তাকর্ষক মন্তব্য আছে তাহার আকর্ষণে আসিবে। এই পর্যন্তই বলিতে পারি।

কিন্তু কতদিন আসিবে? যতদিন না উচ্চতর, সুষ্ঠুতর শিল্পপর্যায়ের তত্ত্বনাট্য লিখিত হইতেছে ততদিন আসিবে। এসব রচনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পসৃষ্টি অপেক্ষা ভবিষ্যৎ তত্ত্বনাট্যকারদের পথনির্দেশক বলিয়া গ্রহণ করা অধিকতর সঙ্গত হইবে। সেই ভাবী তত্ত্বনাট্যসমূহ সৃষ্ট হইলে শিল্পবস্তু হিসাবে রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যের মহিমা লোপ পাইরার আশঙ্কা আছে বলিয়া আমার ধারণা। কিন্তু তখনো আর একজাতীয় আকর্ষণ ইহাদের প্রতি থাকিবে। রবীন্দ্রমানসের গতিবিধির চিহ্নরূপে, প্রচুর কবিত্বরসের আধাররূপে, মানবজীবন সম্বন্ধে সুগভীর মন্তব্যের আশ্রয়রূপে ইহাদের গুরুত্ব কখনো লোপ পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু উচ্চতর শিল্পসম্মত তত্ত্বনাট্যসৃষ্টির সম্ভাবনা অচিরে আছে বলিয়া মনে হয় না—একজনের মধ্যে শিল্পী ও মনীষীর মিলন কদাচিৎ হইয়া থাকে। ততদিন রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্য পাঠক ও দর্শককে আনন্দদান করিতে থাকিবে।

এ নাটকগুলির সবগুলির অভিনয়যোগ্যতা সমান নহে। ডাকঘরের স্বল্পায়তন কাহিনী বিশিষ্ট দর্শকশ্রেণীকে আনন্দদান করিতে সক্ষম। গীতিবহুল ফাল্গুনী গীতিনাট্যও কখনো কখনো আসর জমাইয়া তুলিতে পারিবে। কিন্তু আমার ধারণা, অভিনয়যোগ্য নাটক হিসাবে মুক্তধারার স্থান সর্বোচ্চে। সুদক্ষ প্রযোজকের পরিকল্পনার সাহায্য পাইলে মুক্তধারা শ্রেণীনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর দর্শকেরই আনন্দলাভের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে 'ঠাকুর্দা ও কবি'

রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে ঠাকুর্দা, রূপান্তরে দাদাঠাকুর এবং কবি পরিচয়ে দুটি ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়। একাধিক নাটকে একই নামের বা একই পরিচয়ের পাত্রপাত্রী ঘুরে ফিরে দেখা দিতে থাকলে স্বভাবতই পাঠকের ঔৎসুক্য সজাগ হয়ে ওঠে, মনে হয় ব্যাপারটা কি? মনে হয় এই পাত্রপাত্রীদের দিয়ে লেখক কোন্ বিশেষ ইঙ্গিত করবার চেষ্টা করছেন! মনে হয় ওদের পৌনঃপুনিকতার অর্থ আবিষ্কার করতে পারলে লেখকের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে আরও একটু তলিয়ে যাওয়া যেন সম্ভব হবে। সমালোচনা সাহিত্যের এ একটি চিরাচরিত পন্থা। অন্য একজন বড় লেখকের রচনা থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে সন্ন্যাসী দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনীতে অভিরাম স্বামী, মৃণালিনীতে মাধবাচার্য, চন্দ্রশেখরে রমানন্দ স্বামী এমন অনেক নাম করা যেতে পারে। এইসব সন্ন্যাসী চরিত্র অঙ্কনের দায়ে অনেকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দিত হয়েছেন। অনেকে বলেছেন স্কটের উপন্যাসের নকলে বঙ্কিমচন্দ্র এইসব সন্ন্যাসীর অবতারণা করেছেন। এদেশ সাধু সন্ন্যাসীর দেশ, এ-সব চরিত্র অঙ্কিত করবার জন্যে স্কটের প্রেরণা অনাবশ্যক। কিন্তু এখানে আমরা নিন্দা প্রশংসা বা অন্য কোন বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এঁদের প্রসঙ্গ তুলেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দার কিছু মিল আছে—যদিচ এ পর্যন্ত ঠাকুর্দা চরিত্র সৃষ্টি করবার জন্য তিনি নিন্দিত হ'য়েছেন বলে জানিনে। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীদের পূর্বেতিহাস আমরা জানিনে, আমরা তাঁদের একেবারে দেখতে পাই সিদ্ধ পুরুষ রূপে। তাঁরা আদর্শবাদী কর্মী পুরুষ, যোগবল ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং সেই জন্যেই অনেক সময়ে তারা ঘটনাস্রোতের নিয়ামক। এ অনেকটা গ্রীকট্রাজেডির দেবচক্র deus ese machina-র অনুরূপ যদিচ বঙ্কিমসাহিত্যে সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকলাপ কখনো নৈসর্গিক নিয়ম ও সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম

করে না। এঁদের পরবর্তী ইতিহাসও অজ্ঞাত থেকে যায়। হঠাৎ একসময়ে মহাপুরুষ এসে সত্যানন্দকে নিয়ে চলে যান। "বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল" বলে লেখক বিদায় নেন। মোটকথা, বঙ্কিম উপন্যাসপটে চিত্রিত যে সন্ন্যাসী, সে পূর্বাপরহীন বিশুদ্ধ সিদ্ধ মূর্তি।

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দাও কি তাই নয়? তাদেরও পূর্বাপর জানিনে, মাঝখানে নাটকের মধ্যে তার রসসিদ্ধ সদাপ্রসন্ন মূর্তিখানি দেখতে পাই। কী ভাবে, কোন্ সাধনার পথে এই অবস্থায় সে পৌঁছেছে কবি জানানো প্রয়োজন বোধ করেন নি। কেবল মধ্যাকাশে কিছুক্ষণের জন্য তার শুভ্র ভারবিহীন প্রসন্ন মুখখানা দেখতে পাওয়া যায়, উদয় ও বিলয় দিগন্ত দু-ই সমান অজ্ঞাত। শুধু যে তার পূর্বাপর জানিনে তা নয়, তার পারিপার্শ্বিকের খবরও কিছু পাইনে। নাম ধাম বংশ বাসস্থান প্রভৃতি "name and human habitation"-এর সমস্ত চিহ্ন অঙ্গ থেকে ঝরিয়ে দিয়ে একটি সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দের মধ্যে নির্বিশেষ রূপ লাভ করেছে সে। তার ভাষাটাও গান, প্রাত্যহিক গদ্য নয়, সে যেন "unbodied joy" আনন্দঘন মূর্তি। ঠাকুর্দা যদি "unbodied joy" মাত্র হয় তবে কবি হচ্ছে "A wandering voice"; "A voice a mystery." সুখের বিষয় এ রকম সদাপ্রসন্ন সর্বজন সুহৃদ্ আত্মভোলা ব্যক্তির অভাব নেই আমাদের সমাজে, তাদের দেখেই ঠাকুর্দা চরিত্রের মূল আদরাটা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যে ধাতুতে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা গঠিত, তারই সঙ্গে আর একটু রক্তমাংস, "name and human habitation" মিশিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গড়েছেন কমলাকান্ত মানুষটিকে। আর রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কবির মূল রূপটিকেও দেখতে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের মেলাগুলোতে, গাঁয়ের হাঁটে বাজারে আউল বাউল বৈরাগীরূপে। এরা সব বাংলাদশের মনের মানুষ। বাঙালী সমাজের এই দুটি সর্বজনপরিচিত প্রতিনিধিকে আপন

নাটকে স্থান দিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের নিয়োগ ও ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই মূল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা এখানে সেরে নিয়ে পরে ধীরে-সুস্থে অন্য সব বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারবে। লেখকের বক্তব্য গোড়া থেকে পাঠকের মনে স্পষ্ট থাকলে দুই পক্ষেরই কাজের সুবিধা হয়।

ঠাকুর্দার অনুরূপ যেমন বাঙালী সমাজে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখতে পাওয়া যায় তাকে বাঙালীর একটি অন্তরঙ্গ শিল্পকলায় অর্থাৎ যাত্রার পালা গানে। যাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ জুড়িদলের গান। কিন্তু জুড়ির দল এখন অতীতের বস্তু হয়ে পড়েছে, থিয়েটারের প্রভাবে জুড়ির দলের গান কমতে কমতে এখন সমূলে লোপ পেয়েছে, যার ফলে যাত্রা শিল্প একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হারিয়ে থিয়েটারের অপভ্রংশে পরিণতপ্রায়। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দার, সেই সঙ্গে ধরতে হবে তার গায়ক চেলাদের, কারণ গানের দলটিকে নিয়েই তার পূর্ণতা—এই ঠাকুর্দার নাটকীয় কর্তব্যের সঙ্গে যাত্রাদলের জুড়ির কর্তব্যের মিল দেখতে পাওয়া যায়। এই গেল একদিকের কথা। আবার অন্য দিকে গ্রীক নাটকের কোরাসের সঙ্গেও মিল দেখতে পাওয়া যায় ঠাকুর্দা ও তার গানের দলটির। যাত্রাদলের জুড়ির সঙ্গে ঠাকুর্দার কর্তব্যের মিল সহজেই ব্যাখ্যা করা চলে, কারণ রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ও যৌবনে যে ধরনের যাত্রা পালা শুনেছেন তাতে জুড়ি তখনো কর্তব্যভ্রষ্ট হয় নি, তখনো গান ছিল বড় শরিক।* কিন্তু গ্রীক নাটকের সঙ্গে যে মিল আছে

*এদিকেও যাত্রা পালার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর নাটকের মিল, গানটাই সেখানে দুয়োরাণী। আমরা থিয়েটার "দেখতে" যাই, কিন্তু "শুনতে" যাই যাত্রা। থিয়েটারে "দেখার" অংশটা মুখ্য হয়ে উঠে "শোনার" অংশটাকে কোণঠাসা করে দিয়েছে। যাত্রায় ছিল বারোআনা গান তাই "শোনা" বললে শব্দের অপপ্রয়োগ হয় না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যগুলোকে "শোনা" যায়, এমন কি ফাল্গুনী, রাজা, শারদোৎসবের মতো গীতিবহুল নাটককেও "শোনা" চলে।

বলে মনে হয় তা কোন্ সূত্রে এলো জানিনে। গ্রীক নাটকের ইংরাজি অনুবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর পরিচয় আছে মনে হয় না, তবে প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষে স্বল্প পরিচয়ে ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎ সার টেনে নেওয়া অসম্ভব নয়। শিল্পোৎকর্ষের বিচার ছেড়ে দিয়ে মাত্র পালার জুড়ি গ্রীক নাটকের কোরাস ও রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা ও গানের দলের প্রকৃতি বিচারে বসলে দেখা যাবে যে মূল কর্তব্যে এদের মধ্যে অমিল নেই, এরা তিনজনেই Ideal spectator বা আদর্শ দর্শক। ঘটনা-স্রোত নাটকের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই সব ঘটনাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা উচিত, কী ভাবে গ্রহণ করা উচিত, সেই সব ঘটনা মনের মধ্যে কোন্ তারে ঝঙ্কার তুললে, কোন্ রসের উৎস খুলে দিলে তবে যথার্থ হয়, এ সাধারণ দর্শকদের জানবার কথা নয়, এমন কি নাটকের পাত্র-পাত্রীদেরও সকলের না জানা সম্ভব হতে পারে, আদর্শ দর্শক রূপে যাত্রাদলের জুড়ি, গ্রীক নাটকের কোরাস এবং রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা সেই দেখাটি দেখছে, সেইভাবে গ্রহণ করছে, মনের মধ্যে সেই তারের অনুরণন এবং সেই রসের আস্বাদ অনুভব করছে। একদিকে নাট্যকারের মনে আদর্শ জগৎ, অন্যদিকে দর্শকগণের মনে শিক্ষা ও রুচিভেদে এক বিচিত্র বাস্তব জগৎ, মাঝখানে রঙ্গমঞ্চের উপরে আদর্শে বাস্তবে মেশানো সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ—এই তিন জগতের মধ্যে অনায়াস যাব গতি, এই তিন জগতের ভাষায় যার অধিকার সেই ত্রিচর ও ত্রিভাষী জুড়ি ঠাকুর্দা এ কোরাস একেবারে রসের পরমহংস। কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে সে টানে না বিশ্বসকলের দিকেই সমান টানে তাই সে নির্বিশেষ।

ঠাকুর্দা॥ না, ভাই আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই, সে সব হয়ে বয়ে গেছে, আমি সকল দলের মাঝখানে থাকবো, কাউকে বাদ দিতে পারবো না।[১]

১ শারদোৎসব

অন্যত্র,

দ্বিতীয় ॥ আমাদের রাজার বিচারটা কি রকম দেখানো। ওই আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুর্দা ॥ আমার দশাটাই দেখ্ না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি, আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিল্‌ল না।

তৃতীয় ॥ তবে?

ঠাকুর্দা ॥ তবে কী রে। তাই নিয়েই তো আমার অহঙ্কার। বন্ধুকে কি কেউ কোনদিন পুরস্কার দেয়।[২]

রাজাকে কীভাবে গ্রহণ করা উচিত ঠাকুর্দা এখানে তার ব্যাখ্যাতা।

নির্বিশেষ ও নির্বিকার বলেই নাটকের ঘটনাস্রোতের মধ্যে তার স্থান নেই, আর ঘটনার স্রোতের মধ্যে স্থান নেই বলেই ঘটনার সম্পূর্ণরূপ অর্থাৎ স্বরূপ জানা তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা ঘটনাস্রোতের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, নাটকের বল্‌গা ধারণ করেছে, সেখানে ঠাকুর্দা স্বধর্মচ্যুত। রাজা নাটকে ঠাকুর্দার রাজার সেনাপতিবেশে প্রবেশ ও রাজন্যগণকে যুদ্ধে আহ্বান ও অচলায়তন নাটকে গুরুরূপে অচলায়তনে প্রবিষ্ট-ঠাকুর্দার আদেশ দান—দু-টিই স্বভাব লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত। ঠাকুর্দা ও গানের দলের আরও কিছু কর্তব্য আছে। সুরের ও শব্দের মাধুর্যে দর্শকের মনের উপরে একটি মনোহর চন্দ্রাতপ বুনে দিয়ে রস গ্রহণের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ঠাকুর্দা ও গানের দলের সাহায্যে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যগুলোর একটি প্রধান, বোধ করি প্রধানতম আকর্ষণ সুরসমন্বিতশব্দমাধুর্য। শারদোৎসব, ফাল্গুনী, রাজা প্রভৃতি নাটকের গানের দল বাদ পড়লে

---

২ রাজা

কী অবশিষ্ট থাকে। তানপুরাটির মতো ঠাকুর্দা ও তার সঙ্গীগণ নাটকের মূল সুরটি ধরে রেখে দর্শকের চিত্তকে সেইদিকে আকর্ষণ করছে। এ কাজটি Ideal spectator বা আদর্শ দর্শকের কর্তব্যের অন্তর্গত। আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করলে আপাততঃ এই প্রসঙ্গের শেষ হয়। ঠাকুর্দা ও গানেরদল বিস্তার ও বৈচিত্র্য লাভ করে কবির শেষজীবনের নৃত্যনাট্যে পরিণত হ'য়েছে মনে করলে অন্যায় হয় না।[৩]

ঠাকুর্দা যদি আদর্শ দর্শক এবং নাট্যকার, নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রী ও দর্শকের মধ্যে ত্রিভাষী হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের একাধিক নাটকে যে কবিকে দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রকৃত পরিচয় কি? কবি, কবিশেখর, শেখর কবি, নটরাজ প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত হলেও তার ব্যক্তিত্ব, জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে তার দৃষ্টি অভিন্ন এবং সে ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের নিজের। এই কবি নামান্তরে ও রূপান্তরে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বড় জোর কবিকে তাঁর প্রতিনিধি বলা চলে। ফাল্গুনীর কবিশেখর বা ঋণ শোধের শেখর কবি জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছে তা ভাষান্তরে রবীন্দ্রনাথের মতামত ছাড়া আর কিছুই নয়।—ঠাকুর্দা আদর্শ দর্শক, কবি বিশেষ দৃষ্টির দর্শক, কূটনীতির ভাষায় তাকে কবিগুরুর Personal representative বলা যায়। তবে মনে

৩ শারদোৎসব নাটকে প্রথম ঠাকুর্দা ও গানের দল আবির্ভূত হয় (১৯০৮), তার কারণ তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের গায়করূপে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথকে, যিনি নাকি "আমার সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল নাটের কাণ্ডারী", গায়কদলের নেতা বা ঠাকুর্দা রূপে পাওয়া সম্ভব হল। এই কারণেই পরবর্তী বহুতর নাটকে ঠাকুর্দা ও গানেরদলকে দেখতে পাওয়া যায়। শেষ জীবনে যখন ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য লিখিত হল তখন গানের দলে ছাত্রীদেরও পাওয়া গিয়েছে আর স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত অভিনয়ের জন্য দেশের মন তৈরি হয়ে উঠেছে।

রাখতে হবে যে ঠাকুর্দা ও কবির ভূমিকার এই ভেদ সর্বত্র রক্ষিত হয় নি, দুই মেঘ খণ্ডের মতো বারে বারে মিশে গিয়েছে। এমন হওয়ার একটি কারণ ঠাকুর্দা ও কবি দুজনেরই ব্যক্তিত্বে বায়বীয় উপাদান অধিক, কঠিন পদার্থ কম, এমন স্থলে পাশাপাশি অবস্থান করলে মিলেমিশে না যাওয়াই অসম্ভব। আর একটি সাধারণ কারণ আছে—রবীন্দ্রসাহিত্যে নির্মম তন্ময়তা বিরল। এই বিরলতা রবীন্দ্রনাটকের একটি প্রধান ত্রুটি। যে-সব পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিত্বের সীমানা সুনির্দিষ্ট অনেক সময় তাদেরও কথা ও কাজ অপর এক ব্যক্তির মতো মনে হয়। এমন স্থলে ঠাকুর্দা ও কবির মতো বায়বীয় মানুষের সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব আশা করা বৃথা। তবে মোটের উপরে তাদের সম্বন্ধে পূর্ববর্ণিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সত্য মনে করলে অন্যায় হবে না। রবীন্দ্রনাটকে ঠাকুর্দা ও কবি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যের একটা খসড়া দেওয়া গেল, এবারে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

২

সর্বপ্রথম শারদোৎসব নাটকে ঠাকুর্দাকে সুপ্রকটভাবে দেখা গেল। তারপরে রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর নাটকে তাকে দেখা যাবে। এ ছাড়া গুরু, অরূপরতন, ঋণশোধ প্রভৃতি নামান্তরিত নাটকেও ঠাকুর্দা আছে। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক অচলায়তন ও গুরু নাটকে ঠাকুর্দা দাদাঠাকুর পরিচয়ে জ্ঞাত। এইগুলিই ঠাকুর্দার বিশুদ্ধ মূর্তি যদিচ কোন কোন নাটকে ঠাকুর্দা চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখা যায়, তৎসত্ত্বেও বিশিষ্ট কারণে তাদের ঠাকুর্দা কিংবা ঠাকুর্দা পর্যায়ের ব্যক্তি মনে করা উচিত নয়। প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ ও মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগীতে ঠাকুর্দার কতক লক্ষণ আছে, গান তার ভাষা, সে সমদর্শী মুক্তপুরুষ এবং সর্বোপরি জীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু হলে কি হয়, তার একটি

বিশেষ জীবনতত্ত্ব আছে. সেই তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যেই তার আবির্ভাব। ঠাকুর্দার নিজস্ব কোন তত্ত্ব নাই, কিংবা বলা উচিত যে সমস্ত তত্ত্বের যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে সে। তার নিজের কোন কথা না থাকাতে সকলের কথার সঙ্গে, সকলের দৃষ্টির সঙ্গে সহজে তার মেলে, তাই সে সার্বজনীন প্রতিনিধি। এসব কথা আগে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফাল্গুনীর বাউল এবং রক্তকরবীর বিশু পাগলের গানের ভাষাটি ঠাকুর্দার অন্যতম লক্ষণ বটে তবে তাদের এমন আর কোন লক্ষণ নাই যাতে তাদের ঠাকুর্দা পর্যায়ের মনে করা চলে। কাজেই আগে যে-সব নাটকের উল্লেখ করেছি সেইগুলিই অবশিষ্ট থাকলো, শারদোৎসব রূপান্তরে ঋণশোধ, রাজা রূপান্তরে অরূপরতন, অচলায়তন রূপান্তরে গুরু এবং ডাকঘর।

এই নাটকগুলির মধ্যে রাজার ঠাকুর্দায় এবং অচলায়তনের দাদাঠাকুরে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আর আমি যতদূর বুঝি সে বৈশিষ্ট্য ঠাকুর্দা চরিত্রের অন্তর্গত নয়। প্রয়োজন কালে দু'জনেই যোদ্ধারূপে দেখা দিয়েছে।

অচলায়তনে দেখি, যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ। মহাপঞ্চক শুধায়, উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ, তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রু বেশ কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে। সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

রূপান্তরিত গুরু নাটকেও এই অংশটি অবিকল বিদ্যমান।

রাজা নাটকেও প্রায় অনুরূপ একটি দৃশ্য পাওয়া যাবে।

কাঞ্চী বিদর্ভ পাঞ্চাল প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ স্বয়ংবর সভায় উপবিষ্ট হয়ে সুদর্শনার জন্যে অপেক্ষা করছে এমন সময়ে যোদ্ধৃবেশে ঠাকুর্দার প্রবেশ।

কলিঙ্গ। ও কী ও। ও কে?

পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে লোকটা প্রবেশ করে কে হে!

বিরাট। স্পর্ধা তো কম নয়! কলিঙ্গরাজ, তুমি একে রোধ করো।

কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।

বিদর্ভ। শোনা যাক না কি বলে।

ঠাকুর্দা। রাজা এসেছেন।

বিদর্ভ। রাজা!

পাঞ্চাল। কোন্ রাজা?

কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা।

ঠাকুর্দা। আমার রাজা।

বিরাট। তোমার রাজা।

কলিঙ্গ। কে?

ঠাকুর্দা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন।

কোশল। কী তার অভিপ্রায়।

ঠাকুর্দা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাঞ্চী। ইস্! আহ্বান! কী ভাবে আহ্বান করেছেন।

ঠাকুর্দা। তাঁর আহ্বান যিনি যে ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই—সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিরাট। তুমি কে?

ঠাকুর্দা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

কাঞ্চী। সেনাপতি, মিথ্যে কথা! ভয় দেখাতে এসেছ? তুমি মনে করছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়েনি? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি। তুমি আবার সেনাপতি।

ঠাকুর্দা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মতো অক্ষম কে আছে। তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন, বড় বড় বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

* * * *

কাঞ্চী। আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি রাজদূত, কিন্তু সভায় নয় রণক্ষেত্রে।

ঠাকুর্দা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সেও উত্তম প্রশস্ত স্থান।

অরূপরতন নাটকে এ অংশ নাই, ঠাকুর্দাকে সেখানে যোদ্ধবেশ গ্রহণ করতে হয়নি।

আমার বিবেচনায় এসব ঠাকুর্দা চরিত্রের স্বধর্মচ্যুতি। গ্রীক নাটকে কোরাস বা কোরাসের নায়ক কখনো হাতেকলমে কাজে নামে না, ওটা তার কর্তব্যের মধ্যে নয়, সে ঘটনার ব্যাখ্যাতা মাত্র। আমাদের যাত্রাপালার জুড়িরাও তাই। আগে বোঝাতে চেষ্টা করেছি রবীন্দ্র নাটকে ঠাকুর্দার অনুরূপ কর্তব্য, সে ব্যাখ্যাতা, কর্মী নয়। ব্যতিক্রম বলে পূর্বোক্ত ঠাকুর্দা চরিত্রগুলোকে বাদ দিলে তার বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রূপটি পাই শারদোৎসব, রূপান্তরে ঋণশোধ ও ডাকঘর নাটকে, ঐ সঙ্গে অরূপরতনকে ধরা যেতে পারে, কারণ রাজা নাটকের ঠাকুর্দার মতো হঠাৎ সে কর্মী পুরুষ হয়ে ওঠে নি। কাজেই প্রধানতঃ শারদোৎসব ও ডাকঘরকে অবলম্বন ক'রে ঠাকুর্দা

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবো। আলোচনার সময়ে ঋণশোধ ও অরূপরতনের কথাও মনে রাখতে হবে।

ঠাকুর্দার কতকগুলি নিত্য লক্ষণ আমরা স্থির করেছি, সে মুক্তপুরুষ, তার আত্মীয়তার বন্ধন বিশেষ কারো সঙ্গে নয় বলেই সকলের সঙ্গে। ঠাকুর্দা সহজ রসের সিদ্ধপুরুষ, সকলের সঙ্গে তার সহজে মেলে বিশেষ করে বালক ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। এই দুই ঘনিষ্ঠ লক্ষণ মিলিয়ে তাকে সার্বভৌম পুরুষ বলা যেতে পারে। এই সার্বভৌম পুরুষের আত্মপ্রকাশের ভাষা গান, আত্মপ্রকাশের পথ সখ্যরস, মানুষ মাত্রেরই, রাজা কি রাখাল, সে সখা। শারদোৎসব নাটকের বালকদের সে সখা; রাজা নাটকে রাজার বন্ধু বলে পরিচয় দেয় সে; ডাকঘরের অমলের সে অকৃত্রিম বন্ধু; এমন কি অচলায়তনের শোণ পাংশুগণ তাকে বন্ধু বলেই জানে।

শারদোৎসব নাটকে নিজের পরিচয়দান উপলক্ষে বালকদের সে জানিয়েছে, "না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই, সে-সব হয়ে বয়ে গেছে, আমি সকল দলের মাঝখানে থাকবো। কাউকে বাদ দিতে পারবো না।" আবার সন্ন্যাসী তাকে জানিয়েছে, "তুমি যে জগতের ঠাকুর্দা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, সে তো তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না।"

ডাকঘরের মাধব দত্ত ঠাকুর্দাকে ভয় করে, পাছে কবিরাজের নিষেধ লঙ্ঘন করে অমলকে বাইরে নিয়ে যায়, বলে, "তুমি যে ছেলে খেপানর সর্দার।" একদিকে সে যেমন সকল বালকের বন্ধু, তেমনি আর একদিকে রাজারও সে বন্ধু। অমলকে সে আশ্বাস দেয় রাজা তাকে চিঠি লিখবার উদ্দেশ্যেই তার জানালার সম্মুখে ডাকঘর বসিয়েছেন; মোড়ল পরিহাস করে সাদা কাগজ এগিয়ে দিলে ঠাকুর্দা বলে ওঠে, এ তো সত্যই রাজার চিঠি, সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে

পায় সে। "হ্যাঁ বাবা, আমি ফকির, তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।" তার কথা মিথ্যা হওয়ার নয়, রাজার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সুদর্শনা বলে, "শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু, আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।" ঠাকুর্দা বলে ওঠে, "করো কী, করো কী। আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।" রাজার বাহ্য কঠোরতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে ঠাকুর্দা বলে, "চিনে নিয়েছি যে, সুখে দুঃখে চিনে নিয়েছি, এখন সে আর কাঁদাতে পারে না।" ঠাকুর্দার উক্তি থেকে জানতে পারা যায় যে দুঃখ কণ্টকিত সাধনার পথ তাঁকে পার হয়ে আসতে হয়েছে, তবে সেটা নাটকের বাইরে পড়েছে।

ঠাকুর্দার আর একটি লক্ষণ, তাকে নিত্যলক্ষণ না বলে পূর্বোক্ত নিত্যলক্ষণ সমূহের অনুষঙ্গ বলা চলে, তার মধ্যে একটা চিরনবীনতা আছে।

অরূপরতনে একজন নাগরিক শুধায়, "ঠাকুর্দা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ যে?

ঠাকুর্দা। নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছি।

জনার্দন। সেটা কি তোমাকে শোভা পায়?

ঠাকুর্দা। ওরে পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।"

ঠাকুর্দা আরও বলে, "আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি, বুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল।"

কৌণ্ডিন্য। "তা তুমি নতুন হয়েই রইলে, সে কথা সত্যি, বুড়ো হবার সময় পেলে না।

ঠাকুর্দা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাই নে।"

জরাজয়ী এই নবীন বৃদ্ধটির স্থান সহজ রসের মুক্ত অঙ্গনে যেখানে সব বয়সের সমান অধিকার, আবার যেখানে ঋতু পর্যায়ের লীলা উৎসব নিত্য প্রকট। তাই তাকে দেখতে পাই শারদোৎসবে, রাজা

নাটকের বসন্তোৎসবে। অবশ্য অসুস্থ অমলকে সে ঘরের বাইরে আনতে পারে না, সেইজন্যেই বাইরের মুক্তির ও আনন্দের আবহাওয়াকে সোজা নিয়ে আসে বদ্ধ ঘরের মধ্যে।

এই ছায়াশরীরী পাত্রটি কোন ব্যক্তি নয়, একটি ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র, তার দেহে রক্তমাংস নেই বল্‌লেই হয়। ঠাকুর্দার দেহে রক্তমাংস জুড়ে দিলে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দোসর হতে পারতো, এ কথা আগেই বলেছি, দু'জনেই লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আরও এক বিষয়ে দু'জনের মিল আছে। কমলাকান্ত কালসমুদ্রের পরমহংস, কালসমুদ্রে বিচরণ করা সত্ত্বেও তার গায়ে কালির চিহ্ন পড়েনি। কমলাকান্তের দপ্তরে কালক্রমে আর সকলেরই পরিবর্তন হয়েছে, কমলাকান্ত গোড়াতেও যেমন ছিল শেষেও তেমনি রয়ে গিয়েছে; দপ্তরের ভিতরে বাইরে তার সমান নির্বিকার অবস্থা, সেইজন্যেই কালে কালে তাকে অবলম্বন করে নূতন সৃষ্টির প্রয়াস হয়েছে। ঠাকুর্দাও কালানুক্রমিকতার উর্ধ্বে। নাটকে অনেকেরই পরিবর্তন ঘটেছে, ঠাকুর্দা অপরিবর্তিত, শুধু তাই নয় সে অপরিবর্তনীয়। দেহে রক্তমাংস নেই বলে এই ব্যাপারটা দেখানো সহজ হয়েছে। তার দেহে রক্তমাংস নেই বটে কিন্তু রক্তমাংসল একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে— ঠাকুর্দার ছায়াশরীরী মূর্তি তারই দূরবিক্ষিপ্ত ছায়া বলে মনে হয়। সেই ব্যক্তিটি জীবনস্মৃতি গ্রন্থের শ্রীকণ্ঠ সিংহ, জীবনস্মৃতির পাঠক তাকে জানেন।

জীবনস্মৃতি গ্রন্থের শ্রীকণ্ঠবাবু পরিচ্ছেদ থেকে শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য উদ্ধার করে দিলে ঠাকুর্দা চরিত্রের সঙ্গে মিলির ঘনিষ্ঠতা বুঝতে কষ্ট হবে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "তাঁহার [শ্রীকণ্ঠবাবুর] বাম পার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।…পরিচয়

থাক আর না থাক স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষ মাত্ররই প্রতি তাহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না।—সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল, তিনি কাহারো সম্বন্ধেই সঙ্কোচ রাখিতেন না, কেননা, তাঁহার মনের মধ্যে সঙ্কোচের কারণই ছিল না।…এই বৃদ্ধটি আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলের সঙ্গেই তাহার বয়স মিলিত।"

"সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জিত" ভগবদ্‌ভক্ত এই বৃদ্ধটির গানের প্রিয় শিষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই বয়স থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। বাল্যকালের এই প্রভাব পরিণত ও ফলপ্রসূ হয়েছে ঠাকুর্দা চরিত্রে। কিন্তু তার আগে বৌ-ঠাকুরাণীর হাটের বসন্ত রায় চরিত্রে শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রথম ছায়া নিক্ষেপ করেছেন, শ্রীকণ্ঠ সিংহের অনেক গুণ বসন্ত রায়ে। এই বসন্ত রায় আবার দেখা দিল প্রায়শ্চিত্ত নাটকে। তারপরে আর তাকে পাইনে, তার বদলে পাই অনতিকাল পরে লিখিত শারদোৎসব নাটকে ঠাকুর্দাকে। তারপরে তাকে অনেক নাটকে অনেকবার পাই। এতক্ষণ আমরা ঠাকুর্দা চরিত্রের উদ্ভব, বিবর্তন ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, তার আগে আলোচনা সেরে নিয়েছি ঠাকুর্দা চরিত্র পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে। এবারে সাধারণভাবে উপসংহার সেরে নিলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে।

এই ঠাকুর্দা চরিত্রটি সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন ছিল কি? ছিল বলেই মনে হয়। ঠাকুর্দাকে প্রথম পাই শারদোৎসব নাটকে, তারপরে অনেকগুলি নাটকে ও নাটকের রূপান্তরে। শারদোৎসব রচনার সময় থেকে রববীন্দ্রনাথের নাটক রচনায় মোড় ঘুরে যায়, পূর্ববর্তী রাজা ও রাণী, বিসর্জন, গান্ধারীর আবেদন, সতী, কর্ণকুন্তী সংবাদ প্রভৃতিতে অঙ্কিত জীবন চিত্র সম্বলিত নাটক জীবনতত্ত্ব

সম্বলিত নাটকের দিকে চলতে থাকে; জীবন চিত্রের জীবনতত্ত্বে পরিণত হওয়ার প্রবণতা এই সময় থেকে, শারদোৎসব রচনার সময় থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্য নামের অভাবে এই সময়ের নাটকগুলিকে নটীর পূজা ও তপতীর ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তত্ত্বনাট্য বলা হয়েছে। এখানেই ঠাকুর্দার প্রয়োজন। তত্ত্বগুলোকে বিশ্লেষণ করে দর্শককে বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই ঠাকুর্দার পরিকল্পনা বলে মনে হয়। নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ও দর্শকের মধ্যে ব্যাখ্যার খেয়া পারাপার করছে বলে সে দোভাষী, সেই সঙ্গে নাট্যকারকে ধরলে ত্রিভাষী, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আমাদের যাত্রা পালার জুড়ি ও স্ত্রী নাটকের কোরাসের পরিকল্পনা এ কথাও আগে বলা হয়েছে। খেয়ার মাঝির মতোই ঠাকুর্দার সীমাবদ্ধ ভূমিকা, ব্যাখ্যার নৌকাখানা ঠেলে ঘটনার কূল থেকে দর্শকের কূলে নিয়ে যাচ্ছে, বাস্, তার পরেই তার ছুট। ঠাকুর্দা চরিত্র রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার মহৎ সৃষ্টি না হতে পারে, তবে যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। ঠাকুর্দা তত্ত্বনাট্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাকে বাদ দিলে তত্ত্বনাট্যকে দাঁড় করানো কঠিন, তার ব্যাখ্যার সুযোগ নিয়ে তবে যেন রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বনাটক লিখতে সাহস করেছেন, এই রকম আর একটি সুযোগ তিনি আদায় করেছেন শেষ জীবনের নাটকগুলিতে পরিকল্পিত কবি চরিত্রের কাছে থেকে।

ঠাকুর্দা ও কবি দুজনেই ব্যাখ্যাতা, তবে ঠাকুর্দায় তত্ত্ব ব্যাখ্যা, আর কবিতে আত্ম ব্যাখ্যা।

রবীন্দ্রনাটকে নাট্যকারের মুখপাত্ররূপে কবির প্রথম আবির্ভাব ফাল্গুনী নাটকের সূচনায়, কখনো কখনো যাকে বলা হয়ে থাকে বৈরাগ্যসাধন। তার পরে ফাল্গুনীর কবিশেখর শারদোৎসবের নামান্তর ঋণশোধের ভূমিকায় শেখর কবি নামে দেখা দেয়। রথের রশি ও তার পূর্বরূপ রথ যাত্রায় এবং কবির দীক্ষায় কবির ভূমিকা

পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, বসন্ত ও শ্রাবণ গাথা নামে ঋতুনাট্যে কবি আছে একটু বিশেষ পরিচয়ে। বসন্তে কবি নামে যার পরিচয় সে সভাকবি, আর নটরাজ যার নাম আসলে কবির ভূমিকা তারই, যদিচ নামটা ভিন্ন। শ্রাবণ গাথায় আছে সভাকবি আর নটরাজ। দুটি নাটিকাতেই নটরাজ রবীন্দ্রনাথের মুখপাত্র, আর কবি ও সভাকবি সভাসদ্‌গণের মুখপাত্র যাদের কাব্যরুচি নাকি গতানুগতিক। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে মূল ফাল্গুনী ও শারদোৎসবে কবি ছিল না। ফাল্গুনী নাটক লিখবার বৎসরাধিক কাল পরে কলিকাতায় অভিনয় কালে সূচনাটি সংযোজিত হয়, তখন দেখা দেয় কবিশেখর। আর শারদোৎসব রচনার বেশ কয়েক বৎসর পরে যখন নাটকটি ঋণশোধ নামান্তর গ্রহণ করে তখন শেখর কবিকে দেখতে পাওয়া গেল। আর কিছুই নয়, কবির আত্মব্যাখ্যার ইচ্ছা থেকে ওদের সৃষ্টি। আত্মব্যাখ্যার আগ্রহ বোধ করি বার্ধক্যের একটি লক্ষণ। প্রবীণ পিতামহের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে ব্যাখ্যা ছাড়া অতিশয় সহজ কথাটাও পৌত্র বুঝতে সক্ষম।

ফাল্গুনী নাটকের ভূমিকায় আছে যে ইক্ষ্বাকু বংশীয় এক রাজা হঠাৎ একদিন মাথায় দুটি পাকা চুল দেখতে পেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, ভাবেন বয়স তো গেল, এবারে পরকালের চিন্তা আরম্ভ করা যাক, তিনি ডাক দেন শ্রুতিভূষণকে যাঁর পেশা নাকি মানুষের মনে বৈরাগ্যের দীক্ষা দান। শ্রুতিভূষণ রাজ আহ্বানে ছুটে আসেন, সঙ্গে আনেন বৈরাগ্যবারিধি নামে পুঁথি। শ্রুতিভূষণ সহযোগে রাজা বৈরাগ্যতত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন হন। ওদিকে অনাদরে পড়ে থাকলো রাজার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের কাতর ক্রন্দন, প্রত্যন্তসীমা থেকে আগত যুদ্ধের সঙ্কট সংবাদ, চীন সম্রাটের আপেক্ষমান দূত। বৈরাগ্যবারিধি বলেন জীবনটাই যখন অনিত্য তখন এ সমস্তর কী প্রয়োজন। শ্রুতিভূষণের ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগে কবিশেখর এসে উপস্থিত হন। তিনি আনুপূর্বিক শুনে বলেন যে বৈরাগ্য-

সাধনের যথার্থ সঙ্গী কবিরা, কেননা, "আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য।...আমাদেয় মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোনে তোদের থলি থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে, বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।"

রাজার পাকাচুলের ভীতিকে ব্যাখ্যা করে কবিশেখর বলেন, "মহারাজ এ যৌবন ম্লান যদি হল তা হোক না। আরেক যৌবন-লক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

কবিশেখরের কথা রাজা বুঝতে পারেন না, তবে কথাগুলো মনের মধ্যে গিয়ে ঝঙ্কার তোলে, তিনি কবিশেখরকে একটা নাটকের ফরমাশ করেন। কবিশেখর প্রস্তুত আছেন, তিনি বলেন তাঁর নাটকের বিষয়টা হচ্ছে শীতের বস্ত্রহরণ অর্থাৎ, "বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।"

এইভাবে কবিশেখরের মুখ দিয়ে ফাল্গুনী নাটকের তত্ত্ব ব্যাখ্যা সেরে নিয়েছেন নাট্যকার, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চান কবিশেখর তাই বলেছেন।

ঋণশোধ নাটকের ভূমিকায় শেখর কবি রাজাকে বোঝান, "আমি কেবল স্মরণ করাই, এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।"

রাজা বলেন, "অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়।...তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ! কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে বলো। আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।"

শেখর কবি বলেন, "প্রেমও যে অমৃত মহারাজ।" রাজা শুধান, "কবি ভালবাসাতো দেব কিন্তু কোথায় দেব?"

শেখর ॥ মহারাজ, যেদিন সময় আসে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন বাজে খরচের দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে।

বিজয়াদিত্য ॥ বুঝেছি কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অমৃতের ঋণ শোধ করতে বেরোবো।

বিজয়াদিত্য ও শেখর কবির সংবাদচ্ছলে নাট্যকার ঋণশোধ নাটকের মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা সেরে নিলেন, দর্শকদের পক্ষে নাটকটি যাতে সুগম হয়। শেখর কবি রবীন্দ্রনাথের মুখপাত্র।

কালের যাত্রা নাটকে অবশেষে শূদ্রদলের টানে রথ চল্‌ল। সকলে অবাক, এ কী কাণ্ড, রাজার টানে চল্‌ল না, পুরোহিতের টানে চল্‌ল না, ধনিক, সৈনিক কারো টানে চল্‌ল না, চল্‌ল কিনা শূদ্রদলের টানে। এমন সময়ে নাট্যকারের মুখপাত্ররূপে কবির প্রবেশ। সবাই শুধোয় এ কেমন করে সম্ভব হল ?

কবি বলেন ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি, নীচের দিকে নামলো না চোখ, রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানেনি।

পুরোহিত ॥ তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান, ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে ?

কবি ॥ পারবে না হয়তো।

একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই। দেখো কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে, জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের। তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

তখন আবার রথ অচল হলে বোধ করি চালাবার জন্যে ডাক পড়বে কবির, ঠাট্টা করে শুধোয় পুরোহিত। তদুত্তরে কবি বলেন, "নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুতঠাকুর। রথযাত্রায় কবির ডাক

পড়েছে বারে বারে, কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারেনি সে পৌঁছতে।”

পুরোহিত॥ রথ তারা চালাবে কিসের জোরে, বুঝিয়ে বলো।

কবি॥ গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। আমরা মানি ছন্দ, জানি এক ঝোঁকা হলেই তাল কাটে। মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে চালচলন যার বাঁকা।”

কবি বোঝান যে আজ রথের ঠাকুর “ওদের (শূদ্রদের) দিকেই পাশ ফিরলেন, নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়ে ছিল অতিশয় বেশী, ঠাকুর নেমে দাঁড়ালেন ছোটর দিকে, সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে। সমান করে নিলেন তাঁর আসন।”

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে যাঁদের কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, কবির মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল নন, বিপ্লববাদী নন, সমাজে রাজনীতিতে জীবনে তিনি একান্তভাবে ভারসাম্যবাদী। রথের রশির কবি সেই ভারসাম্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছে। আর সেই সঙ্গে করেছে সমাজে রাজনীতিতে জীবনে কবির ভূমিকার ব্যাখ্যা। অভিষেক থেকে সভ্যতার সঙ্কট পর্যন্ত যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যাবে যে এদিক ওদিক দু'দিকের টানাটানির মধ্যে, একঝোঁকা তাল কাটবার মুখে, সুন্দরের অপমানের সঙ্কটে, বীভৎসার জয়ধ্বনির সময়ে ভারসাম্য রক্ষার্থে কবির ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। “মেশিনগানের সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান”—উক্তির মধ্যে এই তত্ত্বের মূল নিহিত। এ সত্যটি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম না করলে রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা বৃথা।

কবির দীক্ষা নাটক নয়, কবি ও তত্ত্বানন্দ স্বামীর শিষ্যের মধ্যে সংলাপ মাত্র। এখানে কবি ত্যাগ ও ভোগের যে আপেক্ষিক

সম্বন্ধটি বিবৃত করেছেন তা সর্বৈব রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ধারণা। কবি এখানে সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরালের কবি রবীন্দ্রনাথ।

বসন্ত ও শ্রাবণগাথাতে নটরাজ কর্তৃক প্রকাশিত মতামত সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

এবারে উপসংহার করা যেতে পারে। বিশেষ প্রয়োজনে অর্থাৎ তত্ত্বব্যাখ্যার ও আত্মব্যাখ্যার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর্দা ও কবি চরিত্র দুটি সৃষ্টি করতে হয়েছে। এদের চরিত্রে ব্যক্তিত্বের অভাবটাও এই কারণ সঞ্জাত। যাদের সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে তাদের পক্ষে সর্বতোভাবে অপরের মুখপাত্র হয়ে ওঠা কঠিন, অপরের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলে ফেলা, বসে নিজের রঙে রঙিয়ে বলা তাদের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়। তাই তারা ব্যক্তিত্বহীন ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে—সেই শূন্য পাত্র ভরে উঠেছে কবির তত্ত্ব ব্যাখ্যায় ও আত্মব্যাখ্যায়। যে প্রয়োজনে তারা সৃষ্ট সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। এরকম ঝাপসা রেখায় অঙ্কিত চরিত্র রক্তমাংসের মানুষের ন্যায় কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, এরাও হয় নি, কবিও তা প্রত্যাশা করেন নি। কবির ধারণা তাদের কথাগুলোয় বিশ্বাস হলেই যথেষ্ট, সজীব মানুষরূপে তাদের বিশ্বাস করবার আবশ্যক নেই। নাটকীয় বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ সৃষ্ট এই চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলা ও তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর তাৎপর্য পূর্ণ। এদের একজন "unbodied joy", অপর জন, "A wandering Voice, a mystery", এদের বুঝতে পারা গেলে রবীন্দ্রবোধের দিকে খানিকটা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে জনতা

(রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটকে জনতার ভূমিকা দেখা যায়, নাটকগুলির রূপান্তর ধরিলে সংখ্যা আরও বাড়িবে। কোন কোন নাটকে আবার একাধিক জনতা, যেমন রাজা নাটকে বিদেশী পথিকগণের জনতা এবং নাগরিকগণের জনতা। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর জনতা দেখা যায়, তাহারা ঠাকুর্দার নেতৃত্বে পরিচালিত গানের দল। ইঁহাদের পূর্বোক্ত জনতার সহিত এক করা চলিবে না, ইঁহাদের স্বতন্ত্র বক্তব্য বা অস্তিত্ব কিছুই নাই, ঠাকুর্দার গানের দোহারকি করিবার উদ্দেশ্যেই ইঁহারা সৃষ্ট, ইহাদিগকে ঠাকুর্দার ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ মনে করিলে অন্যায় হইবে না।

বহুসংখ্যক নাটকে বিদ্যমান এই যে জনতার কথা বলিলাম, তাহাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা একেবারে নিরর্থক নয়, কেন না, তাহাদের মধ্যেও নাট্যকারকে পাওয়া সম্ভব। এইসব ছায়াপ্রায় ব্যক্তিত্বহীন জনপিণ্ড নাট্যকারের নিতান্তই বাম কল্পনার সৃষ্টি তবু তাহার মধ্যে স্রষ্টার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সৃষ্ট বস্তু যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তন্মধ্যে স্রষ্টার পরিচয় না থাকিয়া যায় না। আর অধিক অগ্রসর হইবার আগে মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এইসব জনতার শুধু যে ব্যক্তিত্ব নাই তাহা নয়, ইহাদের ভূগোল বা ইতিহাস বলিয়াও কিছু নাই। যশোরের জনতা এবং উত্তরকূটের জনতার প্রভেদ নাই আবার সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিপুরা রাজ্যের জনতা এবং অনির্দিষ্ট শতাব্দীর জলন্ধরের জনতা অভিন্ন। কবি কি বলিতে চান যে জনতা জনতা; দেশ-কাল-ভেদে তাহাতে তারতম্য ঘটে না, সর্বদেশে সর্বকালে তাহার মনস্তত্ত্ব ও আচরণ এক প্রকার। কিম্বা কবি কি বলিতে চান যে মানুষ যতক্ষণ ব্যক্তিরূপ লাভ করিয়া স্বতন্ত্র না হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ শিল্পীর কাছে তাহার মূল্য নাই। জন রূপেই তাহার মূল্য

জনতারূপে নয়, নক্ষত্রের মূল্য নীহারিকায় নাই। এ সমস্ত উত্তর নয়, জিজ্ঞাসা মাত্র। জনতা সম্বন্ধে কবির কি ধারণা, জন ও জনতার মধ্যে তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র যে অতি প্রত্যক্ষ প্রভেদ দেখা যায় তাহারই বা কি কারণ, এবং সর্বোপরি জনতার প্রতি কবি কল্পনার এই বামাচরণের কি তাৎপর্য—এ সমস্তর অনুসন্ধান এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।)

রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকাশেই মনুষ্যত্ব, প্রকাশেই কবিত্ব, অপ্রকাশে সমস্ত একাকার; প্রকাশে বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, কবিত্ব। মানুষ যতক্ষণ আপনাকে প্রকাশ না করিতেছে ততক্ষণ তাহা জনতা, যখনি আত্ম-প্রকাশ করিল সে ব্যক্তি হইয়া উঠিল। কবির বক্তব্য কবির ভাষাতেই শোনা যাক। "প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। লোহা গরম হতে হতে যতক্ষণ না দীপ্ত তাপ পর্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায় যার প্রাচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতঃই দীপ্যমান তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। টাকার মধ্যে এই ঐশ্বর্য আছে কোন্‌খানে? যেখানে সে আমার একান্ত প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সে আমার পকেটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নয়, যেখানে তার সমস্ত রশ্মিই আমার কৃষ্ণবর্ণ অহংটার দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই তার মধ্যে অশেষের আবির্ভাব এবং এই অশেষই নানারূপে প্রকাশমান।"

[সাহিত্য, সাহিত্যের পথে]

(প্রকাশের যেখানে অভাব অর্থাৎ মানুষ যেখানে ব্যক্তি নয় জনতামাত্র স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সেখানে কুণ্ঠিত, কাজেই রবীন্দ্র সাহিত্যে জন ও জনতার সমাসন হয় নাই। কিন্তু কখনো কখনো কোন আকস্মিক কারণে ঐ জনতার একটা অংশ প্রকাশমান

হইয়া ওঠে।) হয় তো দুর্ভাগ্যের পীড়ন, নয় তো পীড়ার কষ্ট তাহার মধ্যে আগুন জ্বালিয়া দিল, এতক্ষণ অসংখ্য অদৃশ্য গ্রহকণার সঙ্গে মিলিয়া অন্ধকারে যাহা পাক খাইয়া মরিতেছিল এবারে দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিয়া একটি অন্তিম স্বাতন্ত্র্যে দেদীপ্যমান রূপে সে আত্মপ্রকাশ করিল। দুঃখের স্বাতন্ত্র্যদায়কতা শক্তি আছে বলিয়াই দুঃখ মনুষ্যত্বের উদ্বোধক ও পরিপোষক।

এখানে কবির রচনা হইতে আর দুটি অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি, দুটির মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। রচনাকালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা কাল গায়ে-গায়ে সংলগ্ন, একটি পঞ্চভূত রচনার সমকালীন, অপরটি চৈতালীকাব্য রচনার কিছু আগে ঘটিয়া থাকিবে। অভিজ্ঞতার সংলগ্নতা এবং রচনার ব্যবধান প্রমাণ করে যে দীর্ঘকালেও কবির মতের পরিবর্তন ঘটে নাই। মূল মতের পরিবর্তন বড় ঘটে না। "একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহুদূরে দু-দশটাকা বেতনে ঠিকা মুহুরীগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না সে এত সামান্য লোক ছিল। একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল! আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে 'পিসিমা' 'পিসিমা' করিয়া কাতর স্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল! সেই যে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া একমনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে শূন্যবাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ টগবগ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূর কুটিরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? একদিন যে

তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতম কর্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সেদিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গলবার্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণ কাতর উদ্বেগ জড়িত হইয়াছিল! সহসা সেই রাত্রে সেই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকট দীপ্যমান হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলাম কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—আমার সেই ঠিকা মুহুরির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোন কবি অনুমান করে নাই, কোন পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাক-পোশাক সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারোমাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে আর আমাদের মতো দীপ্তিহীন ছোটো ছোটো লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়—পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায় মানুষে পরিপূর্ণ।"

[মনুষ্য, পঞ্চভূত ১২৯৯-১৩০৩]

এতকাল খোরাক-পোশাক সমেত আট টাকা বেতনের গোমস্তা জনতার অন্তর্গত ছিল, তাহার পরিচয় লইবার প্রয়োজন কেহ অনুভব করে নাই। কিন্তু অবশেষে নিদারুণ ব্যাধির আঘাতে অপ্রকাশ প্রকাসমান হইয়া উঠিয়া বেদনার আগ্নেয় অক্ষরে আপনার স্বতন্ত্র পরিচয় অঙ্কিত করিয়া দিল।

"যাঁরা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুক্তি হলেও একটা খবর এখানে বলা চলে। ছিলেন মফঃস্বলে সেখানে আমার এক চাকর ছিল। তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ী চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে, তার প্রধান গুণ সে কথা বেশি বলে না। সে যে আসে সে তথ্যটা অনুভব করলাম যেদিন সে হল অনুপস্থিত। সকালে দেখি স্নানের জল তোলা হয় নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় ছিলে? সে বললে আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে। বলেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ করে উঠল। ভৃত্য রূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আচরণে ঢাকা তার আবরণ উঠে গেল। মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল। সে হ'ল প্রত্যক্ষ, সে হ'ল বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাশপোর্ট আছে, সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু এই মোমিন মিঞা একে কি বলবো! সুন্দর বল তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য, সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। কিন্তু সেদিন করুণরসে ইঙ্গিতে গ্রাম্যমানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম করে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হ'ল বাস্তব।")

[সাহিত্য তত্ত্ব ১৯৩৪, সাহিত্যের পথে

মোমিন মিঞার কপালেও ঘটিয়াছে সেই দুরূহ সৌভাগ অতর্কিত হেঁচকা টানে একটা নগণ্য গ্রাম্যমানুষকে মনের মানু করিয়া তুলিয়াছে। জনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে যে ছিল ন গোত্রহীন দুঃখে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া তাঁহাকে ট্র্যাজেডির নায় পদবী দান করিল। সুখে মানুষ একাকার। দুঃখে মানুষ একা এই কারণেই ট্র্যাজেডি শ্রেণীর রচনা শিল্পকলার চরম।

রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে সকলের মধ্যেই মন নামক একটা সত্তা আছে, কিন্তু তাহা একেবারে "শরীরের মাপে", তাহা "আবশ্যকের গায়ে গায়ে ফিট করিয়া লাগিয়া থাকে।" জনতার মন আবশ্যকের মন আর আবশ্যকের মন বলিয়াই সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার মূল্য নগণ্য। সেইজন্যেই কোন কালে কোন সাহিত্যিক জনতার উপাদানে উচ্চকোটির কিছু গড়িতে পারেন নাই। সাহিত্যের মুখ্য উপাদান ব্যক্তি, জনতা অস্পষ্ট ব্যাকগ্রাউণ্ড মাত্র।

(এ পর্যন্ত জনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা পাওয়া গেল তাহা নিতান্তই নির্বিশেষ অর্থাৎ সর্বদেশে সর্বকালে সাহিত্যিকগণ যে দৃষ্টিতে জনতাকে দেখিয়াছেন তাহার অধিক কিছু নয়। শুধু এইটুকু বলিবার জন্য প্রবন্ধ লিখিবার বিশেষ সার্থকতা নাই। নির্বিশেষ পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া নাটকগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলে জনতার যে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহাতেই জনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার বৈশিষ্ট্য।)

॥ ২ ॥

এ পর্যন্ত দেখা গেল যে জনতার অবস্থা গতিকে কাব্যে তাহাকে মুখ্যপদ দেওয়া যায় না, এবারে বিচার করিতে হইবে জনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধারণার। পূর্বাহ্নে একটা স্থূল কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে ইংরাজিতে যাহাকে পীপল বলে জনতা তাহা নয়, জনতা Populace বা Rabble মাত্র। জনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যদি উচ্চধারণা পোষণ না করেন তবে মনে করা উচিত হইবে না যে পীপল বা জনগণ সম্বন্ধে তাহার ঐ ধারণা।

রবীন্দ্রনাটকের জনতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে মূঢ়তা ও ভীরুতা, এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধি তাহার প্রধান লক্ষণ। সেই সঙ্গে যোগ করা যাইতে পারে মতিগতির আত্যন্তিক স্থিতি

স্থাপকতার। কৌশলী ব্যক্তি অনায়াসে ইহাদিগকে অবাঞ্ছিত পথে চালিত করিতে পারে, এমন যে সম্ভব তাহার কারণ ব্যক্তিত্বের মেরুদণ্ডের ইহাদের একান্ত অভাব, তদুপরি মূঢ়তা ও ভীরুতা তো আছেই। রঘুপতি ও ক্ষেমঙ্কর দু'জনেই ধর্মান্ধ, কিন্তু তাহাদের ব্যক্তিত্বের তেজ এমন প্রবল যে ধর্মান্ধতা প্রায় একটি গুণে পরিণত হইয়াছে। ফলষ্টাফ ভীরু, লুব্ধ, পরস্বাপহারী, কিন্তু তাহার বিপুল প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাসটা প্রবল হইয়া উঠিয়া ঐ সব দোষকে স্রোতের মুখে নুড়ির মতো ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে জনতার প্রাণশক্তি এমন ক্ষীণ যে ঐ দোষগুলি পদে পদে তাহাকে ব্যাহত করে। ফলষ্টাফের চরিত্র বেগে দোষগুলি হইতে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, জনতার জীবনে ঐসব দোষের বাধা প্রাণের স্বাভাবিক সঙ্গীতকে রুদ্ধ করিয়া দেয়।

বিচারে বিশ্লেষণে নামিলে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ রবীন্দ্র-নাট্যে জনতার কোনপ্রকার কর্তৃপদ নাই, মূল ঘটনাপ্রবাহকে তাহারা এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই। নাটকের অন্তে প্রধান পাত্রপাত্রীগণ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছে, জনতার গোড়াতেও যে শূন্য হাত ছিল, অন্তেও সেই শূন্য হাত, নাট্যকার যেন তাহাদের কথা অনেকক্ষণ বিস্মৃত হইয়াছেন। মূঢ়তা ও ভীরুতার দ্বারা দর্শকের হাসির খোরাক জোগাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ডাক পড়িয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন তাহারা বিস্মৃত। রবীন্দ্রনাটকের অন্দরমহলে প্রবেশের পথে জনতা যেন হাসির পা-পোষ, দরজার বাহিরে তাহার স্বস্থান।)

প্রকৃতির প্রতিশোধ

✓প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকে অনেকগুলি জনতা দৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসীর মোহভঙ্গরূপ নিদারুণ বেদনার সহিত তাহাদের কোনরূপ যোগ আছে মনে হয় না। কবি অবশ্য জীবনস্মৃতি গ্রন্থে

প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"প্রকৃতির প্রতিশোধের এক দিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী, তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতন ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে, আর এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিমুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।"

ইহা কবির আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু নাট্য ঘটনার মধ্যে ইহার কোন বাস্তব প্রমাণ নাই। সত্য বটে যে সন্ন্যাসীর জীবনে একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত আসিয়াছে, তাহার কতকটা পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। কিন্তু জনতার? তাহারা গোড়াতেও যেখানে ছিল, অন্তেও সেখানে আছে। দ্বিতীয় দৃশ্যের এবং পঞ্চদশ দৃশ্যের জনতার আচরণ ও মনোভাব এক ও অভিন্ন, "সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা" এতটুকু দূর হইয়াছে মনে হয় না। নাটকের অন্তে গৃহীর ও সন্ন্যাসীর মিলন হইল বলিয়া কবির দাবির বাস্তব সমর্থন খুঁজিয়া মেলে না। জনতার চোখে সন্ন্যাসী প্রথমে যেমন অহেতুক পূজাস্পদ ছিল শেষেও তেমনি হইয়া আছে, আত্মীয়তার দিকে কোনপক্ষই এক ধাপও অগ্রসর হয় নাই। অনন্তের স্বরূপ সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর ধারণার পরিবর্তন হয় তো হইয়াছে, সেটা তাহার নিতান্তই ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার, তাহার সহিত জনতার কোন যোগ নাই।

আরও একটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের অনেকগুলি জনতা দৃশ্যের মধ্যে নাটকের ঘটনাবিন্যাস ও ঘটনা-সঞ্চালনের জন্য তৃতীয় দৃশ্যটি মাত্র প্রাসঙ্গিক। এই দৃশ্যে নাগরিকগণ কর্তৃক বিতাড়িত অনাচারী রঘুর দুহিতার সহিত সন্ন্যাসীর

পরিচয় ঘটে। বাকি সমস্ত জনতা দৃশ্যগুলি সন্ন্যাসীর জীবনের সহিত সমান্তরাল ধারায় চলিয়াছে, "গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মিলন" ঘটিলে সমান্তরালতা নিশ্চয় লোপ পাইত। তর্ক উঠিতে পারে যে সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গ বিবিক্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে দৃশ্যগুলি পরিকল্পিত। এ তর্ক অবহেলার নয়, তবু মনে রাখা আবশ্যক নাটকের মধ্যে যে-কারণেই যাহা কিছু ঘটুক না কেন নাটকের মূল গতির অঙ্গীভূত হইয়াই তাহা ঘটা উচিত। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের নাটকে সব সময়ে এমনটি ঘটে না, সেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহ সব সময়ে এক নিয়ম বন্ধনের অধীন নহে বলিয়া মনে হয়।

রাজা ও রাণী

প্রকৃতির প্রতিশোধের ভূগোল ও ইতিহাসের বহির্ভূত জগৎ হইতে রাজা ও রাণীতে পৌঁছিয়া পাঠক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। এ দেশ কাশ্মীর বা জলন্ধর যাহাই হোক এখানকার পথঘাট রীতিনীতি এবং মানুষগুলি পাঠকের পরিচিত।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের জনতার কথাবার্তা ও আচরণে জনতার প্রকৃতির সমস্ত লক্ষণগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে দেখা গেল, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্রোহের পন্থা লইয়া নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। অবশেষে রাজবন্ধু দেবদত্ত আসিয়া দু'চার কথায় কয়েকজনকে হাত করিয়া লইয়া বিদ্রোহ সঙ্কল্পের অবসান ঘটাইয়া দিল। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আর একটি জনতা আছে। কথা শুনিয়া মনে হয় যে ইহারা লড়াই করিতে চায়। কিন্তু কার বিরুদ্ধে? আততায়ী জলন্ধর রাজের বিরুদ্ধে না কাশ্মীরের মহাজনদের বিরুদ্ধে? নামে লড়াইটা, জলন্ধর রাজের বিরুদ্ধে হইলেও কার্যতঃ দাঁড়াইল মহাজনদের বিরুদ্ধে। "এবারে লুট করতে চললুম।"—এই হ'ল

তাদের শেষ কথা। নেতৃহীন, লক্ষ্যহীন জনতার যুদ্ধের ধারাটা সর্বদেশে সর্বকালে এই রকমই বটে।

এখানে রাজা ও রাণীর রূপান্তর তপতী নাটকের জনতার বিশ্লেষণ সংক্ষেপে সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। রাজা ও রাণী এবং তপতী নাটকের জনতা চরিত্রে বিশেষ প্রভেদ নাই। তপতী নাটকের জনতার মুখে "মেয়েরা কাল সারারাত ধরে সাজিয়েছে মাঙ্গল্যের ডালা।" আর চন্দ্রসেনের প্রতি জনতার অভিশাপ বাক্য—"ধিক ধিক নিপাত যাও। কোটি কোটি জন্ম তোমার নরকবাস হোক। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীর্ণ করে তার ধূলির মধ্যে তোমার বিলুপ্তি ঘটুক।"—এ জনতার ভাষা নয়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে জনতার প্রতি কবির যে শুধু দরদ নাই তাহাই নয়, জনতার জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয়টাও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। শেক্সপীয়রের নাটক পড়িলে বুঝিতে পারা যায় জনতার প্রতি তাঁহার বিশেষ দরদ ছিল না, তবে পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া তাহারা উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাটকে জনতার ছায়ামূর্তি ব্যঙ্গমূর্তি ও অসমীচীন ভাষাতে পরিচয়ের অভাব সূচিত হয়। "মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে। ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।" কবির এই আত্মঅভিযোগ শুধু বিনয় নহে।

বিসর্জন

বিসর্জন নাটকের জনতা চরিত্রের দু'টি সামগ্রিক লক্ষণ, মূঢ়তা ও ভীরুতা। মূঢ়তা নানা রকমের হইতে পারে, এখানে ধর্মান্ধতা। রঘুপতি তাহাদের বুঝাইতেছে যে বলির পশু না পাইয়া দেবী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এবারে তাহাদের সবংশে মুখে পুরিবেন। তাহারা বিশ্বাস করিতেছে। গোবিন্দ মাণিক্য তাহাদের মাতৃপ্রেমের সার্বজনীনতা বুঝাইতেছে, তাহারা বুঝিতেছে। রঘুপতি দেবীমূর্তি ঘুরাইয়া দিয়া বুঝাইতেছে যে দেবী বিমুখ হইয়াছেন, আবার অপর্ণা

দেবীমূর্তি ফিরাইয়া দিয়া বুঝাইতেছে দেবী প্রসন্ন হইয়াছেন—তাহারা সমস্তই সমান বুঝিতেছে। ইহার উপর আছে ভীরুতা। রঘুপতির প্ররোচনায় জনতা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত কিন্তু যখনি শুনিল সৈন্য সমাগম আসন্ন অমনি দেবী মন্দিরের অঙ্গন যুদ্ধের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া সরিয়া পড়িতে উদ্যত। এ যেন একতাল বেওয়ারিশ কাদা, যাহার যা খুশী গড়িতেছে, কেহই শিব গড়িতেছে না, নাট্যকার শিবের বিপরীত গড়িয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। জনতা কি সত্যই এমন মেরুদণ্ডহীন। মধুসূদন বলিয়াছিলেন. I hate Rama and his rabbles. Rabble বা জনতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ হেন মনোভাব কি অবজ্ঞার রূপান্তর।

মালিনী

বিসর্জন ও মালিনী একই ভাবাক্রান্ত নাটক। বিসর্জনে রাজার জীবনে এবং মালিনীতে রাজকন্যা মালিনীর জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নাটকের গতি ও প্রকৃতি এই ভাবোন্মেষের দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। মালিনী নাটকের জনতা অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকের নয়, তাহারা শিক্ষিত, নাগরিক ও ব্রাহ্মণ। কিন্তু হইলে কি হয়, তাহাদের ভাষা যদি বা কিছু অনুশীলিত, ভাবটা গ্রাম্যলোকের মতোই।

দ্বিতীয় দৃশ্যে ব্রাহ্মণগণ রাজকুমারীর নির্বাসন দাবী করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত। প্রয়োজন হইলে অস্ত্রবলের সাহায্য লইতেও তাহারা পরাঙ্মুখ হইবে না। কিন্তু যখনি সংবাদ আসিল যে "ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে রাজ সৈন্যদল" চঞ্চল হইয়াছে অমনি ব্রাহ্মণ জনতার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। "একী কাণ্ড, ক্রমে এ যে বিপরীত দেখি, বিদ্রোহের মতো।" এই গেল জনতা চরিত্রের ভীরুতার দিক, অতঃপর মূঢ়তার নিদর্শন। তাহারা বলিল, "ধর্মবলে ব্রাহ্মণের জয়, বাহুবলে নহে।" কাজেই তখন তাহারা তারস্বরে "সিদ্ধিদাত্রী

জগদ্ধাত্রীকে আহ্বান করিতে শুরু করিল। এমন সময়ে রাজকুমারী মালিনী মন্দির দ্বারে দেখা দিলেন, দেবীবোধে সুপ্রিয় ও যেনপ্রকর বাদে অন্যান্য সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। মালিনীর দৈব রূপ লাবণ্য ও অমৃতময়ী কথা শুনিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রাহ্মণজনতা স্বীকার করিল "আমরা সকলে পাষণ্ড পামর"—এবং তারপরেই "চলো সবে বিপ্রগণ, জননীরে জয় জয় রবে রেখে আসি রাজগৃহে।" জনতার মনোভাব ও আচরণের চরম। এ বিষয়ে ত্রিপুরার গ্রাম্য-জনতা ও কাশীধামের পণ্ডিত জনতায় কোন প্রভেদ দেখি না। তবে বোধ করি গ্রাম্যজনতাই ভালো, তাহাদের কথা শুনিয়া অন্ততঃ আমোদ পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণজনতার মুখে নিখুঁত ছন্দে উচ্চারিত ভীরুতা ও মূঢ়তা পাঠককে বিরক্ত করিয়া তোলে।

শারদোৎসব

শারদোৎসব নাটকের গ্রাম্য লোকের জনতার কিছু বৈশিষ্ট্য নাই, কাজেই বক্তব্যও নাই, পাড়ায় সন্ন্যাসী আসিয়াছে শুনিয়া তাহারা ভিড় করিয়াছে, সন্ন্যাসীর দেখা পাইলে ওষুধ তাবিজ কবচ টাকাকড়ি প্রার্থনা করিবে। এমন যে কোন গ্রামে ঘটিতে পারে। এক পশলা কৌতুক বর্ষণ করিয়া হতাশ জনতা সরিয়া পড়িয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত ও অচলায়তন

(অতঃপর যে দু'খানি নাটকের আলোচনা করিতেছি তাহাদের জনতার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহাদের জনতা বলা উচিত কিনা তর্ক উঠিতে পারে। জনতা নেতৃবিহীন জনসমষ্টি। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত এবং অচলায়তনের জনসমষ্টি আদৌ নেতৃবিহীন নয়, সৌভাগ্যবশতঃ বিশিষ্ট নেতার দ্বারা তাহারা পরিচালিত, দুর্ভাগ্য-বশতঃ নেতার গুণ আদৌ তাহাদের চরিত্রে প্রতিফলিত হয় নাই, জনতা চরিত্রের প্রকৃত মনোভাবটাই সুপ্রকট।) সেইজন্য আনুষ্ঠানিক অর্থে তাহারা জনতা না হইলেও জনতা বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

প্রায়শ্চিত্তের জনতা ধনঞ্জয় বৈরাগীর চেলার দল। ধনঞ্জয় বৈরাগী সাধুপুরুষ কিন্তু অবস্থা গতিকে রাজনীতির আসরে নামিতে বাধ্য হইয়াছে, গান্ধী-চরিত্রের পূর্বগামিনী ছায়া। মার খাইয়া ফিরাইয়া দিতে নাই, সহ্য করিতে হয়; ক্ষুধার অন্ন রাজস্বরূপে দিতে নাই; গুরু বা নেতার মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মনির্ভর হওয়া আবশ্যক—প্রভৃতি ধনঞ্জয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে, চেলারা কেবল ঠাকুরের সঙ্গে তাল মিলাইয়া নাচিতে শিখিয়াছে। নেতা থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্খলা বোধ তাহাদের জন্মে নাই, তাই তাহাদের জনতা ছাড়া আর কি বলা যায়।

রাজধানীতে যাওয়ার সময়ে প্রজারা হাতিয়ার সঙ্গে লইতে চায়, ধনঞ্জয় শুধাইল, কেন রে হাতিয়ার নিয়ে কি করবি? প্রজারা বলে, যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—! ধনঞ্জয় বলে, তাহলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী ক'রে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতে যাচ্ছ। তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয় তবে এইখানেই থাক।

ধনঞ্জয় আবার বলে, আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন, বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন, কত মার খেলেন, কত কত ধুলোই মাখলেন, হায়, হায়।

এসব কথা চেলাদের বুদ্ধির অগম্য। এসব জনবোধ্য তত্ত্ব হইতে পারে, জনতাবোধ, অবশ্যই নয়।

ধনঞ্জয় চেলাদের বোঝাইতে চেষ্টা করে, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে (রাজাকে) টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে-অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়, তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই, কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারবো না।

এসব কথা চেলাদের মনে ধরে না, তাহারা গুরুর লঘুকরণ করিয়া পরস্পরকে বোঝায়, বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন। চেলাদের কথায় হতাশ হইয়া ধনঞ্জয় বলিয়া ওঠে, বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস, পণ করে বসেছিস যে মরবিনে। কেন মরতে দোষ কী হয়েছে। যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবিনে বুঝি।

চেলারা হয় তো মনে মনে বলে, "রাজাটা ক্ষেপেছে রে!" হয় তো এটুকু বলিবার মতোও ডাকাতী সাহস তাহাদের নাই।

কবির এইরূপ অপদার্থ চেলা চরিত্র আঁকিবার উদ্দেশ্য কি? নেতা থাকা সত্ত্বেও চেলারা আকার প্রকারহীন জনতা সত্তা অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিত্বের দিকে এক ধাপও অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইল কেন? এসব প্রশ্ন মনে ওঠা অন্যায় নয়।

অচলায়তন নাটকে অন্যান্য নাটকের মতো জনতা বলিয়া কিছু নাই, তবে শোণপাংশুর দলকে জনতা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা থাকিতে পারে না। শোণপাংশুদের নেতা দাদাঠাকুর, মাধবপুরের দলের নেতা যেমন ধনঞ্জয় ঠাকুর। এখানে দুই নাটকে মিল। আরও মিল আছে, শোণপাংশুগণ মাধবপুরের জনতার মতোই নেতার নেতৃত্বের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই; তাহাদের কাছে দাদাঠাকুর কেবল খেলার সঙ্গী, মাধবপুরের জনতার কাছে ধনঞ্জয় ঠাকুর যেমন রক্ষাকর্তা গুরু। এখানেই জনতার মনস্তত্ত্বের রহস্য, নেতার কায়িক অস্তিত্বের বেশি তাহাদের অধিগম্য নয়।

দাদাঠাকুর গুরু বেশে অচলায়তনে প্রবেশ করিলে মহাপঞ্চক তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল, ততক্ষণে শোণপাংশুগণ তাহাকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। নির্ভীক মহাপঞ্চক বলিল, কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

তাহার অদ্ভুত কথা শুনিয়া প্রথম শোণপাংশু বলিল—ঠাকুর,

এই লোকটাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাই, আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোন শাস্তিই দেব না।

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

স্পষ্টই দেখা যায় শোণপাংশুগণ দাদাঠাকুরকেও বুঝিতে পারে নাই, মহাপঞ্চককেও। জনতা মুখস্থ করিতে পারে, বুঝিতে পারে না। দাগ বুলাইতে পারে, পথ কাটিতে পারে না; তাহারা অভ্যাসের দাস। এইজন্য জনতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞার চরম প্রকাশ পাইয়াছে দর্ভক দল সম্বন্ধে, দর্ভকগণও নামে না হইলেও কার্যতঃ জনতা, জনতার আচরণ ও মনোভাবে তাহারা গঠিত। অচলায়তনের ভাঙা প্রাচীরের উপরে "নূতন সৌধের সাদা ভিতকে, আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী ক'রে দাঁড়" করাবার উদ্দেশ্যে গুরু ডাক দিলেন পঞ্চকের দল ও শোণপাংশুর দলকে, বলিলেন, "মেলো তোমাদের দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।" তৃতীয় দল দর্ভকগণ একেবারে বিস্মৃত। অচলায়তনের জ্ঞানমার্গ, শোণপাংশুদের কর্মমার্গ এবং দর্ভকগণের ভক্তিমার্গ—এই তিনের মধ্যে নূতন সৌধ নির্মাণের সময় ভক্তি-মার্গীগণ বেমালুম কবির স্মৃতি হইতে লোপ পাইল। ইহাই বোধ করি অবজ্ঞার চরম রূপ। মহাপঞ্চকে শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, শোণপাংশুগণে ও দর্ভকগণে তাহার একান্ত অভাব। সেইজন্যই কি এই বিবরণ। রবীন্দ্রনাথের গুরু বা রাজা বিদ্রোহীকেও স্বীকার করেন; গুরু মহাপঞ্চককে স্বীকার করিয়াছেন; রাজা কাঞ্চী রাজাকে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু দুর্বলের স্বীকৃতি নাই; নাট্যকারের

কাছেও নাই; তাই দুর্বল দর্ভকগণ নূতন সৌধ রচনার বেলায় বিস্মৃত। সব জনতার অধম দুর্বল জনতা।

রাজা

/রাজা নাটকে অনেকগুলি জনতা। বিদেশী পথিক, নাগরিক দল, একদল পদাতিক, আর একদল পথিক, একদল স্ত্রীলোক, একদল লোক, নাচের দল—এখানেই শেষ নয়।)একাধিকবার নাগরিক দলের প্রবেশ ও প্রস্থান আছে, তাহারা একই দলভুক্ত না ভিন্ন বুঝিবার উপায় নাই। এতগুলি জনতা পূর্বে লিখিত কোন নাটকে নাই। তবে সেই সঙ্গে স্বীকার করিতে হয় যে এ নাটকের জনতা একেবারে আকস্মিক নয় কিম্বা হাসির খোরাক জোগাইবার উদ্দেশ্যে comic relief মাত্র নয়—নাট্যবিন্যাসের মধ্যে তাহারা অঙ্গীভূত। নাটকে বসন্ত উৎসবের মেলা বসিয়াছে। উৎসবের মেলায় অগণিত লোক ও বিচিত্র জনতা আসিয়া থাকে—এখানেও আসিয়াছে অর্থাৎ ইহা নাট্যব্যাপারের স্বাভাবিক অঙ্গ। আগের অনেক নাটকের জনতা নাট্যকারের প্রয়োজনে নাট্যকার কর্তৃক প্রেরিত, এখানে তাহাদের প্রেরণার মূলে মেলার আকর্ষণ। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে নাট্যকার জনতাকে নাটকের বুনুনির সঙ্গে গাঁথিয়া লইয়াছেন, স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন নাই। রাজা ও রাণী, বিসর্জন কিম্বা শারদোৎসবে জনতার অনুপস্থিতি সামান্য কিছু রসের হানি হয় তো ঘটাইত, কিন্তু মোটের উপরে নাটকের ঘটনাবিন্যাসে তেমন কোন হানি করিত না। অপরপক্ষে বিচিত্র পর্যায়ের জনতা ছাড়া রাজা নাটকখানিকে কল্পনা করা যায় না। দেখা যাইতেছে যে জনতা শিল্পবস্তুর সঙ্গে অভিন্ন হইয়া উঠিতেছে। তবে জনতার সম্বন্ধে কবির মতের পরিবর্তন হইয়াছে মনে হয় না। পূর্বে বর্ণিত জনতার যাবতীয় লক্ষণে তাহারা বলীয়ান্। মধুসূদন Rama and Rabbles কে অবজ্ঞা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞার পাত্র কেবল Rabbles।

এবারে যে তিনখানি নাটকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি

তাহাতে জনতার ব্যবহারে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য, জনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবে হয় তো সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, নাট্যবস্তুর সঙ্গে জনতাকে সুনিপুণ ভাবে গ্রথিত করিয়া তোলা হইয়াছে, আগের অন্যান্য অনেক নাটকের মতো জনতা অসংলগ্ন বা অবান্তর হইয়া থাকে নাই, এই-সব নাটকের জনতা ঘটনাবিন্যাসের টানা পোড়েনের অন্তর্গত। দুটি পরিবর্তনই লক্ষ্য করিবার মতো। প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, একেবারে শেষ বয়সে কেন এমন পরিবর্তন ঘটিল। যথাসাধ্য উত্তর দানের চেষ্টা করিব। জনতার একটি স্বাভাবিক স্থান আছে, সে স্থান মেলা বা পথ। অন্যত্র যে তার প্রবেশাধিকার নাই এমন নয়, কিন্তু সে প্রবেশের বিশেষ কারণ থাকা আবশ্যক। বিশেষ কারণাভাবে অন্যত্র অসঙ্গত। রাজা নাটকে জনতা অনেকটা স্বভাব সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াছি, কারণ আর কিছুই নয়, রাজা নাটকের প্রারম্ভ বসন্ত উৎসবের মেলায়। অন্যান্য নাটকে যেমন শারদোৎসবে পথের ধারে ঘটনাস্থান, কিম্বা বিসর্জনে কালীমন্দিরের অঙ্গনে পূজা দর্শনার্থীর মেলা আছে সত্য কিন্তু কবি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন মনে হয় না ; মনটা তখন অন্যত্র ছিল, আবার মনটা জনতার প্রতি তেমন প্রসন্ন ছিল না। তাই জনতা শরতের লঘু মেঘের মতো অন্যমনস্কভাবে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে, বিদ্যুতে বা বর্ষণে পাঠকের চিত্ত চমকিত করে নাই।

মুক্তধারা

নাটকে জনতা ব্যবহারের সার্থকতম দৃষ্টান্ত মুক্তধারা নাটক। এখানে পথ ও মেলার যুক্ত পরিবেশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাটকখানিকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তারপরে ঘটনাকাল স্বল্পস্থায়ী। সঙ্কীর্ণ নদীপথে প্রবল ঘটনাস্রোতে ধাবমান, বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকে গঠিত জনতা দ্রুতবেগে ভাসমান শৈবালের মতো এমনভাবে সমস্ত নদীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে যে তাহাকে

বাদ দিয়া নদীর ধারণা করা অসম্ভব। এমন আগে আর রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহে দেখা যায় নাই। মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রথের রশিকে জনতা নাট্য বলা যাইতে পারে। যদিচ তিনখানিতে সমভাবে ও সমমাত্রায় তাহার স্থান নয়।

"উত্তরকূট পার্বত্যপ্রদেশ। সেখানকার উত্তর-ভৈরব মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আম বাগানে রাজা রণজিতের শিবির। অমাবস্যায় ভৈরব মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহু বৎসরের চেষ্টায়, লৌহ যন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝরনাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে।"

পথ, ভৈরবমন্দির প্রাঙ্গণে উৎসব, যন্ত্ররাজের সম্মানের উপলক্ষ্য, স্বয়ং রাজা পুরস্কার দান উপলক্ষ্যে মন্দির যাত্রী ; নাটকের এই একটি মাত্র দৃশ্য। চমৎকার যোগাযোগ। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোক সমাগম হইয়াছে। শেষ অবধি শিবতরাইয়ের লোকও আসিয়া পৌঁছিয়াছে যদিচ উৎসবে যোগদান তাহাদের উদ্দেশ্য নয়।

উত্তরকূটের নাগরিকগণের পাঁচ ছয়টি দল নাটকের মধ্যে আছে, তাহারা একদল না অনেক দল নিশ্চয় বুঝিবার উপায় নাই, একে রাত্রি অমাবস্যা তার উপরে নাটকের ঘনীভূত সঙ্কটে উচ্চ নীচ শত্রু মিত্র মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। অন্য দিকে শিবতরাইয়ের প্রজাদের তিনটি দল, শেষের দলে হাজারে হাজারে লোক। অন্যান্য নাটকের মতো এসব জনতা ঘটনাস্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ড নয়, ঘটনার আঘাতে ইহাদের ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হইয়াছে, আঘাত আরও প্রবল হইলে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া ইহারা বিশিষ্ট হইয়া উঠিতে

পারিত। উত্তরকূটের প্রজাদের সঙ্কল্প নন্দীসঙ্কটের ভাঙা প্রাচীর মরিতে মরিতে গাঁথিয়া তুলিবে। আর শিবতরাইয়ের প্রজাদের সঙ্কল্প যেমন করিয়াই হোক যুবরাজকে ছিনাইয়া শিবতরাইয়ে লইয়া যাইবে। ধনপুরের শিক্ষা যাহা করিতে পারে নাই, ঘটনার চাপে তাহাই করিল। ওদিকে পার্বত্যপ্রদেশ উত্তরকূটের নাগরিকগণ ভিতরে ভিতরে যে পাথরের মতো শক্ত ছিল এখন তাহার প্রমাণ মিলিল, তাহারা রাজা, যুবরাজ, যন্ত্ররাজ সকলের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত, তাহারা মরিতে মরিতে ভাঙা প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতে প্রস্তুত। জনতার এ মনোভাব রবীন্দ্রনাথের নাটকে সম্পূর্ণ নূতন, জনতা সম্বন্ধে নাট্যকারের মনোভাবও নূতন। আরও লক্ষ্য করিবার যোগ্য বিষয় জনতাকে নাট্যবস্তুতে গ্রন্থন শিল্প। রাজা, যুবরাজ বা যন্ত্ররাজকে বাদ দিলে নাটকটি যেমন টেকে না, জনতাগুলিকে বাদ দিলেও তেমনি শূন্যতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ প্রধান পাত্রপাত্রীদের মতোই জনতা এখানে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। পরবর্তী নাটক দু'খানিতেও এই ভাবটি দেখিতে পাইব, কিন্তু বোধ করি রসে, রূপে এমন পূর্ণাঙ্গ শিল্প আর দেখা যাইবে না। মুক্তধারার প্রচণ্ডগতির সঙ্গে তুলনা করিলে রক্তকরবীকে স্থির বলিতে হয়। মুক্তধারা নদী হইলে রক্তকরবী বিল, ঝড় উঠিলে শুধু যাহার জলে চঞ্চলতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ঝড় উঠিয়াছে।

নাটকখানিতে দুটি জনতা আছে, একটি ফসলকাটার দল, একটা খনি খোদাইয়ের দল; দুটিই অলক্ষ্যে আছে, নাট্যব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। প্রবেশ করে নাই সত্য তবু তাদের প্রভাব স্পষ্ট। উত্তর ও দক্ষিণ চুম্বক মেরুর মতো ফসলকাটার দল ও খনি খোদাইয়ের দল নাট্যঘটনাকে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। নাটকে জনতার এ নূতন ব্যবহার। নাটকের মধ্যে একটি সৈন্যদল আছে সত্য তবে তাহাকে জনতা বলা উচিত হইবে না, সৈন্যদলের একটি ব্যক্তিত্ব আছে তাহার মনটাও একাগ্র। সেনাপতি

সৈন্যদলের মন। অবশ্য ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে জনতা বলিতে আপত্তি নাই।

পূর্বোক্ত দুটি জনতার মধ্যে "কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলে" রাজার মুক্তি সহজ করিয়া তুলিয়াছে। ফসলকাটার দল কি করিল? তাহারা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় হইলেও একেবারে নিষ্প্রভাব নয়, রাজা ঐ খোলা মাঠে যেখানে প্রাণের লীলা অবধি সেই দিকেই যাত্রা করিয়াছেন, শেষের গানটি সেই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। ফসলকাটার দল এবং খনি খোদাই দলের বিপরীতমুখী আকর্ষণের কথা বলিয়াছি কিন্তু অন্তিমে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে আকর্ষণ বিকর্ষণ সমন্বিত হইয়া একটি মাত্র গতির সৃষ্টি করিয়াছে—খনি খোদাই দল সেই দিকেই ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে যেদিকে ফসলকাটার দলের আকর্ষণ, ইহার মধ্যে কোন গভীর রাজনৈতিক বা অন্যজাতীয় তত্ত্ব আছে কিনা তাহা অত্র আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। কেবল দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতে চাই। জনতাকে অলক্ষ্যে রাখিয়া ব্যবহার রবীন্দ্রনাটকে এই প্রথম ও নূতন। আর জনতাকে একটি সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়পূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহারা কেবল পাদপূরণের চ বৈ তু হি নয়। তবে এটি একেবারে নূতন নয়—মুক্তধারা নাটকেও জনতার এই একই ভূমিকা দেখা গিয়াছে।

(রথের রশিতে সৈন্যদল, ধনিক দল ও শূদ্র দলের তিনটি জনতা। মন্ত্রী, ধনপতি, পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও কবি প্রভৃতি ব্যক্তি থাকিলেও জনতার গুরুত্বই অধিক। কিন্তু জনতার ব্যবহারে কোন অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে নাই, খুব সম্ভব রস সৃষ্টির চেয়ে তত্ত্ব প্রতিপাদনের দিকেই কবির মনটা ছিল। যে-কারণেই হোক, পড়িতে বসিলে মনে হয় নাটকখানা আধখানা মনের সৃষ্টি কাজেই আলোচনার গুরুভার ইহার উপরে চাপানো নিরর্থক।)

জনগণ বহতা নদী, মলিনতা সত্ত্বেও নির্মল। জনতা পঙ্ক পল্বল,

ভীরুতা, মূঢ়তা, সংস্কারাচ্ছন্ন মন এবং অব্যবস্থিত চিত্ততার চার কূলে আবদ্ধ, স্বভাবতই আবিল।) তাহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবার লোকের কখনো অভাব ঘটে না। রাজবন্ধু দেবদত্ত রাজনীতির প্রয়োজনে, ধর্মান্ধ রঘুপতি ধর্মের প্রয়োজনে স্বার্থসিদ্ধির পথে তাহাদের চালিত করে। যখন তেমন কৌশলী লোপের অভাব হয় তখনও তাহাদের অবস্থা সমান অসহায়। যুদ্ধোদ্যমে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহারা মহাজনের গোলার দিকে যায়—"এই লুট করতে চললাম"। আবার কখনো কখনো বড় ওস্তাদের কূট কৌশলে জনতা জনগণ নামে অভিহিত হইয়া তাহার ক্ষমতাধিকারের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। জনতা সত্যই কৃপার পাত্র। তাহারা এমনই হতভাগ্য ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো বা অচলায়তনের ঠাকুর্দার মতো নিঃস্বার্থপর নেতার প্রভাবও তাহাদের মনে দাগ কাটিতে পারে না। এ হেন জনপিণ্ডের স্বরূপ প্রদর্শন নাট্যকার করিতে বাধ্য, বীরপুরুষ সাজাইতে গেলেও সে সাজ তাহাদের গায়ে মানাইবে কেন? কাজেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে তাহারা যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শেষের তিনখানি নাটকে জনতা চরিত্রে কিছু দার্ঢ, কিছু স্বাবলম্বন দেখা দিয়াছে। ইহা কি নাট্যকারের মত পরিবর্তন জনতি অথবা আর কিছু। দুটাই সম্ভব। মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রথের রশি এই তিনখানি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য আগেই বলিয়াছি, বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে আবার বলিতেছি। এ তিন খানির মধ্যে রক্তকরবীতে জনতা অদৃশ্যভাবে আছে, খনি খোদাইকারদের দূর হইতে একবার অস্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে, উইপোর মতো সোনার তাল বহন করিয়া খনি হইতে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। আর ফসলকাটার দলকে চোখে দেখা যায় নাই বটে তবে তাহাদের গান মাঝে মাঝে শোনা গিয়াছে। অন্তিমে খনি খোদাই কারিকরগণ কারাগার ভাঙিয়া ফেলিতে রাজাকে সাহায্য করিয়াছে তাহাও অদৃশ্য থাকিয়া।

এখানে জনতা প্রচ্ছন্ন, তাহাদের ক্রিয়া স্পষ্ট। ঐ ক্রিয়ার উপরে নির্ভর করিয়া পাঠকের মত পরিবর্তন করিতে হয়, নাট্যকারের মত পরিবর্তনকে অনুমান করিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু মুক্তধারা ও রথের রশিতে অনুমানের উপরে নির্ভর করিবার আবশ্যক হয় না, জনতা ও তাহার ক্রিয়া দু-ই প্রকট। জনতার ক্রিয়া সম্বন্ধে নাট্যকারের মত পরিবর্তনের একটা কারণ যে নাটকের টেকনিকে পরিবর্তন হওয়াতে জনতাকে প্রশস্ত স্থান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহা আগে বলিয়াছি, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অন্য কারণটা গুরুতর।

মুক্তধারা ১৯২২ সালে লিখিত, রথের রশির পূর্ব পাঠ রথযাত্রাও সেই সালের, রথের রশি আরও পরবর্তী সালের। এই সালটা মনে রাখা আবশ্যক। আরও একটা বিষয় মনে রাখিতে হইবে। মুক্তধারার পূর্বগামিনী ছায়া প্রায়শ্চিত্ত নাটিকা লিখিত হয় ১৯০৯ সালে, তার পরবর্তী ছায়া পরিত্রাণ, অনেক পরে। প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণকে একই নাটকের রূপভেদ বলিয়া কবি স্বীকার করিলেও প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তধারা কোন বিচারেই এক নাটক নয়। এক নাটক যে নয় তাহার অনেক কারণ, একটি অমুখ্য কারণ উভয় নাটকে জনতা চরিত্রে প্রভেদ। প্রায়শ্চিত্তে জনতা ধনঞ্জয়ের উপরে নির্ভরশীল, গুরুর ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। ধনঞ্জয় বন্দী হইয়া রহিল। রাজাদেশ প্রচারিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণের জনতা বলিয়া উঠিল, আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না। বাস, ঐ পর্যন্ত। কিন্তু মুক্তধারার জনতা, কি উত্তরকূটের কি শিবতরাইয়ের লোক মৌখিক তর্জনে নিরস্ত থাকে নাই, দুই দলই সক্রিয় ভাবে রাজদ্রোহকর কাজে নামিয়াছে। উত্তরকূটের নাগরিকগণ নন্দীসঙ্কটের খোলাকথ গাঁথিয়া তুলিতে যাত্রা করিয়াছে, তাহাদের পণ মরিতে মরিতেও গাঁথিয়া তুলিবে। ওদিকে শিবতরাই হইতে হাজার হাজার প্রজা রাজধানীতে

আসিয়াছে, অবরোধ মুক্ত করিয়া যুবরাজকে শিবতরাই লইয়া যাইবে। দুই দলই বিদ্রোহী। জনতার এ আচরণ রবীন্দ্রনাটকে অভূতপূর্ব, দেবদত্ত বা রঘুপতির কৌশল ইহাদের কাছে চলিবে না।

রথের রশিতে শূদ্রগণের টানে অচল রথ ছুটিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের মুখপাত্র রূপে দলপতি বলিল, এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়, দলে গিয়ে ধূলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে। এবারে সেই বলি তো নিলো না বাবা।

তাদের উপরে যে রথ চালাবার ভার পড়িয়াছে কি ভাবে জানিতে পাইল জিজ্ঞাসিত হইয়া দলপতি বলেন কেমন ক'রে জানা গেল, সে তো কেউ জানে না। ভোরবেলায় উঠেই সবাই বলল সবাইকে, ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়, পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী, পাহাড় ডিঙিয়ে গেলো খবর, ডাক দিয়েছেন বাবা।

শূদ্র দলপতি বলে সংসার কি তোমরাই চালাও বাবা? আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচো, আমরাই তো বুনি বস্ত্র তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।

যে রথ ব্রাহ্মণের টানে, ক্ষত্রিয়ের টানে, বৈশ্যের টানে চলে নাই, অবশেষে সেই রথ চলিল শূদ্রদের টানে।

এ কোন্ জনতা? ইহাদের তো আগে দেখা যায় নাই রবীন্দ্রনাথের নাটকে। মুক্তধারায় ইহাদের চরণ। কবির মত পরিবর্তন স্বীকার না করিয়া উপায় কি? কিন্তু হঠাৎ কেন এই মত পরিবর্তন? এবারে পূর্বোল্লিখিত সাল তারিখগুলা স্মরণ করা আবশ্যক।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৯০৯ সালে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রকাশ এবং ১৯২২ সালে মুক্তধারা নাটক প্রকাশের মধ্যে পৃথিবীতে দুটি বৃহৎ গণআন্দোলন দেখা দিয়াছে, একটি রুশ দেশে, অপরটি ভারতে। রুশদেশের আন্দোলন ১৯২২ সালে সিদ্ধির কাছাছি, ভারতীয়

আন্দোলনের সিদ্ধি তখনো দূরবর্তী। তবু দুটি আন্দোলনে ঐক্য ছিল, পন্থায় ও আদর্শে নয়, তাহাদের গণচরিত্রে ও ব্যাপকতায়। ভারতীয় সাহিত্যিক যাঁহার মন বিশ্বের দিকে সর্বদা উন্মুক্ত তাঁহার পক্ষে এ দুয়ের প্রভাব এড়াইয়া চলা সম্ভব ছিল না। চিন্তার ক্ষেত্রে গণআন্দোলনের পুরাপুরি সমর্থক তিনি কখনোই ছিলেন না, বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মহাত্মাজীর চারিত্র্যে অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত মতভেদ অস্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন নাই। নব্য রুশ শাসনতন্ত্রের সঙ্গেও তাঁহার গুরুতর মতানৈক্য ছিল। এ সব গেল চিন্তাক্ষেত্রের ব্যাপার। কিন্তু এ দুই গণ বিপ্লবের চমক, নাটকীয়তা ও মূল্য নিশ্চয় তাঁহার শিল্পী সত্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, যাহার পরিণামে ব্যক্তিসত্তার একনিষ্ঠ উপাসক হওয়া সত্ত্বেও গণসভা সম্বন্ধে উদারতর মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গণচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন মোহ ছিল না, তৎসত্ত্বেও গণ আন্দোলনে তাঁহার মনে জনতা সম্বন্ধে ধারণার যে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রথের রশির জনতা চরিত্র তাহার প্রমাণ। মোহ যে ছিল না তাহার প্রমাণ রথের রশির নাটকের মধ্যেই আছে। পুরোহিত প্রশ্ন করছে কবিকে, তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান, ওরাই কি দড়ির নিয়ন মেনে চলতে পারবে। কবি বলছে, পারবে না হয় তো। একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নয়, রথের সর্বময় কর্তা ওয়াই। দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে, জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের। তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।'

বলাবাহুল্য এ মোহগ্রস্তের বিশ্লেষণ নয়। চরকা তাঁতের আন্দোলন সম্বন্ধে কবির বিস্তারিত অভিমত চরকা (ভাদ্র, ১৩৩২) প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। অপর পক্ষে কাস্তে হাতুড়ি আন্দোলন সম্বন্ধেও যে তাঁহার মন মোহহীন ছিল সে প্রমাণ রাশিয়ার চিঠি

গ্রন্থের উপান্তে এবং কবি লিখিত কোন কোন চিঠিপত্রে পাওয়া যাইবে। এ সমস্তই সত্য। তৎসত্ত্বেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, চিন্তার ক্ষেত্রে কুণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও শিল্পের ক্ষেত্রে রুশ ও ভারতীয় গণবিপ্লব রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছে, শেষ তিনখানি নাটকের জনতাচরিত্রে পরিবর্তন তাহারই পরোক্ষ এল। বস্তুত এখানেই আলোচ্য বিষয়ের সমাপ্তি, তবু দু' একটা বিষয়ের জবাবদিহির দায়িত্ব আছে সন্দেহ হইতেছে। প্রবন্ধান্তে বলিয়াছি যে জনতা ও জনসাধারণ এক নয়, বলিয়াছি যে জনতা চরিত্র মূঢ়তা, ভীরুতা প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত, বলিয়াছি যে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও অচলায়তনের ঠাকুর্দার মতো নেতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও জনতা মহত্ত্বলাভে অসমর্থ, বলিয়াছি যে জনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। এখন এই চারিটি উক্তিই শেষ তিনখানি নাটকের জনতা চরিত্র দ্বারা অল্প বিস্তর খণ্ডিত হইতেছে। এ কেমন ধারা হইল? এই contradiction বা দ্বিধার কারণ কি? সত্য কথা বলিতে কি এই দ্বিধার কোন কারণ নাই, এই contradiction জীবনের প্রধান লক্ষণ ও সৌন্দর্য। এখানে সবগুলি সুতায় জোড় মেলে না, শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু জায়গা থাকিয়া যায়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব মিলাইতে গিয়া বিভ্রান্ত হন, শিল্পী সকৌতুকে তাঁহাদের ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া হাসিতে থাকেন। সমস্ত মহৎ শিল্পীর রচনাতেই এমন contradiction এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এইসব contradictionকে স্বীকার করিয়া লইয়া অগ্রসর হওয়াই সমালোচকে কর্তব্য। জীবন যদি contradiction সমন্বিত হয় শিল্পও তবে সেই লক্ষণাক্রান্ত হইতে বাধ্য, কারণ শিল্প জীবনের seachange বা মহৎ রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।)

রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়যোগ্যতা

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির অভিনয়যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণের দেখিবার সুযোগ বড় হয় না, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কখনো কদাচিৎ অভিনীত হয়, কাজেই অভিনয়কালে এগুলি কি রকম দাঁড়াইবে সে বিষয়ে সাধারণের ধারণা নাই। শুধু তাহাই নয়, এগুলিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখিবার ফলে সাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে—রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়যোগ্যতা তেমন নাই। কথাটার বিচার হওয়া আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকের রঙ্গমঞ্চখ্যাতি হয় নাই এ কথা সত্য নহে। 'চিরকুমার-সভা' ও 'শেষরক্ষা' পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। একসময়ে 'রাজা ও রাণী' এবং 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র নাট্যীকৃত রূপ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। পরবর্তী কালে 'বিসর্জন' কিছু পরিমাণে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তবু স্বীকার করিতে হয় যে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সহিত রবীন্দ্র-নাটকের যোগাযোগ আত্মিক নয়, আকস্মিক। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক একসময়ে যে-রকম জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, রবীন্দ্র-নাটক কখনো তেমন দাবি করিতে পারে নাই। আবার, তাঁহাদের নাটকের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যোগ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক, জলের সঙ্গে জলচরের যোগের মত; রবীন্দ্রনাথের নাটক সাঁতার-জানা মানুষ, জলে নামিলে ভাসিতে পারে, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, ডাঙাই তাহার স্বাভাবিক ক্ষেত্র।

নাটকের অভিনয়যোগ্যতার মূলে থাকে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা। শেক্সপীয়র, মলিয়ের, ইবসেন, শ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ ঘটনাচক্রে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রে স্থাপিত হইয়া উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ'-র অভিজ্ঞতা পূর্বোক্ত তিনজনের ন্যায়

অঙ্গাঙ্গী না হইলেও অকিঞ্চিৎকর নয়। বিশেষ, নাটক লিখিবার আগে দীর্ঘকাল শ' জনসভায় বক্তৃতা করিয়া যে-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, শ্রোতাদের যে-পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাকে কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। এইজন্যই দেখা যাইবে যে, তাঁহার নাটকের অনেক পাত্রপাত্রী যেন পাবলিক স্পীকার বা গণবক্তা।

গিরিশচন্দ্রকে তো বাংলাদেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা বলিলেই চলে। আবার, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সহিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-কথা কোনোভাবেই প্রযোজ্য নহে। বাল্যকাল হইতে ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছেন, ঘরোয়া বা আধা-ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটকের প্রধান পাত্ররূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, পরবর্তী কালে বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যে-সব Convention বা সংস্কারকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও পরিকল্পিত সন্দেহ নাই; রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রভাবিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি নিজে কখনো পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দ্বারা অর্থাৎ গণচিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষার সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। ইহা গৌরব করিবার বিষয় নয়, নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি অবাঞ্ছিত অপূর্ণতা; শেক্সপীয়র সমকালীন রঙ্গমঞ্চকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তেমনি নিজেও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চনিরপেক্ষ নাট্যকার হইলে শেক্সপীয়রীয় মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। গীতিকবি বা ঔপন্যাসিক গণ-সংঘাত হইতে দূরে অবস্থান করিয়া শিল্পসৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে তেমন বিবিক্তভাবে অবস্থান সম্ভব নয়; তেমন ব্যবধান ঘটিলে তাহার শিল্পসৃষ্টি অপূর্ণ হইতে বাধ্য।

গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের ইতিহাস ও বিবর্তনের মধ্যে যে একটি মিল আছে এ-কথা আগে অনেকবার বলিয়াছি।

এখানে সেই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলা যায়। গ্যেটে অনেকগুলি অভিনয়যোগ্য নাটক রচনা করিয়াছেন। (এখানে ফাউস্টের কথা বলিতেছি না।) সে-সব নাটকের প্রাথমিক আত্মপ্রকাশের রঙ্গমঞ্চ ছিল Weimer ডিউকের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চের আদর্শেই ও প্রভাবেই গ্যেটের অধিকাংশ নাটক লিখিত—গ্যেটের নাটকের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ-কথা কিছুতেই ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু উক্ত রঙ্গমঞ্চকে প্রকৃত অর্থে পাবলিক স্টেজ বলা উচিত হইবে না। যে অর্থে শেক্সপীয়রের রঙ্গমঞ্চ পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ছিল সে অর্থে নিশ্চয়ই নয়। ইহা একটি অভিজাত রাজপরিবারের সখের সামগ্রী—ইহার গুণপনা, আবশ্যকতা ও উপকারিতা অস্বীকার না করিয়াও অনায়াসে বলা চলে যে, এ-রঙ্গমঞ্চ সাধারণ দর্শক, নাট্যকার ও অভিনেতার মধ্যে সার্থক ও স্বাভাবিক যোগাযোগ ঘটাইয়া পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে পারে নাই। এখন, এই রঙ্গমঞ্চটি গ্যেটের নাটকের আদর্শ ছিল বলিয়াই গ্যেটের কোনো নাটকই নাট্যশিল্পের মানদণ্ডে পূর্ণাঙ্গ নয়। গ্যেটের নাটকগুলি সাহিত্য হিসাবে অপূর্ব। তাহাতে কাব্যরস, মানবজীবনের অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র নরনারীর সমবায় আছে সত্য। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটক ততোধিক কিছু। সেই ততোধিক কিছুর সৃষ্টি হওয়া একমাত্র সম্ভব সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে।

এবারে রবীন্দ্রনাট্য-প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-নাটকের কাব্যরস, মানবরস ও বিচিত্র নরনারীর লীলাকে স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প নয়। কেন নয়, এতক্ষণে বুঝিতে পারার সম্ভাবনা। এগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অনির্বচনীয় জাদুমন্ত্রের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ওঠে নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জাদুপূত হইলেই যে উচ্চশ্রেণীর নাট্যশিল্পসৃষ্টি হয় এ-কথা বলিতেছি না, বলিতেছি যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রভাবের বাহিরে কখনো পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্পসৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক অসাধারণ, কিন্তু ঐ অসাধারণত্বেই তাহার ত্রুটি, সাধারণের নিকট কিছু পরিমাণে

নতি স্বীকার করিলে তবেই এগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প হইয়া উঠিতে পারিত। কাজেই, আমার আশঙ্কা এই যে, দেশে যতই শিক্ষা বিস্তারিত হোক, রুচি যতই উন্নত হোক, রবীন্দ্র-নাটক কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বস্তু হইয়া উঠিবে না। এগুলি অত্যন্ত বেশিভাবে এককের সৃষ্টি। নাটক যৌথ শিল্প, তাহাতে যদি উগ্রভাবে এককের সৃষ্টি হয়, তবে তাহার একঘরে হইয়া থাকার আশঙ্কাই প্রবল।

রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়যোগ্যতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তব্য এবারে বলিতেছি। নাট্যশিল্প প্রধানত তিনটি মূল উপাদানকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়া থাকে—বক্তৃতা, আবৃত্তি ও কথোপকথন। এ-তিনটিই নাট্যশিল্পের চেয়ে পুরাতন। এই তিনের সমাবেশেই নাট্যশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সব সময়ে যে তিনেরই সমান সমাবেশ হইয়া থাকে এমন নয়। যুগভেদে, সামাজিক অবস্থাভেদে এবং লেখকের প্রতিভাভেদে সমাবেশের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শেক্সপীয়রের নাটকে তিনেরই সমাবেশ দৃষ্ট হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে বক্তৃতা ও আবৃত্তির প্রাধান্য। কোরাস-পুরোধা ও অন্য পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্যে কখনো কখনো কথোপকথনের ছাঁচটি ব্যবহৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত নাটকের মাঝে মাঝে যে শ্লোকগুলি আছে সেগুলি আবৃত্তির ছাঁচে ঢালাই করা।

শীয় (শ'-র) নাটকের প্রধান আদর্শ কথোপকথন, অবশ্য অনেক স্থলে বক্তৃতার ছাঁচও দৃষ্ট হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক প্রধানত বক্তৃতার আদর্শকেই গ্রহণ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে বক্তৃতার আদর্শ আছে, আবার কথোপকথনের সুচারু দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

রবীন্দ্র-নাটকের আদর্শ কি? তিনি বক্তৃতাত্মক আদর্শকে প্রায় সমূলে পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার নাটকীয় ভাষার ছাঁচ—হয় আবৃত্তি, নয় কথোপকথন। এখানেও আবার একটি ভাগ করা চলে।

তাঁহার পদ্যে লিখিত নাটকের ছাঁচে আবৃত্তির ঢঙ, আর গদ্যে লিখিত নাটকের ছাঁচে কথোপকথনের ঢঙ। এ-দু'টি সরাসরি নিয়ম না হইলেও, যথাসম্ভব এই ধারাকেই তিনি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী প্রভৃতি কাব্যনাট্যের রস আবৃত্তির রস। এ-সব নাটকের ক্ষেত্রে ততোধিক আশা করা উচিত হইবে না। মনোরম কণ্ঠে যথাযথ আবেগ সঞ্চার করিয়া এই-সব নাটক অভিনীত হইলে বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে বলিয়া আমার ধারণা। যে-ক্ষেত্রে যাহা করা উচিত নয়, তাহাই করিয়া মানুষে অনেক সময় ঠকে। 'মালিনী' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা—ইহাতে আবৃত্তিরস নাট্যরসে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই রঙ্গমঞ্চ যে ইহার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এমন মনে করি না। বেতার রঙ্গমঞ্চ ইহার যোগ্যতর স্থান। কিন্তু মনে হয় যে, ইহার প্রশস্ততম স্থান 'টেলিভিশন' রঙ্গমঞ্চ। বেতারে শুধু আবৃত্তিকেই পাওয়া যাইবে, দৃশ্য-অংশ বাদ পড়িয়া যাইবে, 'টেলিভিশনে' সেই ত্রুটির সংশোধন হইবে। অথচ টেলিভিশনের রঙ্গমঞ্চ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ নয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অভিনয়কালে সহস্র দর্শকের মতামতের দ্বারা অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত। টেলিভিশন রঙ্গমঞ্চ সে-প্রভাবমুক্ত। তাহা এককের বিলাসক্ষেত্র; আর রবীন্দ্রনাথের নাটকও যে অত্যন্ত একাগ্রভাবে এককের সৃষ্টি। কাজেই সেক্ষেত্রে দুইয়ের সার্থক যোগাযোগ হইবে বলিয়া ধারণা।

বাল্মীকি-প্রতিভার গানগুলি সুরে গেয় হইলেও তাহার ছাঁচটা আবৃত্তিমূলক। এ-কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন।

ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মূল ছাঁচ অবশ্য বক্তৃতা, আবৃত্তি বা কথোপকথন নয়, এমন কি সঙ্গীতও নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। এগুলির মূল ছাঁচ নৃত্য। অর্থাৎ 'দেহ গানে'র ভাষাতেই এগুলির যথার্থ রসোদ্বোধন। কাজেই আগে যে-তিনটি ছাঁচের কথা

বলিয়াছি নৃত্যনাট্য ও ঋতুনাট্যের বিচার সে-আদর্শে করা চলিবে না।

একজন বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী মালিনী নাটকের সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজেডির ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে বোধ করি এইজন্যই যে, আবৃত্তির আদর্শে ঢালাই করা গ্রীক ট্র্যাজেডির সঙ্গে আবৃত্তিমূলক মালিনীর মিল তাঁহার চোখে পড়িয়া থাকিবে। অভিনয়ের ক্ষেত্রকে যদি প্রশস্ততর করিয়া লইয়া আবৃত্তিকেও তাহার অন্তর্গত করি, তবে মালিনীর মতো কাব্যনাটকের অভিনয়যোগ্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের কারণ থাকে না। দেশে শিক্ষাবিস্তার ও রুচির উন্নয়নের সঙ্গে এই ব্যাপারটাই ঘটিবে বলিয়া আমার ধারণা। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক, যেমন কাব্যনাটকগুলি, আবৃত্তিমূলক অভিনয়ের দ্বারা, বেতারে, টেলিভিশনে এবং বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর আসরে একটি মনোহর পদবী লাভ করিবে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নিত্যকার ভোজ্য হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। এই-সব রবীন্দ্র-নাটক যখন উল্লিখিত পদবী লাভ করিবে তখন আমাদের রসাস্বাদনের একটা নূতন ক্ষেত্রসৃষ্টি হইবে এবং যোগ্য অভিনেতাদেরও আত্মপ্রকাশের একটা নূতন পন্থা পাওয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট

বাঁশরী সরকার

শেষের কবিতা প্রকাশের চার বছরের মধ্যে বাঁশরী নাটক প্রকাশিত হয়। চার বছর আগে শেষের কবিতা লিখিবার সময়ে কবির মনে যে তরঙ্গাভিঘাত চলিতেছিল বাঁশরী লিখিবার সময়েও তাহা থামে নাই—বরঞ্চ তাহা যেন অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শেষের কবিতাতে যে তিক্ততার সূত্রপাত, বাঁশরীতে তাহা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে; এমন ঝাঁঝ রবীন্দ্রনাথের অল্প রচনাতেই আছে।

শেষের কবিতার মূলে দুটি প্রেরণা, একটি অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমস্যা, দ্বিতীয়টিকে বলা চলে প্রেম-পরিণয়-তত্ত্ব; বাঁশরীতেও মূলে এই দুইটি সমস্যা। শেষের কবিতার মতো বাঁশরীর প্রারম্ভ Satire-এ, পরিণাম Seriousness-এ; শেষের কবিতা আংশিক Novel of Manners, বাঁশরী-ও অংশত Comedy of Manners; শেষের কবিতা গল্পাকারে লিখিত, বাঁশরীও গল্পাকারে লিখিত হইলে অধিকতর শিল্পসৌষ্ঠবসঙ্গত হইত।

এই নাটকের সূচনায় বাঁশরী সরকার ও ক্ষিতীশ ভৌমিকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়। ক্ষিতীশ ভৌমিক একজন আধুনিক লেখক, সে গল্প লিখিয়া নাম করিয়াছে, বাঁশরীর মতে দুর্নাম করিয়াছে। বাঁশরী এই হতভাগ্য লেখকটাকে টানিয়া লইয়া এক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কেন্দ্রে আনিয়া ফেলিয়াছে; সে ক্ষিতীশকে বলিতে চায় যে, যে সমাজকে দূর হইতে অস্পষ্টভাবে দেখিয়া তাহার দলের লেখকরা বিদ্রূপ করে, সেই সমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ দিবার জন্যই তাহাকে এখানে আনিয়াছে।

ক্ষিতীশের চরিত্র আর্টিস্টের অপক্ষপাত তুলিতে অঙ্কিত নয়, তাহা ব্যঙ্গরচকের রচনা; তাহাকে উপলক্ষ করিয়া একদল আধুনিক লেখককে বিদ্রূপ করিবার জন্যই কবি প্রস্তুত। আধুনিক লেখকদের

বিদ্রূপ করাতে কাহারো আপত্তি থাকিবার কথা নয়, কিন্তু আধুনিকদের যোগ্যতম প্রতিনিধি বাছিয়া লওয়া উচিত ছিল। বাঁশরী সরকারের চরিত্র সৃষ্টিতে কবি যে মমতা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার মুখে যে শাণিত বাক্‌বৈভব দান করিয়াছেন, ক্ষিতীশের চরিত্রে ও মুখে কবি সে শক্তি দান করেন নাই; যোগ্যের বিরুদ্ধে যোগ্যকে দাঁড় করাইলে নালিশ উঠিত না এবং শিল্পীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগও করিতাম না। মনে করা যাক্‌, বাঁশরী সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি অমিত রায় হইত! অমিত যদিচ আধুনিক লেখক নয়, তৎসত্ত্বেও সে আধুনিকদের পৃষ্ঠপোষক। তাহা হইলে বাঁশরী সরকার কি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইত? অমিত-বাঁশরী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁশরী জয়লাভ করিলেও অভিযোগের কারণ থাকিত না। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকেও অসাধারণ বাক্‌-কৌশলী পুরুষ আছে। যদিচ শেষরক্ষার চন্দ্রকান্ত বা চিরকুমার সভার অক্ষয় কেহই সাহিত্যিক নয়, তবু তাহারা বাঁশরীর প্রত্যেক যুক্তির এবং প্রত্যেক কুযুক্তির পক্ষচ্ছেদ করিতে পারিত যুক্তি-কুযুক্তিতে প্যাঁচানো বাক্‌-পটুতার শানোজ্জ্বল সুদর্শনচক্রে।

এই পক্ষপাতের ত্রুটি ছাড়াও ক্ষিতীশের চরিত্রে আর একটি গুরুতর ত্রুটি আছে—তাহা চরিত্রসৃষ্টির সমতার অভাব বা অসঙ্গতি।

ক্ষিতীশের 'বেমানান' বা 'ভালোবাসার নীলাম' নামে যুগান্তকারী উপন্যাসের স্বপক্ষে আমাদের কিছুই বলিবার নাই; বাঁশরী ক্ষিতীশের 'ভালোবাসার নীলাম'-এর পাণ্ডুলিপি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে—বাংলা সাহিত্যের উপকারই করিয়াছে। কিন্তু যে লেখক 'বেমানান' বা 'ভালোবাসার নীলাম'-এর মতো নিম্নশ্রেণীর গল্প লেখে সে এমন সুন্দর কথা বলে কি করিয়া? এমন সূক্ষ্ম কারুখচিত, শানিত, উজ্জ্বল বাক্‌-পটুতা সে কোথায় পাইল? সরল ভাষার উপরে এমন সহজ স্বচ্ছন্দ দখল যাহার, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, humour-এর অভাব তাহার হইবার

নয়; আর humour ও কাণ্ডজ্ঞান, একটিকে ছাড়িয়া আর একটি থাকিতে পারে না, যদি থাকে তবে সে বেমানান গল্প লিখিলেও নিশ্চয়ই তাহা প্রকাশ করিত না, আর নিতান্তই 'বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে' প্রকাশ করিলেও বাঁশরীকে পড়িবার জন্য সগৌরবে আনিয়া দিত না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ও গল্পে বাক্-পটুতা একটি বিশেষ গুণ। কোন লোককে বুঝিবার প্রধান উপায় তাহার বাক্যব্যবহার-কলা। কাজের দ্বারা লোক বুঝা যায়; কিন্তু রবীন্দ্র-গল্প-নাটকে action নাই বলিলেই হয়, কাজেই বাক্যই একমাত্র লোককে বুঝিবার উপায়। চন্দ্রকান্ত, অক্ষয়, অমিত রায়কে যে আমরা বুঝি, তাহাদের কাজের দ্বারা নয়, তাহাদের বাক্-বৈদগ্ধ্যের দ্বারা; বাক্যই এখানে কার্যের স্থান অধিকার করিয়াছে।

এখন, বাক্য দ্বারা যদি ক্ষিতীশের চরিত্র-ধারণা করিতে হয় তবে কবি তাহাকে যেভাবে বিদ্রূপের পাত্র করিয়া তুলিয়াছেন, সেভাবে গ্রহণ করিতে আমাদের রসবোধ অস্বীকার করে।—

ক্ষিতীশ

দু'জন মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল। দুই সংখ্যাটা গড়ায় এসে সুশীতল গার্হস্থ্যে। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাট্য। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায়?

* * * *

ক্ষিতীশ

আদালতের সাক্ষীর মতো জানিনে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

* * * *

ক্ষিতীশ

বাঁশি, বৈদিককালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো—যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে, সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা, আবার

পাদোদক নিতেও ছাড়ো না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

*   *   *   *

ক্ষিতীশ

আমার হয়েছে অন্ধ-গো-লাঙ্গুল ন্যায়। ল্যাজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেরেছে আমাকে, কিন্তু চেহারাটা রয়েছে অস্পষ্ট। মোট কথাটা এই বুঝেছি যে, সুষমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদুরকে, পাবে রাজৈশ্বর্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

*   *   *   *

ক্ষিতীশ

তাহলে অন্তত গল্পটার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তারপর সাঁতরিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক্ পারে পৌঁছব।

*   *   *   *

ক্ষিতীশ

আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চঞ্চু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

*   *   *   *

ক্ষিতীশ

এর থেকে ভাষার রেলেটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা মর্মান্তিক জরুরী তোমার পক্ষে তা ঝেঁটিয়ে ফেলা বাজে।

*   *   *   *

উপরে ক্ষিতীশের বচনের উদ্ধৃতি হইতে কী মনে হয়? ইহাতে যে কেবল অসাধারণ বাক্-কৌশল আছে তাহা নয়, নারীচরিত্রের রহস্যভেদের দৃষ্টি আছে, তীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় আছে, বাঁশরীর মনস্তত্ত্ব বিদ্ধ করিবার মতো সুতীক্ষ্ণ বাণ আছে—এক কথায় অসাধারণত্ব আছে। এই কথাগুলি অমিত রায়ের বলিয়া চালাইলেও

বিস্ময়ের কারণ থাকিত না। অথচ এ-হেন ক্ষিতীশ, 'বেমানান' ও 'ভালোবাসার নীলাম' লিখিয়া যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসাবে বাঁশরীকে পড়িতে দেয়! আরও অসঙ্গতি আছে। এমন সূক্ষ্ম কাণ্ডজ্ঞান যাহার, তাহার অবিলম্বে বুঝা উচিত ছিল সুষমা-পুরন্দরের মাঝখানকার তিন সংখ্যাটা স্বয়ং বাঁশরী সরকার। ক্ষিতীশের চেয়ে কম বুদ্ধিমান লোকেও ইহা সহজে বুঝিতে পারিত। আর হঠাৎ কেন যে বাঁশরী তিন চারি দিনের নোটিশে ক্ষিতীশকে বিবাহ করিতে রাজী হইল —ইহাও ক্ষিতীশের পক্ষে না বুঝিয়া ওঠা বিস্ময়ের। ইহা যে ক্ষিতীশের প্রতি প্রেম নয়, সোমশঙ্করের অবহেলার সদম্ভ প্রত্যুত্তর— ইহা অন্ধেও বুঝিতে পারে।

এখন ক্ষিতীশ-চরিত্রে এই অসঙ্গতির কারণ কি? আগাগোড়া সুসঙ্গত একটা চরিত্র সৃষ্টি করিতে গেলে হয় একটা নিরেট বোকা বানাইতে হয়, নতুবা আর একটা অমিত রায় সৃষ্টি করিতে হয়। একটা নির্বোধ সৃষ্টি করিলে নাটকের সূত্রপাত করাই মুশকিল, আর দ্বিতীয় অমিত রায় সৃষ্টি করিলে সে এক মুহূর্তে বাঁশরী ও তাহার সমাজের অভাজনদের যুক্তিজ্ঞানকে তূলা ধুনিয়া উড়াইয়া দিয়া গোড়াতেই নাটকের সমাপ্তি সাধন করিয়া দিবে। এইবারে, শুরুতে যে তিক্ততার কথা পড়িয়াছিলাম তাহা আসিয়া পড়িল। তরুণ বাঙালী সাহিত্যিকরা যখন রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিতেছিল তখন কবি বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভ থাকিলেও থাকিতে পারে। এই অভিজ্ঞতা কবির একটা সময়ের রচনাতে আছে; যাহারা তাঁহার গড়া পুতুল তাঁহার কাছে বেচিয়া বড়াই করে— তাহাদের প্রতি কবির একটা গভীর ধিক্কারের ভাব ছিল। এই অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে তরুণ সাহিত্যের ত্রুটি দেখাইয়া দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; এই প্রেরণা হইতেই নিবারণ চক্রবর্তী ও ক্ষিতীশ ভৌমিকের সৃষ্টি। একদিকে যেমন ক্ষিতীশ ভৌমিক প্রমুখ তরুণ

সাহিত্যিকদের প্রতি বিরাগের ভাব, অপরদিকে তেমনি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি, অন্তত এই নাটকের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি কবির মমত্ববোধ। এই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি তাঁহার মমত্ব-শ্রদ্ধা না থাকিলে সুষমার মতো অসাধারণ মেয়ে, বাঁশরীর মতো তেজস্বী মেয়ে এখানে আবিষ্কার করিতে পারিতেন না; সোমশঙ্করকে শম্ভুগড় হইতে টানিয়া আনিয়া এই আংটি বদলের সভায় ভর্তি করিয়া দিতেন না। এখন এই দুই দলের মধ্যে কবি দো-টানায় পড়িয়াছেন। তরুণ সাহিত্যের প্রতি ধিক্কার—তাহাদের একটা প্রত্যুত্তর—দেওয়া চাই; আবার যে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে তরুণদের অনভিজ্ঞতাজাত আক্রোশ, তাহাকেও সস্নেহে রক্ষা করা চাই। এমন দুই পক্ষ রাখিয়া সৃষ্টি করিতে গেলে পক্ষপাত-সৃষ্টি হইবেই।

ক্ষিতীশ ভৌমিকের দলের সাহিত্যিক বাড়াবাড়ি যদি থাকে তবে কবির সস্নেহপক্ষাশ্রিত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজেরও বাড়াবাড়ি বড় কম নয়। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সতীশ শচীন লীলা তারক বাঁশরী-ক্ষিতীশ সংবাদ লইয়া যে আলোচনা করিয়াছে তাহা যে কেবল অশোভন তাহা নয়, ঘটনা হিসাবে অসম্ভব এবং শিল্প হিসাবে অবিশ্বাস্য ও অবান্তর।

ক্ষিতীশের দলকে উপলক্ষ করিয়া একদল বাঙালী সাহিত্যিককে কবি বলিতে চান যে, তাহাদের পরিচয় কেবল পুঁথির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে নয়; সেইজন্য তাহাদের রচনায় জীবনের সঙ্গীত নাই, আছে পুঁথির প্রতিধ্বনি।

"বানিয়ে তোলা লেখা তোমার, বই-পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।"

যে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে ক্ষিতীশের দল বইয়ে দেখিয়াছে এবং অধিকাংশ সময়েই ইংরেজী বইয়ে দেখিয়াছে, সত্যভাবে তাহাকে দেখিবার জন্য বাঁশরী ক্ষিতীশকে এই দুর্গের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। ক্ষিতীশ দেখিয়া যাক্, এখানেও মানুষের বাস, সংসারের

নির্মম নিষ্পেষণে এখানকার অধিবাসীদেরও হৃদয়ের রক্ত ফাটিয়া ফাটিয়া পড়ে।

বইয়ের ভিতর দিয়া ইহারা সংসারকে দেখে বলিয়াই যাহাকে ইহারা 'রিয়ালিজম্' বলে তাহার সহিত রিয়ালিটির কোন সম্বন্ধ নাই—তাহা একপ্রকার ফিকে রোমান্স। ফিকে রোমান্স ও ফিকে রিয়ালিজম্ মূলে দুই-ই এক, কারণ দুই-ই অর্ধ-সত্য; কবির মতে বইয়ের দূরবীনের ভিতর দিয়া সংসার দেখা সাহিত্যিকের দল এই অর্ধসত্যের গোধূলিরাজ্যের জীব; রিয়ালিজমের সুরা বা রোমান্সের অমৃত কোনটাকেই সহ্য করিবার শক্তি তাহাদের নাই; পুঁথির দিগন্তের ঘের দেওয়া একটা মায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়া বালখিল্যের দল এখানে জগৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতেছে।

সুষমাকে দেখিয়া ক্ষিতীশ বিস্মিত হইয়া বলিতেছে—

কী আশ্চর্য ওঁকে দেখতে! বাঙালী ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না; যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্রুনহিলড্।

বাঁশরী

(তীব্র হাস্যে) হায়, যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষই হোক না কেন, সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রিয়ালিস্ট বলে দেমাক করো, ভান করো, মন্তর মানো না। লাগ্‌ল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে। আজও কবি-মনটা রূপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিঁচড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি করে মনের উপরকার চামড়াটাকে করে তুলছে কড়া। দুর্বল বলেই এত বড়াই।

ক্ষিতীশ

সে কথা মাথা হেঁট করেই মানবো। পুরুষ জাত দুর্বল জাত।

বাঁশরী

তোমরা আবার রিয়ালিস্ট! রিয়ালিস্ট মেয়েরা। যতো বড়ো স্থূল পদার্থ হওনা, যা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের।

পাঁকে ডোবা জলহস্তীকে নিয়েই ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স বানাইনে। রং মাখাইনে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব। ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো! পোড়া কপাল আমাদের। এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়ালিস্ট, রাস্তায় চল্‌তে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা, মিনর্ভা!

* * * *

বাঁশরী

লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার মুখোশটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায়, ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তর ছড়াচ্ছে। সামনে পড়লো পথ-চলতি এক রাজা, শুরু করলে জাদু। কিসের জন্যে। শুনে রাখো, টাকা জিনিসটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের, ওটা তোমাদের রিয়ালিজ্‌মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ

টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বুদ্ধির লক্ষণ, সেইসঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরী

আছে গো, হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজলে দেখ্‌তে পাবে পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু মুনফা একদিকে, হৃদয়টা আর একদিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনি জমবে গল্পটা। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে, বলবে মেয়েদের খেলো করা হোলো, অর্থাৎ তাদের মন্ত্রশক্তিতে বোকাদের মনে খট্‌কা লাগানো হচ্ছে। উঁচুদরের পুরুষ-পাঠকও গাল পাড়বে। বল কি, তাদের মাইথলজির রং চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কি ভয় ক'রো না

ক্ষিতীশ, রং যখন যাবে জ্ব'লে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টিকে, শৈলের মতো, শূলের মতো।"

*　　*　　*　　*

বাঁশরীর মনে কি তিক্ততা! কথায় কি ঝাঁঝ! এথীনা, মিনর্ভা যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী! তাহার ব্যক্তিগত ঈর্ষা ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে—তাহা বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি কবির সনির্বন্ধ উপদেশ। রং নয়, মন্ত্র নয়, মাইথলজি নয়, কোন 'ইজ্‌ম্' নয়,—প্রত্যক্ষভাবে সত্যকে দেখো—সরলভাবে সত্যকে প্রকাশ করো—"লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরা ছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেখুক এতদিন পরে বাংলায় দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোলো যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।"

পুঁথি-মাত্র পড়া বাঙালী সাহিত্যিক এতদিন শিখিয়াছে যে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। তাহাদের প্রতি কবির উপদেশ এই যে, "সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হোলেই তাকে বলে সাহিত্য।"

কোন একটা উপলক্ষে একদল বাঙালী সাহিত্যিককে বিদ্রূপ করা ছাড়াও নাটকের মধ্যে ক্ষিতীশের একটি শিল্পগত প্রয়োজন আছে, নতুবা ক্ষিতীশ-চরিত্র নাটকের পক্ষে অবান্তর হইয়া পড়িত। বাঁশরীর আত্মপ্রকাশের জন্য ক্ষিতীশের দরকার। সোমশঙ্করকে না পাওয়াতে বাঁশরী মনে গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। এমন স্থলে সাধারণ মেয়েরা কাঁদিয়া কাটিয়া পড়াপড়শীর করুণা জাগ্রত করিয়া, প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করিয়া শান্ত হয়—ঐ তাহাদের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু বাঁশরীর মতো অসাধারণ মেয়ে, যে মরিয়া গেলেও কাহাকেও দুঃখ জানাইবে না, তাহার আত্মপ্রকাশ কি উপায়ে? আর এত বড় গুরুতর বোঝা মন হইতে কেমন করিয়া নামিবে—যদি সে দুঃখকে কোন উপায়ে প্রকাশ করিতে না পায়! সংসারে দুঃখপ্রকাশের দুটি উপায় আছে, একটি বাস্তব পন্থা, কান্নাকাটি, বুক চাপড়ানো,

হায় হায়; অধিকাংশ লোক যাহা করে; আর একটি শিল্পপন্থা, খুব অল্প লোকেই সে পথে চলে। নিজের দুঃখকে শিল্পবস্তু করিয়া তুলিতে পারিলে দুঃখেরও লাঘব হয়; তাহা অপরের মুখ দিয়া প্রকাশিত হওয়াতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা চলে, শিল্পগত বেদনা যেন অপরেরই বেদনা; ব্যক্তিগত পরিচয়ের লজ্জা যেন তাহাতে থাকে না। বাঁশরীর মতো চাপা মেয়ে দুঃখপ্রকাশের এই শিল্প-পন্থাকে স্বীকার করিয়াছিল; তাহাতে মনের ভারও যেন লঘু হয়, আবার ব্যক্তিগত লজ্জাকেও যেন স্বীকার করিতে হয় না। এই কারণেই সে শিল্পী ক্ষিতীশকে আশ্রয় করিয়াছে; নিজের দুঃখকে সে তাহার মুখে শুনিতে চায়, নিজের দুর্দশাকে সে তাহার চোখ দিয়া দেখিতে চায়, নিজের কলমকে সে তাহার হাত দিয়া ধরিয়া লেখাইতে চায়। বাঁশরী নিজের অসহায় অবস্থায় যে তাহাকে অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে, ক্ষিতীশের রচনাশক্তি সম্বন্ধে সে কৃতনিশ্চয়। বাঁশরীর মধ্যে একটি অপরিণত, অসম্পূর্ণ শিল্পী আছে, সেই শিল্পীর স্বাভাবিক আকর্ষণই ওই সম্পূর্ণতর, স্ফুটতর শিল্পী ক্ষিতীশের প্রতি। ক্ষিতীশ-শিল্পীর মধ্যে বাঁশরী-শিল্পী যেন নিজেকে objective ভাবে, বস্তুগোচর করিয়া, পূর্ণতর করিয়া দেখিতে পায়; সেইজন্য ক্ষিতীশের প্রতি তাহার অদ্ভুত মিশ্র একপ্রকার মনোভাব, ঈর্ষা, বিদ্রূপ, ধিক্কার, আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণ, আসক্তি ক্ষণে ক্ষণে স্থানপরিবর্তন করিতেছে; নিজের অনায়ত্ত দোসরের প্রতি বোধ করি মানুষের ওই একরকম বিচিত্র আকর্ষণ হয়।

বাঁশরী

সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্রাজেডির সঙ্কেত—আগুনের সাপ ফণা ধরেছে, এখনো চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হলো না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়তো রক্তবর্ণ

আগুনের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টের চোখে, বলতে পারছিনে আর্টিস্টের কণ্ঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হোতেন তাহলে অদৃষ্ট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুকে যেতো ফেটে।

ক্ষিতীশ

কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পারো না, বাঁশি, তুমি নও আর্টিস্ট। তুমি যেন হীরে মুক্তোর হরির লুঠ দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায় দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরী

আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই, তবু বলা—সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায়, হাতে-হাতে দিনে-দিনে। ঘরে-ঘরে মুহূর্তে-মুহূর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।

* * *

মেয়েরা শিল্পের দ্বৈতবাদী, দুইজনের মধ্যে তাহাদের শিল্প আবদ্ধ ; পুরুষ শিল্পের অদ্বৈতবাদী, আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া যায়—কি করিয়া সে কথা বিশ্বের কানে প্রবেশ করে। যেসব মেয়ে সার্থক শিল্পী, তাহাদের মধ্যে পুরুষ জাগ্রত হইয়া কলম ধরিয়া বসে। বোধ করি, প্রত্যেক মহৎ শিল্পীই পৌরুষে নারীত্বে সংমিশ্র ; সে নিছক স্ত্রী-পুরুষের চেয়ে পূর্ণতর জীব ; প্রত্যেক মহৎ শিল্পী অর্ধনারীশ্বর।

বাঁশরী-ক্ষিতীশ সংবাদ বাদ দিলে বাকি গল্পটা এই রকমের। শম্ভুগড়ের অবাঙালী রাজপুত্র সোমশঙ্কর মধ্যযুগীয় সাজসজ্জা লইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসে ; সেখানে বাঁশরীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বাঁশরী তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া তোলে। তাহাদের প্রণয় যখন পরিণয়ে পরিণত হইবার মুখে, এমন সময়ে পুরন্দর নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়া পড়িল। সে বাছিয়া বাছিয়া ছাত্রী পড়াইত ; সুষমা সেন তাহার অসাধারণ ছাত্রী ; সুষমা পুরন্দরকে ভালোবাসিয়া ফেলিল। পুরন্দর কোথায়

নাকি একটা তরুণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য একটি নিষ্কাম দম্পতি খুঁজিতেছে: সুষমা ও সোমশঙ্কর সেই রকম ভাবী দম্পতি; সে সুষমার সঙ্গে সোমশঙ্করের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিল; বাঁশরী বঞ্চিতা হইল। ইহাই নাট্য-কাহিনীর কাঠামো।

সুষমা যে অসাধারণ মেয়ে, এমন পরিচয় নাটকের মধ্যে নাই: তাহার দৈহিক সৌন্দর্যের অপরূপত্বের উল্লেখ আছে মাত্র; কিন্তু তাহার কথাবার্তায় বা ব্যবহারে কোন বৈশিষ্ট্য নাই; তাহার অসাধারণত্ব বিষয়ে পুরন্দর ও সোমশঙ্করের অভিমতকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

পুরন্দরকেও অসাধারণ বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা আছে। সে কখনো রোশনাবাদের নবাবের সঙ্গে পোলো খেলে: কখনো ডাক্তার উইলকক্সকে যোগবাশিষ্ঠ পড়ায়; কখনো ভালুক শিকার করে, কখনো ছাত্রী নির্বাচন করে; দীর্ঘকাল নাকি ইউরোপেও ছিল; নানা বিরুদ্ধ কিংবদন্তী তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া একটা রহস্যের কুয়াশার সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার বিচিত্র খেয়ালও তাহার ব্যক্তিত্বের অংশ; মনকে নাড়া-দেওয়া দু-চারটা কথাও তাহার মুখে শোনা যায়; কিন্তু ইহা ছাড়া যদি কিছু অসাধারণত্ব থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া দেখানো হয় নাই; কবিকে বিশ্বাস করিতে হইবে।

সোমশঙ্কর চেহারায় ও আচার-ব্যবহারে অসাধারণ না হইলেও অদ্ভুত। এই বীরোচিত চরিত্র উদ্‌ভাবন করিতে কবি অবাঙালীর সাহায্য লইলেন কেন? আগেও অনেকটা এই জাতীয় একটি চরিত্র কবি সৃষ্টি করিয়াছেন, গোরা উপন্যাসের গোরা; সে গোরাও বাঙালী নয়, আইরিশম্যানের ছেলে।

সোমশঙ্কর ও গোরাকে অবাঙালী করাতে ইহাই কি বুঝিতে হইবে যে, এমন হাড়-মোটা, মাথায়-উঁচু, আদর্শনিষ্ঠ, ভাবাবেগে

অনুদ্বেজিত দৃঢ়-পিনদ্ধ-চরিত্র বাঙালী সমাজে বিরল? আমার মনে হয়, এই জাতীয় একটা ধারণা কবির মনে আছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবির দুটি প্রবন্ধে বারংবার সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, বিধাতা যেখানে চার কোটি বাঙালী গড়িয়াছেন, সেখানে কেন হঠাৎ একটা বিদ্যাসাগর গড়িয়া বসিলেন? বিদ্যাসাগর-চরিত্র যে বাঙালী সমাজে আকস্মিক—এই ধারণা কবির মনে যেন আছে। যাহা হোক, সোমশঙ্করের পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্য ছাড়া অন্য কোন অসাধারণত্ব থাকিলেও নাটকের মধ্যে বিশেষ করিয়া তাহা দেখানো হয় নাই।

বাঁশরী সরকার এই নাটকের প্রধান ব্যক্তি, কিংবা বাঁশরী সরকারই বাঁশরী নাটক। এই শাড়ি-পরা ঘূর্ণি হাওয়াটি নাটকের হাসির দিগন্ত হইতে অশ্রুর দিগ্‌বলয় পর্যন্ত হু-হু শব্দে ছুটিয়া গিয়াছে; তাহার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে চিরদিনের চেনা আকাশখানার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া অভিনবত্ব প্রকাশ করিয়াছে; তাহার মর্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস সোমশঙ্কর-পুরন্দর-সুষমার ব্রতনিষ্ঠ আদর্শের শুষ্ক পাতা উড়াইয়া একেবারে ভাবী বঙ্গসাহিত্যের বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আর তাহার চাপা অশ্রুর আভাস দিগন্তস্পর্শী পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ভারে সন্নত হইয়া পড়িয়া আত্ম-বিসর্জনের মুখে উন্মুখ।

এই নাটকে সত্যই যদি কেহ অবাঙালী থাকে, তবে তাহা বাঁশরী সরকার। বিধাতা যে প্রাচীন শিলাখণ্ডে দ্রৌপদীকে গড়িয়াছিলেন, তাহারই অবশিষ্টাংশে বাঁশরী সরকার গঠিত। সে বাঙালীও নয়, আধুনিকাও নয়, সে ক্লাসিক্যাল।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাঁশরী একক হইলেও তাহার সগোত্র নারীচরিত্র আছে। ললিতা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, রত্নাবলী! কিন্তু একমাত্র দেবযানীই বোধ করি বাঁশরীর সর্বাংশে সমকক্ষ! দৃপ্ত, দর্পিত, উদ্ধত, স্বয়ং অদৃষ্টকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে উদ্যত। প্রেমের অবমাননায় ইহারা ইন্ধনহীন শিখার মতো নিষ্ঠুর নির্মম বিলাসিনী

রোমান-সম্রাজ্ঞী হইয়া উঠিতে পারে, আবার প্রেমের জন্যই ইহারা অকস্মাৎ অকাতরে সর্বস্ববিসর্জনপর অর্ধ-শাটিমাত্র-সহায় দময়ন্তীর মতো অরণ্য-অন্ধকারে নিঃশেষ আত্মবিলোপে সমর্থ।

এই নাটকে প্রেমতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যে আকস্মিক নয়; বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যে, প্রেম-তত্ত্বের এই ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুত্র আছে, ইহা রবীন্দ্র-দর্শনের একটা মৌলিক প্রয়াস।

প্রেম ও পরিণয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি? প্রণয়িনী গৃহিণী হইতে পারে কি না? অর্থাৎ প্রণয়িনীকে গৃহিণী করিলে প্রেমের প্রকৃতি অবিকৃত থাকে কি না? কিংবা প্রণয়িনী গৃহিণী হইবামাত্র প্রেমের এমন পরিবর্তন ঘটে, যাহাতে প্রণয়িনী আর প্রণয়ের পাত্র থাকে না? প্রণয়িনীর স্থান মনের মধ্যে, সেখানে তাহার কোন সীমা নাই; গৃহিণীর স্থান ঘরের মধ্যে, সেখানে পদে পদে সে সীমায়িত; এখন স্বভাবত যাহা অসীম, তাহাকে সীমার মধ্যে ভরা যায় কি না? আর ভরিলেই অসীম কি সীমাহীন থাকে? অর্থাৎ অসীম ও সীমাকে মিলাইবার কোন উপায় আছে কি না? অথবা মানুষ চিরকাল সীমা ও অসীমের মুক্তবেণীর তীরে বসিয়া পুরূরবার মতো বিরহ-রোদন করিতে থাকিবে?

"পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্য-রচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য-রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। * * * কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া লক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"[১]

রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী পাঠকের পক্ষে কবির এই স্বীকৃতির কোন আবশ্যক ছিল না। সকলেই জানেন, সীমা ও অসীমের আপেক্ষিক

১ জীবনস্মৃতি, ২৪৯-৫০ পৃঃ, ১৩৩৫।

সম্বন্ধ নির্ণয়ই রবীন্দ্র-সাহিত্যের চরম ধূয়া; রবীন্দ্রনাথ সীমার সহিত অসীমের পরিণয়ের ঘটক। রবীন্দ্র-কাব্যের ধ্রুবত্ব বিচারের সময় এই একখানি মাত্র মানদণ্ড ব্যবহৃত হইবে। যে পরিমাণে সীমা ও অসীমের সম্বন্ধ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে—তত্ত্ব হিসাবে নয়, মত হিসাবে নয়, কাব্য হিসাবে—সেই পরিমাণে রবীন্দ্র-কাব্য শাশ্বত হইবে।

সীমা অসীমের তত্ত্বকে কবি জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়াছেন, প্রেমের ক্ষেত্রেও করিয়াছেন।

প্রেম তো অসীম, কিন্তু তাহাকে ঘরে আনিতে হইলে সীমাবদ্ধ মানব-রূপে আনিতে হয়, তাহা হইলে সীমার মধ্যে অসীমের স্থান কিরূপে সম্ভব? প্রেম ও বিবাহের আপেক্ষিক সম্বন্ধ কি রকম?

ভারতীয় শাস্ত্রে ইহার গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিয়া একেবারে 'গর্ডিয়ান গন্থি' ছেদন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রেম ও বিবাহকে আদৌ এক পর্যায়ে ফেলা হয় নাই—ও-দুটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ; কখনো কোনো ক্ষেত্রে দৈবাৎ মিল ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে কাকতালীয় ন্যায়। ব্যবহারিক জীবনে প্রেমে ও বিবাহে মিল ঘটে না এবং ঘটানোর চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সেইজন্য ভারতীয় শাস্ত্রে প্রেমের ও বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক নহেন, স্বতন্ত্র; প্রেমের দেবতা মদন, বিবাহের দেবতা প্রজাপতি। ভারতীয় শাস্ত্রকারের বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা দুটাকেই স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে।

কালিদাস প্রেম ও বিবাহ দুইয়েরই গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এ দুইয়ের প্রকৃতি যে ভিন্ন তাহাও মানিতেন, সংসারে এ দুইয়ের চুলোচুলি লাগিয়াই থাকিবে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই সমস্যার একটা সমাধান তিনি করিয়া গিয়াছেন। প্রেমের ও বিবাহের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, কাজেই বিবাহ হওয়া মাত্রই ইহাদের সমন্বয় হয় না, জায়াত্বে ইহার মীমাংসা নয়, কিন্তু জায়াত্ব

যখন জননীত্বে পরিণত হয়—তখন আপনি সব বিরোধ স্নেহের সমুদ্রসঙ্গমে আসিয়া পরমা শান্তি লাভ করে। এই যুগ্ম ভাবটিকে সুবিধার জন্য 'জায়া-জননীবাদ' বলা যাইতে পারে। কালিদাসের প্রেম-বিবাহের সিদ্ধান্ত 'জায়া-জননীবাদ'।

বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের ধারণা অনুযায়ী এই সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সংসারের প্রকৃতি জানিতেন, তাঁহারা রিয়ালিস্ট ছিলেন। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের খাপ খায় না তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্যই আদর্শ প্রেমিকযুগল রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই—সামাজিক সম্বন্ধ তাঁহাদের ছিল না—বরঞ্চ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে তাঁহারা সমাজের বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। এই আদর্শে মিলনের সামাজিক বন্ধন নাই, সন্তান-সন্ততি নাই, গৃহের বাহিরে বৃন্দাবনের বনে তাহার লীলা। প্রেম মনোরাজ্যের ব্যাপার—সংসারের নয়।

মহাকবি দান্তেও প্রেমের ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; তিনি বিয়াত্রিচেকে বিবাহ করিতে চান নাই। বিয়াত্রিচে তাঁহার গৃহিণী হয় নাই বলিয়াই তাঁহাকে বৈকুণ্ঠের পথ নির্দেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রেম যে সংসারের মধ্যে থাকিলেও অবিকৃত থাকিয়া যায় অর্থাৎ প্রণয়িনী গৃহিণী হইলেও প্রেমের পরিবর্তন ঘটে না—এই ধারণা রোমান্টিক কল্পনার সৃষ্টি। প্রেম ও বিবাহের হরধনুর দুই কোটিতে গুণ পরাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় হতভাগ্য শেলির জীবন ট্রাজিক হইয়া উঠিয়াছিল।

রোমান্টিক কল্পনার উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাটি পাইয়াছেন। চিত্রাঙ্গদায় ইহার প্রথম দর্শন মেলে। অর্জুন প্রণয়িনী চিত্রাঙ্গদাকে ঘরে আনিতে চেষ্টা করিয়াছে—চিত্রাঙ্গদা জানিত, "এ প্রেমের গৃহ নাই।" গৃহে লইয়া গেলে অর্জুনের মোহভঙ্গ হইবে—সেইজন্য সে গৃহে যাইতে চাহে নাই। বর্ষভোগ্য প্রেম-লীলার শেষে আসন্ন জননী চিত্রাঙ্গদা যেদিন আত্মপ্রকাশ করিল,

সেদিনও সে গৃহে যায় নাই। এখানে প্রেম ও বিবাহের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'জায়া-জননীবাদ' সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। জায়াত্বে প্রেমের শান্তি নয়, জননীত্বে হয়তো হইলেও হইতে পারে।

বাঁশরী বলে—"মেয়েরা রিয়ালিস্ট।" বাস্তবিক মেয়েরাই রিয়ালিস্ট। চিত্রাঙ্গদা রিয়ালিস্ট—লাবণ্য রিয়ালিস্ট, বাঁশরী রিয়ালিস্ট!

শেষের কবিতাতেও এই একই প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা। অমিত নিজের জীবনে,লাবণ্য ও কেটি দুজনকেই স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছে; লাবণ্য তাহার উড়িবার আকাশ, মনের সঞ্চরণক্ষেত্র, সে নিছক প্রণয়িনী; আর কেটি তাহার বসিবার নীড়, সে গৃহিণী। অমিতের এই মানসিক সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তের ছল মাত্র, একটি মনোহারিণী মিথ্যা। রিয়ালিস্ট লাবণ্য জানে যে, অমন করিয়া জীবনকে ভাগ করিয়া চলা যায় না, সেইজন্য সে শেষের কবিতার শেষ প্রণামে অমিতের কাছ হইতে নিঃশেষে বিদায় লইয়া সর্বতোভাবে শোভনলালকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে। বক্ষ-ক্ষতের রক্তে চিহ্নিতপথ হরিণীর মতো বিবাহের পরেও পূর্বপ্রণয়ের জের টানিয়া চলে নাই।

পুরন্দর বাঁশরীর কাছ হইতে সোমশঙ্করকে ছিনাইয়া লইয়া সুষমার সঙ্গে বিবাহ দিল। সোমশঙ্কর বাঁশরীকে ভালোবাসে, ভালোবাসায় মোহ আছে, বাঁশরী সোমশঙ্করের ব্রতকে টলাইয়া দিত। বাঁশরীর সঙ্গে সোমশঙ্করের বিবাহে ইহাই আপত্তি।

বাঁশরী কেন সোমশঙ্করের ব্রত রক্ষা করিতে পারিবে না? পুরন্দর সন্ন্যাসী এত জানে, বিদেশীকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইবার মতো বিদ্যা তাহার আছে, অথচ সে কি জানে না যে, আমাদের দেশে পত্নীর প্রতিশব্দ সহধর্মিণী, সে ধর্মপালনের সহায়?

পুরন্দরের স্বপক্ষে এইটুকু বলা চলে যে, যখন সত্যই পত্নী আমাদের দেশে সহধর্মিণী ছিল, তখনকার বিবাহ রোমান্টিক

ভালোবাসার উপরে নির্ভর করিত না। বিবাহের পরে দম্পতির মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীল একপ্রকার ভাব আসিয়া পড়িত বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনব্রতে ধর্মাচরণের বিঘ্ন উৎপাদন করিত না। বাঁশরী-সোমশঙ্করের বিবাহের মূলে যে ভালোবাসা, তাহা ব্রতের অনুকূল নহে।

কিন্তু এই ব্রতের সত্যই প্রতিকূল যদি এই বিবাহে কিছু থাকে, তবে তাহা বাঁশরীর চরিত্র। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সর্বদা জীবনগ্রন্থিকে অলগ্ন করিয়া দেখিতে উদ্যত; সে বুদ্ধিবাদিনী, সন্দিগ্ধা, এক রকমের নাস্তিক। এই ধরনের মানুষ পরের কথায়,—সে কথা হোক না ভালো,—চলিতে পারে না। বিশেষত বাঁশরী অত্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিক, পরের চাপানো ব্রতকে অনায়াসে ঘাড়ে বহন করা তাহার অসাধ্য। দুঃখ সহ্য করিতে সে পরাঙ্মুখ নয়, নিজের ব্যক্তিত্ব-সাধনার জন্য সে যৎপরোনাস্তি দুঃখ বহন করিতে প্রস্তুত। তাহার এই Cynical ব্যক্তিত্বই ব্রতপালনের পক্ষে যথার্থ প্রতিকূলতা।

তারপরে পুরন্দর প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে একটা মনগড়া পার্থক্য খাড়া করিয়াছে; মূলে হয়তো পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে পার্থক্য নাই, থাকা উচিত নয়।

বাঁশরী

সন্ন্যাসী বলেছেন—"প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা, সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে তোলে। * * * প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।"

সামান্যত এ-তত্ত্ব মিথ্যা না হইলেও বিবাহের ক্ষেত্রে এ মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক—ইহা অর্ধ-সত্য। ভালোবাসা যদি ব্যক্তিগত হয়, আর প্রেম যদি সর্বজনীন হয়, তবে বিবাহিতজীবন যাপনের ফলে ব্যক্তিগত ভালোবাসাই সর্বজনীন প্রেমে পরিণত হয়, অন্তত বিবাহের আদর্শই তাহা। কিন্তু গোড়া হইতেই সর্বজনীন প্রেমের বিবাহে প্রেমও ব্যর্থ হয়, বিবাহও নিষ্ফল হয়।

এখন সমস্যাটা এই, সোমশঙ্করের মন রহিল অন্যত্র বাঁধা, আর সুষমার মনে রহিল এমন প্রেম যাহার উপরে সোমশঙ্করেরও যেমন দাবি, পাঠকের দাবিও তেমনি, এমন ক্ষেত্রে সোমশঙ্করের চলিবে কেমন করিয়া? ওদিকে সুষমার মন বাঁধা পড়িয়াছে আবার গুরু পুরন্দরের পায়ে—এরূপ মানসিক ত্রিভুজের বর্গফল কি দাঁড়ায়?

বাঁশরী

"প্রেমের সরকারী রাস্তায় যে প্রেমে সকলেরই অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখকপ্রবর, তোমার সামনে সমস্যাটা এই যে, খোলা হাওয়ায় সোমশঙ্করের পেট ভরবে কি?"

বাঁশরী বলিতে চায় যে, মোহের আশঙ্কায় পুরন্দর ভালোবাসার গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সোমশঙ্করকে সমর্পণ করিতেছে সুষমার হাতে, পরিশেষে সেই মোহই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। মোহভঙ্গের পালা যখন আসিবে, তখন কোথায় থাকিবে ব্রত, কোথায় থাকিবে সার্বজনীন বিবাহের বারোয়ারি!

বাঁশরী ক্ষিতীশকে বলিতেছে—"প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে পোড়াতে।"

ইহার টীকা করিলে দাঁড়ায়, সুষমা মনে মনে পুরন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাকে যখন সে পাইবে না, তখন তাহার কাছে সোমশঙ্করও যেমন, অপর একজন লোকও তেমনি। বরঞ্চ প্রেমের সার্বজনীন ব্যাখ্যাটা তাহার ভালোই লাগিবার কথা, কারণ স্বামীকে স্বতন্ত্রভাবে ভালোবাসিবার তাগিদ তাহাতে নাই, অন্য দশজনের মতোই সে সোমশঙ্করকে ভালোবাসিবে। কিন্তু এই ফাঁকা ভালোবাসায় দীর্ঘকাল তো সোমশঙ্করের পেট ভরিবার নয়, বিশেষ সুষমার প্রেমের 'সরকারী রাস্তা'র উপরে দশজনের দাবি সে

স্বীকার করিবে না, তখন অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? সোমশঙ্করকে এখন সুষমা দেবচরিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, পরীক্ষার মুহূর্তে তাহারই মধ্য হইতে মানবচরিত্র তৃষ্ণার্ত স্বামী বাহির হইয়া পড়িবে। রামচন্দ্রের মতো স্বামী যদি সীতার সতীত্বে সন্দিহান হইয়া থাকেন, তবে সোমশঙ্করের কাছে কী আশা করা যায়? বাঁশরীর কাছে ইহাই তাহাদের দাম্পত্য ভবিষ্যৎ।

ভালোবাসায় মোহ আছে, সেই মোহে বাঁশরী পূর্ণ—কিন্তু সন্ন্যাসীর ব্রতটাও কি একটা সূক্ষ্ম মোহ নয়?

বাঁশরী

পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন্দর

মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছে করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাঁশরী

মোহ চাই, চাই সন্ন্যাসী, নইলে সৃষ্টি কিসের। তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে—* * * আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ঙ্কর তোমাদের মোহ।

পুরন্দর

মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয়, একথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু তুমিও একথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। * * *

কোণঠাসা তার্কিকের শেষ যুক্তি সন্ন্যাসী প্রয়োগ করিয়াছে, আমার কাজ তোমার চেয়ে বড়ো। কে ইহার বিচার করিবে? বাঁশরীও তো মনে করে জগতের সকলের চেয়ে তার কাজ বড়ো, সোমশঙ্করকে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো।

বাঁশরী সুষমাকে বলিতেছে—"তুই পুরুষ নোস্, আইডিয়ার

সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।"

আসল কথা, পুরুষ আইডিয়ালিস্ট, অ্যাবস্ট্রাকশন, প্রেম লইয়া তাহার চলে; মেয়েরা রিয়ালিস্ট, তাহাদের বস্তু চাই, ব্যক্তি চাই, ভালোবাসা চাই; আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তাহাদের শেষ পর্যন্ত চলে না।

সন্ন্যাসী শাস্ত্রজ্ঞ, বাঁশরী মর্মজ্ঞ; নিজের ব্যথার মধ্য দিয়া সে সকলের মর্মকথা জানিয়া ফেলিয়াছে; সে বেদনার অন্তর্যামী।

কিন্তু আসল সমস্যার মীমাংসা হইল কই? প্রণয়িনীকে গৃহিণী ভাবে পাওয়া যায় কি না?

বাঁশরীকে সোমশঙ্করের সঙ্গে কবি বিবাহ দেন নাই। ভালোই করিয়াছেন, কারণ বাঁশরী-প্রণয়িনী সোমশঙ্কর-গৃহিণী হইলে প্রেমের মোহভঙ্গের যে আঘাত বাঁশরী পাইত, সেই আঘাত হইতে কবি তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

সোমশঙ্কর-সুষমার ভালোবাসার বিবাহ নয়, কাজেই ভালোবাসার মোহভঙ্গের ভয় নাই। কিন্তু আর এক সূক্ষ্মতর মোহ যে রহিয়া গেল। তাহাদের বিবাহে মোহের কোন স্থান নাই—এইটাই যে তাহাদের মোহ। সন্ন্যাসীর থিওরী অনুসারে মানবচরিত্র গঠিত নয়; যেদিন সোমশঙ্করের ভালোবাসার বুভুক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিবে, সেদিন কোথায় থাকিবে ব্রত, কোথায় থাকিবেন ব্রতপতি।

অনুপস্থিতে সন্ন্যাসীর পায়ে মন সঁপিয়া দিয়া অপরের ঘর-করা যে সম্ভব নয়, সুষমার এ-মোহও কি শেষ পর্যন্ত অটুট থাকিবে?

সবসুদ্ধ দেখিয়া মনে হয়, কবির এই ধারণা হইয়াছে, প্রণয়িনী-গৃহিণী একসঙ্গে পাওয়া যায় না, পাওয়ার চেষ্টা করাও উচিত নয়।

বিবাহের ভিত্তি ভালোবাসা না হইলেও চলে সোমশঙ্কর-সুষমার বিবাহ-দৃষ্টান্তে বোধকরি ইহাও কবির বক্তব্য; কিন্তু দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত অসামান্য; কারণ বর-বধূর দু'জনের মন দু'জায়গায় বাঁধা পড়িয়াছে,

এমন দৃষ্টান্ত না গ্রহণ করিলেই ভালো হইত—এমন বিবাহ কোন প্রকারেই স্থায়ী হইতে পারে না।

নাটকখানাকে গতানুগতিক শিল্পরীতি অনুসারে কমেডি বলা চলে। বাঁশরী-সোমশঙ্করের মধ্যেও শেষের দিকে একটা মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে; বাঁশরী সোমশঙ্করকে পাইল না কিন্তু তাহার ভালোবাসা পাইল। কিন্তু ওইটুকু মিল না করিলেই বোধ করি ভালো ছিল। ওইটুকুতে বাঁশরীর মহিমা যেন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; আগ্নেয়গিরির উচ্চ চূড়ায় বেদনার তাপে দেদীপ্যমান তাহার মূর্তি সান্ত্বনার ক্ষণিক মেঘে কিয়ৎপরিমাণে যেন পরিম্লান হইয়াছে; এই কৃপাটুকু কবি তাহার উপরে না করিলে কল্পনার জগতে তাহার স্থান উজ্জ্বলতর হইত; বেদনার রসই ইহার প্রকৃত রস, কারণ মূলত ইহা ট্রাজেডি।

সোমশঙ্করকে ক্ষমা না করিয়া সে যদি দেবযানীর মতো দিব্য স্পর্ধায় বলিতে পারিত, "ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে", তাহার তুচ্ছ সান্ত্বনাকে সে যদি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিতে পারিত—

"ক্ষমা কোথা মনে মোর,
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশ-কঠোর
হে ব্রাহ্মণ।"

তাহা হইলে পরম বেদনার বজ্রদীর্ণ রন্ধ্রপথে সে আরও নিবিড়ভাবে পাঠকের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিত। শিল্পলোকের সুবর্ণবহ্নিসমুজ্জ্বল মহিমার উচ্চতম সুমেরু-শিখরে তাহার আসন চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত।

শব্দসূচী